॥ প্রথম খণ্ড ॥

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক,
রামমোহন কলেজ, কলিকাতা।
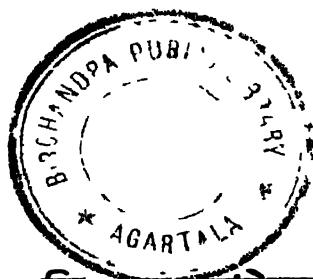
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস আছে, বাংলা সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে। প্রতিভাশালী, দীপ্তবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত বর্গ পৃথক পৃথক ভাবে এই দুই সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় সাহিত্যের যোগসূত্র কি, কিভাবে প্রাচীন সাহিত্যের ভাবধারা যুগবাহিত হইয়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা থাকিলেও, ধারাবাহিক ভাবে তাহা দেখাইবার চেষ্টা ইহার পূর্বে করা হয় নাই। 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার' শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই যোগসূত্র নির্ণয়ের প্রথম চেষ্টা। ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারই পটভূমিকায় আসিয়াছে বাংলা সাহিত্যের বিচার ও আলোচনা। পটভূমি প্রাচীন সাহিত্য, আলো তাহারই—সেই আলোকেই এই গ্রন্থে বাঙালীর উত্তরাধিকারের সমীক্ষা। ইহাকে একদিক হইতে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনাও বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলিতে আমি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্যভাষায় গ্রথিত সাহিত্য সম্ভারকেই বুঝিয়াছি। অর্থাৎ ইহা বৈদিক, সংস্কৃত মিশ্রসংস্কৃত (বৌদ্ধসংস্কৃত), পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ভাষার সাহিত্য। এই সাহিত্য সর্ব ভারতীয় যে-কোন নব্য ভাষা-সাহিত্যের সাধারণ সম্পদ ও আদি উৎস—ইহা আমাদের পিতৃ-পিতামহের মহামূল্য দায়ভাগ। আমাদের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্য-চিন্তায় ইহার প্রভাব সহজ নিশ্বাসের মত সঞ্চারিত। যুগের আবর্তনে নব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাবধারার সংস্পর্শে আসিলেও ইহার মূলে স্থায়িভাবের মত ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য। বাংলাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আছে দুইটি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট মিশ্রণ—একটি প্রাগার্য লৌকিক সংস্কৃতি, অপরটি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য বিকাশের ধারায় আর্যসংস্কৃতিতে আসিয়া ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়াছে আর্যেতর উপাদান। বৈদিক যুগেই এই মিশ্রণের লক্ষণ অতি স্পষ্ট। দর্শনে ও পুরাণে এই মিশ্রণ একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত রূপে প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রে দেখা যায় মিশ্রণের বিপরীত রূপ: উহাতে আদিমতম সংস্কৃতির উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে আর্য-সংস্কারের প্রভাব। বাংলাদেশের ধর্মে ও সাহিত্যে মিশ্রণের এই বিপরীত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

বাংলাদেশ বহুদিন প্রাগার্য জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-রাঢ় পুলিন্দ-শবরাদির আদি ভূমি। এই সূত্রে বাংলার ধর্ম-কর্ম-সাহিত্যের মূলে প্রতিষ্ঠিত লৌকিক সংস্কার। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব এদেশের মর্মমূলে প্রসারিত; মাতৃদেবতাকে

কেন্দ্র করিয়া গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে বুড়ীমা, রঙ্কিনী, বিবিধ চণ্ডীদেবী, মা-মনসা, ষষ্ঠী ও শীতলার স্থান বা থান। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দিগ্বন্দনা অংশে এই লৌকিক সংস্কারের পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান। বাংলার অধিকাংশ দেব-দেবতাও লৌকিক। ঘরজামাই ভিখারি শিব, কোপন চণ্ডী, গোঁয়ার গোবিন্দ মহাদানী কাহ্ন প্রভৃতি লোকজগতেরই চরিত্র। বৃক্ষ প্রস্তর ও জীব-জন্তুতে দেবতা-কল্পনার ভাবটিও লৌকিক। বাংলা কাব্যের জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন ও বিবাহে স্ত্রীআচারাদির বর্ণনাতেও লৌকিক সংস্কারের প্রাধান্য। এই লৌকিক সংস্কার একদিন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া বাঙালীর সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত করিয়াছিল। বাঙালীর ব্রত-পার্বণে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা ও দেবতার নামে 'হত্যা' দেওয়া জৈন প্রভাবের ফল; বাংলার রথযাত্রায়, স্নানযাত্রায় ও কতিপয় দেব-দেবতায় বৌদ্ধ প্রভাবও রহিয়াছে। এই সকল লৌকিক ভাবের উপর আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠাই বাংলার ধর্ম ও সাহিত্য বিকাশের মূলসূত্র। অন্ততঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এ উক্তি ঐতিহাসিক সত্য।

যে-কোন দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রভাব-গ্রহণের দুইটি পদ্ধতি লক্ষণীয়: একটি গতানুগতিক পথে পুরাতনের ভাব গ্রহণ, অপরটি সমন্বয়ের পথে আত্মীকরণ। দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রভাব-গ্রহণেই মৌলিকতা অধিক। অপর সাহিত্যের কতকগুলি ঘটনা বা চরিত্র বা রূপকল্প গ্রহণ করিয়া এক প্রকারে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে; তাহাকে বলা যায় অনুবাদ বা অনুকরণ। তাহাতে মৌলিক প্রতিভা-বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় না; সঞ্চারী ভাবের মত তাহা কবির সৃষ্টিকে মুহূর্তের জন্য অনুরঞ্জিত করে মাত্র। কিন্তু একটি বহিরাগত ভাব যখন স্রষ্টার মর্মস্থান অধিকার করিয়া কবির রচনা-ভাবনাকে অন্তর হইতে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে কবির সৃষ্টি স্বতঃ প্রফুল্ল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই প্রভাব স্থায়ী ভাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে নবাগত ভাবের স্পর্শে স্রষ্টার 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা' প্রজ্ঞার নব নব প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে। প্রতিভাবান কবি-চিত্তে এই ধরনের প্রভাবই গূঢ়সঞ্চারী ও সার্থক।

আলোচ্য গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার বিচারিত হইয়াছে। এই বিচারে দেখা গিয়াছে বাঙালীর মানস-চিন্তায় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব কোনক্রমেই অল্প নয়। বৌদ্ধ চর্যাগান হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পুরাতনের ঋণ প্রচুর—কোথাও ইহা অনূদিত, কোথাও বা স্বীকৃত ও সমীকৃত। বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে ও পদাবলী সাহিত্যে বেদ-পুরাণ-তন্ত্র-দর্শন-মহাকাব্যের ভাব বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত। বাংলার মঙ্গলকাব্য পুরাণের আদর্শে এদেশের জাতীয়

পুরাণ ; বাংলার অনুবাদ সাহিত্য বাঙালীকৃত নব রামায়ণ-মহাভারত ভাগবত ; বাংলার ধর্ম-দর্শন পুরাতনের আধারে ধর্ম-দর্শনের নূতন রূপ। প্রাচীন ভাবধারা কেবল উচ্চতর সাহিত্যে প্রবাহিত হয় নাই, বাংলার লোক-সাহিত্যে—বাউল-গানে, ধাঁধাঁ ও ছড়ায় পর্যন্ত কোন্ দুর্লক্ষ্য খাত বাহিয়া আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রকারে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব শোভায় ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার সমালোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই প্রদত্ত হইয়াছে। ইতিহাসের এই দিগ্‌দর্শনে প্রচলিত প্রথায় সাহিত্যের কাল-বিচারের জটিলতা বা কপোলকল্পিত কবি-পরিচিতির অবান্তর বিতর্ক যথাসম্ভব পরিহার করা হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় ও রসাস্বাদ প্রদানের চেষ্টাই মুখ্য। প্রাচীন সাহিত্যে যে অংশগুলি মধুর, সরস ও সারগর্ভ তাহাদের সানুবাদ মূল প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সাধারণ পাঠক, যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদের ঔৎসুক্য ও রসপিপাসা চরিতার্থ হইবে এবং তাঁহারা অতি সহজে তাঁহাদের প্রাচীন ঐশ্বর্যের পরিমাপ করিতেও সমর্থ হইবেন। যে সমস্ত প্রাচীন রচনা বিচার-বিতর্কের লক্ষ্যেই রচিত এবং যাহা নীরস বলিয়া পরিগণিত, এই গ্রন্থে তাহাদিগকেও যোগ্য আসন দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিয়া বাংলা সাহিত্যে উহাদের প্রভাবের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দুইটি ভাগ: প্রথম ভাগে পড়ে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যা—বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এই বিদ্যাই ভারতীয় ধর্ম জীবন ও সাহিত্যের নিয়ামক। এগুলি ধর্মসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইলেও উহাদের রসাবেদন তুচ্ছ নয়, এমন কি কোথাও কোথাও উহা সমুচ্চ শিল্পকর্মের স্বাক্ষর ও আকর। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সংস্কৃত রসসাহিত্য ও মধ্যভারতীয় অন্যান্য ভাষাসাহিত্য (পালি, বৌদ্ধসংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ)। দ্বিতীয় ভাগটিই প্রকৃত রস-সাহিত্য। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের কথা বাদ দিলে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ই রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বিতীয় ভাগের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গুরুতর। প্রাচীন বাংলার অপূর্ব প্রেমকাব্য বৈষ্ণবপদাবলী সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেম কবিতার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। নব্যযুগের বাংলা নাটক ও কাব্য-কবিতায় রস-সাহিত্যের অপরিসীম প্রভাব। বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব তো আছেই, ফল্গুস্রোতা জৈন ধর্ম-সাহিত্যের প্রভাবও অল্প নয়। বাংলা সাহিত্যে জৈনভাবের আলোচনা নাই বলিলেও চলে। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী বিদগ্ধজন ও স্নেহাস্পদ ছাত্রদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করিয়াছি। প্রথমেই মনে পড়ে সিটি কলেজের পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত দেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা। তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রদান করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। সিটি কলেজ গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক সোসাইটির সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ঋণও অপরিশোধ্য। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শচীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ দ্বারা আমি বহুল পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। এই গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন সহৃদয় বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার শব্দনির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে আমার একান্ত স্নেহের অধ্যাপক শ্রীমান সুশান্ত বসু ও অধ্যাপক শ্রীমান দিলীপ নন্দী। ডি. এম লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী অগ্রজোপম শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল দাস মজুমদার মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। মহেন্দ্র প্রেসের সুযোগ্য কর্মসচিব শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে যে পরিশ্রম ও প্রযত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমার এই শ্রমসাধ্য গ্রন্থরচনার অন্যতম প্রেরণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁহার নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতে পারিয়া আমি অশেষ তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ভাল করিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে না পারায় কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গেল। এবিষয়ে শুদ্ধিপত্র অপেক্ষা পাঠকের সাধারণ বুদ্ধি-বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি। গ্রন্থপঞ্জীতে সমস্ত গ্রন্থের নাম করা সম্ভব হয় নাই; যে-সকল আকর গ্রন্থ আমি অবলম্বন করিয়াছি যথাস্থানে তাহার কিছুটা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এই ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বলিয়া ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে সাহিত্যসেবার মনোভাব লইয়াই আমি নিষ্ঠা সহকারে অসীম পরিশ্রমসাধ্য এই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। আমার লক্ষ্য একনিষ্ঠ সেবা; সে সেবায় যদি ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তাহা মার্জনার যোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই তুলনামূলক আলোচনার নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করায় যদি আমার বর্তমান ও ভাবীকাল বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয়, তাহাই আমার সেবার পুরস্কার বলিয়া গণ্য হইবে। আমি সর্বশ্রেণীর পাঠকের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। নিবেদন ইতি।

পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা
১লা আষাঢ়,

রামমোহন কলেজ, কলিকাতা

সূচী

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. আচার্যশঙ্কর ও রামানুজ : রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

২. আমাদের পরিচয় : ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

৩. ঋগ্বেদ সংহিতা [২য় সং] : রমেশচন্দ্র দত্ত

৪. ঐতিহাসিক রহস্য : রামদাস সেন

৫. কাব্যালোক : ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

৬. গোপালবসু ফেলোশিপ লেকচার : চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

৭. গোর্খ বিজয় : বিশ্বভারতী প্রকাশিত

৮. গৌড়ের ইতিহাস [১ম, ২য়] : রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

৯. জ্ঞানসাগব [আলিরাজা] : আব্দুলকরিম সাহিত্য বিশারদ

১০. চার্বাকদর্শন : দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

১১. চিন্ময় বঙ্গ : ক্ষিতিমোহন সেন

১২. জীবনীকোষ [পৌবাণিক] : শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

১৩. তন্ত্রকথা : চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১৪. তন্ত্র-পবিচয় : সুখময় শাস্ত্রী

১৫. ধানের মঞ্জরী : মহম্মদ মনসুরউদ্দিন

১৬. ত্রয়ী : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১৭. ধ্বন্যালোক ও লোচন : কালিপদ সেন ও সুবোধ সেনগুপ্ত সম্পাদিত

১৮. নাথপন্থ : শ্রীকল্যাণী মল্লিক

১৯. পূজা-পার্বণ : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২০. পূর্ববঙ্গ গীতিকা [৪র্থ খণ্ড, ২য়] : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২১. বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাস : মোহিতলাল মজুমদার

২২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন

২৩. বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

২৪. বাঙলার বাউল : ক্ষিতিমোহন সেন

২৫. বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬. বাঙালীর ইতিহাস : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

২৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস [১ম, ২য়] : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম, ২য়, ৩য়] ডঃ সুকুমার সেন

২৯. বেদমাতা গ্রন্থাবলী. ৩ : দ্বিজদাস দত্ত

৩০. বৈষ্ণব রসসাহিত্য : খগেন্দ্রনাথ মিত্র

৩১. বৌদ্ধদের দেবদেবী : শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য

৩২. বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩৩. ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩৪. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [২য়] : অক্ষয়কুমার দত্ত

৩৫. রামায়ণ [সারানুবাদ] : শ্রীরাজশেখর বসু

৩৬. শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা : শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

৩৭. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩৮. সহজিয়া সাহিত্য : মণীন্দ্রমোহন বসু

৩৯. হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালা [১ম, ২য়] : নরেন্দ্রনাথ লাহা ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

৪০. হারামণি [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

৪১. হিন্দু ষড়্দর্শন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২. A History of Ancient Sanskrit Literature : F. Maxmuller

৪৩. A History of Indian Literature : A. Weber

৪৪. A History of Indian Literature : M. Winternitz

৪৫. An Introduction to Indian Philosophy : Dr. S. C. Chatterjee & D. M. Mitra

৪৬. Cambridge History of India : E. J. Rapson

৪৭. Eastern Lights : Mahendranath Sircar

৪৮. Early History of The Vaishnaba faith and movement in the 16th Century : Dr. S. K. De

৪৯. History of Indian Philosophy : Belvalkar and Ranade

৫০. Literary History of India : R. W. Frazer

৫১. Obscure Religious Cults : Dr. S. B. Dasgupta

৫২. Original Sanskrit Texts [O. S. T] : Muir

৫৩. Pre-historic Ancient & Hindu India : R. D. Banerjee

৫৪. Principles of Tantra : A. Avalon

৫৫. Rigveda Samhita : Edt. F. Maxmuller

৫৬. Sadhanmala : Binoytosh Bhattacharya

৫৭. The Oxford History of India : V. A. Smith

৫৮. The History of Philosophy—Eastern & Western Vol I : Dr. S. Radhakrishnan

৫৯. The story of Philosophy : Will Durant

৬০. The Religion of Man : Rabindranath Tagore

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার

॥ বৈদিক সাহিত্য ॥

বেদের প্রাচীনতা ও অপৌরুষেয়তা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতীয় সাহিত্যের নয়, বিশ্ব আর্য সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ।[১] ইহা যে কত প্রাচীন, তাহার কালসীমা নির্ণয় করা দুরূহ।

তথাপি বেদের ভাষা, ভৌগোলিক উপাদান ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ দ্বারা বিবুধ-বর্গ বৈদিক যুগের কালসীমা চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় 'সায়ণাচার্য' Maxmuller বলেন, বেদের কাল ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ: আচার্য Winternitz বলেন, অন্ততঃ ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।[২] মহামতি তিলকের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বেদ সংগৃহীত ও বিভক্ত হইয়াছিল, উহা আরও পূর্ববর্তী।

বস্তুতঃ যাহা ব্রহ্মের নিশ্বসিত, অবান্তর ঠিকুজি মিলাইয়া তাহার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা নিষ্ফল। আদি বেদ কোন মানুষের রচনা নয়, উহা অপৌরুষেয়। অনাদিকালে পরমব্রহ্মের নিশ্বাসরূপে অবলীলাক্রমে বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেদ অপৌরুষেয়—দেশীয় এই সংস্কারের প্রতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইলেও নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস,—বেদ ব্রহ্মের সহজরূপ ['ব্রহ্মণঃ সহজং রূপম্'], ইহা নিত্য অব্যয়শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মাত্মক বাক্য। ঋগ্বেদে এই শব্দকে বলা হইয়াছে 'গৌরী' [ঋ. ১.১৬৪.৪১): আচার্য সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন 'দেবগর্জনরূপ শব্দ'। আদি কল্পারম্ভে এই শব্দ বেদগর্ভ ব্রহ্মার নিকট প্রকট হইয়াছিল। ব্রহ্মা হইতে 'ঋতজাত' ঋষিগণ অনন্ত ব্যোমে ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। ঋষিগণ 'সাক্ষাৎকৃতধর্মা'। জীবনের এক একটি চরম মুহূর্তে

১। The Rigveda is the most ancient book of the Aryan world—Preface to the Rigveda Samhita. Vol IV —Maxmuller.]

[অধুনা হিত্তী ভাষায় ঋগ্বেদ হইতে প্রাচীনতর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।]

২। Vedic culture may be traced back at least to the second millenary B. C. —A Hist of, Indian Lit, Vol I

যে অক্ষর সত্য প্রকট হইয়াছে, আশ্চর্য তপশ্চর্যাবলে ঋষিগণ সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষিদৃষ্ট বেদ অপরোক্ষানুভূতির প্রকাশ, উহা দৈব প্রেরণা-লব্ধ। যে কোন মহৎ কাব্য রচনার ইহাই মূলসূত্র। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মত, তাহা কবির আয়ত্তের অতীত।' [কবি-জীবনী] এই অর্থেই বেদ অপৌরুষেয়। উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, উহা চেষ্টা প্রসূতও নয়, উহা একটি 'অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ' ঋষি বৃহস্পতি একটি মন্ত্রে এই সত্যের আভাস দিয়া বলিয়াছিলেন,

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ॥ [ঋ. ১০. ৭১. ৪]

—(অলৌকিক) বাক্‌কে কেহ দেখিয়াও দেখেন না, কেহ শুনিয়াও শুনেন না; আবার কাহারও নিকট সুবাসা পত্নী যেমন পতির নিকট দেহ অনাবৃত করে, তেমনই ইনি প্রকাশিত হন।

অপৌরুষেয় বলিয়া তো বটেই, বেদের সঠিক কাল নির্ণয়ে আরও অনেক বাধা বর্তমান। বেদের উপলব্ধি, প্রকাশ ও বিকাশ এক যুগের নয়। সৃষ্টি অনন্তকালের, আর বেদ অনাদিনিত্য। প্রথম সৃষ্টির পর অনেক প্রলয়, অনেক প্রতিসঞ্চর, অনেক কল্পান্ত হইয়াছে। প্রতি কল্পারম্ভে ঋতবাক্ ব্রহ্মার ধ্যানে 'সুপ্তপ্রবুদ্ধ ন্যায়ে'র অনুসরণে পূর্ব পূর্ব কল্পের অনুরূপ সৃষ্টিপত্তন হইয়াছে, নূতন করিয়া অনাদিনিত্য বেদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'যে চিদ্ হি পূর্ব ঋতসাপ আসন্', সেই সত্যসন্ধ ঋষিগণ ব্রহ্মা হইতে বেদ দর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী কালেও বহু ঋষির নিকট বেদ আবিভূর্ত হইয়াছে। কেহ আবার সাক্ষাৎ মন্ত্র দর্শন না করিয়া 'শ্রাবক' শিষ্যরূপে পিতা বা গুরুর নিকট হইতে বেদ লাভ করিয়াছেন।১ এইজন্য বেদের এক নাম 'শ্রুতি'। এইরূপে বেদের দর্শন, শ্রবণ ও বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ যে কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, অধুনাপ্রাপ্ত বেদে যে কত স্তব পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবে কে? বৈদিক সাহিত্যের বিপুল ব্যাপ্তি বিচার করিলেও এই সংশয়ের সত্যতা অনুমিত হয়। অগ্নিপুরাণে সমস্ত বেদকে বলা হইয়াছে 'বেদপাদপকানন'। উপমাটি সার্থক। এই

১। সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয় বভূবুঃ তে অবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতেভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ—যাস্ক।

সুবৃহৎ অরণ্যানি একদিনে সৃষ্ট হইতে পারে না। অব্দ বা অব্দশত দিয়াও ইহার ব্যাপ্তিকাল নিরূপণ করা অসম্ভব।

তবে এইটুকু বলা চলে, বর্তমানে বেদ বলিয়া গ্রন্থাকারে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা অবরকালীন শ্রাবক মুনি-ঋষিদের সংগ্রহ এবং তাহা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল।

২. বেদের সংজ্ঞার্থ ও বিষয়

জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যাপক অর্থে বেদ অখণ্ড জ্ঞানরাশি। ইহা মন্ত্র-কর্ম-জ্ঞানাত্মক সুপ্রাচীন প্রমাণ বাক্য। বেদ নিত্য, অভ্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। বেদবাক্য অখণ্ডনীয়। আচার্য সায়ণ বলেন, 'বেদবাক্যমবিতথম্।' আমরাও কথায় বলি, যে বাক্য সত্য ও অকাট্য, তাহাই বেদবাক্য। বেদ ভারতবর্ষের মর্মবাণী। ইহা এদেশের ধর্মের উৎস, কর্মের মীমাংসা, জ্ঞানের আকর। বেদ ভারতবাসীর চক্ষু, জীবনের নিয়ামক। বেদ যিনি মানেন, তিনি আস্তিক—বেদ যিনি মানেন না, তিনি নাস্তিক। এক কথায় ভারতবাসীর ঐহিক ও আমুষ্মিক আশ্রয় বেদ। বেদের প্রতি এদেশবাসীর এমনই শ্রদ্ধা যে, তাঁহারা ইহার একটি বাক্য, একটি পদ, এমন কি একটি অক্ষরকে পর্যন্ত বিকৃত হইতে দেন নাই; প্রত্যেকটি বাক্যের পদপাঠ [১], ক্রমপাঠ [২], প্রভৃতি দ্বারা বাক্যের পদসংখ্যা, অক্ষর পরিমাণ ও স্বরগাম্ভীর্যকে পর্যন্ত যথাযথ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, বেদ সনাতন প্রমাণ।

বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, সে যুগের জীবনাদর্শকে বুঝিতে হয়। বৈদিক যুগে জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল, সত্য ও জ্ঞান। 'ইরাবতী ধেনুমতী' পৃথিবীতে ঋষিগণ বলিষ্ঠ জীবন লইয়া শতায়ু হইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'জীবেম শরদঃ শতম্,' আর সেই সঙ্গে কামনা করিয়াছিলেন, দেবযান মার্গে জ্যোতির্ময় পরলোক ['অগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্'], চাহিয়াছিলেন অমৃত ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তাঁহারা দৈবশক্তিকে আহ্বান করিতেন। যজ্ঞকর্ম ছিল ঐহিক ও পারত্রিক ফললাভের উপায়। যজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহারা সমবেত হইতেন। প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে দেবতাকে আহ্বান করিয়া কেহ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, কেহ বা মন্ত্র

১। পদপাঠ—সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া প্রত্যেকটি পদের বিশ্লিষ্ট পাঠ; যেমন 'অগ্নিমীলে'র পদপাঠ "অগ্নিম্ ঈলে"।

২। পদের ক্রমানুসারে পরবর্তী পদের সহিত পূর্ববর্তী পদকে যুক্ত করিয়া যুগ্ম পদের যে পাঠ, তাহা ক্রমপাঠ; যেমন 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্'এর ক্রমপাঠ, অগ্নিমীলে। ঈলে পুরোহিতম্। ইত্যাদি।

পাঠ করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেন। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ছিল—আহুতি ও আহুতি—মন্ত্র ও ক্রিয়া।

এই দুইটি অঙ্গ লইয়া বেদের দুই প্রধান ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব সূত্রে বলা হইয়াছে, বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকেই বুঝায়—'মন্ত্রব্রাহ্মণযোর্বেদ নামধেয়ম্'; আচার্য সায়ণও বলেন, 'মন্ত্র ব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগৌ'।

৩. মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

যজ্ঞে আহুতি ও আহুতিকালে যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করা হয়, সাধারণভাবে তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। উহা মনন সাপেক্ষ। যাস্ক বলেন, 'মন্ত্রো মননাৎ'। এই মন্ত্র যজ্ঞের প্রাণবস্তু।

একটি মন্ত্রের তিনটি অঙ্গ: ঋষি, ছন্দ ও দেবতা। যাঁহার নিকট মন্ত্রটি প্রকাশিত হয়, বা যিনি মন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনিই 'ঋষি'। দৈব প্রেরণাবশে তিনি মন্ত্র দর্শন করেন। তিনিই আবার 'মন্ত্রকৃৎ', কারণ, ঋষির মাধ্যমেই তুরীয় বাক্ বৈখরী বাণীরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে দৃষ্টমন্ত্র বিশিষ্ট কোন ছন্দকে আশ্রয় করে। ছন্দ হইতেছে অক্ষর-পরিমাণ। এই অক্ষর-মাত্রাই ছন্দ। মন্ত্র মাত্রেই ছন্দ-স্পন্দিত। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ হয়, তিনি দেবতা। 'দেবত' মন্ত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ['মন্ত্রস্য বাচ্যং দেবতেতি' কিংবা 'মন্ত্রেণ স্তোতব্যে ইত্যর্থঃ'—সায়ণ]। এইরূপে প্রত্যেকটি মন্ত্রই ঋষিদৃষ্ট, ছন্দ-বিলসিত ও দেবোদ্দিষ্ট। যেমন এই একটি মন্ত্র:

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং।
মৃডা সুক্ষত্র মৃডয়॥ [ঋ. ৭. ৮৯. ১]
—হে রাজা বরুণ, মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই।
হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর।

এই মন্ত্রের ঋষি 'বসিষ্ঠ'। ইহার ছন্দ 'গায়ত্রী'। বরুণের উদ্দেশ্যে উক্ত বলিয়া ইহার দেবতা 'বরুণ'।

মন্ত্রকে 'ঋক্' বা শ্লোকও বলা হয়। ঋক্ বা শ্লোক সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু সর্বত্রই মন্ত্র সুষম ছন্দে গ্রথিত নয়। কোন কোন স্থলে উহা গদ্য-পদ্যময়, কোথাও বা শুধু গদ্য। গদ্যময় মন্ত্রের ভঙ্গি এইরূপ:

> অগ্নে জনিত্রমসি। বৃষণৌ স্থঃ। উর্বশ্যসি। আয়ুরসি। পুরূরবা অসি। গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। [শুক্ল যজু: ৫. ২]

ইহা অগ্নি-মন্থন মন্ত্র। ঋষি বলিতেছেন, তুমি অগ্নির আধার। তোমরা অভীষ্ট-বর্ষী। তুমি উর্বশী। তুমি আয়ু। তুমি পুরুরবা। গায়ত্রীছন্দে তোমাকে মন্থন করি। ত্রিষ্টুভ ছন্দে তোমাকে মন্থন করি। জগতী ছন্দে তোমাকে মন্থন করি।[১]

এই প্রকার কতকগুলি মন্ত্র, ঋক্ বা শ্লোকের সমষ্টি 'সূক্ত' (সু+উক্ত)। সূক্ত পূর্ণাঙ্গ স্তুতি। স্তুতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। একাধিক স্থলে বলা হইয়াছে, "না ব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধক্ জোষতি ত্বে' [ঋ. ১০. ১০৫. ৮]—স্তুতিরহিত যজ্ঞ পৃথক, সে যজ্ঞ দেবতার প্রীতিকর হয় না। স্তুতিদ্বারা দেবতা আহূত হন। স্তুতিকারীকে বলা হয় 'হোতা' (আহ্বাতা)। কেহ বলেন, অন্যূন তিনটি ঋক্ না থাকিলে পূর্ণাঙ্গ সূক্ত হয় না।

এইরূপ বহু মন্ত্র বা মন্ত্রের সমষ্টি অনেক সূক্ত লইয়া বেদের মন্ত্রভাগ। কতকগুলি মন্ত্র বা সূক্ত নানাদিক হইতে বিশিষ্ট; সেগুলি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত—যথা, মধুঋক্ [ঋ. ১. ৯০. ৬—৮], হংসবতী ঋক্ [ঋ. ৪. ৪০. ৫], কিংবা গায়ত্রীমন্ত্র [ঋ. ৩. ৬২. ১০] বা ত্র্যম্বক মন্ত্র [ঋ. ৭. ৫৯. ১২]। বিচ্ছিন্ন ভাবে কতকগুলি মন্ত্র যেমন বিশিষ্ট, তেমনই কতকগুলি সূক্ত। সূক্তগুলি সাধারণতঃ তত্তৎ দেবতা বা ঋষির নামে পরিচিত। দেবতার নামে বিখ্যাত সূক্তগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'দেবী সূক্ত' [ঋ. ১০. ১২৫], 'রাত্রি সূক্ত' [ঋ. ১০. ১২৭], 'হিরণ্যগর্ভ সূক্ত' [ঋ. ১০. ১২১]. 'পুরুষ সূক্ত' [ঋ. ১০. ৯০], 'শতরুদ্রিয়' [শুক্ল. যঃ. ১৬], 'পৃথিবী সূক্ত' [অথ. ১২. ১] প্রভৃতি। ঋষির নামে প্রসিদ্ধ সূক্তাবলীর মধ্যে—'সূর্যা সূক্ত' [ঋ. ১০. ৮৫], 'অঘমর্ষণ সূক্ত' [ঋ. ১০. ১৯০] বহুবিখ্যাত।

বৈদিক মন্ত্রের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিশিষ্টতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রার্থনাযুক্ত স্তুতিই মন্ত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার একদিকে আছে 'ঈলে' (প্রশংসা করি), 'আগহি' (এস), 'যজামহে' (ভজনা করি), 'ধীমহি' (ধ্যান করি), 'নমঃ' বা 'অকরং নমঃ' (নমস্কার করি)—অন্যদিকে আছে, 'রয়িং দাঃ' (অন্ন দাও), 'বলং ধেহি' (বল আধান কর), 'অসুং দধাতু' (প্রাণ দান করুন), কিংবা 'পাত স্বস্তিভিঃ' (স্বস্তিদ্বারা পালন কর), 'মা নো বধীঃ' (আমাদিগকে বধ করিও না), 'মৃড় নঃ' (আমাদিগকে রক্ষা কর), 'মা হিংসী' (হিংসা করিও না)।

১ এখানে 'উর্বশী' অধরারণি (নীচের অগ্নিমন্থন দণ্ড)। 'পুরূরবা' উত্তরারণি (অপর অগ্নিমন্থন দণ্ড)। উহাদের ঘর্ষণে আয়ু নামক অগ্নির জন্ম। মন্ত্রটিকে পুরূরবা ও উর্বশীর প্রণয় কাহিনীর উৎস বলিয়া মনে করা হয়।

স্তুতি ও প্রার্থনায় এই প্রকারের নানা অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন মন্ত্রে আবার শত্রুনাশের প্রার্থনা, কোথাও বা শান্তি, সৌভ্রাত্র ও সৌমনস্যের প্রার্থনা।

মন্ত্র ও সূক্তের সর্বত্রই দেবস্তুতি নাই। কোন কোন সূক্তে যজমান, দাতা বা রাজার স্তুতি। এগুলিকে বলা হয় 'নারাশংসী'। 'নারাশংসী' প্রকৃত পক্ষে কীর্তিমান নরের প্রশংসা [-'নরৈঃ শস্যমানত্বাৎ নরাশংসত্বম্'—সায়ণ]। দানকে উপলক্ষ করিয়া যে স্তুতি, তাহার নাম 'দানস্তুতি'। কতকগুলি সূক্তের নাম 'আখ্যান সূক্ত' বা 'সংবাদ স্তোত্র' ['Narratives in forms of dialogues'-Winternitz]—যেমন, পুরূরব. ও উর্বশী সংবাদ [ঋ. ১০. ৯৫], যম ও যমীর কথোপকথন [ঋ. ১০. ১০]। এগুলি অতি পুরাতন কাহিনী-বীজ। নারাশংসী ও আখ্যান-সূক্ত ইতিহাস ও পুরাণ মিশ্র।

এই প্রসঙ্গে বেদের ভাববৃত্তিমূলক ও সৃষ্টি-বিষয়ক সূক্ত গুলিও উল্লেখযোগ্য। এই সূক্তাবলীর ভিতর বৈদিক যুগের নীতি, সদ্ভাব ও দার্শনিক চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্ত' [ঋ. ১০. ১২৯] ও অথর্ব বেদের 'রোহিত সূক্ত' [অ. ১৩. ১] সৃষ্টিতত্ত্বের রূপায়ণ। বৈদিক 'ব্রহ্মোদ্য সূক্ত'[১] গুলিও বিচিত্র। এগুলি প্রহেলিকা জাতীয় প্রশ্নোত্তর। ঋগ্বেদের ১. ১৬৪ সূক্ত, শুক্ল যজুর্বেদের ২৩. ৪৫-৬২, অথর্ব বেদের ১১. ১০—এই প্রকার ব্রহ্মোদ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রকার বহু বিচিত্র মন্ত্র বা সূক্তের সমষ্টি লইয়া বেদের মন্ত্রভাগ। মন্ত্র বা সূক্তের সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'সংহিতা'। সংহিতাই মূল বেদ। বেদের অপরাপর অংশ সংহিতার সম্প্রসারণ মাত্র। 'ব্রাহ্মণ' সংহিতার ভাষ্য, 'উপনিষৎ' সংহিতোক্ত দর্শনতত্ত্বের আলোচনা, 'বেদাঙ্গ'ও সংহিতোক্ত মন্ত্রের স্বরত্ব, মিতত্ব ও বিনিয়োগের প্রসঙ্গ মাত্র। সংহিতাই বেদ-জ্ঞানের আকর এবং প্রাচীনত্বের দিক হইতেও সুপ্রাচীন।

৪. সংহিতা-পরিচয়

প্রথমে সমগ্র বেদ ছিল এক ও অখণ্ড। মানুষের শ্রুতিশক্তি প্রখর ছিল, স্মৃতিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। শ্রুতির সাহায্যে বেদ শ্রবণ করিয়া স্মৃতির সাহায্যে বেদ মনে রাখা হইত। কালক্রমে লোকের স্মরণশক্তি হ্রাস পাইল, বিপুলায়তন বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হইতে বসিল। মনুষ্যের শক্তি ও পরমায়ুর ক্ষীণতা দেখিয়া বিদ্বান দ্বৈপায়ন

১। 'উত্তর-প্রত্যুত্তরৈঃ পরস্পরং সংবাদঃ ব্রহ্মোদ্যম্' [যজুঃ টীকা. ২৩. ৪৫—উব বট]; যজ্ঞকালে হোতা ও অধ্বর্যু, কিংবা যজমান ও যাজক, কিংবা সদস্যদের মধ্যে জ্ঞান-রহস্য বিষয়ে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক আলোচনা হইত, তাহাই ব্রহ্মোদ্য।

বেদরক্ষার নিমিত্ত 'সমস্ত' (অবিভক্ত) বেদকে 'ব্যস্ত' (বিভক্ত) করিয়া চারিটি সংহিতা করিলেন এবং তাঁহার চারিজন বেদপারগ শিষ্য—পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী ও সুমন্তকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ উপদেশ করিলেন। নিখিল বেদের 'ব্যাস' বা বিভাগ করার জন্য মহর্ষি দ্বৈপায়নের নাম হয় 'বেদব্যাস'।

অধুনা বেদের ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব—এই চারিটি সংহিতাই প্রচলিত। কিন্তু অনেকেই বলেন, পূর্বে বেদ ছিল তিনটি—ঋক্, যজুঃ ও সাম; অথর্ব বেদ পরবর্তীকালের যোজনা। বেদের 'ত্রয়ী' নামকরণটিই এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও 'ত্রয়ী' বা ত্রিবেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, 'দেবী ত্রয়ী' [মধ্যম চরিত. ৪.১০] অর্থাৎ তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের ললিত পাঠসমূহের মূল; চার্বাক দর্শনে 'ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ' বলিয়া বেদকর্তাদের নিন্দা করা হইয়াছে; সুপ্রাচীন পালি সাহিত্যেও বলা হইয়াছে 'তেবিজ্জো হোদি বাম্ভনো'। কিন্তু এসকল স্থলে 'ত্রয়ী' 'ত্রয়' বা 'তে' শব্দগুলি বেদের সংখ্যার নিরূপক নয়, উহা বেদ-লক্ষণের নির্দেশক। বেদের মন্ত্রগুলি ত্রিলক্ষণাক্রান্ত; কোন মন্ত্র পদ্য, কোন মন্ত্র গান, কোন মন্ত্র বা গদ্য। পদ্যাংশ ঋক্, গীতাংশ সাম এবং গদ্যাংশ যজুঃ। তাই বেদকে বলা হয় 'ত্রয়ী'। আথর্বণ মন্ত্রের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ ছিল না, উহা ছিল ঋক-সাম-যজুঃ এর মিলিত রূপ। প্রকারান্তরে উহা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জন্য বেদ ত্রয়ী নামেই অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—চারি প্রকার মন্ত্রেরই প্রয়োগ ছিল, প্রয়োগকর্তাও ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন। যজ্ঞ ছিল বৈদিক ক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ। 'সর্বকামধুক্', 'অমৃত চেতন' যজ্ঞের জন্যই বেদের আবির্ভাব—'বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ'। শুক্ল যজুর্বেদে এই যজ্ঞকে বলা হইয়াছে 'চতুঃ শৃঙ্গঃ' [শু. যঃ ১৭. ৯১] —আচার্য মহীধর বলেন 'চত্বারো বেদাঃ শৃঙ্গানি'—চতুর্বেদই এই শৃঙ্গ। প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে কেহ দেবোদ্দেশে স্তব করিতেন, কেহ যজ্ঞশরীর নির্মাণ করিতেন, কেহ রম্যপদ গান করিতেন, কেহ বা যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিতেন। যাঁহারা যজ্ঞকর্মে এই সকল অংশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে বলা হইত—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বলা হইতেছে, 'ঋগ্বেদেন হোতা করোতি সামবেদেনোদ্গাতা যজুর্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ সর্বৈর্ব্রহ্মা'। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে,—একজন ঋকসমূহ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করেন, কেহ গায়ত্রীছন্দে সামগান করেন, ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্তাদি কার্যের কথা বলেন, এবং কেহ যজ্ঞের

'মাত্রা' অর্থাৎ যজ্ঞশরীর নির্মাণ করেন।[১] গোপথ ব্রাহ্মণে কেবল চারি বেদের কথা স্বীকার করা হয় নাই, চতুর্বেদ হইতে নিত্য পাঠ্য প্রথম চারিটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে [গোপথ পূর্বার্ধ ১.২৯]

তবে একথা ঠিক, অথর্ববেদ পূর্বে অপাঙক্তেয় ছিল, অন্ততঃ ইহা সংহিতার মর্যাদা লাভ করে নাই। অথর্ব বেদকে বেদও বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'অথর্বাঙ্গিরস' বা 'আথর্বণ' বা 'ভৃগ্বঙ্গিরস'। ইহার কারণ পরে আলোচনা করা হইবে। এখানে বক্তব্য এই যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঋগ্বিধান, যজুর্বিধান, সামবিধান ও অথর্ব বিধানের প্রয়োগ ছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিধানের মন্ত্রগুলি ছিল অবিভক্ত। ঋষি বেদব্যাস এই বিধানগুলিকে পৃথক করিয়া ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা সঙ্কলন করিয়া চারিজন শ্রাবক শিষ্যকে প্রদান করেন। এই শ্রাবক ও তস্য শ্রাবক পরম্পরায় চারি বেদ কালক্রমে সহস্রাধিক শাখায় বিভক্ত হওয়ায় 'বেদপাদপকানন' সৃষ্টি হইয়াছে।[২]

(খ) ঋগ্বেদ সংহিতা

ব্রহ্মর্ষি পৈল বেদব্যাস হইতে ঋগ্বেদসংহিতা প্রাপ্ত হইয়া উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং তাঁহাব দুই শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে প্রদান করেন। বাস্কল হইতে ঋগ্বেদের বাস্কল শাখা প্রচাবিত হয়। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতেও অনেক শাখা-প্রতিশাখার বিস্তার হয়, তন্মধ্যে শাকল্য ঋষিব 'শাকল্য সংহিতা' বিখ্যাত। বর্তমানে ঋগ্বেদের শাকল শাখাই বহু প্রচলিত।

বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে ঋক্‌সংহিতা নানাদিক হইতে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভাষার প্রাচীনত্ব, গভীর অনুভূতির বলিষ্ঠ প্রকাশ ও ছন্দস্পন্দিত কবিত্ব এই সংহিতার প্রধান বিশেষত্ব। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের প্রতিনিধি ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ একটি প্রবৃদ্ধ বটবৃক্ষ। বিরাট বনস্পতি যেমন বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, বহু জট মেলিয়া বনমধ্যে সন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকে, ভারতবর্ষের হোম-তপোবনে তেমনই উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান এই প্রবৃদ্ধ জটিল বট।

১ ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ [ঋ. ১০. ৭১. ১১]

সোঽয়মেকো যথা বেদস্তরুস্তেন পৃথক্‌কৃতঃ।
চতুর্ধা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননম্। [অগ্নি ৩.৪]

ভারতের সনাতন ধর্ম ও কর্ম, দর্শন ও ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যের উৎস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদকে বলা হয় 'বহ্বৃচ সংহিতা'; বহুসংখ্যক ঋকের সমষ্টি বলিয়াই এই সার্থক নামকরণ। অন্যান্য বৈদিক সংহিতা বহুল পরিমাণে এই বহ্বৃচ ভাণ্ডারের নিকট ঋণী। সামবেদের অধিকাংশ গান ঋগ্বেদের ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও পবমান সোম সূক্তাবলীর অন্তর্গত: যজুর্বেদের গদ্যাংশ নিজস্ব, কিন্তু পদ্যাংশের অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে অভিন্ন; অথর্ববেদের আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত।

শাকল শাখার ঋগ্বেদ সংহিতায় মোট ১০১৭টি সূক্ত। সম্পাদক **Maxmuller** অতিরিক্ত ১১টি 'বালখিল্য' সূক্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এই সূক্তগুলির কোন ভাষ্য করেন নাই। মনে হয়, বালখিল্য সূক্তগুলি শাকল শাখাভুক্ত নয়। এগুলি ছাড়া, পরিশিষ্টরূপে আরও কতগুলি মন্ত্র ও সূক্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এগুলিকে বলা হয় 'খিল সূক্ত'। এগুলিও মূল সংহিতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি কোথাও অষ্টক-অধ্যায়ে, কোথাও বা মণ্ডল-অনুবাকে বিভক্ত অর্থাৎ কোথাও এগুলিকে আটটি অষ্টকে, ৬৪ অধ্যায়ে, ২০০০ বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে; কোথাও আবার ১০টি মণ্ডলে, ১০০ অনুবাকে সজ্জিত করা হইয়াছে। মণ্ডল-বিভাগটিই প্রচলিত ও বিখ্যাত। এই মতে ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত।

প্রথম মণ্ডলে মোট ১৯১টি সূক্ত। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের ঋষিগণ এই সূক্তগুলির স্রষ্টা। ঋষির নামানুসারে তদ্দৃষ্ট সূক্তগুলি পর পর বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রধান ঋষিদের মধ্যে আছেন মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, কণ্ব, গোতম, কুৎস, দীর্ঘতমা ও অগস্ত্য প্রভৃতি। সূচনায় বিশ্বামিত্রপুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দা গায়ত্রীছন্দে অগ্নিদেবতার স্তুতি উচ্চারণ করিতেছেন:

> অগ্নিমীলে পুরোহিতং
> যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
> হোতারং রত্নধাতমম্॥ [ঋ. ১. ১]
>
> —অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি। [অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত]

ইহাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋক্। হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে এই মন্ত্রটি প্রথম উচ্চারিত হয়। এই মণ্ডলের আরও অনেক ঋক্ অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ঋষি মেধাতিথি-দৃষ্ট বিষ্ণুমন্ত্র বা বৈষ্ণবী সংহিতা—'ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে' মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ মনে করেন, ইহা ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পৌরাণিক পরিকল্পনার অঙ্কুর। এই সূক্তেরই অন্তর্গত হিন্দুর বিখ্যাত বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্র :

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্‌॥ [ঋ. ১. ২২. ২০]

—আকাশে চক্ষু যেমন অবাধিত ভাবে দেখিয়া থাকে, সংযত তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বিষ্ণুর পরম পদ সেইরূপ দেখিয়া থাকেন।

গোতম ঋষির মধুঋক্‌ গুলিও প্রথম মণ্ডলে স্থান লাভ করিয়াছে। তিনটি ঋকের সমষ্টি এই মধুশ্লোক, ইহা পংক্তিপাবন 'ত্রিমধু' নামে বিখ্যাত। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবী ও বিশ্বপ্রকৃতি নীরস নয়; পৃথিবী মধুক্ষরা, তাহার সর্বত্র মধুর ক্ষরণ; বাতাস, বনস্পতি, সূর্য, সিন্ধু—এমন কি মাটির ধূলিও মধুময়। ঋষি বলিতেছেন,

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্‌ নো বনস্পতি র্মধু মাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥ [ঋ. ১. ৯০. ৬-৮]

—'মধু বহিতেছে সকল বাতাস। মধু ক্ষরিতেছে নদ ও নদী।
মধু হউক আমাদের ওষধি সকল।
মধু হউক রজনী ও উষা। মধু হউক পৃথিবীর ধূলিকণা। মধু হউক আমাদের পালয়িতা ওই দ্যুলোক।
মধু হউক আমাদের বনস্পতি। মধু হউক ঐ সূর্য। মধু হউক আমাদের ধেনুগণ। [অনুবাদ ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত][১]

গোতম ঋষির প্রার্থনা মন্ত্রগুলি সত্যই সুন্দর। দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত স্তুতি। স্বস্তি প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিতেছেন :

স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ [ঋ. ১. ৮৯. ৬]

১। আমাদের পরিচয়—ডঃ দাশগুপ্ত

—প্রভূত অন্নদাতা ইন্দ্র আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন, সকল জ্ঞানে জ্ঞানবান্ পুষা আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন। অহিংসিত নেমি গরুড় আমাদের স্বস্তি বিধান করুন, বৃহস্পতি আমাদের স্বস্তি বিধান করুন।

শুধু তাই নয়, যষ্টব্য দেবতার কৃপায় আমরা যেন কর্ণে ভদ্র বাক্যই শ্রবণ করি, নয়ন ভরিয়া যেন ভদ্র কল্যাণকেই দর্শন করি :

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা

ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ। [ঋ. ১. ৮৯. ৮]

দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত মণ্ডলগুলিকে 'গোষ্ঠীমণ্ডল' বলা হয়। ইহাদের এক এক মণ্ডলে কোন একজন বিশিষ্ট গোত্র-প্রবর্তক ঋষি বা তাঁহার পুত্র বা শিষ্যের দৃষ্ট সূক্তগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গোষ্ঠীগতভাবে মন্ত্রগুলির বিন্যাস দেখিয়া মনে হয়, এক এক গোষ্ঠীর মন্ত্র সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই রক্ষিত হইত এবং বংশধরগণ শ্রদ্ধা সহকারে মন্ত্রগুলি স্মরণ রাখিতেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের গোষ্ঠীপতি ঋষি গৃৎসমদ। এই মণ্ডলে ৪৩টি সূক্ত : তন্মধ্যে ৩৯টি সূক্তই গৃৎসমদের, কেবল ৪র্থ হইতে ৭ম সূক্ত—এই চারিটি ভৃগুপুত্র সোমাহুতির। ঋষি গৃৎসমদের সূক্তগুলি নাদগভীর ও ভাবগম্ভীর। একটি সূক্তে [ঋ. ২. ১২] 'স জনাস ইন্দ্রঃ'—হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র—এই ধ্রুয়াসহ তিনি ইন্দ্রের যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। ইন্দ্র ভীষণ, তাঁহার ভয়ে কম্পমান্ আকাশ পৃথিবী, পর্বত ; তিনি 'অচ্যুতচ্যুৎ'—স্থিরকেও অস্থির করিয়া তুলেন। যেমন ইন্দ্র, তেমনি দেবতা রুদ্র। রুদ্রও উগ্র এবং হিংস্র পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর [ঋ. ২. ৩৩]। গৃৎসমদের মতে সকল দেবতাই গূঢ়স্বভাব।

তৃতীয় মণ্ডলের ঋষিপ্রধান মহাতেজা বিশ্বামিত্র। তিনিই এই মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের দ্রষ্টা। তদ্গোত্রীয় অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে উৎকীল, ঋষভ, প্রজাপতি (বিশ্বামিত্র পুত্র) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডলের মোট সূক্ত সংখ্যা ৬২। এই দ্বিষষ্টিতম সূক্তের দশম ঋকটিই হিন্দুর প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র। 'দধিনীব সর্পিঃ'—বেদরূপ দধির সার এই ত্রিপদ গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রে ঋষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী ছন্দে সবিতা দেবের বরণীয় তেজকে ধ্যান করিয়া বলিয়াছেন,

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ [ঋ. ৩. ৬২. ১০]

—সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। [অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র]

এই মণ্ডলের ৩৩নং সূক্তটি ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান। অমিতপ্রভ বিশ্বামিত্র স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের পারাপারের নিমিত্ত যে প্রবলস্রোতা বিপাশা ও শতদ্রু নদীর স্রোতকে মন্দীভূত করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত এই সূক্তে আছে। বিশ্বামিত্রের স্তুতিগুলি উগ্রসংগ্রামে জয়ী হইবার প্রার্থনায় পূর্ণ—সর্বত্রই বলিষ্ঠ মনের প্রকাশ। অগ্নির মধ্যে তিনি দেখেন দুর্দমনীয় তেজ—গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম, প্রদীপ্ত শিখা যাঁহার কেশর। ইন্দ্রও তাঁহার দৃষ্টিতে মহাভয়ঙ্কর মহিষ ['মহাঁ অসি মহিষ'—ঋ. ৩. ৪৬. ২]।

চতুর্থ মণ্ডলের গোষ্ঠীপতি ঋষি বামদেব। এই মণ্ডলে মোট ৫৮টি সূক্ত। অধিকাংশ সূক্তের দ্রষ্টা বামদেব স্বয়ং। কেবল দুই একটি সূক্তের ঋষিরূপে ত্রসদস্যু, অজমীল্হ ও পুরুমীল্হের নাম দৃষ্ট হয়। বামদেবের মতে 'স্তুতি'ই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—ইহা যেমন গূঢ়, তেমনি অভীষ্টবর্ষী : স্তুতি যেন সহস্র ধারাবতী কামধেনু। দেবগণ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করেন। 'ঋত'-দেবতার উদ্দেশ্যে বামদেবের স্তুতি [ঋ. ৪. ২৩. ৮-১০] অতি সুন্দর। 'ঋত' শব্দটি সুপ্রাচীন। Maxmuller বলেন, সর্বশক্তিমান পরমাত্মার অতি আদিম বৈদিক নাম 'ঋত'—ইহা সত্যগতি, সত্যকর্ম ও সরল পথ,—এক কথায় ইহাই ধর্মনীতি। ঋষি বামদেব বলিতেছেন, ঋতদেবতার অনেক তেজ, অনেক শক্তি, বিচিত্র রূপ :

ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে
ঋতায় ধেনূ পরমে দুহাতে॥ [ঋ. ৪. ২৩. ১০]

—বিস্তীর্ণ (বহুলে) দুরবগাহ্য দ্যাবাপৃথিবী (পৃথ্বী) ঋত দেবেরই জন্য। অত্যাশ্চর্য (পরমে) ধেনুরূপা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের সেবার জন্যই অন্নজল দান করেন (দুহাতে) [অনুবাদ—দ্বিজদাস দত্ত]। বামদেব-দৃষ্ট 'হংসঃ শুচিষৎ' ঋকটিও [ঋ. ৪. ৪০. ৫] বিখ্যাত। এই শ্লোক কঠোপনিষদেও স্থান পাইয়াছে। মন্ত্রটি "হংসবতী ঋক্' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পঞ্চম মণ্ডলের মোট সূক্ত সংখ্যা ৮৭। এই মণ্ডলের প্রধান ঋষি অত্রি। অত্রি-দৃষ্ট সূক্তসংখ্যা অতি অল্প : বেশির ভাগ সূক্ত অত্রির অপত্য ভৌম, স্বস্তি, শ্যাবাশ্ব প্রভৃতি ঋষির। ইহাতে কয়েকটি বিখ্যাত 'নারাসংশী' আছে। ঋষি অত্রির নারাসংশীতে [ঋ. ৫. ২৭] ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যুর প্রশংসা দৃষ্ট হয়। ৬১নং সূক্তে ঋষি শ্যাবাশ্ব বীর তরন্তের পত্নী শশীয়সীর প্রশংসা করিয়াছেন।

এই মণ্ডলের ২৮নং সূক্তের দ্রষ্টা অত্রিগোত্রজা মহিলা ঋষি 'বিশ্ববারা'। বৈদিক নারীরও যে যজ্ঞকর্মে অধিকার ছিল, তাঁহারাও যে দিব্য অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন বিশ্ববারা-দৃষ্ট অগ্নিসূক্ত তাহার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন:

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ
প্রত্যঙ্ উষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভি-
র্দেবা ইলানা হবিষা ঘৃতাচী॥ [ঋ. ৫. ২৮. ১]

—প্রজ্বলিত এই অগ্নি আকাশের দিকে তাহার শিখা বিস্তার করিয়া উষার অভিমুখে প্রদীপ্ত হইয়াছেন। অর্চনারতা, ঘৃতপাত্রহস্তা বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হইয়া স্তুতি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অগ্নির নিকট বিশ্ববারার প্রার্থনাটিও সুন্দর: তিনি বলিতেছেন, হে অগ্নি, তুমি শত্রুগণকে দমন কর। আমাদের যেন মহৎ সৌভাগ্য লাভ হয়, তুমি আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর: 'সংজাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব॥' [ঋ. ৫. ২৮. ৩]

ষষ্ঠ মণ্ডলের গোত্রপ্রধান ঋষি ভরদ্বাজ। এই মণ্ডলে ৭৫টি সূক্ত আছে। ভরদ্বাজ ও তদগোত্রীয় সুহোত্র, নর, শংযু, গর্গ প্রভৃতি সূক্তগুলির দ্রষ্টা। অনেকগুলি সূক্তের শেষে একই প্রার্থনা—'আমরা যেন শোভন সন্ততি সম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত সুখভোগ করি।' একটি ঋকে ঋষি গর্গ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ইন্দ্রমায়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন। একই ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে বিভাসিত:

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ দশাশতঃ॥ [ঋ. ৬. ৪৭. ১৮]

—সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন,
এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন।
তিনি মায়া দ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হয়েন।
তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। [অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত]

ঋষি গর্গের এই ঋকটিকে বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মধুবিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ, সকল রূপের অন্তরালে সেই অরূপই মধু বা অমৃতের উৎস। তাঁহাকে জানিলেই অমৃতের স্বরূপ জানা যায়।

এই মণ্ডলের অন্তর্গত ঋষি ভরদ্বাজের 'ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়া' [ঋ. ৬. ৭০. ১] মন্ত্রটিও অতি সুন্দর। বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে দ্যাবাপৃথিবী মধুময়। ঋষি বলিতেছেন, দ্যাবাপৃথিবী ঘৃতবতী ও মধুদুঘা, তাঁহারা দেবতারূপে আমাদিগকে যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবর্ণ দান করেন।

সপ্তম মণ্ডলের গোষ্ঠীপতি মহর্ষি বসিষ্ঠ। এই মণ্ডলের মোট ১০৪টি সূক্তেরই দ্রষ্টা বসিষ্ঠ। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, 'বসিষ্ঠের পাপঅনুশোচনা ও ধর্মপিপাসা পবিত্রভাবে হৃদয় প্লাবিত করে।' উক্তিটি এক হিসাবে সত্য। অবশ্য বৈদিক সূক্তের ঋষিমাত্রই শ্রীকাম কিংবা মেধাকাম: প্রায় প্রতি সূক্তেই প্রার্থনা বা কামনা। সেই প্রার্থনাই বসিষ্ঠ-সূক্তাবলীতে অতি উচ্চ গ্রামে ছন্দিত হইয়াছে। শুধু নিজের জন্য নয়, পুত্র-পৌত্রাদির জন্য ধন, যশ ও রক্ষা প্রার্থনায় ঋষিকণ্ঠ অধীর। 'মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়' [ঋ. ৭. ৮৯]—হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর, কিংবা অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতার নিকট 'যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ' —তোমরা স্বস্তি দ্বারা সদা আমাদিগকে পালন কর—ইহাই প্রায় প্রতিটি সূক্তের সূক্তান্তিক ধ্রুবপদ।

বসিষ্ঠ-দৃষ্ট উষা সূক্তগুলিও চমৎকার কবিতা। 'হিরণ্য বর্ণা সুদৃশী' উষার আবির্ভাব এক অপার বিস্ময় [৭. ৭৫—৮১]। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ঋষি বসিষ্ঠের ত্র্যম্বক মন্ত্র। বিশ্বামিত্র-দৃষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রের মতই ইহা শক্তিশালী। শৈব ও শাক্ত সাধকের নিকট এই মন্ত্রের অশেষ সমাদর। মন্ত্রটি এই—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ [ঋ. ৭, ৫৯. ১২]

—সুগন্ধি, পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের উপাসনা করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা বন্ধন ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

মহর্ষি শৌনক বলেন, এই ত্র্যম্বক মন্ত্র নিয়ম করিয়া শতপর্ব জপ করিলে শত বর্ষ সুখকর পরমায়ু লাভ হয়,

সমুদ্দিশ্য মহাদেবং ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকে ত্বৃচা
এতৎ পর্বশতং কৃত্বা জীবেৎ বর্ষশতং সুখী॥ [ঋগ্বিধান. ২. ২৭.]

অষ্টম মণ্ডলকে 'প্রগাথ' মণ্ডল বলে। কারণ প্রগাথ নামক এক প্রকার মিশ্রছন্দে মন্ত্রগুলি গ্রথিত। প্রগাথ একজন ঋষিও বটেন: ইনি ঘোর ঋষির পুত্র হইলেও কণ্বের পুত্র বলিয়া পরিচিত।[১] রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে 'কণ্ব' বা তদ্বংশীয়গণ অষ্টম

১। 'স ঘোরঃসভ্রাতুঃ কণ্বস্য পুত্রতামগাৎ'—সায়ণ

মণ্ডলের ঋষি। কিন্তু এই মত যুক্তিসহ নহে। কারণ, কণ্বগোত্রীয় ঋষি ছাড়াও এই মণ্ডলে অঙ্গিরা গোত্রীয় বৈয়শ্ব, অত্রি-কন্যা অপালা এবং ভৃগুবংশের নেম, জমদগ্নি প্রভৃতির সূক্তও আছে। অতি প্রাচীন কয়েকজন ঋষি—নারদ, মনু, নাভাগ প্রভৃতির স্তোত্রও এই মণ্ডলের অন্তর্গত। উপরন্তু 'বালখিল্য' সূক্তগুলিও এই মণ্ডলের অন্তর্গত। অষ্টম মণ্ডল সকল দিক হইতেই মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত। অনেকে মনে করেন, এই মণ্ডল লইয়াই ঋগ্বেদ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১১টি বালখিল্য সূক্তসহ এই মণ্ডলে ১০৩টি সূক্ত আছে। এই মণ্ডলে মনু ঋষি-দৃষ্ট সূক্তগুলি অতি সুন্দর। দেবতার স্তবে তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন: স্তোতমান্ দেবতা অভীষ্টবর্ষী, তাঁহাদের ভিতর ছোট-বড় নাই, সকলেই মহান ['বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ'—ঋ. ৮. ৩০, ১] এই দেবতার নিকট ঋষির প্রার্থনা,

তে নস্ত্রাধ্বং তেঽবত ত উনো অধি বোচত।

মা নঃ পথঃ পিত্র্যাৎ মানবাৎ অধিদূরং নৈষ্ট পরাবতঃ॥ [ঋ. ৮. ৩০. ৩]

—তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, রক্ষা কর—আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল, পিতৃলোকের পথ হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করি ও না।

আর একটি মন্ত্রে ঋষি মেধ্য একই দেবতার বহুরূপে প্রকাশের কথা ব্যক্ত করিতেছেন:

এক এবাগ্নি র্বহুধা সমিদ্ধ

একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।

একৈবোষা সর্বমিদং বিভাতি

একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্॥ [ঋ. ৮. ৫৮ ২]

—এক অগ্নি বহুধা প্রজ্বলিত, এক সূর্য বহুরূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট ও একই উষা নানাভাবে ভাস্বর, যিনি এক, তিনিই সর্ব হইয়া আছেন।[২]

নবম মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মোট ১১৪টি সূক্তের দেবতাই পবমান সোম। এইজন্য ইহাকে সোমমণ্ডল বলা হয়। সোম দেবতার সূক্ত অন্যান্য মণ্ডলেও আছে। তবুও বিশেষভাবে কতকগুলি সোমস্তুতি এই মণ্ডলে সমাহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগে সোমযাগ ছিল অন্যতম যাগ: প্রায় প্রত্যেক যজ্ঞেই দেবতার উদ্দেশ্যে সোম নিবেদন করা হইত। সোমলতার মধ্যে ঋষিগণ অমেয় তেজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সোমরস মানুষকে দিব্যলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে: সোমের উদ্দেশ্যে তাই তাঁহাদের প্রার্থনা:

২। এই মন্ত্রটি বালখিল্য সূক্তাবলীর অন্তর্গত দশম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র।

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্য হ্বতীরাপে স্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥
যত্রা নু কামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্ত স্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামা স্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দোপরিস্রব ॥ [ঋ. ৯. ১১৩. ৭-১১]

—যে লোকে অবিনশ্বর অজস্র জ্যোতি, যে লোকে আদিত্যাখ্য আলো নিহিত, হে পবমান, আমাকে সেই অক্ষীণ লোকে লইয়া যাও। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যেখানে আছেন রাজা বৈবস্বত, যাহা স্বর্গের দ্বার ; যেখানে আছে আকাশ-গঙ্গাদি পুণ্য সরিৎ—সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যে দ্যুলোকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন স্থানই বর্তমান, যেখানে বিষ্ণুর পরম পদ, অপিচ যে লোক পরম জ্যোতির্ময়—সেই উত্তম লোকে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যেখানে সকল কামনার শেষ, যেখানে সকল কর্মের প্রেরণা-উৎস আদিত্যের স্থান ; যেখানে স্বধা, যেখানে তৃপ্তি, সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ, যেখানে সকল কামনা পূর্ণকাম—সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

এই সূক্তটিতে বৈদিক যুগের স্বর্গ-কল্পনার একটি সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল প্রথম মণ্ডলের মতই নানা গোত্রীয় ঋষিদের স্তুতির সমষ্টি। অনেকে বলেন দশম মণ্ডলটি পরবর্তী কালের সংযোজন। কোন কোন সূক্তের সরলীকৃত ভাষাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। দশম মণ্ডলের দর্শনকাল বা সঙ্কলনকাল যাহাই হউক, এই মণ্ডলের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। ইহাতে মোট ১৯১টি সূক্ত আছে [প্রথম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যাও ১৯১]। ইহার ঋষি অনেক—ত্রিত, ত্রিশিরা বিমদ, কবষ, লুশ, ঘোষা, বাক্, বৃহদুক্থ গয়, অঙ্গ, বেন, অত্রি, জমদগ্নি প্রভৃতি। কয়েকটি সূক্তের দেবতাই ঋষি, যেমন যম, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা। বিশ্বকর্মা, বৃহস্পতি সূর্য্যও কয়েকটি সূক্তের দ্রষ্টা। এই মণ্ডলের বিষয়বৈচিত্র্যও অসাধারণ। সামান্য অক্ষক্রীড়াও যেমন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে [১০.৩৪], তেমনই অনেক গভীর ও গম্ভীর ভাববৃত্তি—শ্রদ্ধা, দান ও সত্যোক্তি ও সৃষ্টির বিষয়ও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। অতি বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদস্তোত্র বা আখ্যানসূক্ত—যেমন যম ও যমীর কথোপকথন [ঋ. ১০. ১০], পুরূরবা ও উর্বশী সংবাদ [ঋ. ১০. ৯৫], সরমা ও পণির উপাখ্যান [ঋ. ১০. ১০৮] এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যমের আত্মসংযম চারিত্রিক দৃঢ়তার এক আদর্শ। যম ও যমীর কথোপকথনে এই আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে। পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ ভারতীয় কাব্য ও নাটকের আদি উৎস। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরী, পুরূরবা মর্ত্যের রাজা। মিলনান্তে নায়ক-নায়িকার বিদায়ী সংলাপ এই সংবাদের বর্ণনীয় বিষয়। সরমা-পণি আখ্যানে সরমার নির্লোভ চরিত্র আর এক উজ্জ্বল আদর্শ। সরমা স্বর্গের শুনী, ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের নির্দেশে তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীর সন্ধানে আসিয়াছেন। পণিগণ ধন-সম্পদ দ্বারা সরমাকে প্রলোভিত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু বিশ্বস্ত সরমা। প্রলোভন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে . . ই।

দশম মণ্ডলের 'সূর্যাসূক্ত' [ঋ. ১০. ৮৫] বহুখ্যাত। ইহাতে বৈদিকযুগের বিবাহ-পদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়। আর্যের বিবাহ শুধু ভোগ নয়, গৃহ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ইহার লক্ষ্য। বধূ এখানে পবিত্র গার্হপত্য ব্রতের কল্যাণী সঙ্গিনী। বিবাহকালে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে আত্মীয়-স্বজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বর বলেন,

> সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
> সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বিপরেতন॥ [ঋ. ১০. ৮৫. ৩৩]

—এই বধূ মঙ্গল লক্ষণযুক্তা। আপনারা সমবেত হইয়া ইহাকে দেখুন। ইহাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া গৃহে গমন করুন। ইনি যেন আপনাদের বিপ্রিয়া না হন।

বধূকে গৃহে আনিবার সময় কত না উপদেশ। তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিসম্পন্না হও,

পতির মঙ্গলকারিণী হও। তোমার মন যেন সর্বদা সতেজ ও সদা প্রফুল্ল থাকে। তুমি বীর-প্রসবিনী, জীবৎ-বৎসা, দেবকামা হও। গৃহের পরিজন তো বটেই গৃহপালিত পশুর প্রতিও বধূ যেন মঙ্গলকারিণী হন। এই বিবাহ দাসীত্ব নহে পতির গৃহে বধূর সম্রাজ্ঞীর অধিকার :

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ [ঋ. ১০. ৮৫. ৪৬]

—তুমি শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অধিকার লাভ কর।

'দানস্তুতি' ঋগ্বেদের অন্যত্রও আছে। দশম মণ্ডলে ভিক্ষু ঋষির 'দানস্তুতি' [ঋ. ১০. ১১৭] উল্লেখযোগ্য। ঋষি বলিতেছেন, দাতার ধন কখনও শূন্য হয় না—'উতো রয়িঃ পৃণতো নোপদস্যতি'। এই মণ্ডলে বৈদিকযুগের কতিপয় সংস্কার ও প্রাচীন বিশ্বাসেরও পরিচয় রহিয়াছে। মৃত্যু সম্পর্কে ঋষিদের ধারণা অতি স্পষ্ট। তাঁহারা জানেন,

ন দেবানামতিব্রতং শতাত্মা চ ন জীবতি।
তথা যুজা বি ববৃতে॥ [ঋ. ১০. ৩৩. ৯]

—শতাত্মা হইলেও দেবতাদিগের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া কেহ চিরদিন বাঁচে না। এইজন্যই সহচর বিয়োগ হয়।

মৃত্যু হইবেই, তাহাতে দুঃখ নাই। 'অদ্য মমার স হ্যঃ সমানঃ' [ঋ. ১০. ৫৫. ৫]—কাল যে জীবিত, আজ সে মৃত। তবুও এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গভীর আকুতি। 'জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্' [ঋ. ১০. ৫৯. ৫]—আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখিতে পাই ; মৃত্যু হইলেও আবার যেন প্রাণ পাই,—

পুন র্নো অসুং পৃথিবী দদাতু
পুন র্দ্যৌ দেবী পুনরন্তরিক্ষং।
পুন র্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু
পুনঃ পুষা পথ্যাং যা স্বস্তি॥ [ঋ. ১০. ৫৯. ৭]

—পৃথিবী পুনরায় আমাদের জীবন দান করুন। দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ পুনরায় জীবন দান করুন। সোম পুনরায় আমাদের দেহ দান করুন, আর শুভকারী পুষা পুনরায় আমাদের বাক্য দান করুন।

দশম মণ্ডলের 'পুরুষ সূক্ত' [৯০ সূক্ত], 'দেবী সূক্ত' [১৪৫ সূক্ত] ও 'রাত্রিসূক্ত' [১২৭ সূক্ত] নানাদিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষসূক্তে 'সহস্রশীর্ষা…

সহস্রাক্ষ: সহস্রপাদ্' পুরুষের বিশ্বব্যাপী রূপ আভাবিত হইয়াছে। দেবীসূক্ত শক্তি-উপাসনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ: এখানে ব্রহ্মরূপিণী দেবীর সর্বাত্মক, সর্বান্তর্যামী শক্তির পরিচয় আছে। ঋষিকন্যা বাক্ এই সূক্তের দ্রষ্টী। 'রাত্রি সূক্ত' রাত্রীরূপা মহাশক্তির আর এক রূপ। এই দুইটি সূক্তই চণ্ডী পাঠের পূর্বে পাঠ করার বিধান আছে।

বৈদিক ঋষিদের সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যান-ধারণার পরিচয় রহিয়াছে দশম মণ্ডলের অন্তর্গত 'নাসদীয় সূক্ত' [১২৯], 'হিরণ্যগর্ভ সূক্ত' [১২১] ও 'অঘমর্ষণ সূক্তে' [১৯০]। সৃষ্টিবিষয়ে ঋষিদেব চিন্তা যে কত সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, এই সকল সূক্ত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না—না সৎ, না অসৎ: মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না—দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। সমস্তই চিহ্নবর্জিত, তমোভূত, জলমগ্ন। ঋষিবাক্যে সেই চরাচর ব্যাপ্ত মহাশূন্যতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে:

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ।
কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥ [ঋ. ১৪. ১২৯. ১]

—তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? [অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত]

পৃথিবীর এই প্রথম অবস্থা যে অব্যক্ত, অচিন্ত্য বৈদিক ঋষি তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। পরম সত্যকে বুঝিতে না পারায় তাঁহাদের কণ্ঠে আত্মার গভীর জিজ্ঞাসা ক্রন্দনের মত ধ্বনিত হইয়াছে[১]:—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন
অথ কো বেদ যত আবভূব॥ [ঋ. ১০. ১২৯. ৬]

১। There arises a sad wail, set to sadder music of the soul's lament over the defeat of human hopes to pierce the secret of the omniscient and omnipotent cause which existed from before all time;— Literary Hist of India. Chap iv, Frazer.

—কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পরে হইয়াছেন। কোথা হইতে হইল কেই জানে? [র: দ:]

বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টির আদিতত্ত্ব খুঁজিয়াছেন, উপলব্ধি ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, মনীষী কবিগণ নিজের হৃদয়ে বুদ্ধি দ্বারা পর্যালোচনা করিয়া অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন :

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্য কবয়ো মনীষা। [ঋ. ১০. ১২৯. ৪]

এই ১২৯নং সূক্তই বিখ্যাত 'নাসদীয়'সূক্ত : ইহার দ্রষ্টা স্বয়ং প্রজাপতি। অন্য একটি সূক্তেও [ঋ. ১০. ৭১] বলা হইতেছে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি—['দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত', ঋ. ১০. ৭২]। এই সূক্তগুলির পরিপূরক হিরণ্যগর্ভ সূক্ত [ঋ. ১০. ১২১]। অব্যক্ত এক হইতে যিনি জন্মিলেন, তিনি দেবগণের পুরোধা দেবতা হিরণ্যগর্ভ। ইনিই পরম প্রজাপতির প্রথম পুত্র। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ—মূল সৃষ্টির কারণ। তিনিই এই সূক্তের দ্রষ্টা। উদাত্ত স্বরে তিনি ঘোষণা করিলেন :
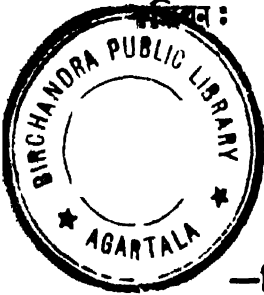
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাম্
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ (ঋ ১০.১২১.১)

—হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হইয়াছেন সর্বাগ্রে। জাত হইয়াই তিনি নিখিলের একমাত্র পতি হইলেন। তিনি ধারণ করিলেন এই পৃথিবী ও দ্যুলোক। কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করিব?[১] (ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত)

১। এই হিরণ্যগর্ভ সূক্তে মোট ১০টি ঋক্ : প্রথম ঋকটি এখানে উদ্ধৃত হইল। দশম ঋক্ ব্যতীত প্রত্যেকটি ঋকের পরেই 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' এই উক্তি আছে। অনেকেই এই বাক্যটিকে প্রশ্নবোধক ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন To what God shall we offer our oblation? [Muir—O.S.T. Vol. iv]—'কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?' [র: দ:]। কিন্তু আচার্য্য সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, 'কং প্রজাপতিং দেবায় দেবং...হবিষা...বিধেম পরিচরেম'—তাঁহার মতে, 'ক' নামক প্রজাপতিই এই সূক্তের দেবতা—'ক-শব্দাভিধেয়ঃ প্রজাপতি র্দেবতা'। ইহার অর্থ— 'ক' নামক দেবতাকে আমরা হবির্দ্বারা অর্চনা করিব।

ক্ষুদ্র 'অঘমর্ষণ' সূক্তটি [ঋ. ১০.১৯০] পূর্বোল্লিখিত সূক্তগুলির চুম্বক। এই সূক্তে অতি সংক্ষেপে সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, বিধাতার (হিরণ্যগর্ভের) উৎপত্তি এবং বিধাতার সৃষ্টি পত্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুর নিত্য সন্ধ্যার মন্ত্রে পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত এই 'অঘমর্ষণ' সূক্তটি পাঠ করা হয় :

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততঃ রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ ॥ ১ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্যমিষতো বশী ॥ ২ ॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথ স্বঃ ॥ ৩ ॥

—প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন। তাবৎ লোক দেখিতেছে। সৃষ্টিকর্তা যথা সময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। [অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত]

বেদের সংহিতাভাগে প্রায় সর্বত্রই প্রার্থনা। কতিপয় দানস্তুতি, নারাশংসী ও দার্শনিক সূক্ত ব্যতীত সর্বত্রই স্তুতিযোগে কাম্য প্রার্থনা করা হইত। ঋষিরা ছিলেন শ্রীকাম ও মেধাকাম। শ্রীকাম ঋষিগণ ধন, জন, পুত্র, আয়ু ও সৌভাগ্য কামনা করিতেন। কিন্তু মেধাকাম ঋষিগণ জ্ঞান প্রার্থনা করিতেন, কখনও বা সৌমনস্য ও ঐকমত্য প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক ঋষিদের সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের মন্ত্রগুলি শাশ্বত মানবধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ। দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তটি এইরূপ সৌমনস্য প্রার্থনা। ইহার ঋষি 'সংবনন', দেবতা 'সংজ্ঞান' বা 'ঐকমত্য'। ইহাতে সাম্যের উদার মন্ত্র উদ্ঘোষিত হইয়াছে :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সং জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ [ঋ. ১০.১৯১. ২—৪]

—তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর এক মত হউক। প্রাচীন দেবতাগণ একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, ইহার সঙ্গে সমাগত হউন ইহাদিগের মন, চিত্ত সকলও একপ্রকার হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের ঐক্যমতের জন্য হোম করিতেছি। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক। তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বপ্রকারে একমত হও

Maxmuller সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতায় দশটি মণ্ডলের অতিরিক্ত ৩২টি 'খিলসূক্ত' যোজিত হইয়াছে। ভাষা বিচার করিলে উহাদিগকে খুব প্রাচীন বলা চলেনা। এগুলি মূল সংহিতার অন্তর্ভুক্ত নয়। শৌনক বলেন, খৈলিক নামক যে সূক্ত, তাহা মূল সূক্তগুলির সহিত গণনা করা হয়না।[১] কিন্তু বহুবিখ্যাত 'শ্রীসূক্ত'টি এই খিল অংশের অন্তর্গত। শ্রীসূক্ত হিরণ্যবর্ণা হরিতকান্তি লক্ষ্মীর আবাহন মন্ত্র। ইহার নবম ঋকটি খুব বিখ্যাত,

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

—গন্ধ লক্ষণা দুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শস্যাদি দ্বারা) শুষ্ক গোময়বতী (অর্থাৎ গবাদি বহু পশু সমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি। [অনুবাদ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত][২]

খিল সূক্তে বিষ-অপনয়নের মন্ত্রও স্থানলাভ করিয়াছে। একটি সূক্তে অজগর কালিক, কর্কোটক সাপের নাম পাওয়া যায়। অন্য একটি সূক্তে জরৎকারু, জরৎ-কন্যা ও আস্তীকের নাম রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের জগৎ জীবনের ছন্দে ছন্দিত। সে জীবন বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ, দেবভাবে পূর্ণ। ঋগ্বেদের মনুষ্যগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন 'Pastoral tribes'; বৈদিক সূক্তগুলিকে কেহ কেহ বলিয়াছেন 'চাষার সঙ্গীত'। সে যুগের সভ্যতা কৃষি নির্ভর ছিল সন্দেহ নাই—গোধন, শস্যসম্পদ ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু এ সভ্যতা নানাদিক হইতে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে। এ যুগেও রাজ্য ছিল, রাজা ছিল, দার্শনিক চিন্তা ছিল, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ছিল। অলৌকিকতা ও ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস যেমন ছিল,

১। খৈলিকা নাম নাদেশোঽস্মিন্ গ্রন্থে অনুবাকানাং।
যত্ত চর্চায়তে বেদে তত্ত সংখ্যেতি ন শ্রুতিঃ॥

২। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

তেমনি অপরদিকে যুক্তি-বুদ্ধিরও অভাব ছিল না। 'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানং' বলিয়া সংশয়প্রশ্নও তাঁহাদের মনে জাগিত। সর্বোপরি এ যুগের মানুষের ছিল, কবিত্বে ভরা মন। উদার প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ভগবদ্ মহিমায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, আর সেই সঙ্গে আবেগোচ্ছল সঙ্গীতে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত 'Pearls of lyric Poetry'; দেবতার সহিত তাঁহাদের ছিল সখ্যপ্রীতির সম্পর্ক—এ সম্পর্ক বাহিরের নয়, অন্তরের। অন্তরের দিব্য শক্তিই তাঁহাদিগকে উদার বলিষ্ঠ ও সাম্য-মৈত্রীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আর্য সাম্যমন্ত্রগুলি শাশ্বত মানবতার আদর্শে উদ্দীপ্ত।

(ii) যজুর্বেদ-সংহিতা

যজুর্বেদের প্রধান সংহিতা দুইখানা: তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয় সংহিতা' অথবা কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ উপদেশ করেন। বৈশম্পায়ন এই বেদ তাঁহার শিষ্যবর্গকে প্রদান করেন। শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শিষ্য ছিলেন ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হওয়া উচিত—এই প্রশ্ন লইয়া গুরুশিষ্যে মতভেদ হয়। গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া শিষ্যকে তাঁহার উপদিষ্ট বেদ পরিত্যাগ করিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বেদ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ঋষিগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া এই বেদ গ্রহণ করেন। এইজন্য যজুর্বেদের এই শাখার নাম হয় 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'। ইহাকে কৃষ্ণ যজুর্বেদও বলা হয়। এই সংহিতায় গদ্যাংশের সহিত পদ্যাংশ মিশ্রিত হইয়া আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া যজুর্বেদের একটি নূতন শাখা প্রাপ্ত হন। সূর্যদেব বাজিরূপ ধরিয়া এই বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় 'বাজসনেয় সংহিতা'। কেহ কেহ বলেন, 'বাজ' শব্দের অর্থ অন্ন। কিরূপে এই অন্ন উৎপন্ন হয়, তাহার নির্দেশ এই সংহিতায় আছে বলিয়া ইহার নাম বাজসনেয় সংহিতা। ইহা শুক্ল যজুর্বেদ নামেই বেশি পরিচিত। শুক্ল অর্থাৎ পরিষ্কৃত। ইহাতে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ পৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য এই বেদকে পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত করিয়া কণ্ব, মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্যবর্গকে প্রদান করেন। বাংলা দেশে শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অধিক প্রচলন। আচার্য মহীধর ইহার ভাষ্যকার।

শুক্ল যজুর্বেদ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি কণ্ডিকা বা মন্ত্রের সমষ্টি। কোন কণ্ডিকার মন্ত্র গদ্য, কোনটির পদ্য। গদ্য মন্ত্রগুলি যজুর্বেদের নিজস্ব। অধ্বর্যুগণ যজুর্বিধানে যজ্ঞশরীর নির্মাণ করিতেন। যজ্ঞের

দ্রব্যোদ্‌যোগ করিয়া দিতেন। এক কথায় যজ্ঞের ক্রিয়াকর্মের অংশ ছিল অধ্বর্যুদের অধিকারে। এইজন্য যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ক্রিয়াত্মক, অনেকটা বৈদিক কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের অনুরূপ। সমিধাহরণে, গো-দোহনে, যজ্ঞবেদী নির্মাণে, অগ্নিজননে, আহুতি প্রদানে এই সকল মন্ত্র প্রয়োগ করা হইত। প্রত্যেকটি কর্ম ছিল মন্ত্রপূত, প্রত্যেকটি দ্রব্য দেবভাবে ভাবিত। যজ্ঞে যজমানের মস্তক মুণ্ডন করা হইবে, ক্ষুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হইবে :

শিবো নামাসি। স্বধিতিস্তে পিতা। নমস্তে অস্তু। মা মা হিংসীঃ। [৩. ৬২]

—তোমার নাম শিব, পরশু তোমার পিতা। তোমাকে নমস্কার। হিংসা করিও না। ইহাই যজুঃ মন্ত্রের ধরন।

যজুঃ-সংহিতার অধ্যায় বিভাগেও স্বাতন্ত্র্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন যাগ-যজ্ঞ অনুসারে মন্ত্রগুলি বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শযাগ, দ্বিতীয়ে পিতৃযাগ (শ্রাদ্ধ), তৃতীয়ে অগ্নিহোত্র, নবমে রাজসূয়, একাদশে অগ্নিচয়ন, ষোড়শে শতরুদ্রিয় হোম ইত্যাদি। ষড়বিংশতি অধ্যায় হইতে উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে খিলমন্ত্র অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল মন্ত্র অনুক্ত ছিল, সেই সকল মন্ত্র। কোথাও বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও যজ্ঞবিধানও প্রদত্ত হইতেছে। এই সংহিতার শেষ অধ্যায়টি (৪০ অঃ) একটি উপনিষৎ; উহাই ঈশোপনিষৎ। যজুর্বেদ ক্রিয়ামূলক বলিয়াই এখানে দেবস্তুতিগুলি কাটা কাটা, একমাত্র শতরুদ্রিয় ব্যতীত ইহাতে সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কোন সূক্ত নাই।

শুক্ল যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রটি এই :

ইষে ত্বা। ঊর্জে ত্বা। বায়বস্থ। দেবো বঃ সবিতা
প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। [শুঃ যজুঃ ১.১]

এই মন্ত্রটি হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে পঠিত হয়। এই মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং পরমেষ্ঠী প্রজাপতি। 'অনিয়তাক্ষর পাদাঽবসানাং যজুঃ'—তাই যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রে ছন্দ-কল্পনার তেমন স্থান নাই। তথাপি প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন ছন্দ কল্পনা করা হয়। ছন্দ বলিতে বুঝায় অক্ষরপরিমাণ। যজুঃমন্ত্রের পাদগুলি অনিয়তাক্ষরা হইলেও প্রত্যেকটি পাদ অক্ষরপরিমিত। তাই ইহার এক এক পাদে এক এক প্রকার ছন্দ। উপরের মন্ত্রের দেবতা 'শাখা' (পলাশ বা শমী শাখা)। শাখাচ্ছেদনে এই মন্ত্রটির প্রয়োগ। ইহার অর্থ—(হে শাখে), বৃষ্টির জন্য তোমাকে (ছেদন করিতেছি); বলকারক রসের জন্য তোমাকে (সংনমিত করিতেছি); তোমরা আপ্যায়ক হও ['বায়বস্থ']। যজ্ঞরূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত দেব সবিতা তোমাদিগকে সংযুক্ত করুন।

যজুর্বেদের মন্ত্রগুলিও স্তুতিযুক্ত প্রার্থনা। তন্মধ্যে বহুখ্যাত ষোড়শ অধ্যায়ের 'শতরুদ্রিয়'। ৬৬টি কণ্ডিকা বা মন্ত্রে ঈশান রুদ্রকে নমস্কার জানাইয়া প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে। রুদ্র এখানে পৌরাণিক শিবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি পশুপতি, ভূতপতি, পুষ্টিপতি—তিনি 'স্তেন-স্তায়ু-তস্করে'রও পতি। ইঁহারই উদ্দেশ্যে ঋষির নমস্কার ও প্রার্থনা:

নমস্তে রুদ্র মন্যবে উতো ত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুত তে নমঃ॥ ১॥
যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥ ২॥

—হে রুদ্র, তোমার মন্যু (ক্রোধ) ও ইষুকে নমস্কার; নমস্কার তোমার বাহুকে। তোমার যে তনু অঘোর, মঙ্গলকর ও অপাপপ্রকাশিনী—সেই সুখকর তনু দ্বারা, হে গিরিশ, আমাদিগকে দর্শন কর।

যজুর্বেদের গদ্যময় প্রার্থনাগুলিও সুন্দর। একটি মন্ত্রে ঋষি তেজ, বীর্য, বল ওজঃ (কান্তি), মন্যু (ক্রোধ) ও সহ (সহিষ্ণুতা) প্রার্থনা করিতেছেন:—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্য ওজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥ [শুঃ যঃ ১৯.৯]

আর একটি মন্ত্রে ঋষি এই পৃথিবীতে বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার আকূতি জানাইতেছেন,

পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্।
শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। প্রব্রবাম শরদঃ শতম্।
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্। ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ [শুঃ ৩৬.২৪]

—একশ বছর যেন চোখে দেখি। একশ বছর যেন বাঁচি। একশ বছর যেন কানে শুনি। একশ বছর যেন কথা বলিতে পারি। একশ বছর যেন অদীন হই। এইরূপ হউক শত শত বছর।

মধুমতী পৃথিবীকে যাঁহারা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এ প্রার্থনা তাঁহাদেরই। বৈদিক যুগের মানুষ জীবন-পলাতকা নহেন, জীবন-প্রেমিক।

(iii) সাম-সংহিতা

ঋষি জৈমিনী বেদব্যাসের নিকট হইতে সামবেদ লাভ করেন। 'সহস্র বর্ত্মা সামবেদ' —সাম বেদের সহস্র শাখা। জৈমিনীর পৌত্র সুকর্মা, সুকর্মার অন্যতম শিষ্য পৌষ্পিঞ্জি; পৌষ্পিঞ্জি হইতে সামবেদের বহু শাখা প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে পৌষ্পিঞ্জি-শিষ্য কুথুম হইতে সামবেদের প্রসিদ্ধ 'কৌথুমী শাখা'র উৎপত্তি। সাম-সংহিতার এই কৌথুমী শাখার পাঠই বিশেষভাবে প্রচলিত।

এই সংহিতায় মোট ১৫৪৯টি ঋক্ আছে। কতকগুলি ঋক্ দুইবার, এমনকি তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ৭৫টি বাদে আর সবগুলি ঋক্ ঋগ্বেদ সংহিতাতেও স্থান পাইয়াছে। পার্থক্য এই যে—ঋগ্বেদে ঋক্ ছন্দোবদ্ধ স্তুতি, সামবেদে উহারা তাল-লয় যুক্ত সুললিত গান।

সাম-সংহিতার ঋক্‌গুলি দুইভাগে সাজানো—ছন্দ আর্চিক ও উত্তরার্চিক। ছন্দ আর্চিকের সূক্তগুলি আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও পাবমান—এই তিন পর্বে বিন্যস্ত। আগ্নেয় পর্বে ১২টি, ঐন্দ্র পর্বে ৩৬টি এবং পাবমান সোম পবে ১১টি—মোট ৫৯ টি সূক্ত ছন্দ আর্চিকে স্থান পাইয়াছে। উত্তরার্চিকে ২১টি অধ্যায়। ইহাতে ছন্দ আর্চিকের বহু মন্ত্র দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর আর্চিকের মন্ত্রগুলি বিশেষতঃ গানের আকারেই বিন্যস্ত: গানগুলি সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ ৩, ৪ বা ৫টি ঋকের সমষ্টি। সামবেদ ললিত পাঠযুক্ত গান, অনেকটা Hebrew Psalms-এর মত। যজ্ঞকালে উদ্‌গাতৃগণ এই মন্ত্র গান করিতেন। বৈদিক সাহিত্যে সামগানের যে কত উচ্চমূল্য ছিল, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিই—'বেদানাং সামবেদোঽস্মি' তাহার প্রমাণ।

ছন্দ আর্চিকের আগ্নেয় পর্বের প্রথম ঋকটি হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে তৃতীয় মন্ত্ররূপে পঠিত হয়। মন্ত্রটি এই,

> অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে।
> নি হোতা সংসি বর্হিষি॥ [সাম. ছন্দ. আগ্নেয় ১. ১]

—এই ঋকের ঋষি ভরদ্বাজ; দেবতা অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। ঋষি বলিতেছেন, হে অগ্নি, স্তূয়মান্ হইয়া তুমি চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের জন্য ও দেবগণকে হব্য প্রদানের নিমিত্ত আগমন কর। হোতারূপে এই আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন কর।

সামবেদের সকল গানই এইরূপ দেবস্তুতিমূলক।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাসে সামগানের একটা বিশেষ স্থান আছে। বৈদিক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি স্বর-বৈচিত্র্যের প্রভাব পরবর্তী সঙ্গীতের উদারা, মুদারা, তারা প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়াছে কি না, তাহা সঙ্গীতবিশারদগণের বিচার্য—

কিন্তু যে সঙ্গীত 'শিশুর্বেত্তি পশুর্বেত্তি বেত্তি গীতরসং ফণী'—সেই শিশু-পশু-সর্পেরও মনোমুগ্ধকর গীতরসের আদি নির্ঝর সামবেদ। সামরব ভারতের তপোবনে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল।

(ঙ) অথর্ব-সংহিতা

মহর্ষি ব্যাসদেব হইতে অথর্ববেদ লাভ করেন অমিতদ্যুতি সুমন্তু। ঋষি সুমন্তুর শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা এই বেদেরও বহু শাখা বিস্তৃত হয়। তন্মধ্যে পিপ্পলাদ ঋষির 'পৈপ্পলাদ সংহিতা' ও শৌনক ঋষির 'শৌনক সংহিতা' প্রসিদ্ধ। শৌনক শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে; এ যাবত পৈপ্পলাদ শাখার যে সংহিতা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই খণ্ডিত। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় উড়িষ্যার এক গ্রাম হইতে পৈপ্পলাদ শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা হইতে অনেক নূতন তথ্য বাহির হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ পর্যন্ত অথর্ব সংহিতা সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা শৌনক সংহিতারই আলোচনা। আমরাও শৌনক সংহিতাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে অথর্ববেদ নানাদিক হইতে বিশিষ্ট। অথর্ববেদ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম লিখিত আকর গ্রন্থ, যোগসাধনার ভিত্তি ও অতি প্রাচীন লৌকিক বিশ্বাসের ভাণ্ডার। অথচ প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রতি একটি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ ইহাকে অপ্রাচীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ইহাকে যজ্ঞানুপযুক্ত বলিয়া হীন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস।

অথর্ববেদ অপ্রাচীন নয়। 'Weber সাহেব বলেন, Atharva Samhita contains pieces of great antiquity' [Hist. of Indian Lit.]; ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'The Atharvaveda contains much earlier matter' [Pre historic Ancient & Hindu India] ; পণ্ডিত প্রবর Winternitz বলেন, It is equally certain that the magic poetry of the Atharvaveda is in itself at least as old, if not older than the sacrificial poetry of the Rigveda [A Hist. of Indian Lit. Vol 1] : বালগঙ্গাধর তিলক দেখাইয়াছেন, অথর্ববেদোক্ত 'তৈমাতা' সুপ্রাচীন সুমেরীয় ধর্মের সর্পদেবতা। অথর্ববেদের অর্ধেকেরও বেশি মন্ত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্ত, ত্র্যম্বক মন্ত্র, হিরণ্য-গর্ভ সূক্ত, দেবীসূক্ত প্রভৃতি অথর্ব-সংহিতারও প্রসিদ্ধ সূক্ত। অথর্ববেদের ঋষি 'অথর্বাঙ্গিরস' প্রাচীন ঋষিদের অন্যতম। অতএব অথর্ববেদ অপ্রাচীন, এই মত বিচারসহ নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি, অথর্ববেদ যজ্ঞানুপযুক্ত ['অথর্ব বেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্ত শান্তি-পৌষ্টিকাভি-চারাদি কর্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব'—প্রস্থানভেদ]। এই আপত্তি একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। শান্তি, পুষ্টি, অভিচারাদির মন্ত্র ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদেও রহিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের শেষ সূক্ত বিষ-অপনয়নের মন্ত্র, সপ্তমণ্ডলের নিছুটি মন্ত্র ['সহস্র শৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ'] অথর্ব বেদেরই মন্ত্র [অ. ৪. ৫. ১]। ঋগ্বেদেও রক্ষোঘ্ন মন্ত্র [ঋ ১০. ৮৭] ও শান্তি মন্ত্র অনেক আছে। যজুর্বেদেও এই ধরনের মন্ত্রের অসদ্ভাব নাই, যথা,

১। বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। তমতো মা মৌক্। [শুঃ যঃ ১. ২৫]
—হে দেব সবিতা, যে আমাদিগকে হিংসা করে, আমরা যাহাকে হিংসা করি, তাহাকে শত পাশ দ্বারা অন্ধ তামিস্র নরকে বন্ধন কর। অন্ধকার হইতে মুক্ত করিও না।

২। তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ [শু. য. ১৫. ১৬]
—যাহাকে আমরা হিংসা করি, যে আমাদিগকে হিংসা করে, তাহাকে ইহাদের মুখে নিক্ষেপ করিব।

জীবনে শত্রু আছে, দুর্দৈব আছে, ব্যসন আছে, মরণ আছে, এই সকল হইতে সকল মানুষই রক্ষা প্রার্থনা করে। এই রক্ষা প্রার্থনা ও অভিচার মন্ত্র শুধু অথর্ব বেদে নয়, প্রত্যেক বেদেই আছে। যজ্ঞে যে এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ ছিল, 'কৌশিক সূত্রে' তাহা বিবৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে অথর্ববেদকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার বা ইহার অমর্যাদা ঘোষণার কারণ কি? স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, আদৌ আর্যগণ অসভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যেও অনার্যজনোচিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আর্যগণ যখন সভ্য হইলেন, তখন এই অন্ধ বিশ্বাসগুলিকে স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিলেন। এই জন্যই অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রগুলি প্রথমে আর্য-স্বীকৃতি লাভ করে নাই।[১] কিন্তু এমত বিচার-

১। It is a repositary of the magical charms and incantations which were used by the Indo Aryan people before they became civilised by contact with the Dravidians and which in a later stage of culture, they were ashamed to recognise as a part of their holy ritual. [Pre-historic Ancient Hindu & India—R. D. Banerji]

সহ নয়, কারণ, আর্যগণ দ্রাবিড়দের সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইয়াছিলেন—এ তথ্য অনৈতিহাসিক।

মনে হয়, অথর্ববেদে আর্যপূর্ব জাতির বহু সংস্কার ও বিশ্বাস স্থানলাভ করিয়াছিল। এগুলি ছিল 'a real popular belief uninfluenced by the priestly religion', এই লৌকিক সংস্কারগুলিকে উচ্চতর সমাজ নিন্দার চোখে দেখিতেন। অথচ উহাদিগকে অস্বীকার করিবার উপায়ও ছিল না। বৈবাহিক সূত্রে বা অন্য কারণে মিশ্রণের ফলে লৌকিক সংস্কার বৈদিক সংস্কারের উপর সংক্রামিত হইতেছিল। যে ব্রাত্যগণ অদীক্ষিত ও নিন্দিত ছিলেন, অথর্ববেদে সেই ব্রাত্য মহানুভব দেবাদিদেবের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন [অ: ১৫], আথর্বণ মন্ত্রগুলিও পৌরোহিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে [পৌরোহিত্যঞ্চ অথর্ববিদৈব কার্যম্—সায়ণ]। ঠিক এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রে: তন্ত্র যেমন ব্যবহারিক ধর্ম, অথর্ববেদের ক্রিয়াও তেমনই ব্যবহারিক ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। যে কারণে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বহুকাল নিন্দিত হইয়াছে, সেই একই কারণে আথর্বণ ক্রিয়াকর্ম তির্যক কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন যেখানে স্বীকৃত এবং প্রভাব যেখানে অপরিহার্য—সেখানে বিষয়টিকে গ্রহণ করিতেই হয়। কাজেই অথর্ববেদ তথা তন্ত্রশাস্ত্র পরবর্তীকালে আর্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অথর্ববেদের এবং তন্ত্রের ভাবে ও ভাষায় ব্রাহ্মণ্য হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্নও বর্তমান। আচার্য Winternitz ঠিকই বলিয়াছেন, 'The songs of magic in the Atharva Veda which according to their main contents, are certainly popular and very ancient, have no longer even their original form in the Samhita, but are Brahmanised' (A Hist. of Indian lit. Vol 1]

অবশ্য একথা স্বীকার্য, অথর্ব-সংহিতায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব বেশি। ইহাতে আছে মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, উদ্বেজন ও বশীকরণাদি মন্ত্র। অথর্ববেদের জগৎটিও ঋগ্বেদের জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদে ঋষির কল্পনা প্রকৃতি-জগৎ সঞ্চারী; ভূলোক ও দ্যুলোকের বিশ্বপ্রকৃতি—'সুদুঘা সুধারা' নদীর সৌন্দর্য, 'অঞ্জনগন্ধা সুরভী' অরণ্যানির মহিমা, 'দেবচক্ষু সূর্য', 'মধুদুঘা' দ্যাবা পৃথিবী, 'ভাস্বতী উষা' ও 'আয়তী' রাত্রির অপরিমেয় ঐশ্বর্যে-মাধুর্যে মুগ্ধ কবি জীবনের স্বাদে তন্ময়: বলিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহাদের বলিষ্ঠ প্রার্থনা। দেবতার সঙ্গে তাঁহাদের পিতা-পুত্র, সখা-সখ্যের সম্পর্ক। আথর্বণ ঋষির প্রকৃতি দৃষ্টি অনেকটা সঙ্কুচিত। মানুষ দুর্দিন-দুঃশকুনভীত, দুঃস্বপ্নে ও সপত্নভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, পাপ দেবতা নির্ঋতির নিকট অবনমিত। শত্রুকে নিস্তেজ করিয়া যাদু দ্বারা কাম্যবস্তুকে লাভ করিয়া এখানে ঋষি অভ্যুদয় যাচ্ঞা করেন,

১। সূর্য যত্তে তপস্তেন তং প্রতি তপ।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ (২. ২১. ১)

—হে সূর্য, তোমার যে সন্তাপন শক্তি, তাহা দ্বারা তাহাকে সন্তপ্ত কর, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যাহাকে দ্বেষ করি।

২। ব্যস্যৈ মিত্রাবরুণৌ হৃদশ্চিত্তানি অস্যতম্।
অথৈনাম্ অক্রতুংকৃত্বা মমৈব কৃণুতং বশে॥ [অঃ ৩. ২৫. ৬]

—হে মিত্রাবরুণ, তোমরা এই স্ত্রীর হৃদয় ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া ইহাকে কার্য্যাকার্য জ্ঞানশূন্য করিয়া আমার বশ কর।

৩। নুদস্ব কাম প্রনুদস্ব কাম
অবর্ত্তীং যন্ত মম যে সপত্নাঃ।
তেষাং নুত্তানাম্ অধমা তমাংসি
অগ্নে বাস্তূনি নির্দহ ত্বম্॥ [অঃ ৯. ২. ৪]

—হে কাম, আমাদের যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে অপসারিত কর, দূরে অপসারিত কর। অপসৃত হইযা তাহারা যে অধম তমোময় লোকে বাস করে, হে অগ্নি, তুমি তাহা দগ্ধ কর।

কিন্তু এই ধরনের প্রার্থনাই অথর্ববেদের সর্বস্ব নয়। এরূপ প্রার্থনা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদেও ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। তবে অথর্ববেদে সুরটা অত্যন্ত চড়া। তাহার কারণ, আথর্বণ জগতের মানুষ অনেকটা বাস্তববাদী। জগতে বন্ধন আছে, ব্যসন আছে, সপত্ন আছে, সপত্নী আছে, দৈব-দুর্যোগ আছে, মরণ-ভয় আছে। ঐহিক জগতে অভ্যুদয়ের পথে অনেক বিপত্তি। অথর্বাঙ্গিরা এই বিপত্তিকে দেখেন, ইহা হইতে মুক্ত হইতে কামনা করেন। তাই প্রার্থনার সুরে আছে—'জহি', 'অরসাং-কৃণু', 'অতেজসং কৃণু', 'বিধ্যামি', 'জম্ভে দধ্মঃ' (মুখে অর্পণ করিব), 'অধস্পদং দ্বিষতস্পাদয়ামি' ইত্যাদি। আচার্য সায়ণ বলেন, অথর্ব-মন্ত্র দ্বারা ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়বিধ ফল লাভ হয়—'ঐহিকামুষ্মিক সকল পুরুষার্থপরিজ্ঞানোপায়ভূত অথর্ববেদঃ' [অথর্ব-সংহিতা-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত]। উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অথর্ববেদে ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির কামনা, ভুক্তির কামনা যেমন আছে, তেমনই আছে মুক্তির কামনা, উচ্চতর লক্ষ্য ও শাশ্বত ঐক্যমতের বাণী। অথর্ববেদের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

শৌনক শাখার অথর্ব-সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডে কতকগুলি করিয়া সূক্ত। সূক্তগুলি বিশেষ কোন ক্রম অনুসরণে বিন্যস্ত হয় নাই; যদিও কৌশিক সূত্রে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রগুলির ক্রমানুসারে যজ্ঞে প্রয়োগের কথা বর্ণনা

করা হইয়াছে। মন্ত্রগুলিকে বরং কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. মেধাজনন কর্ম ২. ঐকমত্য-সম্পাদক কর্ম ও সম্পৎ-সাধক কর্ম ৪. রাজকর্ম (শত্রুজয়, শত্রুত্রাসন, সপত্নক্ষয় ইত্যাদি) ৫. পৌষ্টিক কর্ম (গৃহপুষ্টি, পাপক্ষয়, গো-সমৃদ্ধি সাধক কর্ম) ৬. সৌভাগ্যকরণ (অভীষ্ট সিদ্ধি, দুঃশকুন ও দুঃস্বপ্ননিবারণ, বৃষ্টিজনন, ঋণোপনোদন ইত্যাদি। ৭. ভেষজ্য কর্ম, (রোগ নিবারণ, প্রাণ-সঞ্চারণাদি) ৮. গৃহ্যকর্ম (বিবাহ, পুংসবন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি) ৯. অভিচার কর্ম, ১০. শান্তি কর্ম ও ১১. দার্শনিক চিন্তা (সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতত্ত্বাদি)।

আথর্বণ ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ রস বা জল জল অভিষব করিয়াই শান্তি-পুষ্ট্যাদি কর্ম সাধন করিতে হয়। এইজন্য এই বেদের প্রথমেই 'আপ' দেবতার কয়েকটি সুন্দর স্তুতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আপোমার্জনে আথর্বণ মন্ত্র তুলনা রহিত। হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে এই মন্ত্রটি চতুর্থ মন্ত্ররূপে পঠিত হয় ;

শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভি স্রবন্তু নঃ ॥[১]

—এই মন্ত্রটির দ্রষ্টা সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, দেবতা আপোদেবতা। ঋষি বলিতেছেন, জল দেবতাগণ যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন এবং মঙ্গল-বিধায়ক হইয়া আমাদিকে অভিসিঞ্চিত করুন।

জলের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। জল "ময়োভুব' (সুখকর)। তাহার রস কল্যাণকর ['শিবতমো রসস্তস্য' অ. ১. ২] ; এই জল আমাদের পক্ষে শিবময়ী হউন—'শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ' [অ. ১. ৬. ৪]।

দ্বিতীয় কাণ্ডের 'অভীঃ' মন্ত্রগুলিও সুন্দর। ঋষি বলিতেছেন—

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥
যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ [অ. ২. ১৫. ১, ৫]

---

১. শৌনক সংহিতায় এই মন্ত্রটি প্রথম কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে বেদোক্ত যে মন্ত্রগুলি পঠিত হয়, তাহা তত্তৎ বেদের প্রথম মন্ত্র। অথর্ববেদ সম্পর্কে ইহার ব্যতিক্রম একটি সন্দেহের বিষয় ছিল। যদিও বিনিয়োগ-বিধানে এই মন্ত্রটি যে পৈপ্পলাদ শাখাভুক্ত আথর্বণ মন্ত্র, তাহার নির্দেশ ছিল। কিন্তু এই শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা আবিষ্কৃত না হওয়ায়, বিষয়টি সন্দেহাতীত ছিল না। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা এই সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। 'শন্নো দেবী' মন্ত্রটি পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ব সংহিতার প্রথম মন্ত্র।

—দ্যাবাপৃথিবী যেমন ভয়শঙ্কা করে না, তাহাদের যেমন বিনাশ নাই, সেইরূপ হে প্রাণ, অভয় হও।

লোক ব্যবহারে সত্য ও মিথ্যা যেমন ভয় পায় না, বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ, হে প্রাণ, তুমি অভয় হও।

অথর্ববেদের ঐকমত্য-সম্পাদক সাংমনস্য মন্ত্র, ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে কোন অংশে হীন নয়। সমগ্র গৃহকে সমনা করিবার জন্য ঋষি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোঽন্যমভিহর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচাং বদতু শান্তিবাম্॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিষৎ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া॥ [অ. ৩. ৩০. ১-৩]

—আমি তোমাদিগকে সমনা ও হিংসা রহিত করিতেছি: বৎস যেমন জাতমাত্র গাভীর অভিমুখে গমন করে, তোমরাও তেমনই পরস্পরের অভিমুখী হও।

পুত্র পিতার অনুব্রত হউক, মাতার সহিত সমনা হউক; জায়া পতির প্রতি মধুমতী ও শান্তিকরী বাক্য প্রয়োগ করুক।

ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে হিংসা না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে বিদ্বেষ না করে। সমনা ও সব্রতা হইয়া ভদ্র বাক্য বলুন।

এতদ্ব্যতীত এই বেদের ব্রহ্মচারী-প্রশংসা [১১. ৭], পৃথিবীসূক্ত [১২.১], ব্রাত্য-স্তুতি [পঞ্চদশ কাণ্ড] প্রভৃতি নানাদিক হইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ব্রহ্মচারীষ্ণংশ্চরতি রোদসী উভে'—ব্রহ্মচারী তপস্যাবলে উভয় লোক বিচরণ করেন; ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি, ব্রহ্মচারীই বিরাট, ব্রহ্মচারীই ইন্দ্র: 'ব্রহ্মচর্যেন তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি' [১১.৭.১৭] -ব্রহ্মচর্য দ্বারা রাজা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন; 'ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্' [১১. ৭. ১৮]—ব্রহ্মচর্য দ্বারা কন্যা যুবা পতি লাভ করে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের পৃথিবী-সূক্ত। ঋগ্বেদে স্বতন্ত্র কোন পৃথিবীসূক্ত নাই, দ্যৌস্পিতার সহিত যুক্ত হইয়াই পৃথিবীর মহিমা। আথর্বণ ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বিস্ময়। ৬৩টি শ্লোকে সেই বিস্ময়কে ঋষি ভাষা দিয়াছেন,

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ [অ ১২.১.১]

—সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম ও যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। সেই পৃথিবী, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী, তিনি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুন।

সমতল ও বন্ধুর এই পৃথিবী কত না ওষধী ভরণ করেন, ইহাতে কত সমুদ্র, কত সিন্ধু—চতুর্দিকে কৃষিযোগ্য ভূমি; এই পৃথিবী 'বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্য-বক্ষা জগতো নিবেশনী' [১২. ১. ৬]; এই পৃথিবীর অমৃতহৃদয় পরম ব্যোমে সত্য দ্বারা আবৃত ['যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ'—১২. ১. ৮]। জলধারায় 'ভূরিধারা' ভূমি; এইখানেই গিরি পর্বত অরণ্য। বিশ্বরূপা এই ধ্রুবাভূমি কোথাও শ্বেতবর্ণা, কোথাও কৃষ্ণা, কোথাও রোহিণী—মরকতদ্যুতি। 'অগ্নিবাসা পৃথিবী' [১২. ১. ২১]—ইহার ওষধী, রস ও প্রস্তর অগ্নিগর্ভ। শিলা-মৃত্তিকা-কঙ্কর-পাংসু-ধৃতা ভূমি ['শিলাভূমিরশ্মাপাংসুঃ সা ভূমি সংধৃতা ধৃতা'-১২. ১. ২৬]। এইখানেই আবর্তিত হয় ষড়ঋতু ['গ্রীষ্ম স্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ' ১২. ১. ৩৬]। পৃথিবীতে বাস করে বিচিত্র জীবজন্তু—আরণ্য পশু—মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, উল, বৃক—দ্বিপাদ পক্ষী হংস, সুপর্ণ, শকুন, কাক; পৃথিবীই 'আবপনী জনানাম্' (মনুষ্যলোকের আধার)। ইনি 'কামদুঘা পপ্রথানা' (বিস্তীর্ণা কামধেনু)-১২. ১-৬১।

ঋষির বড় গৌরব যে, তিনি এই পৃথিবীর পুত্র: 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ' [১২. ১. ১২]। আকুল হৃদয়ে জীবধাত্রী জননীর নিকট তাঁহার প্রার্থনা: 'ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু' [১২. ১.৫]—পৃথিবী আমাদিগকে বরাঙ্গ ও রূপ দান করুন, 'সা নো ভূমির্বিসৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ' [১২. ১. ১০]—মাতা যেমন পুত্রকে দুগ্ধ দান করেন, তেমনই ভূমি মাতা আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুন; 'সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুর্দধাতু' [১২. ১. ২২] এবং

> য স্তে গন্ধ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ
> যং গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
> মা নো দ্বিক্ষতঃ কশ্চন ॥ [১২. ১. ২৩]

—হে পৃথিবি, যে গন্ধ তোমাতে উৎপন্ন, ওষধি ও জল যে গন্ধকে ধারণ করে, গন্ধর্ব ও অপ্সরা যে গন্ধ উপভোগ করে, সেই গন্ধ দ্বারা আমাকে সুরভিত কর; আমাদিগকে কেহ যেন বিদ্বেষ না করে।

> শান্তিবা সুরভিঃ স্যোনা কীলালোঘ্নী পয়স্বতী।
> ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ ॥ [১২. ১. ৫৯]

—অমৃতস্তনী, দুগ্ধবতী, সাধুগন্ধী, আনন্দময়ী পৃথিবী আমাদিগকে শান্তি বচন বলুন।

ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্। [১২. ১. ৬৩]

—হে মাতা পৃথিবি, কল্যাণ দ্বারা আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর; হে কবি (ক্রান্তদর্শী) দ্যুলোকের সহিত তুমি আমাকে শ্রী ও বৈভবে প্রতিষ্ঠিত কর।

অথর্ব-বেদের এই পৃথিবী কবির চোখে-দেখা বিচিত্ররূপিণী, কল্যাণকারিণী পৃথিবী; কবিত্বে, আবেগে ও বস্তুদৃষ্টির সততায় এই পৃথিবীর স্তুতি অপূর্ব।

অথর্ববেদের ব্রাত্য কাণ্ডটিও (পঞ্চদশ কাণ্ড) কয়েকটি দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাত্য হইতেছে সাবিত্রী-পতিত সংস্কারহীন পুরুষ। বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে ব্রাত্য অনধিকারী। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ব্রাত্য অবৈদিক লোকায়ত সম্প্রদায়। ইহারা পতিত ও অপাংক্তেয়। অথচ অথর্ববেদে এই ব্রাত্যই দেবাদিদেবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রাত্য কাণ্ডের ভাষা গদ্যময়: ইহাতে মোট ১৮টি সূক্ত।

ব্রাত্যের অঙ্গবর্ণ নীল লোহিত—'নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্' [১৫. ১. ৭]: তাঁহার অনন্ত মহিমা, অপরিমেয় তেজ। তিনি চতুর্দিক কম্পিত করিয়া চলেন। পূর্বদিকে ভব ইহার ইষু, দক্ষিণে ঈশান, পশ্চিমে পশুপতি, উত্তরে উগ্র [১৫. ৫]। ইতিহাস, পুরাণ, নারাশংসী ইহার জয়গান করে: 'তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্' [১৫. ৬. ১১]। ব্রাত্যের সপ্ত প্রাণই অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, পবমান, আপ, পশু ও প্রজা। ব্রাত্যই ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর। ব্রাত্য কোন গৃহে অতিথি হইলে, সে গৃহ ধন্য। গৃহী তখন কি করিবেন?—

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্ব অবাৎসীঃ ব্রাত্য
উদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য
যথা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্তু ইতি। [১৫. ১১. ২]

—নিজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বলিবেন, ব্রাত্য কোথায় ছিলেন? ব্রাত্য, এই যে পাদ্যোদক। ব্রাত্য, তৃপ্ত হউন, আপনার যাহা প্রিয় তাহাই হউক, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আপনার যাহা ঈপ্সিত (নিকাম) তাহাই হউক।

এই ব্রাত্যকে নমস্কার—'অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়'।

অথর্ব-বেদের সৃষ্টিতত্ত্বও বিশেষত্ব মণ্ডিত। ঋগ্বেদে পরম পুরুষ হইতেই সৃষ্টির পত্তন দেখানো হইয়াছে; অথর্ববেদেই প্রথম জায়া ও পতির বিবাহ-রূপকে সৃষ্টি পত্তনের কথা পাওয়া গেল:

যন্মন্যু র্জায়ামাবহৎ সংকল্পস্য গৃহাদধি।

ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ ॥ [অ. ১১. ১০. ১]

—যখন মন্যু সঙ্কল্পের গৃহ হইতে জায়াকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন কে বরযাত্রী, কাহারা কন্যাবরণকর্তা, কে প্রধান বর হইয়াছিলেন ?

আথর্বণ সৃষ্টিতত্ত্বে 'কাল' একটি বিশেষ তত্ত্ব। কাল সৃষ্টির উৎস, কাল সৃষ্টির নিয়ন্তা ; কালেই তপস্যা, কালেই ব্রহ্ম সমাহিত ; কাল সর্বেশ্বর :

কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।

কালো হি সর্বেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ। [১৯. ৫৩. ৮]

এই কাল-তত্ত্ব পরবর্তী কালের শৈব ও শাক্ত ধর্মের মূল তত্ত্ব। অথর্ববেদ যত নিন্দিতই হউক, লোকসংস্কারের বাহক রূপে ইহার মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

৫. ব্রাহ্মণ

বেদের দ্বিতীয় অংশ 'ব্রাহ্মণ'। ইহা প্রধানতঃ বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও যাগযজ্ঞের নির্দেশ পূর্ণ। ইহা বেদের কর্মকাণ্ড। ইহার বাহন বর্ণনাত্মক প্রাঞ্জল গদ্য, মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক ও গাথাও আছে। ব্রাহ্মণগুলির একদিকে আছে 'বিধি'—অর্থাৎ মন্ত্র-প্রয়োগের বিধান, মন্ত্রোৎপত্তির ইতিহাস ও মন্ত্রের বা যজ্ঞের প্রশংসা ; অপরদিকে আছে 'অর্থবাদ'—মন্ত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যা এবং কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি। ব্রাহ্মণ বেদ-জ্ঞানের ভাণ্ডার। জানিয়া ক্রিয়া করাই ব্রাহ্মণের প্রধান নির্দেশ : 'য এবং বেদঃ স বেদ সর্বমিতি'—ইহাই প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা, নির্দেশ বা বিনিয়োগের অন্তিক বাক্য। জ্ঞানার্থে 'বেদ' শব্দের প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণেই ; মন্ত্রার্থ, মন্ত্রের বিনিয়োগ, মন্ত্রের ইতিহাস জানানোই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষ্য—ব্রাহ্মণ বেদিতব্যের বেদন। ব্রাহ্মণের মতে বেদনেই অভ্যুদয়, বেদনেই নিঃশ্রেয়স্ : তাই কথায় কথায় 'বেদ' (জানা)-এর প্রশংসা : 'অপ পাপ্মানং হতে য এবং বেদ' [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ], 'ইন্দ্রিয়বান্ বশীয়ান্ ভবতি য এবং বেদ' [গোপথ ব্রাহ্মণ]।

ব্রাহ্মণকে একদিক হইতে বলা যায় বৈদিক যুগের পুরোহিতদর্পণ। তবে পুরোহিত দর্পণ হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। দর্পণে বিধি আছে, অর্থবাদ নাই—ব্রাহ্মণে দুইই আছে। উপরন্তু ব্রাহ্মণ শুধু ক্রিয়া-কর্মের নির্দেশ নয়, জ্ঞানেরও ভাণ্ডার। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণের তিনটি অংশ : ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ ব্রাহ্মণে ক্রিয়ার অংশ প্রধান, উপনিষৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ। বৈদিক যুগের

দার্শনিক চিন্তার সার উপনিষৎ। আরণ্যক মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত; উহা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের যুক্তবেণী। আরণ্যকোপনিষৎ সহ ব্রাহ্মণের মর্যাদা অপরিমেয়। কর্মে ও জ্ঞানে যেমন জীবনের পরিপূর্ণতা, তেমনই বেদের পরিপূর্ণতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎকে লইয়া। শাখার যেমন পল্লব ও পুষ্প, তেমনই মন্ত্র-সংহিতার ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সমবায়ে সমগ্র বেদ।

ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়াও বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। সংহিতার যেমন অনন্ত শাখা, ব্রাহ্মণেরও তেমনই অনন্ত শাখা। ব্রাহ্মণের বহু অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহার সংখ্যাও নগণ্য নয়।

ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ দুইখানি,—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও (২) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণখানিকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলিব প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় দেববাত শুনঃশেপের কাহিনী। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্র-রোহিত সংবাদে ভারতবর্ষের বহুবিখ্যাত চলার মন্ত্র 'চরৈবেতি' সূক্তিগুলি স্থান লাভ করিয়াছে।

যজুর্বেদের দুইটি সংহিতা—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদেব বিখ্যাত ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; ইহা মূল সংহিতার সহিত যুক্ত। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয়-সংহিতাখানিই ব্রাহ্মণের লক্ষণাক্রান্ত। অনেকে ইহাকেও অতিশয় প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। এই ব্রাহ্মণ হইতে সংহিতার সমকালীন গদ্যভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। শত পথে (অধ্যাযে) বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম 'শতপথ'। এই ব্রাহ্মণখানি নানাদিক হইতে মূল্যবান। ইহা হইতে প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মৎস্য-পুরাণের বহুখ্যাত মনু-মৎস্য কাহিনী ইহার অন্তর্গত। তাহা ছাড়া আছে পুরূরবা-উর্বশীর উপাখ্যান, সোমরাজার বৃত্তান্ত, সৃষ্টি-বিষয়ক নানা পৌরাণিক আখ্যান। ভাষা বিচার করিলে শতপথ ব্রাহ্মণের গদ্য অপ্রাচীনত্বের লক্ষণ বহন করে।

সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণ 'তাণ্ড্য' বা 'পঞ্চবিংশ' ব্রাহ্মণ। অথর্ব-সংহিতায় আছে ব্রাত্য-স্তুতি; এই ব্রাহ্মণে ব্রাত্যষ্টোমের বিধান। গায়ত্রী-পতিত হইলেও ব্রাত্যগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ব্রাত্যষ্টোম প্রকৃতপক্ষে অনার্য জাতিকে শুদ্ধ করিয়া আর্যসমাজে গ্রহণ করার প্রতীক। সামবেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ' ও 'সামবিধান ব্রাহ্মণ' এর নাম উল্লেখযোগ্য। সামবিধান ব্রাহ্মণে রাত্রিদেবীকে শবরী মূর্তিতে ধ্যান করা হইয়াছে,

ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাম্।
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্॥ [সা. বি. ব্রা. ৩. ৮২]

অথর্ববেদের বহুখ্যাত ব্রাহ্মণ 'গোপথ ব্রাহ্মণ'। ইহা পূর্ব ও উত্তর এই দুইভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে পাঁচটি, উত্তর ভাগে ছয়টি প্রপাঠক। এই ব্রাহ্মণে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই, তবে ইহাতে অথর্বাঙ্গিরার উৎপত্তি-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও বা অথর্ব-সংহিতাকে বলা হইয়া 'ভৃগ্বঙ্গিরসঃ'। অথর্ববেদ যে বেদের সারভূত, এ সত্যটিও প্রতিপাদিত হইয়াছে:

যে অঙ্গিরসঃ স রসঃ। যে অথর্বাণ স্তদ্ভেষজম্। যদ্ ভেষজং তদমৃতম্। যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম। [গো. ব্রা. পূর্ব. ৩]

'ব্রহ্ম'[১] সংক্রান্ত কর্ম হইতে সম্ভবতঃ 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, 'ব্রাহ্মণ' হইতেই বর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। 'ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। উত্তরকালে যে সকল ক্রিয়াকর্ম হিন্দুত্বের সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে, 'ব্রাহ্মণই' তাহার মূল উৎস। প্রতিটি ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের উপযোগিতা, যজ্ঞকর্মে পুরোহিত নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণের প্রশস্তি ও সদক্ষিণা যজ্ঞকর্মের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তেমনই কালক্রমে বহু সংস্কার, আচারসর্বস্বতা এবং ক্রিয়াকর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই চার্বাকগণের কটূক্তি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য 'ভোগৈশ্বর্য গতিং প্রতি'—এইরূপ কটাক্ষ গীতাতেও আছে। তথাপি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ইহার উদ্দেশ্য হীন নয়, কেবল ভোগৈশ্বর্য লাভের কামনা নয়। ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্রপদের ভাষ্য, 'ব্রাহ্মণ' বৈদিক শব্দের 'নিরুক্তি', 'ব্রাহ্মণ' প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন, 'ব্রাহ্মণ' বিবিধ আখ্যায়িকার ভাণ্ডার। 'ব্রাহ্মণ'কে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় অন্যতম দর্শন—কর্ম-মীমাংসা।

ব্রাহ্মণের নিরুক্তি অংশগুলি কৌতূহলোদ্দীপক, যেমন, ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণের এই উক্তি:

স যোঽয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ। তান্ এষ প্রাণান্ মধ্যতঃ ইন্দ্রিয়েন ঐন্ধ। যদ্ ঐন্ধ তস্মাদ্ ইন্ধঃ। ইন্ধো হ বৈ তমিন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। পরোক্ষ কামা হি দেবাঃ। [শ. ব্রা. ৬. ১. ১]

১ ব্রহ্ম অর্থ 'স্তুতি' বা 'স্তোত্র'।

—ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্য প্রাণ, তিনি ইন্দ্র। তিনি মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণবর্গকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। ইন্ধন স্বরূপ হওয়ায় তিনি ইন্ধ। ইন্ধকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়।

ব্যুৎপত্তিনির্দেশে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট বাক্য,—'পরোক্ষকামা হি দেবাঃ' কিংবা 'পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ'। দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় তাঁহারা পরোক্ষ অর্থকেই পছন্দ করেন, স্থূল বা বাচ্যার্থ তাঁহাদের অপ্রিয়। মনে হয়, পুরাণে ও সাহিত্যে রূপকসৃষ্টির বীজ উপ্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণে।

চিরকালাগত কতকগুলি প্রথারও কৌতুকপ্রদ ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় মানুষের জন্মগ্রহণ করিতে এক বৎসর সময় লাগে, কারণ স্বয়ং প্রজাপতি সম্বৎসরে নিজে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এক বৎসর পরে শিশুরা কথা বলিতে শিখে, কারণ প্রজাপতি এক বৎসর পরে কথা বলিয়াছেন ['তস্মাদ্ উ সম্বৎসরে এব কুমারো ব্যাজিহীর্ষতি সম্বৎসরে হি প্রজাপতি র্ব্যাহরৎ'—শ. ব্রা. ১১.১.৬]। 'হারিয়ে মারিয়ে কাশ্যপ গোত্র' প্রবাদটির বীজও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়:

> স যৎ কূর্মো নাম এতদ্ বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত।
> যদসৃজত অকরোৎ তদ্ যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্মঃ। কশ্যপো বৈ
> কূর্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব প্রজাঃ কাশ্যপ ইতি। [শ. ব্রা. ৭.৪.৩]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, সম্ভোগের পূর্বে স্ত্রীলোক অদ্যাবধি ভোগ্য প্রার্থনা করে, ইহার একটি মৌল কারণ বিবৃত হইয়াছে। প্রজাপতি সোমরাজকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে তিনটি বেদ প্রদান করেন। সাবিত্রী সীতা সোমকে কামনা করেন। কিন্তু সোমের প্রিয়া ছিলেন শ্রদ্ধা। সীতা তখন প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রজাপতি তাহাকে অলংকৃত করিয়া গন্ধ দ্রব্যে চর্চিত করিয়া সোমের নিকট প্রেরণ করেন। সোম তাহাতে সীতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। সীতা বলেন, ভোগের দান দাও। সোম তখন তাঁহাকে ত্রিবেদ প্রদান করেন। সেইজন্য আজও পর্যন্ত স্ত্রীলোক মিলনের পূর্বে স্বামীর নিকট ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকে ['তস্মাদ উ হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে'—তৈ. ব্র. ৩.১০][1]

ব্রাহ্মণের কাহিনীগত আকর্ষণ অপরিসীম। এই কাহিনীর বৈচিত্র্যও অসাধারণ। পরবর্তী কালের বহু লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী ব্রাহ্মণেই অঙ্কুরিত হইয়াছে।

১। এই কাহিনীই পরবর্তীকালে পুরাণে রোহিণীপ্রিয় সোমের কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কতকগুলি কাহিনীতে জীবনের সুউচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। মনে করি, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের [৩. ১০] ইন্দ্র-ভরদ্বাজ বৃত্তান্ত। ভরদ্বাজ তিনজন্ম ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বৃদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভরদ্বাজ যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম্ কিমেতেন কুর্যা ইতি'—আমি যদি তোমাকে চতুর্থ জন্মের আয়ু প্রদান করি, তাহা দিয়া তুমি কি করিবে? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, 'ব্রহ্মচর্যমেব এনেন চরেয়মিতি'। ব্রহ্মচর্য পালনের প্রাপ্তি অগ্নিসাবিত্রী বা বেদ। ইন্দ্র ভরদ্বাজকে সেই অমূল্য রত্নই দান করিয়াছিলেন।

জীবনে চলার মহিমাও জীবন্ত ভাষায় কীর্তিত হইয়াছে ব্রাহ্মণে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখি, রাজপুত্র রোহিত বরুণের ক্রোধ এড়াইবার জন্য অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘোষণা করিলেন পথচলার দিব্য মন্ত্র; হে রোহিত থামিও না, চল, চল—'চরৈবেতি'। চলাই জীবন, যে চলে সেই সৌভাগ্যবান্, যে চলে সেই অমর,

> নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি রোহিত শুশ্রুম।
> পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরত সখা
> চরৈবেতি॥
>
> পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
> শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ
> চরৈবেতি॥
>
> আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
> শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ
> চরৈবেতি॥
>
> কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
> উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্
> চরৈবেতি॥
>
> চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
> সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্
> চরৈবেতি॥

—হে রোহিত, আমরা শুনিয়াছি, নানা শ্রমে শ্রান্ত জনের শ্রী আছে। অলস জন পাপী। যে চলে ইন্দ্র তাহার সখা। চল, পথ চল।

চলমান ব্যক্তির জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত; তাহার বর্ধিষ্ণু আত্মা ফললাভের যোগ্য। তাহার পাপ শ্রম দ্বারা হত হইয়া পথে শুইয়া থাকে। চল, পথ চল।

বসিয়া থাকিলে ভাগ্যও বসিয়া থাকে, উঠিয়া দাঁড়াইলে ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায়। শুইয়া থাকিলে ভাগ্যও শুইয়া থাকে; যে চলে তার ভাগ্যও সচল। চল, পথ চল।

ঘুমন্ত ব্যক্তি কলি, জাগ্রত ব্যক্তি দ্বাপর, উত্থিত ব্যক্তি ত্রেতা যুগ, যে চলে, তাহার সত্য যুগ। চল, পথ চল।

চলমান ব্যক্তিই মধু লাভ করে, চলাই স্বাদু ফল। লক্ষ্য কর সূর্যের শ্রী, যিনি চলার পথে অতন্দ্র। চল, পথ চল।

বেদের ব্রাহ্মণ-অংশ এই ধরনের বহু বিচিত্র কাহিনীর ভাণ্ডার। সংহিতা-ভাগেও কাহিনী-বীজ আছে। ব্রাহ্মণে সেই বীজ অঙ্কুরিত। পুরাণাদিতে এই অঙ্কুরই বিস্তৃত বনস্পতি। বর্ণনাত্মক প্রাঞ্জল গদ্যও কাহিনীব উপযুক্ত বাহন। এই সকল দিক হইতে ব্রাহ্মণ কেবল কর্মকাণ্ড বা কর্ম-মীমাংসা নয়, ইহা গদ্য-বাহিত সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

৬. বেদান্ত বা উপনিষৎ

বৈদিক সাহিত্যের অন্ত-বা শেষ ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বেদের যে দুইটি প্রধান ভাগ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট উপনিষৎ। ইহা বৈদিক যুগের সুউচ্চ দার্শনিক চিন্তাব বাহন। সকল ক্রিয়া-কর্ম, যাগযজ্ঞের শেষে জীবনের চরম প্রাপ্তি কি, বেদান্ত বা উপনিষৎ তাহারই উত্তর। শব্দটির ব্যুৎপত্তি উপ-নি-সদ্; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়'। উহার ব্যঞ্জিত অর্থ—'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'পরাবিদ্যা' বা 'বিদ্যা' বা 'জ্ঞান'। উপনিষদ্-মতে এই জ্ঞান বা বিদ্যাই নিঃশ্রেয়স্।

অনেকেই মনে করেন, মূল সংহিতা হইতে উপনিষদের কালগত ব্যবধান প্রায় সহস্র বৎসর এবং উহা সংহিতা-ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত একটি নতুনতর চিন্তার প্রকাশ ['A new start'—Maxmuller]; একথা ঠিক যে, কালক্রমে নবতর উপনিষৎ যোজিত বা রচিত হইয়াছে—তথাপি উপনিষৎ সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। উপনিষৎ স্বতন্ত্র নয়, উহা বেদেরই একটি অংশ। বেদের অংশ বলিয়াই ভারতীয় দর্শনের উপজীব্য উপনিষৎ-শ্রুতি। উপনিষদও বেদ, বেদ পাদপের মূল; এই মূলটি

ফুটাইবার জন্যই মন্ত্র ও মন্ত্র-বিনিয়োগের আয়োজন, স্তুতি ও যজ্ঞের ভূমিকা। সংহিতার 'ব্রহ্মোদ্য' বা ভাববৃত্তিমূলক সূক্তাবলীতে বা অন্যান্য অংশে উপনিষৎ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেও উপনিষদের আলোচনা আছে। বিস্তার যে বীজ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে নিহিত, বেদান্তে তাহাই পল্লবিত ও পুষ্পিত। উপনিষৎ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ নয়, বরং কর্ম উপনিষৎ-পুষ্প চয়নের আঁকশি। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন[১], 'বস্তুতঃ প্রকৃত বেদ ও প্রকৃত বেদান্ত এক, একই তত্ত্বের দুইটি দিক মাত্র।'

উপনিষৎ বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। মনোজ্ঞ কাহিনীর মধ্য দিয়া গুরু-শিষ্যের কথোপকথনছলে কিংবা সংহিতোক্ত 'ব্রহ্মোদ্য' সূক্তের আকারে এই জ্ঞান পরিবেশন করা হইয়াছে। উপনিষদের প্রকাশমাধ্যম গদ্য ও পদ্য উভয়ই। পদ্যাংশে মূল সংহিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; গদ্যাংশের ভাষা ব্রাহ্মণের সমগোত্রীয়। কোন কোন স্থলে উহা ব্রাহ্মণেরই প্রতিধ্বনি। ভাব ও ভাষার দিক হইতে মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদের মিল থাকিলেও উপনিষদের প্রকৃতি ভিন্ন; মন্ত্র-ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ বেদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দিক, আর উপনিষৎ উহার তত্ত্বের দিক।

বৃক্ষের যেমন শাখা, পল্লব ও পুষ্প—তেমনই বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। প্রত্যেক বেদের যেমন একাধিক সংহিতা, একাধিক ব্রাহ্মণ—তেমনই একাধিক উপনিষৎ। উপনিষদের সংখ্যা অসংখ্য। তন্মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য অদ্বৈত মত প্রতিপাদনের জন্য যে বারখানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি), সেইগুলিই সমধিক প্রচলিত। এগুলি ছাড়াও আরও বহু উপনিষদের অস্তিত্ব আছে, বহু উপনিষৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদের উপনিষদগুলির মধ্যে (১) কৌষীতকি ও (২) ঐতরেয় উপনিষদ প্রধান। কৌষীতকি উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দন সংবাদ প্রসিদ্ধ; সত্যই যে ইন্দ্র, এই তত্ত্বটি এই কাহিনীতে ঘোষিত হইয়াছে। ঐতরেয় উপনিষদে কোন কাহিনী নাই; আত্মার ঈক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি পত্তন হইয়াছে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। একটি মাত্র শ্লোক 'গর্ভে নু সন্' ব্যতীত ইহার সমস্ত অংশই গদ্য। নিজেকে পরমাত্মারূপে অনুভব করাই জ্ঞান, ইহাই এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতার মূল উপনিষৎ 'তৈত্তিরীয়' উপনিষৎ। ইহা

১। বেদমাতা গ্রন্থাবলী—৩, দ্বিজদাস দত্ত।

তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত; শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগু বল্লী। প্রথম বল্লী উপদেশামৃতে পূর্ণ। শিষ্যের প্রতি আচার্যের আদেশ :

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়াম্মা প্রমদ।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নেতরানি।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। [তৈ. উ. ১. ১১. ১—৩.]

ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় : 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'রসোবৈ সঃ'। তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয়, 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ' (পঞ্চম স্থানীয় যম কার্যে প্রবৃত্ত হয়)। এই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি অভয় : 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' [তৈ. উ. ২. ৪.]। এই উপনিষদের শেষ অধ্যায় 'ভৃগুবল্লী'। ইহাতে আনন্দ-ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভৃগু ছিলেন বরুণের পুত্র। তিনি বরুণ সমীপে উপনীত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। বরুণ কহিলেন, 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।' তপস্যা করিয়া ভৃগু ক্রমে ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইলেন, অবশেষে জানিলেন :

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি

জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। [তৈ. উ. ৩. ৬.]

—আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অবশেষে আনন্দে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দে বিলীন হয়।

উপনিষদে এই আনন্দ-ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব। অন্ন হইতে আনন্দ পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম। অন্নও নিন্দিত নয়, উপেক্ষণীয় নয় ['অন্নং ন নিন্দ্যাৎ', 'অন্নং ন পরিচক্ষীত'], অন্নকে বর্ধিত করিতে হইবে ['অন্নং বহু কুর্বীত']। সূক্ষ্মের দিকে যাঁহাদের যাত্রা, স্থূলকেও তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না। ইহাই উপনিষদের শিক্ষা।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অপরাপর উপনিষদগুলির মধ্যে বহুখ্যাত 'কঠোপনিষৎ' ও 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ'। কঠোপনিষদের কাহিনী প্রসিদ্ধ যম-নচিকেতা সংবাদ। নচিকেতা ছিলেন বাজশ্রব উদ্দালকের পুত্র। পিতার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দান দেখিয়া বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, আমাকে কাহাকে দান করিলেন? বার বার একই প্রশ্ন করায় পিতা বলিলেন, 'মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।' নচিকেতা যমালয়ে উপনীত হইলেন। যম উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া নচিকেতাকে তিনদিন অপেক্ষা করিতে হইল। তিনদিন পরে যম আসিয়া নচিকেতাকে সমাদরে

বরণ করিলেন, তিন রাত্রি অনাহারে প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চাহিলেন। নচিকেতা প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পিতা যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যম তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা, অগ্নি-বিদ্যাসহায়ে যে অভয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার বিষয় জানিতে চাহিলেন। যমরাজ নচিকেতাব সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আরও একটি বর দিলেন যে, সেই অগ্নি-বিদ্যা নচিকেতার নামেই পরিচিত হইবে এবং অবশেষে কহিলেন, 'তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব।' নচিকেতা বলিলেন :

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্বয়াঽহং
ববাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ [কঠ. ১. ১. ২০]

—মৃত্যুর পব আত্মা থাকেন কি না—মানুষের এই যে সংশয়, আপনি তাহাই নিরসন করুন। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।

মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি ন'—এই জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার চরম। ইহাই আত্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ইহা চিবকালেব রহস্য। এ রহস্তেব উত্তব কঠিন, জটিল ও সূক্ষ্ম। যম তাই নচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি শতায়ু প্রার্থনা কব, ধন-জন-ঐশ্বর্য প্রার্থনা কর—হয়-হস্তী-সুবর্ণ প্রার্থনা কর : যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলো'কে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। [১. ১. ২৫.]

কিন্তু সংকল্পে অবিচলিত শিশু উত্তর করিলেন, 'অপি সব' জীবিতমল্পমেব'—হে যমরাজ, এ সকলই তো অনিত্য; 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্য'—মানুষ তো শুধু বিত্ত লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না। তখন যম কহিলেন, নচিকেতা, তুমি 'প্রেয়'কে পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়' প্রার্থনা করিয়াছ। সাধু তোমার জিজ্ঞাসা। এই বলিয়া মধুর শ্লোকে শ্লোকে তিনি তাঁহাকে 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, তাহাই বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, পরম তত্ত্ব হইল ব্রহ্ম বা আত্মা; ইহা 'অক্ষর'—ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'। ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হইতেও মহত্তর—'অণোর-ণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। শরীররথে তিনিই রথী—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু' [১. ৩. ৩.]। 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ'—যাহা ইহকালে, তাহাই পরকালে—যাহা পরকালে, তাহাই ইহকালে [২. ১. ১০.]। তিনিই 'হংসঃ

শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ হোতা বেদিষদ্ অতিথির্দুরোণসৎ' [২. ২. ২.]—সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে যিনি এক, বাহিরের রূপে তিনিই বহু :

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ [২. ২. ৯.]

এই যে অমর আত্মা, ইঁহাকে শুধু শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না, ধীর ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা হৃদয় মধ্যে সেই শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতির্ময়কে অনুভব করেন। তাঁহাকে জানার পথ অতি দুর্গম ; ক্রান্তদর্শী কবিগণ বলেন, সে পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়। অতএব, হে নচিকেতা, তুমি ওঠ, জাগো, বরণীয় লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ [কঠ. ১. ৩. ১৪]

ভারতবর্ষের শিশুও যে একদিন 'প্রেয়' ভোগ্যকে পরিহার করিয়া 'শ্রেয়কে' জীবনে কামনা করিত, শিশু নচিকেতা তাহার জাবন্ত উদাহরণ। কঠোপনিষদের শ্লোকগুলি মধুর অমৃতবর্ষী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই উপনিষদের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে।

'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষৎ আগাগোড়া শ্লোকে নিবদ্ধ। বৈদিক সংহিতার বহু ঋক্ ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি'—এই বাক্য দ্বারা ইহার সূচনা। ইহাতে কোন কাহিনী নাই। কয়েকটি দিক হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহাতে শৈব ও শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ যজুর্বেদীয় শতরুদ্রিয়স্তোত্রের দেবতা ঈশানরুদ্র এখানে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ; তৃতীয়তঃ ইহাতে যোগ-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে. 'বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ'—২. ৯. ; চতুর্থতঃ মহর্ষি কপিলকে এখানে আদিজাতক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে'—৫.২. ; পঞ্চমতঃ প্রকৃতিই মায়া এবং মহেশ্বর মায়াধীশ—এই তত্ত্বটও এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত,

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ [শ্বেত. ৪. ১০]

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সগোত্র, এইজন্য শক্তিযোগে ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশের উপর এখানে গুরুত্ব। এই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য :

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ [শ্বেত. ৪. ১]

—যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও শক্তিযোগে বহুকে প্রকাশ করেন, প্রলয়ে যাঁহাতে বিশ্ব বিলীন হয়, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির সহিত যুক্ত করুন।

শুক্লযজুর্বেদের শেষ অধ্যায় (৪০ অধ্যায়) 'ঈশোপনিষৎ' নামে খ্যাত। ১৮টি শ্লোকে সমাপ্ত এই উপনিষদে ধর্ম ও কর্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং সম্ভূতি ও অসম্ভূতির সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম ও কর্ম এক শৃঙ্খলে গ্রথিত। বিশ্বজগতকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিয়া ত্যাগশুদ্ধ ভোগকেই ভারতবর্ষ স্বীকার করে। ঋষি তাই বলেন,

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ [ঈশ. ১]

বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান—উভয়কেই জানিতে হইবে। অবিদ্যা ও বিজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত আস্বাদন করিতে হইবে—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' [ঈশ. ১১]। পরম সত্যের মুখখানি অতি উজ্জ্বল হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত, এই চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য অপসারিত হইলেই সত্যকে দেখা যায়। তাই ঋষির প্রার্থনা,

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ [ঈশ. ১৫]

শুক্ল যজুর্বেদের আর একখানি উপনিষৎ 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ'। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায় এবং আয়তনে সুবৃহৎ। ইহা তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড ও খিলকাণ্ড। প্রত্যেক কাণ্ডে দুইটি করিয়া অধ্যায়। মধুকাণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব; এই কাণ্ডেরই অন্তর্গত বহুখ্যাত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ[১] [বৃঃ আঃ ২. ৪]। মৈত্রেয়ী ভারতীয় নারী জীবনের একাদর্শ। একদিন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পার্থিব সম্পৎ ভাগ করিয়া দিয়া সন্ন্যাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন, পৃথিবী বিত্তদ্বারা পূর্ণ হইলেও আমি কি অমর হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় না। তখন মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—যাহা দিয়া আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দিয়া কি করিব?

১. এই সংবাদটি যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের—অর্থাৎ ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণে পুনরুক্ত হইয়াছে।

অমরত্ব লাভের উপায় আপনি যাহা জানেন, তাহাই বলুন। প্রিয়ার প্রিয় প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দিত হইলেন, পত্নীকে উপদেশ করিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম বা আত্মার প্রয়োজনেই পতি জায়ার প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়া; আত্মার প্রয়োজনেই পুত্র, বিত্ত, লোক—সব কিছু প্রিয়। এই আত্মারই নিশ্বাস ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা।[২] ব্রহ্মই সর্বভূতান্তরাত্মা। মধুকাণ্ডের 'মধুব্রাহ্মণ [২. ৫] কবিত্বে ও তত্ত্বগাম্ভীর্যে সুমধুর। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, 'যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্'—আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই সর্ব। এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর পক্ষে মধু; জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূত জলের মধু; এইরূপে বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু (মেঘরব), আকাশ, ধর্ম, সত্য, মানুষ—সবাকছু সকলের পক্ষে মধু। এই মধুর সার 'আত্মা'—ইনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড নামে পরিচিত। এই কাণ্ডের প্রধান নায়ক যাজ্ঞবল্ক্য। বিদেহসম্রাট জনকের বহুদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠানে সুবর্ণশৃঙ্গ সহস্র গাভী দক্ষিণার্থে সংগৃহীত হইয়াছে। জনকের ইচ্ছা, শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এই দক্ষিণা গ্রহণ করেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। কেহই গাভী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। আসিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি অন্তেবাসী সামশ্রবাকে গাভী মোচন করিতে বলিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একে একে সকলে যাজ্ঞবল্ক্যকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্তি, কহোল, আরুণি, বাচক্লবী গার্গী আরও অনেকে। সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া মুনিগণকে নিরস্ত করিলেন ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য। বচক্লুদুহিতা গার্গী এই সভার অন্যতম গৌরব; তিনি নারী, তিনি জিজ্ঞাসু, তিনি নির্ভীক; অক্ষরব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্নটি তাঁহারই। সে প্রশ্ন সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় সপত্ন-ভেদী। যাজ্ঞবল্ক্য তাহারও উত্তর দিলেন, অক্ষরব্রহ্মই চরম তত্ত্ব:

> এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত
> এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত
> এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তো অহোরাত্রাণ্য—
> র্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি......বৃ. আ ৩. ৮. ৯]

---

২. 'অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি' [বৃ. আঃ ২. ৪. ১০] —এই বাক্য হইতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তালিকা সংগ্রহ করা যায়।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে জ্যোতিঃ ব্রাহ্মণ অংশটিও [৪. ৩] অতি সুন্দর :

জনক প্রশ্ন করিলেন, কিং জ্যোতিঃ ?
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সূর্যপ্রভাই জ্যোতি।
জনক : সূর্য অস্তমিত হইলে জ্যোতি কি ?
যাজ্ঞবল্ক্য : তখন চন্দ্রই জ্যোতি।
জনক : চন্দ্রের অভাবে জ্যোতি কি ?
যাজ্ঞবল্ক্য : অন্ধকারে অগ্নিই জ্যোতি।
জনক : অগ্নি নির্বাপিত হইলে জ্যোতি কি ?
যাজ্ঞবল্ক্য : অগ্নির অভাবে জ্যোতি শব্দ। অন্ধকারে
যেখানে আলো নাই, সেখানে শব্দজ্যোতি পথ দেখায়।
জনক : শব্দেরও যখন অভাব হয় তখন জ্যোতি কি ?
যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, আত্মাই তখন জ্যোতিঃস্বরূপ।
এই আত্মাই 'হিরণ্ময় পুরুষ একহংসঃ'

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় 'খিলকাণ্ড'। ইহাতেও কয়েকটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ-উপাখ্যানটি উল্লেখযোগ্য। প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবতা, মানুষ, অসুর। ব্রহ্মচর্যে বাস করিয়া তাঁহারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ বলিলেন। উপদেশ দিন। প্রজাপতি বলিলেন, 'দ'। দেবগণ বুঝিলেন, প্রজাপতি বলিতেছেন, 'দাম্যত' (দমন কর)। মনুষ্যগণকেও প্রজাপতি উপদেশ করিলেন, 'দ'। মানুষেরা বুঝিল, প্রজাপতি বলিতেছেন 'দত্ত' (দান কর)। অসুরগণও অনুরূপে প্রজাপতি হইতে 'দ' উপদেশ পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিতেছেন, 'দয়ধ্বম্' (দয়া কর)। দম, দান, দয়া এই তিনের প্রতীক তিন 'দ'। আজও পর্যন্ত মেঘগর্জনে এই তিনটি দৈবী বাক্ উচ্চারিত হয়, 'দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি'। [বৃ. আ. ৫. ২]।

সামবেদের বিখ্যাত উপনিষৎ 'ছান্দোগ্য উপনিষৎ'। এই উপনিষৎখানিকে প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে একখানি বলিয়া গণ্য করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রকৃতি অন্যান্য উপনিষৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে উপাসনার গুরুত্ব। আটটি অধ্যায়ের ভিতর প্রথম তিন অধ্যায়ে বিবিধ উপাসনার বিষয়, যথা, উদ্‌গীথোপাসনা, সূর্যোপাসনা ও মধুবিদ্যা। আরও একটি বিষয়ে এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : দেহই যে ব্রহ্মপুর এবং উহার অভ্যন্তরে 'দহর পুণ্ডরীকবেশ্ম' (হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ),

তাহা উক্ত হইয়াছে। দেহস্থ রসবাহী নাড়ীর উল্লেখও ইহাতে পাওয়া যায়। দেহতত্ত্বের এই সকল অংশ উপনিষদে নূতন। উপনিষদের মর্মবাণী—আত্মাই জিজ্ঞাস্য—এ বিষয়েরও অসদ্ভাব নাই। এই আত্মাই 'ভূমা', উহাই সুখ—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্' [ছা. উ. ৭.২৩]।

কাহিনীর অবতারণাতেও এই উপনিষদের ত্রুটি নাই। চাক্রায়ণ (=চক্র-তনয়) উষস্তির উপাখ্যান, শ্বেত কুকুরের উপাখ্যান, জানশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যান কৌতূহলোদ্দীপক। জাবাল সত্যকামের কাহিনী [৪. ৪-৯] অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। সত্যকাম ছিলেন 'পরিচারিণী' জবালার পুত্র। তিনি একদিন মাতাকে বলিলেন, আমি গুরুগৃহে বাস করিতে চাই, আমার গোত্র কি—'কিংগোত্রো ন্বহমস্মীতি?' মাতা উত্তর করিলেন, তুমি যে কোন্ গোত্র, তাহা ত জানি না। যৌবনে আমি বহুচারিণী পরিচারিণী ছিলাম ['বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী']। সেই সময় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। তুমি নিজেকে জাবালসত্যকাম নামে পরিচয় দিও। সত্যকাম হারিদ্রুম গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্যে বাস করিব। তিনি কহিলেন, সৌম্য তোমার কি গোত্র? সত্যকাম মাতার উক্তির প্রতিধ্বনি করিলেন। গৌতম কহিলেন, 'নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহর। উপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।'—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ এরূপ বলিতে পারে না, হে সৌম্য, তুমি সত্যভ্রষ্ট হও নাই, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব। সত্যকাম গোচারণে বহির্গত হইলেন: চারিশত দুর্বল গাভী সত্যকামের পরিচর্যায় সহস্র গাভীতে পরিণত হইলে তিনি আচার্যসদনে চলিলেন। ফিরিবার কালে তিনি বৃষভ, অগ্নি, হংস ও মদ্গু (একপ্রকার জলচর পাখী) হইতে ব্রহ্মের চতুষ্কল চারিটি তত্ত্ব অবগত হইয়া গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরু প্রশ্ন করিলেন, তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন? সত্যকাম উত্তর করিলেন, মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, এখন আপনি আমাকে উপদেশ করুন। গুরুও তাঁহাকে সেইরূপই উপদেশ করিলেন।

শ্বেতকেতু-আরুণি সংবাদটিও সুন্দর। আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, আমাদের কুলে কেহই 'ব্রহ্মবন্ধু' (ব্রাহ্মণবংশজাত হইয়াও যে আচার-বর্জিত) নয়, তুমি গুরুকুলে গিয়া অধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু বার বৎসর বয়সে গুরুকুলে গিয়া চব্বিশ বৎসরের সময় ফিরিয়া আসিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াও 'মহামনা' (অহংকারী), 'অনূচানমানী' (জ্ঞানাভিমানী) ও 'স্তব্ধ' (অবিনীত) হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, যাহাদ্বারা অশ্রুত শ্রুত-

হয়, অমন্তব্য মন্তব্য হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, সেই 'আদেশটি পাইয়াছ কি?' শ্বেতকেতু কহিলেন, নিশ্চয় গুরুগণ তাহা জানেন না, তাই আমাকেও বলেন নাই; আপনি আমাকে বলুন। পিতা তখন ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করিলেন, বুঝাইলেন, সৃষ্টির আদিতে ছিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'—[ছা. ৬. ২. ৩] —তাহার ফলে সৃষ্টি পত্তন হইল। পিতা পুত্রকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষা দিলেন এক আত্মাই বহু হইয়াছেন। সমস্ত জগৎ সেই আত্মারই প্রকাশ, সেই আত্মাই সত্য। হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই—'তত্ত্বমসি'। 'তত্ত্বমসি'—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উপনিষদের শিক্ষা।

নারদ-সনৎকুমার সংবাদে [ছা. উ. ৭.] 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই তত্ত্বটি পরিবেশন করা হইয়াছে। সনৎকুমারই স্কন্দ। তিনিই 'মৃদিতকষায়' (রাগদ্বেষাদি বিমুক্ত) নারদকে অন্ধকারের পরপার দর্শন করাইয়াছিলেন। এই উপাখ্যান হইতে তৎকালপ্রচলিত অপরা বিদ্যার একটি তালিকা পাওয়া যায়; সেগুলি হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্বণ, পঞ্চমবেদ ইতিহাসপুরাণ, 'বেদানাং বেদং' (ব্যাকরণ), 'পিত্র্য' (শ্রাদ্ধকল্প), 'রাশি' (গণিত), 'দৈব' (উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা), 'নিধি' (অর্থশাস্ত্র) 'বাকোবাক্য' (তর্কশাস্ত্র), 'একায়ন' (নীতিশাস্ত্র), 'দেববিদ্যা' (নিরুক্ত), 'ব্রহ্মবিদ্যা' (শিক্ষা-কল্পাদি), 'ভূতবিদ্যা', 'ক্ষত্রবিদ্যা' (ধনুর্বেদ), 'নক্ষত্রবিদ্যা' (জ্যোতিষ), 'সর্পদেবজনবিদ্যা' (গারুড় ও গান্ধর্ব শাস্ত্র) [ছা. উ. ৭. ১. ২]। সকল বিদ্যার সার আত্মজ্ঞান।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের সর্বশেষ আখ্যান—ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ। ইন্দ্র দেবরাজ, বিরোচন অসুরপতি। যে আত্মাকে লাভ করিলে সকল কাম্য লাভ করা যায়, তাহাকে জানিবার জন্য উভয়ে প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, অক্ষিতে (চক্ষুতে) যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আত্মা। বিরোচন বুঝিলেন, দেহই আত্মা; তিনি অসুরগণের নিকট গিয়া প্রচার করিলেন, দেহই আত্মা, দেহই 'মহয্য' (পূজনীয়), দেহই 'পরিচর্য' (পরিচর্যার যোগ্য)। ইহাই আসুরী উপনিষৎ। এইজন্য যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, অযজ্ঞা—তাহাকে আজিও বলা হয় অসুর। পথে যাইতে যাইতে ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, দেহ আত্মা হইতে পারে না, কারণ, আত্মা অজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধা-পিপাসা-হীন—কিন্তু দেহ নশ্বর, শোক, ক্ষুধা, ও পিপাসার অধীন। তিনি প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।' তখন প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্যে বাস করাইলেন ; এইরূপ আরও বত্রিশ বৎসর করিয়া শতবর্ষে ইন্দ্রকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। দেবগণ তাই আত্মবিদ্।

সামবেদের আর একখানি উপনিষৎ 'কেনোপনিষৎ'। 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ'—কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন কার্য করে—এই প্রশ্ন লইয়া ইহার সূচনা। উত্তর হইল, 'তদেব ব্রহ্ম'। এই ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, অথচ বাক্য-মন ইহাদ্বারা উদ্ভাসিত। আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহা দ্বারাই অমৃত লাভ হয় ['বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্'—২. ৪.]। উমা-হৈমবতীর মনোজ্ঞ কাহিনী দ্বারা [কেন. ৩. ৪.] এই সত্যই সমর্থিত হইয়াছে। অসুরদের জয় করিয়া অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব-শক্তির মহিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলে সহসা এক যক্ষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। অগ্নি জানিতে গেলেন, কে এই যক্ষ। যক্ষ অগ্নিকে 'জাতবেদা' জানিয়া তাঁহাকে একগাছি তৃণ দগ্ধ করিতে বলিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তাহার পর আসিলেন মাতরিশ্বা বায়ু। সমস্ত শক্তি দিয়া তিনিও তৃণগাছিকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন আসিলেন স্বয়ং ইন্দ্র। যক্ষ তখন অন্তর্হিত হইয়াছেন। সেই আকাশে বিরাজ করিতেছেন, 'বহু শোভমানা' স্ত্রীমূর্তি উমা হৈমবতী। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'কিমেতদযক্ষম্'; তিনি উত্তর করিলেন, 'ব্রহ্মেতি'; এই ব্রহ্মের বিজয়েই দেবগণ মহিমান্বিত হইয়াছেন। কাহিনীটি ব্রহ্মতত্ত্বের দিক হইতে যেমন তাৎপর্য পূর্ণ শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতেও তেমনই ইঙ্গিতগর্ভ। উমা-হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা।

অথর্ববেদের প্রায় একশত কুড়ি খানি উপনিষৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে : কোন কোনটি অতি অর্বাচীন। মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও প্রশ্ন—এই তিনখানি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। মুণ্ডকোপনিষদের জিজ্ঞাসু শৌনক, উত্তর কর্তা ঋষি অঙ্গিরা। ইহা শৌনক শাখার উপনিষৎ। এখানে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে…পরাচৈবাপরা চ' [মু. ১. ১. ৪.]। বেদ-বেদাঙ্গাদির বিদ্যা অপরা বিদ্যা। কর্মফলকামী অপরা বিদ্যার উপাসনা করেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্মও অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে অগ্নির সপ্তজিহ্বারূপে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কর্মদ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও বিচ্যুতি আছে। ব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিদ্যা। ব্রহ্ম 'অমূর্তঃ', 'পরতঃ পরঃ'—তিনি 'আনন্দরূপমমৃতম্'; তাহা শুভ্র—জ্যোতিরও জ্যোতি, তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ বিশ্ব জগৎ : 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ব মিদং বিভাতি'। [মু. ২. ২. ১০]

সত্য দ্বারা এই আত্মা লভ্য হয়। সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নয়—সত্য দ্বারা দেবযান পথ বিতত (আস্তীর্ণ): 'সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ' [মু. ৩. ১. ৬.]। এই আত্মাকে শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, মেধা দ্বারা বা শ্রুতি দ্বারা লাভ করা যায় না—বলহীনের দ্বারাও আত্মা লভ্য হন না ['নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—৩. ২. ৪.]; বিদ্বানই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে 'ওঙ্কার-মহিমা' কীর্তিত হইয়াছে; 'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্'। উপনিষদখানি আকারে অতি ক্ষুদ্র। ওঙ্কার আত্মার প্রতীক। আত্মা 'চতুষ্পাৎ', অর্থাৎ উহার চারিটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, চতুর্থ বা তুরীয়। চতুর্থ অবস্থা অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য—উহা 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'; মাত্রাহীন (অমাত্র) ওঙ্কার সেই চতুর্থ অবস্থা। যিনি ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং আত্মায় প্রবিষ্ট হন।

প্রশ্নোপনিষদও পরংব্রহ্ম-জ্ঞাপক। সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণি, কৌসল্য, বৈদর্ভী, ও কবন্ধী প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি ভগবান পিপ্পলাদকে 'প্রশ্ন' করিয়া উপনিষৎ জ্ঞাত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'প্রশ্নোপনিষৎ'। ইহা পৈপ্পলাদ শাখার উপনিষৎ। ছয়জনের প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর ইহার ছয়টি অধ্যায়। এখানেও ব্রহ্মই যে পরম, 'নাতঃ-পরমস্তি'—এই সত্য বিঘোষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে দেহস্থ নাড়ী ও প্রাণ-বায়ুর কথা বিবৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের বাণী: 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা' [প্রশ্ন. ৬. ৬.]—সেই বেদ্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে।

এই তিনখানি উপনিষৎ ব্যতীত অথর্ববেদের আরও অনেক উপনিষৎ আছে। সেগুলি যোগ ও তন্ত্রোপাসনার কথায় পূর্ণ। 'তারকোপনি[illegible], 'জাবালোপনিষৎ' 'তেজোবিন্দুপনিষৎ', 'হংসোপনিষৎ' প্রভৃতি উপনিষদে যোগাচার এবং 'কৌলোপনিষৎ' 'ত্রিপুরোপনিষৎ' প্রভৃতিতে শাক্তাচারের কথা পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ও তাহার শাখা-প্রশাখার সহিত যোগ ও তন্ত্রের গূঢ় সংযোগ রহিয়াছে।

ব্রহ্ম বা আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই উপনিষদের প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্মবাদ বা আত্ম-বাদ উপনিষদের নিজস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদের সংহিতা ভাগে সকল দেবতার অন্তরালে যে পরম এক আছেন, তাহা আভাসিত হইয়াছে। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' [ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬.], 'দেবানাং নামধা এক এব' [ঋ. ১০. ৮২. ৩.], 'একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্' [ঋ. ৮. ৫৮. ২.]—এইরূপ একেশ্বরবাদ, কিংবা যে কোন দেবতার 'মহী'-রূপে প্রতিষ্ঠা, যেমন, ইন্দ্র 'একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা' [ঋ. ৬. ৩৬. ৪.], 'সূর্য্য

আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' [ঋ. ১. ১১৫. ১.], 'বট্ মহাঁ অসি সূর্য' [সা. ২. ; অ. ১৩. ২. ২৯] থাকিলেও, পরমেশ্বর রূপে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ সেখানে নাই ; ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের কথা বীজাকারে আছে ['ব্রহ্মণঃ সাত্মতাম্'—শত. ব্রা. ১১. ৫. ৬.] ; উপনিষদে ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয় ; ব্রহ্মই শ্রোতব্য, মন্তব্য, জ্ঞেয় ; ব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিদ্যা ; ইহাই নিঃশ্রেয়স্‌। উপনিষদে পাণ্ডিত্য, মেধাও শ্রুতিজ্ঞানকেও নিম্ন আসন দেওয়া হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক মনোভাব আরণ্যক-উপনিষৎ হইতেই সুরু হইয়াছে।[১] উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত : ব্রহ্মকে জানাই জীবনের চরম লক্ষ্য : তাঁহাকে জানিলেই অমৃত ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা। এই যুগে এই জ্ঞানের জন্ত উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ—নর ও নারী—রাজা ও সাধারণ গৃহস্থ। চিন্তার দিক হইতে প্রাগ্রসর এই জীবন নিঃসন্দেহে গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, উপনিষদের মানুষ কি কর্ম-বিমুখ হইতে চাহিয়াছে ; সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে যে জীবন-রসিক মানুষের কথা পাওয়া গিয়াছে, উপনিষদের মানুষ কি তাহা হইতে স্বতন্ত্র ? স্বতন্ত্র নয়, জীবন-পলাতকাও নয়। উপনিষদের কাহিনী-গুলিই তাহার প্রমাণ। যে ব্রহ্ম-স্বাদ লাভের জন্য মানুষ ব্যাকুল, তিনি রসঘন ['রসো বৈ সঃ'], তিনি আনন্দরূপ অমৃত 'আনন্দরূপমমৃতম্']। এই রসকে লাভ করিয়া জীবও আনন্দ-স্বরূপ হয়—'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি' [তৈ. উ. ২. ৭.]। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' এই জ্ঞানে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—ত্যাগ দ্বারা ভোগ —ইহাই উপনিষদের আদেশ। জগতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র পথ : সত্যকে যাঁহারা জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মকে যাঁহারা সর্বব্যাপী দেখিয়াছেন, আনন্দ ও অমৃতকে যাঁহারা বিশ্বময় ছড়ানো দেখিয়াছেন, তাঁহারা জীবন প্রেমিক। যাঁহাদের দৃষ্টিতে সবই পূর্ণ, 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং'—প্রেম, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারাই বলিতে পারেন, 'সহ বীর্যং করবাবহৈ…মা বিদ্বিষাবহৈ'। ঋতে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে বলিষ্ঠ জীবন, সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে আনন্দে ও অভয়ে সুপ্রতিষ্ঠ যে জীবন, উপনিষদের মানুষ সেই জীবনের প্রত্যাশী।

১. 'The earliest trace of heterodoxy and criticism in the history of Indian religious thought is to be found in the Aranyakas and the Upanisadas'—Obscure Religious cults. Chap. III, Dr. S. B. Das Gupta.

৭. অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য : বেদাঙ্গ, সূত্র ও উপবেদ

বেদ বলিতে সাধারণতঃ চতুর্বেদ ও তাহাদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, অরণ্যক ও উপনিষদগুলিকেই বুঝায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপ্তি আরও বিরাট। বেদাঙ্গ, সূত্র, অনুক্রমণী ও পাঠ—এগুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বেদাঙ্গ

বৈদিক সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ 'বেদাঙ্গ'। বেদ বুঝিবার পক্ষে বেদাঙ্গ অপরিহার্য। লোকে বলিতেও বলে, 'বেদ-বেদাঙ্গ'। বেদাঙ্গ ছয়টি : শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্ ও কল্প। বেদ-পুরুষের ছয়টি অঙ্গ, অর্থাৎ 'ষড়ঙ্গ'। 'ছন্দ' বেদ-পুরুষের পদ, তাহার হস্ত 'কল্প', 'জ্যোতিষ' তাঁহার চক্ষু, 'নিরুক্ত' শ্রোত্র, 'শিক্ষা' ঘ্রাণ, আর 'ব্যাকরণ' তাঁহার মুখ। কল্পনাটি সুন্দর। বস্তুতঃ অঙ্গ লইয়া যেমন মানুষের পরিপূর্ণতা, তেমনি বেদাঙ্গ লইয়া বেদের পরিপূর্ণতা।

॥ শিক্ষাশাস্ত্র ॥ বৈদিক মন্ত্রগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভেদে স্বরের উচ্চারণ রীতি, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে স্বরের নাদ-বৈচিত্র এবং অক্ষরের মাত্রা ও বল (উচ্চারণের প্রযত্ন) প্রভৃতি জানা আবশ্যক। এইগুলিই 'শিক্ষা'র আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে বেদের ধ্বনি-বিজ্ঞান। এই ধ্বনি-বিজ্ঞান জানা না থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণে প্রমাদ ঘটিতে পারে এবং তা যজমানের পক্ষে ক্ষতিকর। এইজন্যই শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

॥ ব্যাকরণ ॥ পদের সাধুত্ব জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন 'ব্যাকরণ'। ইহা দ্বারা কিভাবে একটি পদগঠিত বা সাধিত হয়, তাহা জানা সম্ভব। বেদপাঠে স্বরের যেমন গুরুত্ব, পদেরও তেমনি গুরুত্ব। প্রতি চরণে পদগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্থাপিত। পদ-সাধন জ্ঞান না থাকিলে পদের মর্মার্থ অনুধাবন করা দুষ্কর। এইজন্য ব্যাকরণ বেদ-জ্ঞানের একটি অন্যতম অঙ্গ।

শিক্ষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মহর্ষি পাণিনি-কৃত শিক্ষা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই প্রাচীনতম বলিয়া মনে করা হয়। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি' বলিয়া তিনি পঞ্চখণ্ডে শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পাণিনি-ব্যাকরণ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার আর এক নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার দিক হইতে অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীন হিন্দুমনীষার একটি অমর কীর্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থখানিকে অবলম্বন

করিয়া আরও পরবর্তীকালে কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) একখানি 'বার্তিক' এবং পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) 'মহাভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন।

॥ নিরুক্ত ॥ বৈদিক মন্ত্রপদের অর্থজ্ঞানের জন্য 'নিরুক্ত'। নিরুক্ত এক হিসাবে বৈদিক শব্দকোষ বা মন্ত্রভাষ্য। বৈদিক ঋষিগণ কোন্ শ্লোকে, কি অর্থে, কোন্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৈদিক শব্দার্থ নিরূপণের জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাহাকে বলা হইত 'নৈরুক্তবাদী'। মন্ত্রের পদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত নৈরুক্তবাদীদের মতের ও ব্যাখ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সুপ্রাচীন নিরুক্তকার হিসাবে শাকপুনি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি আচার্যের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের কিছু কিছু মত পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন নিরুক্তগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য যাস্ক-প্রণীত 'নিরুক্তই' [খ্রীঃ পূঃ ৮০০][1] এ বিষয়ে এখন একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৈদিক সংহিতার অতি প্রাচীন ব্যাখ্যারূপে নিরুক্ত-ভাষ্যের মূল্য অসাধারণ। 'সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্য'—এইরূপ সূচনা সহ যাস্কের ভাষ্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বেদোক্ত দ্রব্য, দেবতা ও পদার্থ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিরুক্তেরই মত আর একখানি গ্রন্থ 'নির্ঘণ্টু'। ইহাও যাস্কপ্রণীত এবং পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত একটি শব্দকোষ।

॥ ছন্দ ॥ বৈদিক মন্ত্রগুলি পাদবদ্ধ। এক এক পাদে পরিমিত অক্ষর সন্নিবিষ্ট হয়। পাদের এই অক্ষর-পরিমাণকেই ছন্দ বলে। যাস্ক বলেন, 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'—অর্থাৎ ছন্দ পাপকর্মকে আচ্ছাদন করে। ছন্দদ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ দোষ ক্ষালিত হয়। যজ্ঞ-মন্ত্রে এইজন্য ছন্দের স্থান অতি উচ্চে। বৈদিক ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। এগুলিকে অলৌকিক ছন্দ বলে। এ ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত ও পাদবদ্ধ। যেমন গায়ত্রী ছন্দঃ ইহা ত্রিপদা ও প্রতিপাদে আটটি করিয়া অক্ষর। তিন পাদে মোট ২৪টি অক্ষর। প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি এই ছন্দে গ্রথিত,

তৎসবিতুর্বরণীয়ং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥[2]

বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রীই স্বল্পাক্ষরা। গায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যা চার করিয়া বৃদ্ধি করিলে ক্রমানুসারে পরবর্তী ছন্দের অক্ষর সংখ্যা পাওয়া যায়।

১। 'Yaska lived between 700—500 B.C'—Winternitz.

২. বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদী বা লাচাড়ী ছন্দ অনেকটা গায়ত্রীর অনুরূপ।

কথিত আছে সৈতব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, মাণ্ডব্য প্রভৃতি মুনিগণ ছন্দশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। বর্তমানে পিঙ্গলমুনি-বিরচিত ছন্দ গ্রন্থই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়, যদিচ পিঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের। পিঙ্গলছন্দ:'ধী, শ্রী' প্রভৃতি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে আলৌকিক বৈদিক ছন্দগুলির আলোচনা, অপর পাঁচ অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যের উপযোগী লৌকিক ছন্দের প্রসঙ্গ।

॥ জ্যোতিষ ॥ কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্রের জ্ঞানই জ্যোতিষ শাস্ত্র। বৈদিক দর্শযাগ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি যাগযজ্ঞের জন্য কাল-জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। কারণ, এক এক যজ্ঞ এক এক কালে অনুষ্ঠিত হইত—যেমন, দর্শযাগ কৃষ্ণপক্ষে, পৌর্ণমাস শুক্লপক্ষে, চাতুর্মাস্য ঋতুর অন্তে এবং পশুমেধ অয়নান্তে। যজ্ঞকাল নিরূপণের জন্য তাই প্রয়োজন হইত জ্যোতিষ।[৩] রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচারে ভারতীয় জ্যোতিষ সভ্য জগতে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। বেদাঙ্গরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রই—ইহার মূল। এই শাস্ত্রের প্রবর্তক স্বয়ং সূর্যদেব। সৌর জ্যোতিষ কালের কবলে গ্রস্ত। পরবর্তীকালে গর্গাদি মুনি কর্তৃক যে গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমানে ভারতীয় জ্যোতিষের ভিত্তি।

॥ কল্পশাস্ত্র ॥ বৈদিক কর্মানুষ্ঠান-ক্রমের নির্দেশ। ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। ইহাকে বলা চলে সংক্ষেপিত ব্রাহ্মণ। কিভাবে হৌত্র, আধ্বর্য ও ঔদ্গাত্র প্রয়োগ করিতে হয়, কল্পশাস্ত্রে তাহারই বিধান। অশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষি কল্পশাস্ত্রের প্রণেতা।

॥ সূত্র সাহিত্য ॥

কল্পশাস্ত্রের প্রসঙ্গে সূত্র সাহিত্যের নাম করিতে হয়। সূত্রসাহিত্যও বিস্তীর্ণ এবং নানাদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রসাহিত্যই বেদ ও বেদোত্তর সাহিত্যের যোগসূত্র। শুধু তাই নয়। ইহা বেদের ব্রাহ্মণাংশের প্রতিনিধি। শ্রুতির কর্মকাণ্ড এক সময় বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। যাগ-যজ্ঞের সংখ্যা এবং তাহাদের বিধি ও বিধান ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর এবং বিস্তৃততর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মণের সুবিস্তৃত বিধি ও বিধানকে সংক্ষেপে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই সূত্র সাহিত্যের সৃষ্টি।

---

৩. বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞা
তস্মাদিদং কালাভিধান-শাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম্। [শব্দকল্পদ্রুম]

সূত্র সাহিত্যও নানাভাগে বিভক্ত—ধর্মসূত্র, শ্রৌত্রসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও শুল্বসূত্র। এই চারিটির সাধারণ নাম 'কল্পসূত্র'। সূত্রগুলির মধ্যে প্রধান শ্রৌতসূত্র ও স্মার্তসূত্র।[১] শ্রৌতসূত্রগুলি শ্রুতি-মূল; শ্রুতির যাগ-যজ্ঞের বিধানগুলি এখানে সূত্রাকারে গ্রথিত। সূত্র 'ব্রাহ্মণ' লক্ষণাক্রান্ত হইলেও উহার প্রধান বিশিষ্টতা সংক্ষিপ্ততা। ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা বিস্তৃত, সূত্রের নির্দেশ সংক্ষিপ্ত। 'স্মার্তসূত্র'গুলি গৃহজীবনের 'স্মৃতি': এগুলি সূত্রাকারে গৃহজীবনের পালনীয় বিধান। তাই এগুলির পরিচিত নাম 'গৃহ্যসূত্র।'[২] আপস্তম্ব, অশ্বলায়ন, হিরণ্যকেশী প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থগুলি বহুবিখ্যাত।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও কর্মজীবনের ধারক অমর গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'র নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা 'স্মৃতি'। স্মৃতিরূপ ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ প্রভৃতি ঋষির নাম পাঠ করা হয়—কিন্তু ইহাদের মধ্যে মনু ও মনুসংহিতাই শীর্ষস্থানীয়। মনুসংহিতা সমগ্র সূত্র সাহিত্যের একটি ছন্দোবদ্ধ সার সঙ্কলন: বিশেষতঃ বৈদিক গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রের ভিত্তিতে ইহা রচিত—'The sources of the metrical treatise known as Manusamhita are to be traced to the Dharma sutras, partly to the Brahmans and also to the Grihyasutras' [preface to Manusanhita. Prof. B. Goswamea]। মনুসংহিতার রচনাকাল লইয়া মতভেদ থাকিলেও, ইহা যে খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০-২০০ শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে জগতের সমুৎপত্তি, সংস্কারবিধি, দীক্ষা, বিবাহ, জীবিকা, স্ত্রীধর্ম, বর্ণাশ্রম, রাজধর্ম অপরাধের শাস্তি, চতুর্বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম, আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি ও নিঃশ্রেয়স্ বা আত্মধর্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই নিয়ম দ্বারাই হিন্দুসমাজের, আচার-বিচার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম—এক কথায় সমগ্র জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত।

॥ উপবেদ ॥

বৈদিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে উপবেদগুলির নামও উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় উপবেদ চারিখানি: আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। ভারতীয় জীবনের কাম্য

---

১ পিতামহেন বিপ্রাণাম্ আদৌ অভিহিতঃ শুভঃ।
ধর্মো বিমুক্তয়ে সাক্ষাৎ শ্রৌতঃ-স্মার্তো দ্বিধা পুনঃ॥ [কূর্ম পুঃ, উপরিভাগ, ২৪ অ]

২. গৃহ্য সূত্র: 'ceremonies to be celebrated at birth, before birth, at marriage, at death and after death'—Weber: এক কথায় গৃহ্যসূত্র হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের বিধি-নির্দেশ। পৌরোহিত্য কর্মে 'ব্রাহ্মণ' অপেক্ষা 'সূত্রের' প্রয়োগ বেশি।

চতুর্বর্গ : ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তন্মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লোক-স্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। উপবেদ প্রধানতঃ এই ত্রিবর্গ-সাধক। উপবেদ-গুলি অথর্ববেদমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(i) **আয়ুর্বেদ** চিকিৎসাশাস্ত্র। রোগ-নির্ণয় ও রোগের উপশম করাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপদেষ্টা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি প্রভৃতি। কথিত আছে ধন্বন্তরি কাশীরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে সুশ্রুত আয়ুর্বেদের উপদেশ লাভ করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'সুশ্রুত-সংহিতা' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। চরক-প্রণীত 'চরক-সংহিতা'ও আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরই অন্তর্গত কামশাস্ত্র।[১] কিন্তু কালক্রমে এই শাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র ও বহুব্যাপক শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। কামসূত্রে[২] আছে, মনু এই শাস্ত্রের একাংশ লইয়া ধর্মাধিকারিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের একাংশ লইয়া অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। কামশাস্ত্রের আদি আচার্য নন্দী। তৎপরে শ্বেতকেতু উদ্দালক, বাভ্রব্য, দত্তক, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ, গোণিকাপুত্র, সুবর্ণনাভ ও কুচুমার এই শাস্ত্রের কোন-না-কোন অংশ প্রচার করেন। এই সকল আচার্যের শাস্ত্রগুলি সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া বাৎস্যায়ন কামসূত্র প্রণয়ন করেন। বর্তমানে বাৎস্যায়নের কামসূত্রই বহু প্রচলিত। এই বাৎস্যায়ন কে, তাহা লইয়া বিতর্ক আছে। কেহ মনে করেন, কৌটিল্য চাণক্যই বাৎস্যায়ন। তাহা হইলে কামসূত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু অধুনা-প্রচলিত কামসূত্রকে আরও পরবর্তী মনে করিবার কারণ আছে। কামসূত্রের সংগ্রহ যত অপ্রাচীনই হউক, ইহার মূল অতি প্রাচীন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে উহার স্বীকৃতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র—সাধারণ, কন্যাসম্প্রযুক্ত, ভার্যাধিকারিক, বৈশিক, পারদারিক, সাম্প্রয়োগিক ও উপনিষদিক এই সাতটি অধিকরণে বিভক্ত। 'ধর্মার্থ-কামেভ্যো নমঃ' বলিয়া ইহার সূচনা। যৌবনই কামসেবার কাল ['কামঞ্চ যৌবনে' ১. ২. ৩.]। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ের অনুকূলে যে প্রবৃত্তি, তাহাই কাম; কিন্তু বিশেষার্থে 'স্পর্শবিশেষবিষয়াত্বস্য'ভিমানিকসুখনিবিদ্ধাফলবত্যর্থ প্রতীতিঃ প্রাধান্যাৎ কামঃ' [সূ.১. ২. ১২.]—স্পর্শবিশেষকে আশ্রয় করিয়া সুখাদির যে প্রতীতি, তাহাই কাম। শরীর রক্ষার জন্য কামের প্রয়োজন, ইহা ধর্ম ও অর্থের ফলস্বরূপ। বাৎস্যায়ন-মতে, ত্রিবর্গের অবিরোধী যে কাম, তাহাই সেব্য। এই

১. 'কামশাস্ত্রমপ্যায়ুর্বেদান্তর্গতমেব তত্রৈবসুশ্রুতেনবাজীকরণাখ্যকামশাস্ত্রাভিধানাৎ'—প্রস্থানভেদ।

২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সমগ্র কামসূত্র'।

কামের অঙ্গ চতুঃষষ্টিকলা। কামশাস্ত্রে বৈধী ও অবৈধী কাম ও সম্ভোগ-শৃঙ্গারের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(ii) ধনুর্বেদ যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্র। কথিত আছে, ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রথমে এই শাস্ত্র প্রচার করেন। পরে ঋষি বিশ্বামিত্র এই বেদ রচনা করেন। প্রস্থানভেদ গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্বেদের আলোচনা আছে: উহা দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ এই চারিপাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে অস্ত্রাদির লক্ষণ। অস্ত্র চারি প্রকার—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যে সকল অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা মুক্ত, যেমন চক্রাদি; যাহা হস্ত হইতে মুক্ত হয় না, তাহা অমুক্ত, যথা খড়্গ; শূলাদি মুক্তামুক্ত—উহা নিক্ষেপও করা যায়, হাতেও রাখা যায়; যন্ত্রযোগে যাহা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যন্ত্রমুক্ত, যথা শরচাপাদি। সাধারণ ভাবে মুক্তায়ুধের নাম অস্ত্র, আর অমুক্তের নাম শস্ত্র। যুদ্ধের বল চারিপ্রকার—হয়, হস্তী, রথী ও পদাতি—উহাই যুদ্ধের চতুরঙ্গ। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরই ধর্ম। ইহার প্রয়োজন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'দুষ্টস্য দণ্ডঃ চৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্বেদস্য প্রয়োজনম্' [প্রস্থানভেদ]। প্রাচীন ভারতে এই যুদ্ধবিদ্যা যে একটি বিশিষ্ট বিদ্যা ছিল, বেদের কতিপয় সূক্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

(iii) গান্ধর্ববেদের বিষয় গীত, বাদ্য, নৃত্যাদি। এই শাস্ত্রে বিশেষতঃ গন্ধর্বগণেরই অধিকার, এইজন্য নাম গান্ধর্ববেদ ['গন্ধর্বাণাং চ যস্মাদ্ধি তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে'—নাট্যশাস্ত্র. ২৮, ৯.]। গন্ধর্ব দেবযোনি বিশেষ—তাঁহারা গীত-বাদ্য কুশল। গন্ধর্বের সহিত অপ্সরা ও কিন্নর-কিন্নরীর নামও উল্লেখযোগ্য। অপ্সরা স্বর্বেশ্যা ও নৃত্য-গীত পটীয়সী; কিন্নরও সঙ্গীতজ্ঞ। ইহারাই গান্ধর্ববেদের ধারক। এই বেদ ভরত মুনি-প্রণীত। ভরত মুনির কাল লইয়া বিতর্কের অবসান হয় নাই। পণ্ডিতগণের মতে, তিনি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন।[১] কিন্তু পুরাণ-মতে তিনি আরও প্রাচীন।

গান্ধর্ববেদের আদি নিদর্শনরূপে ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রই প্রধান অবলম্বন। ইহা প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্য বা অভিনয়-প্রয়োগের আলোচনা। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ ইহাতে গীত, বাদ্য, নৃত্য, নেপথ্যপ্রয়োগ, ছন্দ, অলঙ্কার ও শ্রব্যকাব্যাদির বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা ৩৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত: ১. নাট্যোৎপত্তি ২. মণ্ডপবিধান (নাট্যমঞ্চ-নির্মাণ) ৩. রঙ্গদেবতা পূজা ৪. তাণ্ডবলক্ষণ (তাণ্ডব নৃত্যাদি) ৫. পূর্বরঙ্গ (নান্দী-প্রস্তাবনা) ৬. রস-প্রকরণ ৭. ভাব-ব্যঞ্জন (বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতি)

১. Sanskrit Poetics—Dr. S. K. De.

২. Bombay Ed. [কাব্যমালা. ৪২ সংখ্যা]

৮. উপাঙ্গাভিনয় ৯. অঙ্গাভিনয় ১০. চারীবিধান (পদচারণ-বিধি) ১১. মণ্ডলকল্পন ১২. গতি-প্রচার (স্থিতিবিধি) ১৩. করযুক্তধর্মব্যঞ্জন ১৪. ছন্দোবিধান ১৫. ছন্দোবৃত্ত-বিধি ১৬. অলঙ্কার লক্ষণ (কাব্যালঙ্কার) ১৭. বাগভিনয়ে কাকুস্বরবিধান ১৮. দশরূপ-লক্ষণ (অভিনয়ের নাটক-প্রকরণ-অঙ্ক-ব্যায়োগ-ভাণাদি রূপভেদ) ১৯. নাট্যসন্ধি (মুখাদি পঞ্চসন্ধি) ২০. বৃত্তি-বিকল্প (সাত্বতী, কৈশিকা, আরভটী প্রভৃতি) ২১. আহার্য-অভিনয় (নেপথ্যবিধান) ২২. সামান্যাভিনয় ২৩. বৈশিক (কামশাস্ত্রোক্ত বৈশিক নায়ক-নায়িকা লক্ষণ) ২৪. স্ত্রী-পুরুষোপচার ২৫. চিত্রাভিনয় ২৬. প্রকৃতি বিকল্প (স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি) ২৭. নাটকীয় সিদ্ধি-লক্ষণ ২৮. আতোদ্য বিধি (গীত-বাদ্য বিধি) ২৯. বাদ্যবিধি ৩০. শুষিরাতোদ্যাধিকার ৩১. তালবিধান ৩২. ধ্রুবাধ্যায় (নাট্যবিষয়ের সহিত সংবদ্ধ একপ্রকার গানকে ধ্রুবা বলে) ৩৩. গুণাধ্যায় (গীতের গুণ) ৩৪. পুষ্করবাদ্য ৩৫. ভূমি বিকল্প ৩৬. নাট্য শাপ কথা ৩৭. গুহ্য বিকল্প (শাস্ত্র প্রশংসা)।

নাট্যশাস্ত্র শূদ্রাদিরও শ্রবণযোগ্য এক নব বেদ ['নব্যবেদবিহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু' ১. ১২.]। ইহা ভারতীয় রস-প্রস্থানের আদি গ্রন্থ।

(vi) **অর্থশাস্ত্র** চতুর্থ উপবেদ। প্রস্থানভেদের মতে, নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকার শাস্ত্র ও চতুঃষষ্টিকলা এই বেদের অন্তর্গত। কিন্তু চতুঃষষ্টিকলা[১] প্রধানতঃ কামশাস্ত্র ও গান্ধর্ববেদের অঙ্গ। মনে হয়, কারুকলাগুলিই অর্থশাস্ত্রের অঙ্গ, চারুকলা গান্ধর্ববেদ বা কামশাস্ত্রের। অর্থশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজতন্ত্র ও রাজ্যশাসন-নীতি। এই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন বৃত্তি বা শিল্পের আলোচনা। বৃহস্পতি-নীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের মূল। পরবর্তীকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিষয়ে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। পররাষ্ট্রনীতি, রাজ্যশাসন নীতি ও মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে এই গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা আছে।

উপবেদগুলি বেদ-মূল বলিয়া অভিহিত হইলেও বস্তুতঃ এগুলি লোকযাত্রানির্বাহ-বিষয়ক বিদ্যা। উপবেদ লৌকিক, উহা লৌকিক জীবনের বেদ।

১. চতুঃ ষষ্টি কলা—১. গীত ২. বাদ্য ৩. নৃত্য ৪. আলেখ্য (চিত্রাঙ্কন বিদ্যা) ৫. বিশেষকচ্ছেদ্য (তিলকরচনা) ৬. তণ্ডুলকুসুমবলিবিচার (তণ্ডুল ও কুসুমচূর্ণে মণ্ডলাদি রচনা) ৭. পুষ্পাস্তরণ ৮. দশন-বসন-অঙ্গরাগ ৯. মণি-ভূমিকা (মণি দ্বারা গৃহতল ভূষিত করার শিল্প) ১০ শয়ন-রচন ১১. উদকবাদ্য ১২. উদকাঘাত (জলকেলির হস্তকৌশল) ১৩. চিত্রযোগ (বেশাদির পরিবর্তন বিদ্যা) ১৪. মাল্যগ্রথন ১৫. শেখরাপীড়যোজন (শিরোভূষণযোজন শিল্প) ১৬. নেপথ্যপ্রয়োগ (বেশভূষা রচনকৌশল) ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮. গন্ধযুক্তি (গন্ধ-বিলেপন) ১৯. ভূষণ-যোজন ২০. ঐন্দ্রজাল ২১. কৌচুমার যোগ (আয়ুর্বেদোক্ত বাজীকরণ) ২২. হস্তলাঘব

বৈদিক দেবতা

বৈদিক যজ্ঞ ও স্তবস্তুতির প্রধান লক্ষ্য 'দেবতা'। দেবতাই হবনীয়, দেবতাই স্তবনীয়। ইহজীবনের অভ্যুদয় ও পরজীবনের অভীষ্ট ফলদাতা দেবতা। সংহিতার সূক্তে সূক্তে তাই অন্তহীন দেব-বন্দনা।

এই দেবতা কে, তাহার উৎপত্তির হেতুই বা কি—ইহা চিরকালের প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ প্রয়োজন দেব-কল্পনার মূল ভিত্তি। ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্যবোধ হইতেও দেবসত্তার কল্পনা করা হয়। প্রয়োজন-প্রেরণাই মুখ্য। ভূলোকে প্রয়োজনীয় অগ্নি, সোমলতা, জল অপ্। তাই অগ্নি, সোম, আপ দেবতা। দ্যুলোকে অতি প্রত্যক্ষ সূর্য ও সৌর জগৎ। সূর্যের অয়নে আবির্ভূত হয় রাত্রি, উষা—তাই সূর্য, রাত্রি, উষা দেবতা। অন্তরিক্ষ লোকে প্রবহমান মাতরিশ্বা বায়ু—বায়ুর প্রভাবও অপরিসীম, তাই তিনি দেবতা। কিন্তু, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়? তাঁহারাও প্রয়োজন-সাধক, কিন্তু তাঁহারা কিসের প্রতীক? সহস্রশীর্ষা পুরুষ, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা, দেবমাতা অদিতি—ইহারাও দেবতা।

বস্তুতঃ ঠিক কোন্ সূত্রে, কে, কখন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বেদ-ব্যাখ্যাতারূপে নানা সম্প্রদায় বর্তমান ছিলেন—ঐতিহাসিক, যাজ্ঞিক, নৈরুক্ত, আত্মবিদ্। সম্প্রদায়ভেদে দেব-কল্পনার ব্যাখ্যাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ঐতিহাসিকগণ দেবতার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী, যেমন অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, 'রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ'—পুরাকালের দুই পুণ্যকীর্তি রাজাই দুই অশ্বিনীকুমার।

(হাতছাপাই) ২৩. বিচিত্র শাকযূষ ভক্ষ্যবিচারক্রিয়া ২৪. পানকরস রাগাসব যোজন ২৫. সূচীবান্ কর্ম (সূচী-শিল্প) ২৬. সূত্রক্রীড়া ২৭. বীণাডমরুকবাদ্য ২৮. প্রহেলিকা (ধাঁধাঁ) ২৯. প্রতিমালা (কবিতার উত্তরপ্রত্যুত্তর) ৩০. দুর্বাচকযোগ (দুর্বোধ্য শ্লোকাদির প্রয়োগ) ৩১. পুস্তকবাচন ৩২. নাট্যাখ্যায়িকা দর্শন ৩৩. কাব্য-সমস্যা পূরণ ৩৪. পট্টিকা বেত্রবান যোগ (বেতস দ্বারা পটিকাদি নির্মাণ) ৩৫. তর্কুকর্ম ৩৬. তক্ষণ ৩৭. বাস্তুবিদ্যা ৩৮. রূপ্যরত্ন পরীক্ষা ৩৯. ধাতুবাদ ৪০. মণিরাগাকর জ্ঞান ৪১. বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ ৪২. মেষকুক্কুটলাবক যুদ্ধবিধি ৪৩. শুকসারিকা প্রলাপন ৪৪. উৎসাদন-সংবাহন-কেশমর্দন কৌশল ৪৫. অক্ষরমুষ্টিকাকথন (মুষ্টি-সঙ্কেত জ্ঞান) ৪৬. ম্লেচ্ছিত বিকল্প (ম্লেচ্ছভাষার জ্ঞান) ৪৭. দেশভাষাজ্ঞান ৪৮. পুষ্পশকটিকা (পুষ্পময় শকটনির্মাণ) ৪৯. নিমিত্তজ্ঞান ৫০. যন্ত্র-মাতৃকা (যন্ত্রচালন জ্ঞান) ৫১. ধারণ-মাতৃকা ৫২. ছলিতক যোগ ৫৮. বস্ত্র গোপনবিদ্যা ৫৯. দ্যূত বিশেষ ৬০. আকর্ষক্রীড়া ৬১. বালক্রীড়নক ৬২. বৈনায়িকী (বিনয়াচার) ৬৩. বৈজয়িকী (বিজয়বিদ্যা) ৬৪. বৈয়ামিকী (ব্যায়ামাদি ক্রীড়াদক্ষতা) [শব্দকল্পদ্রুমধৃত শিবপুরাণোক্ত বাক্য; কামসূত্রেও (১. ৩. ১৬) এই তালিকা আছে। 'মহাবস্তু'র অন্তর্গত কুশজাতকের রাজচক্রবর্তী কুশের এই সকল কলা আয়ত্ত ছিল]।

হইতে পারে, পার্থিব সুকৃতকর্মা কালক্রমে দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছেন। সাংখ্যের ঈশ্বরসংজ্ঞা এই মতের পরিপোষক। যাজ্ঞিকগণের সংস্কার অনেকটা চিরকালের পূজক-পুরোহিতের অনুরূপ। আত্মবিদ্ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দার্শনিক পর্যায়ের, সকল দেবতাই তাঁহাদের মতে এক দেবতার রূপভেদ। দেবসত্তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও অনেকটা এই ধরনের ; যেমন শতপথ ব্রাহ্মণের ইন্দ্র শব্দের ব্যাখ্যাটি।[১]

দেব-কল্পনার ব্যাখ্যায় নৈরুক্ত সম্প্রদায় নিসর্গবাদী। তাঁহারা মনে করেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোকের প্রাকৃতিক লীলায় বিমুগ্ধ ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অগ্নির প্রয়োজন-সাধক কর্ম, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দ্যাবাপৃথিবীর বিস্ময়কর অবস্থান, দেখিয়াছেন সূর্যকেন্দ্রিক সৌরলোকের অপরূপ লীলা, আয়তী রাত্রি ও ভাস্বতী উষার আবির্ভাব, আর অন্তরিক্ষে মেঘ-মরুৎ-বায়ু-বিদ্যুতের খেলা। এই নিসর্গ-লীলাই ঋষি-দৃষ্টিকে দেবকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। নিরুক্তবাদীদের মতে দেবতা প্রধানতঃ তিন— ভূলোকে অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য, অন্তরিক্ষলোকে ইন্দ্র বা বায়ু। অন্যান্য দেবতা এই ত্রয়ীরই রূপভেদ। তাঁহাদের মতে দেবস্থানও তিন : ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ।

বৈদিক ঋষিদের দেবকল্পনার ব্যাখ্যায় কোন সম্প্রদায়ের মতই অগ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে নৈরুক্তসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা প্রকৃতির কোলে পুষ্ট মানব সমাজের পক্ষে অধিকতর গ্রাহ্য।

ঋষি-কল্পনায় দেবমাত্রই চিন্ময়। বিগ্রহ-দেবতারূপে পূজিত না হইলেও প্রত্যেক দেবতা মানবীয় রূপে রূপিত ও মানবীয় ভাবে ভাবিত—এমন কি তাঁহারা অনেকস্থলে লৌকিক সম্পর্কের সূত্রে সম্পর্কিত : কেহ পতি, কেহ জায়া, কেহ পিতা, কেহ পুত্র বা কন্যা, কেহ বা সখা। পুরুষ ও স্ত্রীভেদে বৈদিক দেবতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর।

(i) পুরুষ দেবতা

বেদে পুরুষদেবতারই প্রাধান্য। পুরুষই ‘পুরুষ সূক্তে’র সহস্রশীর্ষা বিরাট। পরম দেবতার স্বরাট্ রূপ ক-দেবতা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ; ইনিও পুরুষ। যজ্ঞীয় অন্যান্য দেবগণের মধ্যে যাঁহারা বরস্তুত, অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্রও পুরুষ।

অগ্নি : ভূলোকস্থ দেবগণের মধ্যে সবপ্রধান অগ্নি। যজ্ঞকর্মে অগ্নিই প্রধান সহায়। মর্ত্যে দেবতার দূত অগ্নি, দেবোদ্দেশে অর্পিত স্তুতি-হবি-সোম অগ্নিই দেবলোকে বহন করিয়া লইয়া যান। অগ্নিই একাধারে যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক ও হোতা।

১. শতপথ ব্রাহ্মণ. ৬. ১. ১. ১ ; ‘ব্রাহ্মণ অংশের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

তিনি অভীষ্টবর্ষী। অগ্নিই 'রত্নধাতা', অগ্নি দ্বারা যজমান অন্ন লাভ করেন। মাতার ন্যায় তিনি সকলকে ভরণ করেন ['মাতেব যৎ ভরসে পপ্রথানো জনং জনং ঋ. ৫. ১৫. ৪] : তিনি দস্যুহন্তা, রণে ধনঞ্জয় ['ধনংজয়ং রণে রণে'—শু. য. ১১. ৩৪]। আর্য-কল্পনায় এই অগ্নি 'হরিশ্মশ্রু', 'তিগ্ম জম্ভ' (ভয়ঙ্কর মুখ), চিত্র-ভানু' (উজ্জ্বল শিখ) ও 'শুক্রবর্ণ'। অগ্নির পত্নী 'অগ্নায়ী'। ঋষি-দৃষ্টিতে অগ্নি দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত : দ্যুলোকে তিনিই সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, জলধিতে বাড়বানল। অগ্নি 'কবিক্রতু', তিনি অকবিগণের মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবি। অগ্নিই সুবুদ্ধির প্রেরক—'ধিয়ঃ হিম্বানঃ'। মর্ত্য অগ্নির নানারূপ : যজ্ঞিয়াগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, ক্রব্যাদাগ্নি ইত্যাদি। বেদে অগ্নি বহুস্তুত। ব্রহ্মারূপে অগ্নিদেবের প্রতিষ্ঠা বেদে হয় নাই।

সোম : পৃথিবীস্থ অপর দেবতা 'সোম'। সোমরস বৈদিক ঋষিদের পরম প্রিয় পানীয়। ইহা একপ্রকার 'বভ্রুবর্ণ' লতা। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ। ইহার মাদক শক্তিও অদ্ভুত। এই শক্তি একদিকে যেমন দেহে বলাধান করিত, অপরদিকে তেমনই মনে অপরিমেয় আনন্দ সঞ্চার করিত। যজ্ঞে সোম নিবেদন করা হইত; এই বিশেষ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'সোমযাগ'। সমগ্র বেদ সোম-বন্দনায় মুখর, বিশেষতঃ ঋগ্বেদের নবমমণ্ডলে 'পবমান সোম'ই একমাত্র দেবতা। সোম 'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা'। ধন, অন্ন, বল, মেধা, কবিত্ব—সবই সোমের অধিকারে। ইহার প্রভাবে ঋষিগণ শাশ্বত জ্যোতির্ময় ধামে যাইতে পারেন [৯. ১১৩]। ঋষি বলেন,

অপাম সোমমমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্। [ঋ. ৮. ৪৮. ৩]

—সোম পান করিয়া অমৃত হইব, পরে দ্যুতিমান স্বর্গে গমন করিব, ও দেবগণকে অবগত হইব। [রমেশচন্দ্র দত্ত]

বেদে 'সোমতত্ত্ব' একটি রহস্যময় তত্ত্ব। এক সোম মানুষ পান করে, আর এক সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন ['দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ'-অ. ১৪. ১১]। সূর্যাসূক্তে বলা হইয়াছে, 'সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি পার্থিবঃ'—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ জানেন, মানুষ তাহাকে পান করে না। দ্যুলোকের এই সোম সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলতা ও চন্দ্র অভিন্ন। সোম ছিলেন মুজবৎ পর্বতে, সুপর্ণ তাঁহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [১. ২৭] আছে, সোম গন্ধর্বগণের অধিকারে ছিলেন, স্ত্রীরূপধারিণী বাগ্‌দেবতার সহায়তায় দেবগণ তাঁহাকে ক্রয় করেন। মনে হয়, সোমতত্ত্বের সহিত স-উমা—'উময়া সহ বর্তমানঃ' শিবতত্ত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে।

সূর্য : দ্যুলোকের দেবগণের মধ্যে প্রধান বিশ্বচক্ষু সূর্য। যাস্কের মতে, দ্যুস্থানের প্রতিনিধি সূর্য। সবিতা, পুষা, মিত্র এই সূর্যেরই প্রকারভেদ। 'সূরশ্চক্রং হিরণ্ময়ম্' সূর্যচক্র হিরণ্ময়—ইহা ঋষিদের বিস্ময়। সহস্র রশ্মি সূর্য যেন সহস্র শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষভ ['সহস্র শৃঙ্গো বৃষভঃ' ঋ. ৭. ৫৫. ৭]। সপ্তাশ্ব বাহিত রথে ইনি ভুবন পরিক্রমণ করেন, যেন সপ্তভগ্নীরূপ সপ্ত হরিৎ (অশ্ব) জগতের কল্যাণার্থ সূর্যকে রথে বহন করেন। অপরিমেয় সূর্যের বিভূতি; কেহ ইহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারে না। শ্যেনের মত সূর্যের গতি। দেবী উষা সূর্যের প্রিয়া ['সূর্যস্য যোষা' ঋ. ৭. ৭৫. ৫]। অতি অপূর্ব উদয়-সূর্যের বর্ণনা,

> চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
> চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
> আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
> সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ [ঋ, ১.১১৫.১]

—বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ—মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ সূর্য উদিত হইয়াছেন: তিনি স্বায় কিরণে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর বস্তুর আত্মা।

সূর্যের এই অমেয় মহিমা দেখিয়া ঋষি বলেন, 'বট্ মহাঁ অসি সূর্য' [ঋ. ৮. ৯০. ১১ ; অ. ১৩. ২. ২৯]। বৈদিক দেবগণের মধ্যে সূর্য সত্যই মহান্।

এই সূর্যেরই আর এক রূপ দেব 'সবিতা'। সায়ণ বলেন, 'উদয়াৎ পূর্বভাবী সবিতা'—সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণের অবস্থাই সবিতা। বিখ্যাত গায়ত্রী-মন্ত্র, এই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজের ধ্যান। সবিতা বিশ্বের অকল্যাণ দূর করেন, যাহা ভদ্র তাহা প্রেরণ করেন। তাই ঋষির প্রার্থনা :

> বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
> যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ [ঋ. ৫. ৮২. ৫]

অথর্ববেদে [অ. ১৩. ১] 'উত্তনুভানু'র নাম 'রোহিত'। ইনিও 'সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ', 'যুবা কবি', ও 'সুবীরঃ'। সুবর্ণা রোহিণী ইহার অনুব্রতা। রোহিত বিশ্বরূপের জনয়িতা ['বিশ্বরূপাণি জনয়ন্', 'বিশ্বমিদং জজান'-অ. ১৩. ১. ১]। সৃষ্টিতত্ত্বে রোহিতের স্থান অতি উচ্চে। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে দৃঢ়রূপে ধারণ করেন, তাঁহার দ্বারা দেবগণ অমৃত লাভ করেন।

বিষ্ণু : অনেকের মতে বিষ্ণুও সূর্যের প্রকারভেদ। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, 'প্রাচীন হিন্দুগণ সূর্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন।' এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ, 'বৈষ্ণবী সংহিতা'র প্রথম ঋক্,

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ [ঋ. ১. ২২. ১৭][1]

—বিষ্ণু সমগ্র জগৎ পরিক্রমণ করেন। তিনি তিন স্থানে পদক্ষেপ করেন। তাঁহার (তৃতীয় পদ) ধূলিজালে আবৃত।

বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপের বিষয় বেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও মতে, এই তিনটি পদক্ষেপ যথাক্রমে উদীয়মান্, মধ্যাহ্নকালীন ও অস্তগামী সূর্যের তিনটি স্থান। ইহাই বিষ্ণুর ও সূর্যের অভিন্নতার সূত্র। বিষ্ণুর অন্তহীন মহিমা। বিষ্ণুর 'পরমপদ' সকলে দেখিতে পায় না, আতত চক্ষু মেলিয়া সুরগণ সেই পদ দর্শন করেন। পুরাণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উল্লেখ বেদে নাই। তবে বিষ্ণুর ত্রিধা পদক্ষেপই পরবর্তীকালে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। [দ্রষ্টব্য. শ্রীমদ্ভাগবত]

ইন্দ্র : অন্তরিক্ষলোকের দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ইন্দ্র। কেবল অন্তরিক্ষলোকের নয়, বৈদিক দেবসঙ্ঘের পুরোধা ইন্দ্র। বৈদিক সংহিতায় ইন্দ্র বহুস্তুত। সংখ্যায় ইন্দ্রস্তুতি অন্যান্য দেবস্তুতি হইতে অনেক বেশি। ইন্দ্র মহাবলবান্ বীর ; জন্মমাত্র তিনি উগ্র ও মহাভয়ঙ্কর। তিনি বিশ্ববীর্যের আধার—'বজ্রহস্ত', 'বজ্রবাহু'। সিংহের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর, হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তিনি 'বৃত্রহা'। সোমপান করিয়া তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন 'উভে ভয়েতে রজসী অপারে'—উভয়লোক ভীত হয়। হিরণ্যকশা হস্তে তিনি 'রথে হিরণ্যয়ে' বিচরণ করেন। তিনি কেবল বীর্যবান্ নহেন, বুদ্ধিমান। তাঁহার জঠরে সোম, দেহে প্রচণ্ডশক্তি, হস্তে বজ্র, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ['জঠরে সোমং তন্বি সহোমহো হস্তে বজ্রং ভরতি শীর্ষাণি ক্রতুম্'—ঋ. ২. ১৬. ২]। তিনি 'একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা'। ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন,

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥ [ঋ. ২. ১২. ১]

১. এই মন্ত্রটি প্রত্যেক বেদেই গৃহীত হইয়াছে [সা. ১. ২২২ ; শু. য. ৫. ১৫ ; অ. ৭. ২৬. ৪]।

—যিনি আদি ও জ্ঞানী—যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—যাঁহার নিশ্বাসে দ্যাবা- পৃথিবী ভীত হয়, যিনি অমিত বলশালী—হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র।

ঋষি-দৃষ্টিতে ইন্দ্র পরমাত্মা 'ঈশান'। বিশ্বামিত্র বলেন, 'রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি' —মহান্ ইন্দ্র, যেখানে যে রূপ, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।. এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঋষি গর্গ, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' [ঋ. ৬. ৪৭. ১৮]—ইন্দ্র মায়া প্রভাবে নানারূপে বিচরণ করেন। তিনি শুভবুদ্ধিরও প্রেরক।

রুদ্র: অন্তরিক্ষলোকের আর একজন ভীষণ দেবতা 'কপর্দী' (জটাধারী) 'রুদ্র'। বেদের রুদ্র-বন্দনায় একটি ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত ভাব। ভয়ঙ্কর বলিয়াই তাহা হইতে রক্ষা প্রার্থনা। রুদ্র 'উগ্র', 'ক্ষয়দ্বীর' (অতিবলী), 'গোঘ্ন', 'পুরুষঘ্ন'। তিনি দৃঢ়াঙ্গ, দীপ্যমান্, 'স্থিরধন্বা', 'ক্ষিপ্রেষু' (দ্রুতগতি ইষু যাহার), 'তিগ্মায়ুধ' (তীক্ষ্ণ আয়ুধধারী)। রুদ্রের পত্নী 'রোদসী'। রুদ্রের সন্তান মরুৎগণ—যাঁহাদের গর্জনে পৃথিবী ও মানুষ কম্পিত হয়। যাস্ক বলেন, যিনি রোদন করেন বা রোদন করান—তিনি রুদ্র ['রুদ্রো রৌতীতি সতঃ রোরুয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা]; আচার্য সায়ণও রুদ্রের এই অর্থ করিয়াছেন, 'রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ'। রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, 'রুদ্র শব্দের অর্থ বজ্র অথবা অগ্নির রূপবিশেষ।' কেহ মনে করেন, রুদ্র অন্-আর্য দেবতা, কারণ যজুর্বেদের 'শতরুদ্রিয়' স্তবে রুদ্রকে—'স্তেনানাং পতয়ে নমঃ', 'তায়ূনাং পতয়ে নমঃ', 'তস্করাণাং পতয়ে নমঃ', 'নমো ব্রাত্যেভ্যঃ' —বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। রুদ্র যিনিই হউন, ঋগ্বেদে রুদ্রের কল্যাণতম রূপের কল্পনাও আছে, তিনি 'শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ' (ধনের ভা[illegible]), তিনি 'গাথপতি, মেধপতি, ভেষজপতি'। তাঁহার হস্তে শোভা পায় বরণীয় ওষধী—'হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্যাণি' [ঋ. ১. ১১৪]। আচার্য সায়ণ রুদ্র শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন, 'রুৎ' সংসারাখ্য দুঃখ, সেই দুঃখকে যিনি বিনাশ করেন, তিনিই 'রুদ্র', তিনি আরও বলেন, 'রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যা ব[illegible]'। রুদ্র যে বন্ধনমুক্তিরও হেতু, বসিষ্ঠের 'ত্র্যম্বক মন্ত্রে' তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদে রুদ্রের ওষধি-পাত রূপেরই প্রাধান্য—যজুর্বেদের 'শতরুদ্রিয়' স্তবে রুদ্র পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। তথাপি রুদ্র দেবতায় অবৈদিক দেবতার চিহ্ন বর্তমান।

অশ্বিদ্বয়: অশ্বিনীকুমারদ্বয় রূপবান্ ('মধু[illegible]') যুবাপুরুষ ('যুবানা')। তাঁহাদের কণ্ঠে 'পুষ্করস্রজ' (পদ্মমালা)। তাঁহারা নানাপ্রকার লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত। তাঁহারা কাহারও অন্ধত্ব, কাহারও খঞ্জত্ব মোচন করেন। কৃশকে যুবক করেন, মৃতকে সঞ্জীবিত করেন। তাঁহারা মায়াবী ('মায়িনা') ভিষক্ ('ভিষজা')। যাস্কাচার্য অশ্বিদ্বয়ের

স্বরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি মত উদ্ধার করিয়াছেন। কাহারও মতে অশ্বিদ্বয় 'অহরাত্রৌ', কেহ বা মনে করেন ইহারা প্রাচীন নরপতিদ্বয়। বস্তুতঃ অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ অস্বচ্ছ। পরবর্তীকালে রূপবান্ দেববৈদ্য রূপেই অশ্বিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা।

বরুণ: বরুণ দেবতার স্বরূপও অস্পষ্ট। তিনি প্রায়শঃ 'মিত্র' দেবতার সহিত একসঙ্গে আহূত হইয়াছেন। কাহারও মতে 'মিত্র' অহরভিমানী দেবতা, আর বরুণ রাত্র্যভিমানী। সায়ণের মতে, অস্তগমনশীল সূর্যই বরুণ। মিত্র ও বরুণ উভয়েই ওষধী বর্ধন করেন, বৃষ্টি সৃজন করেন [ঋ. ৫. ৬২]। বরুণ অনন্ত শক্তিধর: তিনি রাজা, উরুচক্ষ, ধৃতব্রত। জলাধিপতি বরুণের প্রসঙ্গও বেদে দুর্লভ নয়।

অন্যান্য পুরুষ দেবতার মধ্যে দেবশিল্পী 'ত্বষ্টা', 'মন্দ্রজিহ্ব' বৃহস্পতি, বৈবস্বত যম উল্লেখযোগ্য। ত্বষ্টা 'সুগভস্তি', 'সুকৃৎ' ('Skilful handed', 'Skilful worker'—Muir)—তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাতা। যম পরলোকের রাজা: মরণশীলদের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত, প্রথম পরলোকগত ['যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্'—অ. ১৮. ৩. ১৩]; বেদে ও পুরাণে যমই অবসান-কর্তা।

(ii) স্ত্রী দেবতা

বেদে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য। স্ত্রীদেবতার স্বীকৃতি ও সুন্দর সুন্দর স্তুতি থাকিলেও তাঁহারা পুরুষ দেবতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষই অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত সৃষ্টির মূল। এই পুরুষদেবতার ছায়ারূপে—স্ত্রীদেবতা পুরুষের জননী, জায়া, প্রেমিকা বা দুহিতা। 'অদিতি' দেবমাতা, 'পৃথিবী' দ্যৌষ্পিতার সঙ্গিনী, 'সরস্বতী', সরস্বান্ নদের স্ত্রী, আর রাত্রি ও উষা 'দুহিতর্দিবঃ', উষা 'সূর্যস্য যোষা'। অবশ্য দেবত্ব তাঁহাদেরও আছে, তাঁহারাও 'দ্যোতনশীল', 'অভীষ্টবর্ষী', অন্ন-বল-মেধার জনয়িত্রী; তথাপি প্রেম ও সৌন্দর্যের নায়িকারূপে তাঁহাদের যেমন প্রতিষ্ঠা, দেবতা-রূপে তেমন নয়। এই সকল দিব্য নায়িকা-দর্শনে ঋষির সৌন্দর্য-দৃষ্টি অবারিত হইয়াছে, কবিত্বের উৎস-মুখ খুলিয়া গিয়াছে। কবিত্ব ও সৌন্দর্যচেতনার অন্তরালে তাই স্ত্রীদেবতার দেবত্ব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ-প্রধান সমাজের পুরপ্রাসাদের বাতায়ন-পথে যেমন ক্ষণে ক্ষণে শুদ্ধান্তঃপুরিকার দর্শন-দুর্লভ রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই অগণিত পুরুষ-স্তুতির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ-চমকের মত স্ত্রীদেবতার আবির্ভাব। তাঁহাদের প্রকাশ ক্ষণেকের, কিন্তু প্রভাব সুচিরকালের। স্বল্প সংখ্যক সূক্তের দেবতা হইয়াও তাঁহারা বহুমান্যা, 'বহু শোভমানা' ও বহুবার প্রজাবতী।

ঋগ্বেদের সূচনাতেই তিনটি দেবী উল্লেখিত হইয়াছেন, 'ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো

দেবীর্ময়োভুবঃ' [ঋ. ১. ১৩. ৯]; শুক্ল যজুর্বেদের বহুমন্ত্রে আছেন, 'সরস্বতী ভারতী ইড়া'। আচার্য মহীধরের মতে, এই তিন দেবী যথাক্রমে তিনটি দেবস্থানের প্রধান প্রতীক—'সরস্বতী মধ্যস্থানা ভারতী দ্যুস্থানা ইড়া পৃথিবীস্থানা' [শু. য. ভাষ্য. ২০. ৬৩]। তাহা ছাড়া আছেন, দেবমাতা 'অদিতি', ইন্দ্রাণী 'শচী', রুদ্রপত্নী 'রোদসী', অগ্নিপত্নী 'অগ্নায়ী', বরুণপত্নী 'বরুণানী', 'রাকা', 'অনুমতি,' 'কুহু', 'সিনীবালী', 'শ্রদ্ধা', ভাস্বতী নেত্রী 'ঊষা', আয়তী 'রাত্রি', মাতা 'পৃথিবী', 'বার্ষিকী আপদেবতা', হিরণ্যবর্ণা 'শ্রী', পাপদেবতা 'নির্ঋতি' প্রভৃতি।[১]

আপদেবতা ঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট রসরূপে জল বা আপদেবতা বেদে বহুস্তুত। জলের অনন্ত মহিমা। সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী, পরুষ্ণি প্রভৃতি রসবাহিনী নদী এই দেবতার মহিমা ঘোষণা করে [ঋ. ১০. ৭৫]। মাতার ন্যায় এই দেবতা সকলকে পরিশুদ্ধ করেন। অথর্ববেদে জলদেবতাগণের মাহাত্ম্য উচ্চ বিঘোষিত। কূপে, তড়াগে, ওষধিতে, নদীতে, সমুদ্রে এই দেবতার অধিষ্ঠান। দেবগণ দ্যুলোকে ইহাদের সারভূত অমৃত উপভোগ করেন, অন্তরিক্ষে ইহারা বৃষ্ট্যাদিরূপে বহুপ্রকার হন। হিরণ্যবর্ণা পবিত্রকারিণী জলেই সবিতা ও অগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন, রাজা বরুণ জল হইতে জনগণের সত্যামথ্যা দর্শন করেন [অ. ১. ৩৩]। সোম বলিয়াছেন, জলের মধ্যেই সকল ভেষজ অবস্থান করে ['অপ্‌সু মে সোমোঽব্রবীদ্ অন্তর্বিশ্বানি ভেষজা'—অ. ১. ৬. ২] আপদেবতা 'ময়োভুব' (সুখকর), তাহার রস 'শিবতম'। তাই ঋষির প্রার্থনা,

> শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ
> শিবয়া তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।
> ঘৃতশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকা-
> স্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু॥ [অ ১. ৩৩. ৪]

—হে আপদেবতা, শিবময় চোখে আমাকে দর্শন কর, কল্যাণকর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ ও ত্বক্ স্পর্শ কর; ঘৃতশ্চ্যুত শুচি পাবকরূপিণী যে জল, তাহা আমাদের পক্ষে শান্তিকরী ও শুভঙ্করী হউক।

সরস্বতী ঃ জলদেবীগণের মধ্যে অন্যতমা 'সরস্বতী'। সরস্বতী স্বনামধন্যা নদী, ইনি সরস্বান্ নদের পত্নী। এই সরস্বতী-তীরে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। ঋষিদৃষ্টিতে

১. গোপথ ব্রাহ্মণে দেব-পত্নীগণের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়: 'পৃথিবী অগ্নেঃ পত্নী বাগ্ বাতস্য পত্নী সেনা ইন্দ্রস্য পত্নী ধেনাবৃহস্পতেঃ পত্নী পথ্যা পূষ্ণঃ পত্নী ত্রিষ্টুপ্ রুদ্রানাং পত্নী জগতী আদিত্যানাং পত্নী অনুষ্টুপ মিত্রস্য পত্নী বিরাড্ বরুণস্য পত্নী পংক্তি বিষ্ণোঃ পত্নী দীক্ষা সোমস্য রাজ্ঞঃ পত্নীতি [গো. ব্রা. উত্তর ভাগ. ২. ৯]

সরস্বতী 'ঘৃতুষা সুধারা', তিনি 'নদীনাং শুচিঃ' [ঋ. ৭. ৩৬, ৭. ৯৫]। কিন্তু এই সরস্বতী নদী মাত্র নহেন, ইনি স্তুতির প্রেরয়িত্রী, সত্যবাক্যের নেত্রী, বুদ্ধির প্রকাশিকা ['ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি'—শুঃ য. ২০. ৮৬, 'সর্বজন্তুবুদ্ধেঃ প্রকাশয়তি'—ঐ ভাষ্য মহীধর]। সায়ণ বলেন, 'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ' [ঋ. ভাষ্য. ১. ৩. ১২]। মনে হয়, নদীরূপা দেবীই দেবমর্যাদায় ভূষিতা হইয়া 'ধীনামবিত্রী' (বুদ্ধির পালয়িত্রী) বিদ্যা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। বৈদিকস্তুতিতেও পৌরাণিক সরস্বতীর এই রূপ প্রতিষ্ঠিত, যেমন মধুচ্ছন্দা ঋষির এই সরস্বতী-বন্দনা,

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥ [ঋ. ১. ৩. ১০-১১ ; শুঃ য. ২০. ৮৪-৮৫]

—পবিত্রকারিণী, অন্নবতী, প্রজ্ঞাবতী সরস্বতী অন্নসহ আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুমতিদাত্রী সরস্বতী যজ্ঞ ধারণ করেন।

পৃথিবী: মর্ত্যলোকের প্রধান প্রতীক ভূদেবী বা মাতা পৃথিবী বা মহী। বেদের অধিকাংশ সূক্তে 'দ্যাবাপৃথিবী' একসঙ্গে স্তুত হইয়াছেন। দ্যৌ পিতা, আর পৃথিবী মাতা। আকাশ আর পৃথিবী—এই দুইয়ের মিলনেই সৃষ্টি ; তাই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী—সৃষ্টির জনক-জননী। পরিকল্পনাটি সুন্দর ও কবিত্বময়। এই দ্যৌপিতা ও পৃথিবীমাতা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছেন: 'ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী'। তাঁহারা মধুদুঘা, মধুব্রতা, ঋতবৃধা, ঘৃতবতী, পয়স্বতী ও বহুলা। ঋষি দীর্ঘতমা বলেন,

দ্যৌ র্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র
বন্ধু র্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্। [ঋ. ১. ১৬৪. ৩৩]

—দ্যৌ আমার পিতা জনক, তিনিই বন্ধনরজ্জু—আর মাতা আমার মহীরূপা এই পৃথিবী, তিনি বন্ধু।

বেদের পৃথিবী-স্তুতির মধ্যে ঋষিদের মর্ত্য-মমতা প্রতিফলিত। জীবনে এই পৃথিবী যেমন প্রধান আশ্রয়, মৃত্যুর পরও এই পৃথিবী শেষাশ্রয়। ঋষির প্রার্থনা এই পৃথিবী দৃঢ়া হউক, তিনি আসুরী মায়ার স্বস্তি বিধান করুন—'দৃংহস্ব দেবি পৃথিবি স্বস্তয় আসুরী মায়া' [শু. য. ১১. ৬৯]। পৃথিবী-বন্দনা চরমে উঠিয়াছে অথর্ববেদের পৃথিবী সূক্তে।

অরণ্যানি: মর্ত্য-প্রেমিক কবির দৃষ্টিতে অরণ্যদেবতা অরণ্যানি এক সজীব নারীমূর্তি। অরণ্যানি নির্ভয়। সায়ংকালের অরণ্য এক অপার বিস্ময়। কেহ

ধেনুগুলিকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক্ষ কর্তন করিতেছে—মনে হয়, অরণ্য নিজেই যেন ক্রন্দন করিতেছেন। অরণ্য কাহাকেও হিংসা করে না, অরণ্যের স্বাদুফলে মানুষ পূর্ণকাম। ঋষিকণ্ঠে তাই অরণ্যদেবীর বন্দনা,

অঞ্জনগন্ধাং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগানাং মাতরমরণ্যানিমসংসিশম্॥ [ঋ. ১০. ১৪৬. ৬]

উষা ও রাত্রি: এই দুইজন দ্যুলোক দেবতা। দ্যুলোকের অধিকাংশ দেবতা সৌরমণ্ডলের প্রাকৃতিক সত্তা। সূর্য, সবিতা, রোহিত, পুষা, চন্দ্রমা—সকলেই সূর্যমণ্ডল-ভুক্ত। সূর্যের আহ্নিক গতির ফলে যে উষা ও রাত্রির আবির্ভাব—তাঁহারাও দ্যুলোক দেবতার অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক ঋষিদের প্রকৃতি-দৃষ্টি অভিনব ও কবিত্বময়। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম আর্য সাহিত্য হইতেই আগত। ভারতবর্ষের উদার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলিলে স্বভাবতঃই কল্পনার দ্বার খুলিয়া যায়। এই প্রকৃতি সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে পুরাতন ঋষি-কবিদের হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তুলিত। অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশে 'অপৃথগ্‌যত্নে' বাণী স্বাভাবিকভাবেই শব্দ ও অর্থালঙ্কারে ভূষিত হইত। প্রাকৃতিক সত্তাকে ঋষিগণ অচেতন মনে করিতেন না। সর্বত্রই চৈতন্যের গূঢ় সঞ্চার, সবকিছুই প্রাণময় ও অনুভব সম্পন্ন। কবি-মানসের এই ভাবটি সর্বাপেক্ষা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে উষা ও রাত্রি সূক্তগুলিতে।

ঋগ্বেদের প্রায় প্রত্যেক ঋষিই উষার বন্দনা গাহিয়াছেন। উষা 'দুহিতর্দিবঃ'—স্বর্গের দুহিতা, তিনি দিব্য যোষা—দেববালা। অপূর্ব তাঁহার রূপ। তিনি 'সুনরী'—সুন্দরী, তিনি শুক্লবসনা যুবতি—'যুবতিঃ শুক্রবাসা' তিনি 'ভাস্বতী' -আশ্চর্য দীপ্তিমতী। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তাঁহার আবির্ভাব। স্বয়ং সূর্যদেব এই উষার প্রণয়ী। এই উষার দেবসত্তাও অম্লান। ইনি 'নেত্রী সুনৃতানাং', ইনি 'ঋতাবরী'—সত্যবতী:

বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী
বিশ্বস্য বাচম্ অবিদৎ মনায়োঃ। [ঋ. ১. ৯২. ৯]

—সকল জীবকে ইনিই জাগ্রত করেন: মানুষ ইঁহারই
প্রভাবে ব্যবহারোপযোগী বাক্ লাভ করিয়াছে।

সপ্তম মণ্ডলে ঋষি বশিষ্ঠের উষা-সূক্তগুলি [৭. ৭৫, ৭. ৭৬] অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ।

'রাত্রি' দেবীও আকাশ-দুহিতা—'দুহিতর্দিবঃ'। দেবী উষা ইঁহার ভগ্নী। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে 'আয়তী' (আগমনকারিণী) রাত্রির এক চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি আসিতেছেন, চতুর্দিকে দৃষ্টি বিস্তার করিয়া রাত্রি আসিতেছেন; তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে—'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'।

গ্রামগুলি নিদ্রামগ্ন : গবাদি পশু, পক্ষী ও কামার্থী সুখে শয়ন করিয়া আছে। এই রাত্রির নিকট ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যেন মূর্ম্যে।
অথা ন সুতরা ভব॥

—হে রাত্রি, হিংস্র বৃককে দূরে লইয়া যাও, চোরকে
দূরে লইয়া যাও, আমাদের পক্ষে শুভকরী হও। [ঋ. ১০. ১২৭. ৬]

দ্যুলোকের অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে আছেন 'রাকা', 'অনুমতি', 'কুহু' ও 'সিনীবালী'। রাকা পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক, 'অনুমতি' চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা ; 'কুহু' পূর্ণ অমাবস্যা ও সিনীবালী চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যার প্রতীক। এই সকল দেবতা গর্ভাধান ও সুপ্রসবাদির জন্য আহূত হইয়াছেন।

অন্তরিক্ষলোকের নারী দেবতাগণের মধ্যে আছেন ইন্দ্রপত্নী 'ইন্দ্রানী শচী' ও রুদ্রপত্নী 'রোদসী' [রোদসী মতান্তরে মরুৎ-পত্নী : 'রোদসী মরুৎ-পত্নী বিদ্যুৎ বা'—সায়ণ]। বেদে ইহাদের নাম মাত্র আছে, প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাই।

বেদের খিল-সূক্তে একটি দেবী উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন, তিনি 'শ্রী'দেবী। ইনি প্রকারান্তরে 'হিরণ্ময়ী লক্ষ্মী'—যিনি সর্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি পদ্মে স্থিতা পদ্মবর্ণা পদ্মমালিনী—সর্বকান্তির আধার, অপর দিকে ইনিই প্রভূত অন্ন ও পশুর নেত্রী ['যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্']। পরবর্তীকালের কমলাসনা লক্ষ্মীর বন্দনা-উৎস এই শ্রী-সূক্ত। মনে হয়, সূক্তটি অবরকালের যোজনা।

বেদে স্ত্রী-দেবতা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। যত উচ্চ প্রশংসাই বর্ষিত হউক না কেন, তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য ইন্দ্রাদি দেবতার মত সর্বব্যাপী নয়। তবে ঋগ্বেদেরই 'দেবী সূক্তে' এক স্ত্রী-দেবতা পরমাত্মা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সূক্তটির দ্রষ্ট্রী ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক্ ; ইনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা। এই সূক্তে দেবী স্বয়ং স্বমহিমা ঘোষণা করিয়েছেন,

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম
আদিত্যৈরুত বিশ্ব দেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ [ঋ. ১০. ১২৫. ১]

—আমি রুদ্ররূপে, বসুরূপে, আদিত্য ও বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ
করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি।

ইহাই প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের প্রথম ঋক্। সূক্তটি অষ্ট ঋকের সমষ্টি। প্রত্যেকটি

ঋকেই দেবীত্বের মহিমা। তিনি বলেন, 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্' [১০. ১২৫. ৩]—আমি রাষ্ট্রশক্তি, ঐশ্বর্যের জননী, সর্বদর্শী, যষ্টব্যগণের প্রথমা; ব্রহ্মদ্বেষ্টা শত্রুকে হননের জন্য আমিই রুদ্রহস্তে ধনু বিস্তার করিয়াছি ['অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ১০. ১২৫. ৬]; আমার মহিমা সর্বব্যাপী ['পরো দিবা পরো এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সংবভূব'—ঋ. ১০. ১২৫. ৮]

এই সূক্তটি চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করা হয় এবং ধারণা এই যে, এই দেবী পরাশক্তি। অবশ্য শৈব বা শাক্তের পরমাদেবীর উল্লেখ বেদে না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু ভারতীয় ধর্মে-কর্মে দুইটি সংস্কৃতি এত সন্নিকৃষ্ট যে একটির প্রভাব অন্যটিতে কখন যে সংক্রামিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই মিশ্রণের ফলেই লৌকিক জগতের শক্তি দেবী ও রুদ্র বৈদিক সাহিত্যে আসন করিয়া লইয়াছেন এবং রুদ্র-পত্নীও ক্রমে প্রতিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী প্রকারান্তরে স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা।

অবৈদিক দেবতা কিরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পাপদেবতা 'নির্ঋতি' তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ঋগ্বেদে নির্ঋতিকে দূর করিবার জন্যই অন্য দেবতার আবাহন। কিন্তু যজুর্বেদে বা অথর্ববেদে নির্ঋতি নমস্কৃতা। তিনি কৃচ্ছ্রাপতি বা ভূমিদেবতা ['নির্ঋতিঃ কৃচ্ছ্রাপতিঃ ভূমি র্বা'—মহীধর]।

বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য দেবতা। তাঁহাদের প্রকৃতি, শক্তি ও মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। ঋগ্বেদেই কোথাও দেবতার সংখ্যা বলা হইয়াছে ৩৩, কোথাও ৩৩৩৯। কোথাও আবার সকল দেবতাই এক দেবতার প্রকাশ, এরূপ উক্তিও দুর্লভ নয়। বস্তুতঃ বৈদিক দেবতা কয়জন ['কতি দেবতা'], ইহা একটি সমস্যা। যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতা অনন্ত, যত নাম তত দেবতা। নৈরুক্তমতে দেবতার সংখ্যা মূলতঃ তিন: পৃথিবীর দেবতা 'অগ্নি', অন্তরিক্ষের দেবতা 'ইন্দ্র' বা 'বায়ু' এবং দ্যুলোকের দেবতা 'সূর্য': অন্যান্য দেবতা এই তিন দেবতারই রূপভেদ।[১] আত্মবিদ্ দার্শনিকগণ দেবতার একত্বে বিশ্বাসী, তাঁহারা এই বেদবাক্যটি উদ্ধার করিয়া বলেন, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। উপনিষদে এই একেশ্বরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগের দেবকল্পনার জটিলতা লক্ষ্য করিয়া আচার্য **Maxmuller** সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, **'If we must have a g. .eral name for the earliest form**

১. 'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রোবান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি'—যাস্ক, নিরুক্ত ৭. ৫.

of religion among the vedic Indians, it can be neither monotheism nor Polytheism, but only henotheism'.[২]—অর্থাৎ বৈদিক ভারতবাসীর ধর্মসম্পর্কে যদি সাধারণ কোন নাম দিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, উহা একেশ্বরবাদও নয়, বহু-ঈশ্বরবাদও নয়, উহা বহু একেশ্বরবাদ। Henotheism সংজ্ঞাটি নূতন। হয়তো তিনি বলিতে চান, ভারতবর্ষ বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুকে দেখিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। একই আত্মা নানাভাবে, নানারূপে বিশ্বজগতে লীলা করিয়া চলিয়াছেন; বহু একেরই প্রকাশ, আবার বহুর অন্তরালে এক। এইজন্য বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহাকেই ঈশান (মহেশ্বর) বলিয়াছেন, আবার বিশাল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে—আকাশে, অন্তরিক্ষে, সাগরে, বনস্পতিতে, মুষলে, উদূখলে বা অন্তরের ভাববৃত্তিতে পৃথক দেবসত্তার অস্তিত্ব দেখিয়াছেন। ভারতীয় দৃষ্টিতে—দেবতা যেমন এক, তেমনই বহু—যেমন অনন্ত, তেমনই সান্ত। সুপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবাসী এই বিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

৯. বৈদিক সমাজ

বৈদিক যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম একটি পরিণত যুগের স্বাক্ষর বহন করে। সভ্যতার দিক হইতে যখন বিপুলা ধরিত্রীর অন্যান্য অঞ্চল শৈশব স্তর অতিক্রম করে নাই, তখন জ্ঞান-গরিমা ও সমাজব্যবস্থা, কর্ম ও দার্শনিক চিন্তার দিক হইতে ভারতবর্ষ প্রৌঢ়। বৈদিক সভ্যতা মাত্র কয়েক বৎসরে গড়িয়া উঠে নাই, উহা বহু কালাগত। এই সভ্যতা একটি অবিমিশ্র জাতির রচনা বলিয়াও মনে হয় না, উহার অনেক উপাদান বিমিশ্র।

তখন ভারতবর্ষে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। বনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকিলেও তখন গ্রাম, বিশ্, জনপদ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিমান (ক্ষত্র) ছিলেন রাজশক্তির ধারক। রাজা একজন ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজার অস্তিত্ব ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। যুদ্ধে অশ্ব, রথ ও অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কোন রাজা অসপত্ন অধিকার লাভ করিয়া 'একরাট্' (একচ্ছত্র সম্রাট) হইতেন।

দৈবশক্তির উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ইষ্টদেবতা অভীষ্টদাতা, আর মানুষ প্রতিগ্রহীতা। ধন, জন, অন্ন, আয়ু, শস্য, গোসম্পদ দেবতার অধিকারে। দেবতা তুষ্ট হইলে অভীষ্ট বর্ষণ করেন। দেবতার তুষ্টিবিধানের উপায় যজ্ঞ। যাগ-যজ্ঞ

২. Hibbert lectures Vol vi.

ছিল প্রধান ধর্মানুষ্ঠান, কর্ম ছিল ধর্মনিষ্ঠ। রাজ্যাভিষেকে, যুদ্ধযাত্রায়, দুর্নিমিত্ত নিরোধে, কৃষিকর্মে, পুষ্টি ও শান্তিবিধানে এবং গার্হস্থ্যকর্মে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন ব্রাহ্মণ। তাঁহারাই বংশানুক্রমে মন্ত্র ও ক্রিয়া রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল। এক এক গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণের জন্য যজমানও ছিলেন পৃথক। যজমান যজ্ঞকালে প্রচুর দান-ধ্যান করিতেন। বৈদিক 'নারাশংসী' এই দান-ধ্যানের প্রশংসায় মুখর। এই নারাশংসীগুলিই পরবর্তী কালের কুলপঞ্জী ও বংশস্তুতির ঠিকুজী। ১

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—সমাজে এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠা ছিল। উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনও ছিল। বর্ণভেদ প্রথা তখনও ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং ধনাধিকার অনুসারে 'ভোজ' ও 'ভিক্ষু'—এই দুইটিই ছিল প্রধান শ্রেণীবিভাগ; তাহা ছাড়া ছিল দস্যু, অসুর, অব্রহ্মা, অব্রতা নামে একটি সম্প্রদায়। তাহারা যজ্ঞবিরোধী। মনে হয়, এই দলের যাহারা ব্রাহ্মণ-বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারাই পরবর্তী কালের তথাকথিত 'শূদ্র'; ইহাদেরই ভিতর যাঁহারা ছিলেন তপঃশুদ্ধ ও জ্ঞানী অথচ সাবিত্রী-হীন—তাঁহাদিগকে বলা হইত 'ব্রাত্য'। ব্রাত্যগণ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতেন [অথর্ববেদ. ১৫]

সমাজে নানাপ্রকার বৃত্তি প্রচলিত ছিল, 'নানানাং বৈ উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্' [ঋ. ৯. ১১২]: কেহ 'তক্ষা' (সূত্রধর), কেহ 'ব্রহ্মা' (পুরোহিত), কেহ 'ভিষক্', কেহ 'কর্মার', কেহ 'কারু' (শিল্পী)। শুক্ল যজুর্বেদে [৩০ অধ্যায়] পুরুষমেধ যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আটচল্লিশ প্রকার বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[১] এই তালিকা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শিল্পকর্মে ও চতুঃষষ্টি কলায় বৈদিক যুগেও এ দেশ যে অনেক প্রাগ্রসর ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। সেকালে চর্মশিল্প, তন্তুশিল্প, রূপশিল্প ছিল—ছিল ভল্লুক শিকারী 'নিষাদ', ব্যাঘ্রশিকারী 'দুর্মদ', সাপুড়ে 'সর্পদেবজন', অক্ষক্রীড়াসক্ত 'কিতব', বিদলকার (বংশপাত্রকারী) ও কণ্টকীকার। দ্যূতক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সমাজে 'দস্যু' 'তস্কর', 'স্তেন' প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীরও অবস্থান ছিল।

তৎকালে অপরা বিদ্যারূপে বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান,

১. ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রং তমসে তস্করং নারকায় বী[illegible]ণং পাপ্মনে ক্লীবং আক্রয়ায় অযোগূং কামায় পুংশ্চলং অতিক্রুষ্টায় মাগধম্। [শু. য ৩০. ৫]

নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্মায় সভাচরং নরিষ্ঠায়ৈ ভীমলং নর্মায় রেভং হসায় কারিং আনন্দায় স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্যায় তক্ষণম্ [শু.য.৩০.৬]

'রাশি' (গণিত), নিধি (অর্থশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কবিদ্যা), একায়ন (নীতিশাস্ত্র) ও জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চা হইত [ছা. উ. ৭. ১. ২; বৃ. আ. ২. ৪. ১০]। কিন্তু এই সকল বিদ্যা হইতে প্রধান বলিয়া গণ্য হইত পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যা অর্জন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য ছিল গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের সোপান। জীবনের বনিয়াদ গঠিত হইত গুরুগৃহে। গার্হস্থ্য আশ্রম মধুময় হইয়া উঠিত শিক্ষা-মহিমায়। ধর্মবিদ্যা ও কর্মবিদ্যা-ভূয়িষ্ঠ জীবনই ভারতবর্ষের জীবন।

গৃহাশ্রমে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান (ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাদি পাঠ, নৃযজ্ঞ বা আতিথ্যধর্ম, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ-তর্পণ, দেবযজ্ঞ বা দেবারাধনা এবং ভূতযজ্ঞ বা ইতর প্রাণীর সেবা) ছিল নিত্য কর্মের অঙ্গীভূত। বিবাহাদি সংস্কারও গার্হস্থ্যধর্মের অঙ্গ। সমাজে বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল। অনেকস্থলে সপত্নীর উল্লেখ ও সপত্নী-বিনাশের মন্ত্র দৃষ্ট হয়। মন্ত্রদ্বারা বশীকরণাদি ক্রিয়ার উল্লেখও দেখা যায়। তথাপি গৃহে দাম্পত্য-বন্ধনের সমাদর ছিল; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কাম্য ছিল 'সংজাস্পত্য'। সংসারে বধূর ভূমিকা 'সুমঙ্গলী' গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা। বধূর প্রসন্ন দৃষ্টিই গৃহের কল্যাণ; বধূই গৃহের সম্রাজ্ঞী। পুত্র-জনন প্রভৃতি কর্মও ছিল ধর্মের অঙ্গ। বেদের 'অগ্নিচয়ন' মন্ত্রগুলি গর্ভাধান ও পুংসবনেরই মন্ত্র। সন্তান ক্ষণিক বিলাসের জলবুদ্বুদ মাত্র নয়, সন্তান দ্বিতীয় আত্মা। পরিবারের সকলে 'সমনা' হউক, বধূ সকলের কল্যাণকারিণী হউক, পুত্র পিতার অনুগত হউক, মাতার সহিত সমনা হউক, ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে দ্বেষ না করে—এইগুলিই ছিল প্রিয় কামনা। সমাবর্তন কালে গুরুও এই উপদেশ দিতেন, 'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব'।

বৈদিক সমাজে নারীর উচ্চাধিকার ছিল। তাঁহারাও উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি। বিশ্ববারা, ঘোষা, বাক্, সূর্যা—উপনিষদের বাচক্নবী গার্গী ও মৈত্রেয়ী নারী-মহিমার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি শ্যাবাশ্ব বীর তরন্তের পত্নী শশীয়সীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন [ঋ. ৫. ৬১]। একটি ঋকে অবশ্য নারীর প্রতি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে:

ইন্দ্রশ্চিদ্ঘা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ
উতো অহ ক্রতুং রঘুম্। [ঋ. ৮. ৩৩. ১৭]

—ইন্দ্র বলিয়াছেন, নারীর মন অশাস্ত; তাহার বুদ্ধি কম।

বৈদিক নারীসমাজ সম্পর্কে এই উক্তি সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য নয়। সমাজে পুণ্যশ্লোক ও পাপাত্মা, সাধু ও অসাধু নানা প্রকারের লোকই বর্তমান ছিল। পুরু

ও অসুর, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা, অকাম ও কামনাবান্, স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও ভিক্ষু নানা প্রকার ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। একটি সুউচ্চ মানদণ্ড দ্বারা মানুষের বিচার হইত—তাহা হইতেছে 'সত্য' ও 'ঋত'। নীতির বিশ্বকেন্দ্রিক রূপটিকেই বলা হইত 'ঋত'। এই ঋতের নেতা বরুণ, 'অয়ং হি নেতা বরুণ ঋতস্য' [ঋ. ৭. ৪০. ৪], সূর্য হইতেছেন এই ঋতদেবের উজ্জ্বল চক্ষু। যিনি ঋতবৃধা, তিনিই ঋষি। ঋতত্বই মানবত্ব। এই ঋত পথে চলিয়া স্বর্গের সরমা (শুনী) পণি-অপহৃত গাভীর সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন ['ঋতস্য পথা সরমা বিদৎ গাঃ'—ঋ. ৫. ৪৫. ৭]। সত্যের মানদণ্ডে মানবত্ব বিচারের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাবাল সত্যকামের আখ্যান। মাতা জবালা ছিলেন 'বহু-চরন্তী পরিচারিণী', তাহার পুত্র সত্যকাম। গুরু তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে সত্যকাম সত্যোক্তি করিল। গুরু গৌতম কহিলেন, 'নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি' [ছা. উ. ৪. ৪.]। সত্যই মানবত্ব, সত্যই ব্রাহ্মণত্ব: সত্যকাম সত্যভ্রষ্ট হন নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ। দেবগণও সত্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতা।[১]

বৈদিক যুগেও নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল। বশীকরণাদি মন্ত্রে বিশ্বাস, মন্ত্রদ্বারা মৃত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার, মন্ত্রদ্বারা দুর্দৈব নিবারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে যুগের মানুষ স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণকে বর্জন করেন নাই। মৃত্যুকে সে যুগের ঋষিরা জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, 'শতাত্মা চ ন জীবতি'। কিন্তু মৃত্যুতেই যে সব শেষ হইয়া যায়, তাহা মনে করিতেন না। মৃত্যুর পর সত্তা দূর দিগন্তে মরুৎ-বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া কর্মানুসারে শুক্লা বা কৃষ্ণা গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান পথে যাইবার ইচ্ছাই মানুষের প্রবল, কখনও পিতৃগণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরলোকে বিশ্বাসী হইলেও, কিংবা দেব-নির্ভর হইলেও পরলোক ও দেবতা সম্পর্কে তাঁহাদের মনে সংশয় প্রশ্নও ছিল। কেহ কেহ যে ইন্দ্রের অস্তিত্বে সংশয় করিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে [ঋ. ১০. ১২৯. ৭]:

১. শতপথ ব্রাহ্মণে [৯.৫.১] এই কাহিনীটি আছে: দেবতা ও অসুর পূর্বে এক প্রকারই ছিলেন; উভয়েই সত্য ও অনৃত বাক্য বলিতেন। তখন দেবগণ অনৃতকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্যকে পাইলেন, অসুরগণ সত্যকে ত্যাগ করায় অনৃতই লাভ করিল। সত্যকে লাভ করিয়া দেবগণ দেবত্ব লাভ করিলেন।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো'স্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

—এই সৃষ্টি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি না, যিনি পরম ব্যোমে ইহার অধ্যক্ষ, হয়তো তিনি জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না।

দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক একটা অন্ধ বিশ্বাস বা আবেগ-প্রসূত ভক্তির ব্যাপার ছিল না। দেবতার সঙ্গে ছিল বলিষ্ঠতার সম্পর্ক, ভক্তি ছিল জ্ঞান-প্রহরায় সংযত। বৈদিক যুগে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির পথ ছিল উন্মুক্ত।

ক. বৈদিক সমাজে লোক-সংস্কার

বৈদিক সমাজ অবিমিশ্র সমাজ নয়। উহাতে প্রাগার্য জাতির নানা প্রকার বিশ্বাস আচার-আচরণ ও লৌকিক সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অবৈদিক কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম রহিয়াছে—অসুর, পণি, দস্যু। অসুরগণ দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ['অদদানমশ্রদ্দধানময়জমানমাহুরাসুরো'—ছা. উ. ৮. ৮. ৫]; পণিগণও অশ্রাদ্ধা, অবৃধা ও অযজ্ঞা, উপরন্তু তাঁহারা 'মৃধ্রবাচঃ'[১] (যাহাদের বাক্যে মূর্ধন্যধ্বনির প্রাধান্য)। অসুর ও পণি উভয়েই দস্যুদলভুক্ত। বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই সকল অবৈদিক বা লৌকিকগোষ্ঠী কয়েকটি দিক হইতে প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছে।

১. বৈদিক বরুণ ও রুদ্র দেবতার প্রকৃতি বিমিশ্র। বরুণ নিজেই 'অসুর'। অবশ্য বেদে অসুর শব্দটি প্রাণশক্তির প্রতীক; এই অসুরত্ব প্রায় সকল দেবতারই আছে। অসুরগণ 'মায়াবী'; 'মায়া'ও বেদে দেবশক্তির প্রতীক। মনে হয়, 'অসুরত্ব' ও 'মায়া'—অসুরসমাজের এই দুই বৈশিষ্ট্য বৈদিকসমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। এই আসুরীমায়া সর্বাধিক বরুণের; 'অসুরস্য মায়য়া' তিনি আকাশ হই'তে বৃষ্টি বর্ষণ করেন [ঋ. ৫. ৬৩. ৩]। ঋগ্বেদে রুদ্রও ভীষণ। তিনি পশুপালক ও ওষধিপতি। যজুর্বেদের 'শতরুদ্রিয়ে' রুদ্র 'ঈশান' অর্থাৎ মহেশ্বর হইয়াও তস্কর, স্তেন ও তায়ুদের পতি। অথর্ববেদে ব্রাত্য (অদীক্ষিত গায়ত্রী পাতত অন্-আর্য) ঈশান রুদ্রের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

২. পণ্ডিতগণ মনে করেন, বেদের সমাজ পুরুষ-তন্ত্রের অধীন। এইজন্যই বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্য। কোন স্ত্রীদেবতাই ইন্দ্রের মত মহত্ত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের 'দেবী সূক্তে' একটি দেবী পরমাত্মা দেবতার

---

১. নি অক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীন্ ।
অশ্রদ্ধান্ অবৃধান্ অযজ্ঞান্ । [ঋ.৭.৬.৩]

পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত মন্ত্র-তান্ত্রিকদের [illegible] ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তটিও তাৎপর্য পূর্ণ। এই রাত্রি নিসর্গ প্রকৃতি রজনীর প্রতীক মাত্র নহেন; ইনি যে অন্-আর্য দেবী, সামবিধান ব্রাহ্মণের শবরীরূপিনী রাত্রির মূর্তি তাহার প্রমাণ। ঋগ্বেদের সায়ণভাষ্যে [১. ৮৯. ৩]—'শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রিরিতি' উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত গর্ভ।

৩. বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ অথর্ববেদে যে বশীকরণ মারণাদি মন্ত্র ও অদ্ভুত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, আচার্য Winternitz এর মতে তাহার অধিকাংশ 'popular belief' হইতে সংগৃহীত। আথর্বণ উপনিষদগুলিতে যে যোগাচার ও তন্ত্রাচারের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও লৌকিক জগৎ হইতে সমাহৃত।

৪. বৈদিক সাহিত্যে 'নির্ঋতি' পাপদেবী। ঋগ্বেদে এই নির্ঋতি অপসারণের জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে. 'পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহিতাম্' [ঋ. ১০. ৫৯]—নির্ঋতি দূরদেশে চলিয়া যাউক। কিন্তু যজুর্বেদে পাই নির্ঋতি বন্দনা: 'নমো দেবি নির্ঋতে তুভ্যমস্তু' [শু. য. ১২. ৬২]। দেবসংঘে পাপদেবতার এই প্রতিষ্ঠা অবৈদিক প্রভাবের সূচক।

৫. C. Kunhan Raja মনে করেন,[১] বৈদিক সাহিত্যে অরণ্য-জীবনের ক্রমিক প্রভাব এবং আরণ্য পশু ও বনবৃক্ষাদির দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা প্রাগার্য সমাজ হইতে সমাহৃত। বৈদিক আর্য ছিলেন প্রধানতঃ গ্রাম ও জনপদবাসী; বৈদিক দেবগণের মণ্ডনকলা ও যুদ্ধসজ্জা রাজার মত। তাঁহারা অলঙ্কৃত, সুবাসা, বজ্রহস্ত, রথারূঢ়। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, দেবগণ অরণ্য ও মৃগয়ার সহিত যুক্ত। রাত্রিদেবী 'পাশহস্তা শিখণ্ডিনী'; 'অঞ্জনগন্ধা অরণ্যানী' মৃগমাতা, যজুর্বেদের ওষধি-বন্দনাতেও বন-ভেষজের মহিমা। ওষধী 'অশ্বাবতী', 'সোমাবতী', বলকারক ও ওজোবর্ধক ['অশ্বাবতীং সোমাবতীম্ ঊর্জয়ন্তীমুদোজসম্'। শু. য. ১২. ৮১]। তাই এই বন-ভেষজের উদ্দেশ্যে ঋষির প্রার্থনা,—

যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ।
বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥ [শু. য. ১২. ৮৯]

—যে সকল ওষধী ফলিনী বা অফলা, পুষ্পিনী বা অপুষ্পা বৃহস্পতি-সন্ততি সেই ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।

শুধু তাই নয়, আরণ্যক-উপনিষদের যুগে রহস্যবিদ্যা আলোচনার কেন্দ্রও অরণ্য।

---

১. Pre-vedic elements in Indian Thoughts—The Hist of Philosophy Eastern & Western Vol I.

৬. ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন বৈদিক সাহিত্যের কুট, কদলী, ময়ূর, পূজা প্রভৃতি শব্দ অন্-আর্য মূর্ধন্য ধ্বনিগুলিও দেশজ ধ্বনি বলিয়া গণ্য : এগুলি 'মৃধ্রবাচঃ' অবজ্ঞাদেরই ধ্বনি-সম্পদ। ধ্বন্যাত্মক অনুকার শব্দগুলিকেও ভাষাবিদ্‌গণ দেশজ লৌকিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন : বৈদিক সাহিত্যে নিম্নলিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পাওয়া যাইতেছে ;

(i) 'অললা' : ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, জলবতী নদীগণ 'অললা' এইরূপ হর্ষসূচক শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে ['এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তী ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ'—ঋ. ৪. ১৮. ৬]

(ii) 'চিচ্চিক' : ১০ মণ্ডলের 'অরণ্যানি-সূক্তে' অরণ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ['বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ'। এখানে চিচ্চিক চিচ্চিক-ধ্বনিকারী পাখী।

(iii) শুক্লযজুর্বেদের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে আছে 'আহলাগাত' (হলহলা) ও 'নিগল্‌গল্'—এই দুইটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

(iv) 'গর্গরা' : অথর্ববেদে [৪. ১৫. ১২] বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলা হইতেছে, 'আপোনিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণ'—হে বরুণ, জল সিঞ্চন করিতে করিতে আমাদের পিতৃগণ গর্গর শব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করুন।

(v) 'উলুলবঃ' : উলুউলুধ্বনি। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে [৩. ১৯. ৩] আদিত্যের জন্মপ্রসঙ্গে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে : 'তং জায়মানং ঘোষা উলুলবোঽনূদতিষ্ঠন্ ...তস্মোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলুলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি'—তাহার জন্ম হইলে উলুউলুধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, এইজন্য আজিও সূর্যের উদয় বা অস্তগমনকালে উলুউলুধ্বনি উত্থিত হয়।

১০. বেদাদির সাহিত্যিক মূল্য

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, বেদাঙ্গ ও সূত্রাদি সহ বৈদিক সাহিত্যের বিপুল আকার। কিছু অংশ ক্রিয়া-কর্মের বিধান, কিছু অংশ জ্যোতিষ-কল্প-শিক্ষাশাস্ত্রের বিবরণ, কিছু ব্যাকরণ, কিছু অভিধান। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আগাছা বাদ দিয়া বিশাল বেদ-পাদপ-কাননে প্রবেশ করিলে পুষ্পিতা কাব্য লতিকার শোভা এবং কুন্তলিনী অরণ্যানির ঐশ্বর্য যে-কোন বেদচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পদ্যে ও গদ্যে বৈদিক সাহিত্য বহুবিচিত্র। সংহিতা ভাগের ছন্দ-বিলসিত কবিতা, অক্ষর-পরিমিত গদ্য মন্ত্র, ব্রাহ্মণভাগের প্রাঞ্জল গদ্যময় কথা এবং উপনিষদের সংলাপাত্মক

কাহিনীর কাব্যমূল্য কোনক্রমেই অল্প নয়। বৈদিক সাহিত্যই পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য—দর্শন, পুরাণ, কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, গান, ছন্দ, ও অলঙ্কার শাস্ত্রের আদি উৎস। উৎসমুখে যাহা বিন্দু, পরবর্তী সাহিত্যে তাহাই সিন্ধু। বেদের ছায়াপথ ধরিয়াই অবরকালীন ভারতীয় সাহিত্যের যাত্রা। বেদোত্তর কালের কবি-মনীষী ক্রান্তদর্শী বৈদিক কবির দায়ভাগ লইয়াই সমৃদ্ধ হইয়াছেন।

(i) বেদে পুরাণ-প্রসঙ্গ

ইতিহাস-পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ অংশ। এই ইতিহাস-পুরাণের মূল বীজ বেদ। পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সৃষ্টিকল্প ও বংশবর্ণনা। এই দিক হইতে ইতিহাস-পুরাণ বেদেরই 'উপবৃংহণ'। বেদের সৃষ্টি বিষয়ক সূক্তাবলীতে যে সকল তত্ত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ব্রাহ্মণ-অংশে যাহার ঈষৎ বিস্তার—পুরাণে তাহাই বিপুলাকাব সর্গ-বর্ণনায় পরিণত হইয়াছে। 'নাসদীয় সূক্তে'র রহস্যঘন শূন্যতা, 'পুরুষ সূক্তে'র বিরাট, 'হিরণ্যগর্ভসূক্তে'ব স্বরাট্ প্রজাপতি, অঘমর্ষণ সূক্তের সৃষ্টিক্রম সবই পুরাণে আছে। আদি সৃষ্টিকল্পে দেবাসুরের উদ্ভব, দেবাসুরের সংগ্রাম, অদিতি হইতে দেবতা ও দক্ষাদির জন্ম—বৈদিকসূক্তে ও ব্রাহ্মণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাবই শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ পুরাণ।

পুবাণেব বংশ ও বংশানুচরিতের বীজ বেদের 'আখ্যান-সূক্ত' বা 'সংবাদস্তোত্র' এবং 'নারাশংসী'। বেদেব মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি—বিশ্বামিত্র, অত্রি, বামদেব, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু—পুবাণ-ঋষির অন্যতম। এই সকল ঋষিদেব লইয়াই পুরাণে 'নব ব্রহ্মা'ব পবিকল্পনা। পৌরাণিক কাহিনীগুলিরও আকর বেদ-ব্রাহ্মণ। অগস্ত্য-লোপামুদ্রাব কাহিনী, পুরূরবা-উর্বশীব উপাখ্যান, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিচিত্র কথা, মনু-মৎস্য সংবাদ প্রভৃতি বেদে ব্রাহ্মণে ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। ইন্দ্রের বৃত্রবধের কাহিনী পুরাণের একটি বহুখ্যাত প্রসঙ্গ। বৈদিক সংহিতার প্রায় প্রত্যেকটি 'ঐন্দ্র'সূক্তে এই কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দ্রের জন্মই বৃত্র বধের জন্য 'ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবাঃ' [ঋ. ৩. ৪৯. ১]। ইন্দ্রের 'হস্তে বজ্রম্', এই বজ্র ত্বষ্টা কর্তৃক নির্মিত—'ত্বষ্টা অস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ' [ঋ. ১.৩২.২]। পুবাণে ইন্দ্র শচী-পতি। বেদে শচীই সুভগা ইন্দ্রাণী কিনা, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইন্দ্র যে শচী-পতি তাহার ইঙ্গিত আছে,—'হন্তা দস্যূনামভবৎ শচি-পতিঃ' [অ. ৩. ১০. ১২]।

পুরাণের ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ঠিক যে রূপে ইহারা পৌরাণিক দেবতা সে রূপ বেদে না থাকিলেও, উহাদের অস্তিত্ব বেদেও ছিল। পুরাণের 'ব্রহ্মা' বেদে

'প্রজাপতি'। ব্যাকৃত সৃষ্টিতে তিনিই প্রথম মূর্ত পুরুষ, এবং তিনিই প্রপঞ্চ সৃষ্টির কর্তা। বৈদিক সূক্তাবলীতে তিনি হিরণ্যগর্ভ, ধাতা, ক-দেবতা ['কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" ঋ. ১০. ১২১] নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রজাপতিই পুরাণের প্রজাপতি ব্রহ্মা। অবশ্য পুরাণে ব্রহ্মা-সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলির উল্লেখ বেদে-ব্রাহ্মণে নাই, তবে 'পিতা যৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ [ঋ. ১০. ৬১. ৭] মন্ত্রটিতে তাঁহার স্ব-দুহিতার প্রতি আসক্তির ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পুরাণের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান।

'বিষ্ণু'ও বেদের একজন প্রধান দেবতা। অবশ্য পৌরাণিক বিষ্ণু-কাহিনীর প্রসঙ্গ বেদে নাই। তবে 'বিষ্ণু গোঁপা' পদাংশটি তাৎপর্য বোধক। বেদে 'গোপা' শব্দের অর্থ 'পালয়িতা'। পুরাণেও স্থিতির কর্তা বিষ্ণু। কেহ আবার এই অংশ হইতে বিষ্ণুর গোপকুলের সহিত সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। উহা অবশ্য কষ্টকল্পনা। বিষ্ণুসূক্তে আছে, 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্' [ঋ. ১. ২২. ১৭]। বিষ্ণুর এই ত্রিপদক্ষেপের প্রসঙ্গ হইতে যে পৌরাণিক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু ও বলি-বামনের উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। পুরাণ-মতেও ধ্যেয় বিষ্ণুর পরমপদ, উহাই পরমস্থান। ইহা বৈদিক বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্রেরই স্মারক।

পৌরাণিক ত্রিমূর্তির তৃতীয় দেবতা উমাপতি মহেশ্বর। পুরাণের বিচিত্র শিবো-পাখ্যান, পৌরাণিক শিবের রূপ ও বিভূতি বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে রুদ্র ওষধিপতি, ভেষজ-দেবতা এবং তিনি অতি ভয়ঙ্কর। রুদ্রের রুদ্রত্ব পুরাণেও রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ওষধিপতির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেদের রুদ্র 'কপর্দী' (জটাধারী) ও 'সুধন্বা' (পিণাক-পাণি)—পুরাণের রুদ্রও জটাজুটধারী ও পিনাক-পানি। যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়ের রুদ্র অবশ্য পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। যজুর্বেদের আর একটি মন্ত্রে—'এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়া'—রুদ্র ভগ্নী অম্বিকার সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আহুত হইয়াছেন ; পুরাণে শিব অম্বিকা-পতি।

বৈদিক প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র পরবর্তীকালে পুরাণের ত্রিমূর্তি হইলেও, রূপ, গুণ ও লীলায় তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, দেবসত্তায় ব্যক্তিত্বের আরোপ। বেদের এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারদের বলা হইত 'ঐতিহাসিক'। তাঁহারা দেবতার প্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, অতীতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিই দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। দেবসত্তায় অলৌকিক কীর্তি-কলাপের যোজনা, প্রকৃতির রূপক-দেবতাকে মানুষের মত আশা-কামনার অধীন করিয়া চিত্রিত করিবার কীর্তি তাঁহাদেরই। বেদের ব্রাহ্মণাংশেও ইহাদের

হাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপেই সংহিতার বীজ ব্রাহ্মণে অঙ্কুরিত হইয়া পুরাণে পল্লবিত হইয়াছে। পুরাণ-সাহিত্যের উৎসরূপে বেদের মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

(ii) কথা সাহিত্যে বেদের দান

জাতক, পঞ্চতন্ত্র ভারতীয় কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার। পুরাণ-ইতিহাসেও বহু কথা স্থান লাভ করিয়াছে। এগুলি হইতেও প্রাচীন কোন কথা-ভাণ্ডারের বিষয় যদি উল্লেখ করিতে হয়, তাহা বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ। অবশ্য জাতক-পঞ্চতন্ত্রাদি কথা-সাহিত্যে যে ধরনের কথা পাওয়া যায়, বেদে-ব্রাহ্মণে তাহা নাই। বেদের আখ্যায়িকা বেশির ভাগ পুরাণ-ঘেঁষা; ইতিহাসের অড়ও কিছু কিছু আছে। তথাপি ইহারই মধ্যে লৌকিক জীবনের স্বাদ যেটুকু পাওয়া যায়, জীবন-কথার দিক হইতে তাহাদের মূল্য অল্প নয়। সংহিতার 'সংবাদ স্তোত্র' এবং 'নারাশংসী'গুলি এইরূপ কথার আদি বীজ। কয়েকটি কথার আভাস দেওয়া যাইতেছে :—

১. নারী-হৃদয়ের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হইয়াছে অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদে। [ঋ. ১. ১৭৯]। লোপা বলিতেছেন, সেবায় কতকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এখন জরা আসিয়া তনু-শ্রী গ্রাস করিতে উদ্যত, পুরুষ এবার স্ত্রীর নিকট গমন করুন। পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণও প্রাণকে রক্ষা করিয়াছেন, নিঃশেষ হইয়া যান নাই, পত্নী এবার পুরুষের সহিত মিলিত হউক।

অগস্ত্য উত্তর করিতেছেন, দেবতা যাহাদের রক্ষা করেন, তাহারা শ্রান্ত হয় না। জপ ও সংযমে নিযুক্ত থাকিলেও কাম আজ অবারিত লোপামুদ্রা আজ সমর্থ পতিতে সঙ্গতা হউক।

যিনি এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন, পরিশেষে তিনি মন্তব্য করিতেছেন, 'পুলুকামো হি মর্ত্যঃ'—মানুষ কামনাবান্। ঋষি অগস্ত্য অবশ্য উভয় কুলই রক্ষা করিয়াছেন, অপত্যও লাভ করিয়াছেন, দেবতার আশীর্বাদ হইতেও বঞ্চিত হন নাই।

২. কবষ-দৃষ্ট একটি সূক্তে [ঋ, ১০. ৩৩] পাই পিতার মৃত্যুতে শোক-কাতর পুত্রের মর্মবিদারী চিত্র, আর সেই সঙ্গে তৎকালীন পুরোহিতের সান্ত্বনাবাণী। কবষ ছিলেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে) ব্যাধ জাতীয় দাসীর পুত্র। তিনিই আবার রাজা ত্রসদস্যু ও তৎ পুত্র কুরুশ্রবণের যাজক। পিতার মৃত্যুতে কুরুশ্রবণ শোকবিহ্বল। কবষ তাঁহার দানস্তুতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন : আমি যদি মৃত্যু বা অমৃতের অধীশ্বর হইতাম, তাহা হইলে আমার ধনদাতাকে নিশ্চয় জীবন দান

করিতে পারিতাম। দেবতার মর্যাদা অতিক্রম করিয়া শতায়ু ব্যক্তিও বাঁচিতে পারে না, এই জন্যই তো প্রিয়-বিয়োগ হয়:

ন দেবানামতিব্রতং শতাত্মা চ ন জীবতি।
তথা যুজা বি বব্রুতে॥ [ঋ. ১০. ৩৩. ৯]

একজন পুরোহিতের পক্ষে এই নির্মম সত্যের স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয়। সূক্তটির ভিতর একটি কাহিনীও সঙ্কেতিত।

৩. অক্ষ-সূক্তে [ঋ. ১০. ৩৪] পাই একটি জুয়ারীর আত্মকাহিনী। এই সূক্তটিরও ঋষি কবষ। সূক্তটির মধ্যে পাশার নেশায় প্রমত্ত মানুষের সর্বনাশা পরিণামের একটি চিরকালীন সামাজিক চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাশার আকর্ষণ মোহকর। এই আকর্ষণে ঘরের সখীসমা ঘরণী অনাদৃতা হয়। শাশুড়ী নিন্দা করে, বৌ বাধা দেয়, বাবা, মা, ভাইয়েরা বলে—জানিনা উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও; জুয়ারীর বৌকে অন্যে স্পর্শ করে ['অন্যে জায়াং পরিমৃশন্তি]। জুয়াবী ভাবে, আব পাশা খেলায় যোগ দিবে না, কিন্তু পাশাফেলার দানের শব্দ 'জারিণী'র মত আকর্ষণ করে। পাশার শব্দ যেন 'মধ্বা সংপৃক্তাঃ'। রাজাও পাশাকে নমস্কার করেন। জুয়ারীর জায়া দুঃখ পায়, মায়েরও সেই অবস্থা। পাওনাদারের ভয়ে জুয়ারীকে রাত্রিতে অন্যের বাড়ীতে আত্ম গোপন করিতে হয়। অতএব,

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানাঃ।

—পাশা খেলিও না, কৃষিকর্ম কর—আপন ধনই যথেষ্ট মনে করিয়া সুখী হও।

বৈদিক সংহিতায় এই ধরনের বহু কথা আছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের কাহিনী-গুলির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জীব-জন্তু কাহিনী। বেদে-ব্রাহ্মণে-উপনিষদে সে কাহিনীরও অঙ্কুর রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সরমা ও পণিগণের কাহিনী [ঋ. ১০. ১০৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গের শুনী (কুকুরী) সরমা। তাহার নির্লোভ চরিত্র নির্লোভ মানুষেরই চরিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল সত্যকাম ঋষভ (ষণ্ড) হংস ও মদ্গু (জলচর পাখী) প্রভৃতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়াছেন। মনুষ্যেতর প্রাণীকে নায়ক সাজাইয়া এই প্রকারের বহু-কাহিনী পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। কথাসাহিত্যে কোন কোন উপাখ্যানে সেই উপাখ্যানের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত একটি বীজ-শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়। বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ কথা-বীজ জাতীয় শ্লোকের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,

১. দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্ অন্য অভিচাকশীতি॥ [ঋ. ১. ১৬৪. ২০]

—দুইটি শোভন-গমন সমানযোগ পাখী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া সখ্যে বাস করে; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অন্যটি ভক্ষণ না করিয়া শুধু দেখে।

সায়ণ বলেন, 'অত্র লৌকিক পক্ষিদ্বয় দৃষ্টান্তেন জীব পরমাত্মনৌ স্তূয়তে'। লৌকিক পক্ষীর এই দৃষ্টান্ত একটি কথার সঙ্কেত।

২. অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ [শ্বেত. উ. ৪. ৫]

—নিজের অনুরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজাকে একটি অজ আসক্ত হইয়া ভোগ করে, অপর একটি অজ ভুক্ত ভোগা অজাকে ত্যাগ করে।

শ্লোকটির মধ্যে প্রকৃতি এবং বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের গূঢ়তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও উহাতে প্রাণী-কাহিনীর একটি বীজও রহিয়াছে।

কথা সাহিত্যের প্রধান বাহন গদ্য। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদোক্ত গল্পগুলিরও বাহন প্রাঞ্জল গদ্য। এই গদ্যই প্রাচীনতম ভারতীয় গদ্যের নিদর্শন। গদ্যের এই ধারা সূত্রসাহিত্যের ক্ষীণ সূত্রে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভাষ্য-টীকার ভিতর উহার গতি মন্থর ও প্রকৃতি নীরস হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাহিনীবর্ণনায় বা ঘটনার বিবৃতিতে এই গদ্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত ছিল, তাহারই পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করি পালি জাতকাদির মধ্যে ও পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথাসাহিত্যের গদ্যে। গল্প রচনায় গদ্যই যে শ্রেষ্ঠ বাহন, এ আবিষ্কার বৈদিক যুগের। উদাহরণ স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য-গদ্যের একটি অংশ উদ্ধার করা যাইতেছে।

প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমসৃজত। ত্রয়ো বেদাঅসৃজন্ত। তান্ হস্তে কুরুত। অথ হ সীতা সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে। শ্রদ্ধাম্ উ স চকমে। সা হ পিতরং প্রজাপতিমুপসসার। তং হ উবাচ নমস্তে অস্তু ভগবঃ। উপ ত্বা অয়ানি প্র ত্বা আপদ্যে। সোমং বৈ রাজানং কাময়ে শ্রদ্ধাম্

উ স কাময়তে ইতি। তস্মৈ উ হ স্থাগরমলঙ্কারং কল্পয়িত্বা…অলঙ্কৃত্য অস্তমর্দ্ধং বব্রাজ। তাম্ হ উদীক্ষ্য উবাচ উপ মা বর্ত্তস্ব ইতি। তং হ উবাচ ভোগন্ত মে আচক্ষ এতন্মে আচক্ষ যত্তে পাণবিতি। তস্মৈ উ ত্রীন্ বেদান্ প্রদদৌ। তস্মাদ্ উ হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে। [তৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০]

—প্রজাপতি সোমরাজাকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর তিন বেদ সৃষ্টি করিলেন। (সোম) উহাদিগকে হস্তে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী সীতা তাঁহাকে কামনা করিল। তিনি (সোম) শ্রদ্ধাকে কামনা করিলেন। সে (সীতা) পিতা প্রজাপতির নিকট গেল। তাঁহাকে বলিল, হে ভগবন্, প্রণাম। আপনার নিকট অভিযোগ করিতেছি। আমি সোম রাজাকে কামনা কবি, তিনি শ্রদ্ধাকে কামনা করেন। (প্রজাপতি) তাহার জন্য অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া মন্ত্রপূত করিয়া সাজাইয়া দিলেন। (সীতা) তাঁহার (সোমের) সম্মুখে দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া তিনি (সোম) বলিলেন, আমার কাছে আইস। সে তাঁহাকে বলিল, ভোগের মূল্য দাও—তোমার হাতে যাহা আছে, তাহাই দাও। তিনি (সোম) তাহাকে তিন বেদ প্রদান করিলেন। এইজন্য এইরূপে স্ত্রীলোকেবা ভোগ্য আদায় করিয়া থাকে।

মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, পালি গদ্য এবং পঞ্চতন্ত্রাদিতেও এই গদ্যভঙ্গিই অনুসরণ করা হইয়াছে। অবশ্য কথা সাহিত্যেব গদ্য কিছুটা অলঙ্কৃত, ব্রাহ্মণের গদ্য নিরাভরণ।

(iii) বেদে নাট্য ও ছন্দ শাস্ত্রাদির উপাদান

নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, বেদে তাহা নাই। কিন্তু কয়েকটি সংবাদ-সূক্ত অপূর্ব নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। তন্মধ্যে যম ও যমী সংবাদ [ঋ. ১০. ১০] এবং পুরূরবা-উর্বশীসংবাদ [ঋ. ১০. ৯৫] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যম ও যমী সংবাদে একদিকে উদ্ঘাটিত হইয়াছে নীতিভ্রষ্টা ভগ্নীর নগ্ন লালসার চিত্র, অন্যদিকে ধর্মধীর ভ্রাতার নীতিজ্ঞান। কথার দ্বন্দ্বে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়াছে :

যমী বলিতেছে, 'ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাম্'—আমি সখাকে সখ্যে
বরণ করিব ; যম উত্তর দিতেছেন, 'ন তে সখা সখ্যং বষ্টি'—
সখা তোমার সখ্য কামনা করে না।
যমী বলিতেছে, 'দিবা-পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ'—দ্যাবাপৃথিবীতে
মিথুনগণ এইরূপেই বন্ধুত্ব করে ; যম উত্তর করিতেছেন, 'অন্যমিচ্ছস্ব

সুভগে পতিং মৎ'—আমাকে ছাড়া, হে সুভগে, অন্য কাহাকেও পতিত্বে কামনা কর।
যমী সখেদে বলে, 'কিং ভ্রাতা অসদ্ যদনাথং ভবাতি'—ভ্রাতা থাকিতে
ভগ্নী কি অনাথ হইবে? যম উত্তর করেন, ইহা যে পাপ।
ক্রুদ্ধ যমী বলে, যম, তুমি ভীরু, তোমার মন বা হৃদয় বলিয়া কিছু আছে,
দেখিতে পাইতেছি না ['বতো বত অসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ঞ্চ
অবিদাম'] ; তথাপি যমের একই উত্তর, 'অন্যম্ উষু ত্বং যমি!'

পুরূরবা ও উর্বশী সংবাদের নাটকীয় সম্ভাবনাকে কালিদাস 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। বৈদিক সংবাদটি এক পূর্ণাঙ্গ প্রেম-কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ। পুরূরবা স্বরপ্সরী উর্বশীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। উর্বশী পুরূরবার প্রিয়ারূপে কিছুকাল বসবাস করিয়া যখন পুরূরবার তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। উর্বশী আকাশ পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন, পিছনে উন্মাদের মত ডাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে চাহিতেছেন পুরূরবা। সংবাদটি প্রাচীন, ভাষাতেও প্রাচীনত্বের জটিল বন্ধন, ভাবও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট। সংক্ষেপিত তর্জমায় সংলাপটি এইরূপ দাঁড়ায়:

পুরু: হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে
বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈনু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে
ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্॥ [ঋ. ১০. ৯৫. ১]

—ওগো ঘোরা জায়া, দাঁড়াও, উভয়ে একটু কথা বলি। সুখকর 'মনের কথা' শেষবারের জন্য বলা হয় নাই।

উর্ব: কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং
প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি
দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি॥ [ঋ. ১০. ৯৫. ২]

—তোমার কথা শুনিয়া কি করিব? আমি এখন প্রথম উষার মত চরনশীলা। পুরূরবা, ঘরে ফিরিয়া যাও, আমি এখন বাতাসের মত দুষ্প্রাপনীয়া।

পুরূরবা বলিলেন, মানুষ হইয়া দেবী অমানুষীতে প্রেম অর্পণ করিয়াছি, এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।

উর্বশী বলিলেন, মর্ত্য মানব অমর নারীতে আসক্ত হইলেও অমরী কখনও মানুষকে হৃদয় দান করে না, হাব-ভাবে ভুলায় মাত্র।

পুরূরবা বলিলেন, তবু তুমি আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছ। তোমাতে যে সন্তান রহিয়াছে সে জন্ম গ্রহণ করুক, তখন যাইও।

উর্বশী উত্তর করিলেন, বৃথা অনুনয় করিও না। মূর্খ, ফিরিয়া যাও।

পুরূরবা বলিলেন, ফিরিয়াই যাইবে, 'পরাবতংপরমাং গন্তবা উ'—যাইবে চির দূরের দেশে; সে মরিবে, তাহার দেহ হইবে বৃকের ভক্ষ্য।

উর্বশী কহিলেন, পুরূরবা, মরিও না, মনে রাখিও, স্ত্রীদের সখ্য নাই, তাহাদের হৃদয় শৃগালের মত :

> ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
> সালাবৃকাণাং হৃদয়ানি এতা ॥ [ঋ. ১০. ৯৫. ১৫]

পুরূরবা বলিলেন, ওগো আকাশকামিনি, তোমাকে তবু অনুনয় করি, নিবৃত্ত হও, আমার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইতেছে—'নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে'—[ঋ. ১০. ৯৫. ১৭]।

আঠারটি শ্লোকের সমষ্টি এই সংলাপ, শেষ শ্লোকটি দেবগণের সান্ত্বনা-বাক্য। পুরূরবা উর্বশীকে ফিরিয়া পান নাই। বিরহের সন্তাপ-বেদনা লইয়া সংবাদের পরিসমাপ্তি। কারুণ্যে ও প্রেমের আকুলতায় সূক্তটি একটি সুন্দর নাট্যকাব্য।

এই প্রকারের নাটকীয় উপাদান ব্রাহ্মণ-আরণ্যকেও দুর্লভ নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ইন্দ্র-রোহিত সংবাদ বা কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; নাটকীয় দ্বন্দ্বের দিক হইতে না হউক, জীবন-কেন্দ্রিক সংলাপের দিক হইতে বৈদিক সাহিত্যের সংলাপগুলির মূল্য অপরিসীম।

ভারতীয় ছন্দ-শাস্ত্রেও বৈদিক ছন্দের দান অল্প নয়। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক গায়ত্রী-উষ্ণিগাদি ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দটি প্রচুর পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলির প্রধান ছন্দ অনুষ্টুপ্। আদিকবি বাল্মীকির 'মা নিষাদ' শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দই লৌকিক ছন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল [দ্রষ্টব্য উত্তর রাম চরিত নাটক, ২য় অঙ্ক]। বৈদিক ছন্দ অক্ষর-সংখ্যাত, সংস্কৃত ছন্দও প্রধানতঃ অক্ষর সংখ্যাত; পার্থক্য এই যে, সংস্কৃতে অক্ষরের লঘু-গুরু বিচার ছিল, বেদে উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরের।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি নির্ঝর 'সামবেদ'।

(iv) বৈদিক সূক্তের কবিত্ব

কবিতার দিক হইতে বৈদিক সূক্তাবলীর একটি স্বকীয় মূল্য আছে। গভীর অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবে, কোন কোন সূক্ত বা সূক্তের কোন কোন অংশ এক একটি নিটোল গীতিকবিতা ['Pearls of lyric poetry'—Winternitz]। অধিকাংশ স্তোত্রই স্তুতিমিশ্রা প্রার্থনা। এই প্রার্থনার অংশেই অনুভূতির অভিব্যক্তি। ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য ধন চাই, অন্ন চাই, ভোগ্য চাই—ভোগ্য ভোগ করিবার জন্য শতায়ু চাই, বীর্য চাই, স্বাস্থ্য চাই। বৈদিক মন্ত্রাবলীতে এই কামনা অন্তহীন। 'দেহি-দেহি' রবে ঋষিকণ্ঠ সোচ্চার। কামনা ছোট, নিতান্তই ঐহিক—কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশের সাবল্য নগ্ন শিশুর মতই মনোহর। রক্ষা-প্রার্থনায় কম্প্রকণ্ঠের করুণ ধ্বনি যে-কোন হৃদয়কে স্পর্শ করে। 'মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়', 'যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ', 'মা নঃ প্রিয়া স্তন্বো রুদ্র রীরিষ', 'মা মা হিংসীঃ' প্রভৃতি ধ্বনি বড় করুণ। ইহারই সঙ্গে আছে শান্তি, সৌমনস্য ও সৌভ্রাত্রের প্রার্থনা। উদার হৃদয়ের এই উদার প্রার্থনা মানবতার একাদর্শ। 'শং নো দিব্যাঃ পার্থিবঃ শং নো অপ্যা', 'সু গা ঋতস্য পন্থাঃ', 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম', 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্', 'সং বো মনাংসি সংব্রতা', 'সমানী প্রপা সহ বোন্নভাগঃ'—প্রভৃতি প্রার্থনা চিরকালীন সাম্য ও শান্তির কামনায় পূর্ণ। আর্ষ প্রার্থনা আরও উদার, আরও উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনায়। সংখ্যায় অল্প হইলেও মন্ত্রের ব্যঞ্জনা মর্ম-প্রসারী, যেমন,

১. উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥ [ঋ. ১. ৫০. ১০]

—তমসার পরে জ্যোতি দর্শন করিতে করিতে দেবলোকে সূর্য দেবতা, তাহারও উপরে উত্তম জ্যোতির্লোকে গমন করিব।

২. যত্র আনন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥ [ঋ. ৯. ১১৩. ১১]

—যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ—যেখানে সকল কামনা পূর্ণকাম—সেইখানে আমাকে লইয়া অমৃতময় কর।

বৈদিক ঋষির প্রকৃতি-দৃষ্টি অনন্য সাধারণ। এই প্রকৃতি বর্ণনা ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব। পরবর্তীকালের কবিগণ আর্ষ অঞ্জন পরিয়াই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দেবসত্তা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহারা ভূলোকে দেখিয়াছিলেন সিন্ধু-সরিতে আপদেবতার লীলা, অরণ্যানির সৌন্দর্য—দ্যুলোকে দেখিয়াছিলেন সূর্য-চন্দ্রের গতি, কালের আবর্তন,

রাত্রি ও উষার অভ্যুদয়—অন্তরিক্ষে দেখিয়াছিলেন মেঘের খেলা, বৃষ্টির ধারাপতন, বিদ্যুতের প্রদীপ্ত বিকাশ, মরুৎ-মাতরিশ্বার হাহাশ্বাস। বেদের নিসর্গ-সূক্তাবলী অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত। প্রকৃতির মধ্যে জোর করিয়া প্রাণ আরোপ করিতে হয় নাই, লীলা চঞ্চল সুন্দরী প্রকৃতির ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বৈদিক কবি 'অপৃথগ্‌যত্নে' সমাসোক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃতির জগতকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা মর্ত্য জগতের অনুরূপ আর একটি হাসি-কান্নার, প্রেম-সোহাগের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—সেখানে দ্যাবাপৃথিবী আদি জনক-জননী, রুদ্র-রোদসী পতি-পত্নী, রাত্রি ও উষা দুই দ্যুলোক দুহিতা, দুই ভগ্নী, উষা সূর্য প্রিয়া, বিষ্ণু 'ইন্দ্রস্য যুজ্যো সখা', অশ্বিদ্বয় সূর্যের সারথী। শোভনহনু বজ্রহস্ত ইন্দ্র এই জগতের রাজা; তিনি শত্রুহা, বুদ্ধিমান্; তাঁহারও গৃহ আছে, কল্যাণী জায়া আছে ['কল্যাণী জায়া সুরাণাং গৃহে তে'-ঋ. ৩. ৫৩. ৬]। বরুণ এই জগতের সত্যানৃতের দ্রষ্টা। রূপবান্ অশ্বিদ্বয় উহার বৈদ্য ['ভিষজা']। এখানেও যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, জয়-পরাজয় আছে। পিতা কন্যার বিবাহে প্রচুর ব্যয় করেন, কুমারী কন্যা বিবাহের পর সুমঙ্গলী বধূরূপে পতিগৃহে পদার্পণ করেন [দ্রষ্টব্য সূর্যা-সূক্ত]। বৈদিক ঋষির কল্পনা অবারিত হয় উদ্যৎ-ভানুর উদয়ে, সবিস্ময়ে তাঁহারা বলিয়া উঠেন, 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্'। 'আয়তী রাত্রি'র আবির্ভাব আর এক বিস্ময়। ঋষির সৌন্দর্য-চেতনার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে আকাশ-কন্যা উষার রূপাঙ্কনে।[১] জ্যোতির্ময় প্রভাতের সূচনা করিয়া উষা আবির্ভূতা হন: তিনি 'সূনরী' (সুন্দরী), 'যুবতিঃ শুক্রবাসা' (শ্বেতবসনা যৌবনবতী), 'ভাস্বতী নেত্রী' (দীপ্তিমতী নায়িকা), 'সূর্যস্য যোষা' (সূর্য প্রিয়া)। এই নায়িকার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি বাসিষ্ঠ সূক্তে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে: কবিত্বের দিক হইতে ইহা অনুপম:

> উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা
> বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ।
> অভূদগ্নি সমিধে মানুষাণাম্
> অকর্জ্যোতি র্বাধমানা তমাংসি ॥
> বিশ্বং প্রতীচী সপ্রথা উদস্থাৎ
> রুশদ্বাসো বিভ্রতী শুক্রমশ্বৈৎ।

১. The hymus which are addressed to these divinities, the two Asvins and to Ushas (The Dawn), at least those which salute the arrival of the latter, do not spring from devotion alone, but are the product of a deep poetical feeling, and a delicate imaginative power [Original Sans. Texts. Vol V—Muir]

হিরণ্যবর্ণা সুদৃশীক সংদৃক্
গবাং মাতা নেত্রী অহ্নামরোচি॥ [ঋ. ৭. ৭৭. ১-২]

—যৌবনবতী নারী সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছেন। বিশ্বলোক জাগিয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞার্থে অগ্নি সমিদ্ধ হইয়াছেন। (উষা) প্রকাশ করিতেছেন অন্ধকার-নাশা জ্যোতি।

দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বের অভিমুখে উষা আসিতেছেন। দীপ্ত বসন হইতে শুক্রজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। শোভা পাইতেছেন হিরণ্যবর্ণা আনন্দদায়িনী লোকমাতা দিবসের নেত্রী (উষা)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ঋষিদের পৃথিবী-প্রেম। অরণ্য-বনস্পতি-ওষধি-পর্বত-মৃত্তিকা মণ্ডিতা পৃথিবী 'মাতা'। বসুন্ধরা আদি জননী—এ কল্পনা বৈদিক। মায়ের স্নেহধারায় পুষ্ট কবি শুধু পৃথিবীর সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া ধন্য হন নাই, মাতৃ-মমত্বের গভীরতাও অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা ধরণীর ধূলিকেও বলিয়াছেন, 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম ও মর্ত্য-মমতার আদি গঙ্গোত্রী বেদ-উপনিষৎ।

(v) বৈদিক সাহিত্যে অলঙ্কার

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, ঋষিগণ দ্রষ্টা বা স্মর্তা। দৈবশক্তির প্রেরণায় ঋষিগণের মাধ্যমে যে মন্ত্রগুলি প্রকাশিত হইত, তাহা ছন্দস্পন্দিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিত। এইজন্য ঋষিকে বলা হইত 'মন্ত্রকৃৎ' বা 'শ্লোককৃৎ'। এই মণ্ডনকলা ছিল স্বভাবসিদ্ধ, অর্থাৎ উহা 'অপৃথগ্‌যত্নে' নিবর্তিত। সাহিত্যে সুন্দরের প্রকাশ বা অলঙ্করণের প্রয়াস ঠিক কোন্ সূত্র ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হয়তো মানুষের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা ইহার অন্যতম কারণ। বৈদিক সাহিত্যেও সৌন্দর্য-নির্মাণের প্রেরণা বাহিরের কোন অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া আসে নাই। এখানেও প্রচুর অলঙ্কৃত বাক্য রহিয়াছে। রহিয়াছে প্রৌঢ়োক্তি, রহিয়াছে ভঙ্গিমাময় উক্তি-বৈচিত্র্য; কিন্তু সেগুলি অনুভবের সহজাত। প্রকৃতির রাজ্যে লালিতা বনবালাকে কেহ বনফুলে সজ্জিত হইতে নির্দেশ দেয় না, কিন্তু সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে বনকন্যা কর্ণে পুষ্পমঞ্জরি গুঁজিয়া দিয়াছে, কণ্ঠে পরিয়া আসিতেছে বনফুলের মালা। অলঙ্করণ-প্রবৃত্তি সহজাত। এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-এষণারই প্রকাশ ঘটিয়াছে বৈদিক সংহিতার সু-উক্ত সূক্তাবলীতে।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে কতকগুলি শ্রুতিমধুর সুনির্বাচিত শব্দ ও সুললিত বিশেষণ বা আরোপিত গুণ বা ধর্ম। দেব-দেবতা অথবা যে কোন বস্তুই হউক, তাহা

নিছক বস্তু মাত্র নয়, তাহা বিশেষিত বস্তু। অগ্নি শুধু অগ্নি নহেন, তিনি 'ঘৃতযোনি', 'ধূমকেতু', 'শুক্রশোচি' (শুভ্র জ্যোতির্ময়), 'চিত্র-ভানু' (দর্শনীয় দীপ্তি); তেমনই জল 'বার্ষিকী' (বর্ষণকারিণী), 'রেবতী' (প্লাবমানা), 'পাবকা' (পবিত্রকারিণী)। সূর্য 'বিশ্বচক্ষু', 'দূরদৃক্', মরুৎগণ 'শুক্রজ্যোতি' (শুদ্ধতেজা), 'চিত্রজ্যোতি' (দর্শনীয় দীপ্তি), 'সত্যজ্যোতি', 'ঋতপা' (যজ্ঞপাতা) [শু. য. ১৭. ৮০]—উষা 'সুনরী' (শোভনা রমনী), 'শুক্রবাসা' (শুক্লবসনা)—সোম 'পবমান' (পবিত্রকারক)—আর পৃথিবী 'মধুমতী', 'মধুদুঘা', 'ঘৃতবতী', 'অগ্নিবাসা'। দেবগণের মধ্যে কেহ 'সুক্ষত্র' (বলবান), কেহ 'অসুর' (অমেয় প্রাণশক্তি সম্পন্ন), কেহ 'মায়ী' (অলৌকিক মায়া-শক্তির অধিকারী); দেবীগণের মধ্যে কেহ 'ঋতাবরী' (সত্যবতী), 'বিভাবরী' (দীপ্তিমতী), 'সুনৃতবতী', 'পাবকা', 'বাজিনীবতী' (অন্নশালিনী)—সকলেই 'সুভগা'। একমাত্র নির্ঋতি ইহার ব্যতিক্রম, তিনি পাপদেবতা।

এই বিশেষণ বা আরোপিত ধর্মগুলি শুধু বিশিষ্ট নয়, সুন্দর। মনে হয়, ভাষায় রূপ-রচনায় বিশেষিত শব্দের প্রয়োগই অলঙ্করণের প্রথম স্তর। প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা বিশেষিত শব্দগুলির মধ্যেই প্রথম আত্ম প্রকাশ করে। অবশ্য বিশেষণ-প্রয়োগের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। যখন সৌন্দর্য-এষণা সচেতন হয়, তখন সুনির্বাচিত বিশেষণ কবি-প্রতিভার প্রৌঢ়ত্বও সূচনা করিয়া থাকে; তখন বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া বিশেষণ ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া উঠে। বৈদিক সূক্তের বিশেষণগুলি প্রথম স্তরের। প্রত্যক্ষ রূপই ঋষিদের নয়নে রূপাঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে, বিশেষণগুলি বাচ্যার্থের পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অভিধেয় অর্থকেই প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই বিশেষণ বাক্-প্রৌঢ়ির সুন্দর নিদর্শন। এগুলি আর্ষজগতের নিজস্ব সম্পদ। পরবর্তী সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ দেখা যায় না।

কেবল বিশেষিত শব্দ নয়, বৈদিক সাহিত্যে অন্যান্য প্রসাধন-কলাও লক্ষণীয়। এখানে দেবগণই শুধু 'অরঙ্কৃত' (অলংকৃত) নহেন, বাক্যও অরঙ্কৃত। যাস্ক মুনি তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থপাদে বৈদিক অলঙ্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় 'উপমা'। বৈদিক সাহিত্যে 'উপমা' বা ঔপম্যগর্ভ বাচনই প্রধান অলঙ্কার। শুধু বৈদিক সাহিত্য কেন, ভাষায় মানুষের আদি সৃষ্টি 'উপমা'। সাদৃশ্যবোধ মানব মনের একটি সহজাত পুরাতনী বৃত্তি। বক্তব্যকে স্পষ্ট করিবার জন্য, সমর্থন করিবার জন্য বা সুন্দর করিবার জন্য কথায়-বার্তায় বা কবি-কর্মে উপমা-দৃষ্টান্তের প্রয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নয়। যাস্ক মুনি দেখাইয়াছেন, সাদৃশ্য-বাচক 'বৎ',

'বর্ণ', বা 'রূপ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর উপমা সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেমন 'ঘৃতবৎ হবিঃ', 'হিরণ্যবর্ণা' উষা, 'শুক্রবর্ণ' অগ্নি ইত্যাদি।

উপমা-সৃষ্টির কৌশল যাহাই হউক, এই সকল উপমার বৈচিত্র্য অসাধারণ। উপমান-চয়নে ঋষি-দৃষ্টি ভূলোক-দ্যুলোক সঞ্চারী। ভূলোক-সম্পৎ বর্ণনা করিতে আসিয়াছে দ্যুলোক-অন্তরিক্ষের উপমান, আবার দ্যুলোক-অন্তরিক্ষের বর্ণনায় আসিয়াছে মাটির কল্পনা। উর্বশী মর্ত্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, 'উষসামগ্রিয়েব'—আদি উষার মত, তিনি বায়ুর ন্যায় দুষ্প্রাপ্য 'দুরাপনা বাত ইব' [ঋ. ১০. ৯৫]; অগ্নি হইতেছেন অন্তরিক্ষলোকের সুদক্ষ দূত ['সুদক্ষমন্তর্দূতং রোদসী'—ঋ. ৭. ২. ৩]; আকাশ-মেঘের ন্যায় তাঁহার গর্জন ['অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ'—ঋ. ১০. ৪৫. ৪]; সুরগণ বিষ্ণুর পরম পদকে দেখেন 'দিবীব চক্ষুরাততম্'—আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়। আবার আকাশ-অন্তরিক্ষের বর্ণনায় মাটির পৃথিবীর তুলনা: রুদ্র হইতেছেন 'দিবো বরাহঃ'—আকাশ-বরাহ, ইন্দ্র হইতেছেন অন্তরিক্ষের 'বৃষভ'—তিনি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত, সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

বৈদিক উপমা প্রায়শঃ সমাসোক্তি বা অন্যারোপাশ্রিত; অথবা বলা যায়, ইহা উপমার আর এক দিক, অর্থাৎ 'প্রতীপ' (Inverted simile)। বৈদিক দেবতা প্রাকৃতিক সত্তা। এইজন্য প্রসিদ্ধ উপমানগুলিই এখানে উপমেয়, আর প্রসিদ্ধ উপমেয়গুলি উপমান। ফলে প্রাকৃতিক দেবজগতে মর্ত্যলোকের কলরোল। ধর্মে, কর্মে, গুণে, আচারে-আচরণে প্রকৃতি মানুষের অনুরূপ। আপ দেবতা এখানে জলধারা বর্ষণ করেন তেমনই ভাবে, প্রীতিযুক্তা মাতৃগণ যেমন সন্তানকে স্তন্যপান করান ['উশতীরিব মাতরঃ'—ঋ. ১০. ৯. ২]; সূর্য দ্যোতনশীলা উষার পশ্চাতে গমন করেন তেমনই ভাবে, মর্ত্যনায়ক যেমন গমন করে নারীর পশ্চাতে ['সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ'—ঋ. ১. ১১৫. ২]; পুত্রের প্রতি পিতার মত সোমদেব অনুকূল হউন ['পিতেব সূনবে বি বো মদে মৃড়'—ঋ. ১০. ২৫. ৩]।

উপমা প্রয়োগে এই বিপরীত রীতির মধ্যে ঋষিদের বস্তুদৃষ্টির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঋষি-দৃষ্টি যেমন অবাধে বিচরণ করিয়াছে প্রকৃতি-জগতে, তেমনই বিচরণ করিয়াছে প্রাকৃত জগতে। প্রাকৃত জগতের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ বৈদিক উপমা। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জায়া, পতির সম্পর্ক তো বটেই, পার্থিব জগতের অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জীবন-দৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম ঘটনাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়েই আর্ষ উপমার অবতারণা, কিন্তু ইহারই মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রস্ফুট হইয়াছে বস্তু-দর্শনের সৌন্দর্য। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল:

১. অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্তি অক্তুভিঃ ঋ. ১. ৫০. ২০

—সূর্যরশ্মির সম্মুখে নক্ষত্রগুলি চোরের মত পলায়ন করে।

২. উত স্ম এনং বস্ত্রমথিং ন তায়ুম্

অনুক্রোশন্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু।—ঋ. ৪. ৩৮. ৫.

—বস্ত্রাপহারী তস্করকে দেখিয়া লোকে যেমন চিৎকার করে, তেমনই (দধিক্রাকে) দেখিয়া লোকে চিৎকার করে।

৩. পব্যেব রাজন্ অঘশংসমজর

নীচা নি বৃশ্চা বনিনং ন তেজসা। ঋ. ৬. ৮. ৫.

—(হে অগ্নি) দুষ্কৃতকারীকে বিদ্যুতাহত বৃক্ষের ন্যায় পাতিত কর।

৪. ধন্বন্নিব প্রপা অসি অগ্নে—ঋ. ১০. ৪. ১.

—হে অগ্নি তুমি মরুভূমির জলের ন্যায়।

৫. ব্রহ্মণস্পতি এতাসং কর্মার ইবাধমৎ—ঋ. ১০. ৭২. ১.

—ব্রহ্মণস্পতি ইহাদিগকে কর্মকারের ন্যায় গড়িয়াছেন।

৬. স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্ম্যং—শু. য. ১৫. ২৫.

—আকাশে আদিত্যের ন্যায় অগ্নিতে অর্পিত (স্বরাদিবিশিষ্ট) স্তুতি।

৭. মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে—শু. য. ২৯. ৪১.

—মাতা যেমন পুত্রকে উৎসঙ্গে ধারণ করেন (তেমনই ধনু শরকে কোলে নেয়)

৮. অভি ত্বা শূর নোনুমঃ অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ—শু. য. ২৭. ৩৫.

—হে শূর (ইন্দ্র), অদুগ্ধা গাভী যেমন বৎসের নিকট নমিত হয়, তেমনই তোমার নিকট নমিত হইতেছি।

৯. অহিরিব ভোগৈঃ পর্যতে বাহুং—শু. য. ২৯. ৫১.

—সাপ যেমন ফণা ঘুরায় (শস্ত্রধারী তেমনই) বাহু নাচায়

১০. ইহ ইমৌ ইন্দ্র সংনুদ চক্রবাকেব দম্পতী—অ. ১৪. ২. ৬৪.

—হে ইন্দ্র, এই দম্পতীকে চক্রবাকের ন্যায় প্রেরিত কর।

উপমা কোথাও কৌতুক-দীপ্ত, কোথাও গম্ভীর। স্তুতি ভিক্ষুনীর মত অন্ন ভিক্ষা করে [ঋ. ৪. ৪১. ৫], সংবৎসর শয়ান থাকিয়া বৃষ্টি পাইয়া ভেকগুলি ব্রাহ্মণের মত বেদ পাঠ করিতে থাকে [ঋ. ৭. ১০৩], সায়ংকালে মনে হয়, অরণ্য চিৎকার করিতেছে [ঋ. ১০. ১৪৬] প্রভৃতি উপমায় লঘুচপল কৌতুক; আবার কোথাও উপমায় মহাসাগরের বিপুল গাম্ভীর্য। যেমন ঋষি বসিষ্ঠের এই সুগম্ভীর-মালা উপমা:

সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ॥ [ঋ. ৭. ৩৩. ৮]
—হে বাসিষ্ঠগণ, তোমাদের স্তব সূর্যের জ্যোতির ন্যায়; তাহার মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং বায়ু-বেগের ন্যায় অন্যের দুরধিগম্য।

(vi) বেদের সূক্তি

বৈদিক স্তুতির এক নাম 'সূক্ত' (=সু+উক্ত); বেদ সু-উক্তির সমষ্টি। কিন্তু যে প্রচলিত অর্থে 'সূক্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বেদের সকল উক্তিই সেরূপ নয়। সুভাষিতাবলীরও প্রকার ভেদ আছে। কোন কোন সুভাষিত কালের কপোলে অক্ষয় তিলক; মানুষ প্রবাদে-প্রবচনে সেগুলি ধরিয়া রাখে। সেগুলি চিরন্তন সত্যের প্রতীক। পূর্ব পুরুষদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সত্যের বাহন এই সকল সূক্তির সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য—মূল্য সত্য বিশ্লেষণের দিক হইতে, জ্ঞানের গভীরতা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দিক হইতে। নিম্নে কয়েকটি বৈদিক সূক্তির দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল:

১. তরণি ইৎ জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি
ন দেবাসঃ কবত্নবে। [ঋ. ৭. ৩২. ৯]

—ত্বরিৎকর্মা ব্যক্তিই জয়লাভ করে, বাসস্থান পায় ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতকর্মা ব্যক্তির দেবতা নাই।

২. ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি [ঋ. ৮. ২. ১৮]

—ক্রিয়াবান্‌কেই দেবতা কামনা করেন। স্বপ্নালুকে নয়।

৩. অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হি অপ্রাট্
স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদা অনুশিষ্টঃ।
এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত
স্রুতিং বিন্দতি অঞ্জসীনাম্॥ [ঋ ১০. ৩২. ৭]

—অক্ষেত্রবিদ্ ক্ষেত্রবিদ্‌কে জানিয়া ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ দ্বারা গন্তব্য পথ লাভ করা যায়।

৪. ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চ ন জীবতি [ঋ. ১০. ৩৩. ৯]

—শতায়ু থাকিলেও দেবগণকে অতিক্রম করিয়া কেহ চিরকাল বাঁচে না।

৫. (i) যুবানং সন্তং পলিতং জগার।
(ii) অদ্য মমার স হ্যঃ সমানঃ। [ঋ: ১০. ৫৫. ৫]

—যুবা বৃদ্ধ হয়। কাল যে জীবিত, আজ সে মৃত।

৬. (i) ন বৈ উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্ বধং দদুঃ।

—দেবগণ ক্ষুধায় মরিবার বিধান দেন নাই।

(ii) ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে।

—যে বন্ধুকে দান করেনা, সে বন্ধু নয়।

(iii) ও হি বর্তন্তে রথ্যা ইব চক্রা অন্যমন্যমুপতিষ্ঠন্ত রায়ঃ।

—রথচক্রের মত ধন আবর্তিত হয়; আজ সে একজনের, কাল সে অপরের।

(iv) সমৌ চিদ্ হস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ
সম্মাতরা চিদ্ সমং ন দুহাতে।
যমশ্চিদ্ ন সমা বীর্যাণি
জ্ঞাতি চিৎ সন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ॥

—দুই হাত সমান হইলেও সমান কাজ করে না, দুইটি গাভী এক মায়ের শিশু হইলেও সমান দুধ দেয় না, যমজ হইলেও দুইজনের একপ্রকার শক্তি হয় না, জ্ঞাতিরাও সকলে সমান দাতা হয় না [ঋ. ১০. ১১৭]

৭. শ্রদ্ধযা দেবো দৈবতমশ্নুতে
শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা লোকস্য দেবী। [তৈ. ব্রা. ৩. ১২]

—শ্রদ্ধা দ্বারা দেবতার দেবত্ব; শ্রদ্ধা দেবীই লোকের প্রতিষ্ঠা।

৮. দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে [শু. য. ১৯. ৩০]

—দক্ষিণা (দান) শ্রদ্ধাকে (আস্তিক্যবুদ্ধি) লাভ করে, শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য লাভ হয়।

৯. ঋতং সত্যম্ অমৃতং সত্যম্ [শু. য. ১১. ৪৭]

—যজ্ঞ সত্য, আর সত্য অমৃত।

১০. প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ [অ. ১১. ৬. ১৫]—প্রাণেই সকল কিছু প্রতিষ্ঠিত।

১১. (i) ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি

—ব্রহ্মচর্য তপ দ্বারা রাজা রাষ্ট্র রক্ষা করেন।

(ii) ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।

—ব্রহ্মচর্যদ্বারা কন্যা যুবা পতি লাভ করে। [অ. ১১. ৭. ১৭, ১৮]

শুধু সংহিতা নয়, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদও সূক্তি-সাগর।

(vii) বৈদিক 'ব্রহ্মোত্ত'

উত্তরকালে যে সকল ধাঁধাঁ-প্রহেলিকা ও রহস্য-গভীর ছড়া লোকসাহিত্যের একাংশ জুড়িয়া আছে, তাহারও দৃষ্টান্ত মিলে বৈদিক 'ব্রহ্মোত্ত' শ্লোকগুলিতে। ব্রহ্মোত্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংবাদ।[১] এগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য তির্যক প্রশ্নের রহস্যময়তায় ও কূট প্রশ্নের সমাধানে। শ্লোকগুলি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর। যেমন,

১. প্রশ্ন: কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম্‌
আরম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্‌ বিশ্বকর্মা
বি দ্যামৌর্ণদ্‌ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥

—বিশ্বকর্মা যখন দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তাহার অধিষ্ঠান কি ছিল, আরম্ভ-কারণ কি ছিল, ক্রিয়াই বা কি ছিল?

উত্তর: বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ
দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ॥

—সর্বত চক্ষু, সর্বত-মুখ, সর্বত-বাহু, সর্বত-পাদ্‌ সেই এক সহায় দেব ধর্মাধর্ম নিমিত্ত কারণ ও ভূতাদিরূপ উপাদান করণের সংযোগে দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [ঋক্‌ ১০, ৮১, ২-৩]

২. প্রশ্ন: কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্‌ হিমস্য ভেষজং কিম্‌ আবপনং মহৎ॥

—কে একাকী চলেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন? শীতের ঔষধ কি? বিস্তীর্ণ বপন-স্থানই বা কি?

উত্তর: সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নি হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ॥

—সূর্য একাকী চলেন, চন্দ্র পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন; শীতের ঔষধ আগুন, আর ভূমি সুমহৎ বপন-স্থান।

১। 'উত্তর-প্রত্যুত্তরৈঃ পরস্পরং সংবাদঃ ব্রহ্মোত্তম্‌' [যজু টীকা ২৩. ৪৫—উব্বট.]

প্রশ্ন : কিং স্বিৎ সূর্য সমং জ্যোতিঃ কিং স্বিৎ সমুদ্রসমং সরঃ।
কিং স্বিৎ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ঃ কস্য মাত্রা ন বিদ্যতে॥

—সূর্যের মত জ্যোতি কাহার? সমুদ্রের মত বিস্তৃত কি? পৃথিবী হইতে কে বয়সে বড়? কাহার পরিমাণ নাই?

উত্তর : ব্রহ্ম সূর্য সমং জ্যোতি র্দ্যৌ সমুদ্র সমং সরঃ।
ইন্দ্রঃ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ গোস্তু মাত্রা ন বিদ্যতে॥

—ব্রহ্ম সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান্, আকাশ সমুদ্রের মত বিস্তৃত, ইন্দ্র পৃথিবী হইতে বর্ষীয়ান্, পৃথিবী বা গাভীর পরিমাণ নাই। [শু. য. ২৩. ৪৫-৪৮]

৩. প্রশ্ন : কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতোঽগ্নিরজায়ত।
কুত স্ত্বষ্টা সমভবৎ কুতো ধাতা অজায়ত॥

—ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিলেন? সোম কোথা হইতে জন্মিলেন? অগ্নি, ত্বষ্টা ও ধাতাই বা কোথা হইতে জন্মিলেন?

উত্তর : ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমোঽগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টু র্ধাতু র্ধাতা অজায়ত॥

—ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। ত্বষ্টা হইতে ত্বষ্টা এবং ধাতা হইতে ধাতা জন্মিয়াছেন।* [অ. ১১. ১০. ৮-৯]

৪. বৃহদারণ্যকোপনিষদেও এই ধরনের বহু 'ব্রহ্মোদ্য' আছে। তন্মধ্যে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদটি উল্লেখযোগ্য।

১১. বৈদিক সাহিত্য ও বাংলা

বঙ্গদেশ বহুদিন বেদ-বহির্ভূত দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। এদেশে ও এদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদ-বিরোধী জাতি বসবাস করিত। বৈদিক সাহিত্যে [ঐ. আ. ২. ১. ১. ৫] তাহারা 'বয়াংসি' নামে উল্লেখিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় প্রয়াগের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলিকে আর্যাবর্তের সীমার মধ্যে ধরা হয় নাই, বরং বেদাচার ভ্রষ্ট হওয়ায় অনেকে এদেশে নির্বাসিত হইয়াছেন, এরূপ উল্লেখ মহাভারতে [মহা. আদি. ১০৪] পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশে আর্যাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

আর্যাধিকার প্রসারিত হইলেও এদেশে বৈদিক ধর্মকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ফলে বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই

* । উত্তরের তাৎপর্য এই যে পূর্বকল্পের ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেই যথাক্রমে বর্তমানকল্পের ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে [তুঃ—'ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ' ঋ. ১০. ১৯০]

সীমাবদ্ধ ছিল। এদেশের ব্রাহ্মণগণ উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশে আসিলেই ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন, বেদ ভুলিয়া যাইতেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব অনুভূত হওয়ায় তাই বারবার কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছে। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর মতে রাজা আদিশূর খ্রীষ্টীয় ৭৫৩ অব্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বলেন, গৌড়াধিপ শ্যামলবর্মার সময় [১০৭৯ খ্রীঃ] যশোধর মিশ্র প্রমুখ বেদবিদ্যা ভূয়িষ্ঠ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন।

কুলমঞ্জরীর মত অবশ্য প্রমাণ-গ্রাহ্য নয়। গুপ্ত, বর্ম, পাল ও সেন রাজন্যবর্গের যে সকল তাম্রশাসন, শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে যে বেদচর্চা হইত না, এ মত সমর্থিত হয় না। দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর তাম্রশাসন-গুলি হইতে জানা যায়, গুপ্ত শাসনকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এদেশে 'অগ্নিহোত্র' ও 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের প্রথমে উত্তর-পূর্ব বঙ্গে বর্মরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ভাস্করবর্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, এদেশে কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদী, সামবেদী ও বাহ্বৃচ্য (ঋগ্বেদী) ব্রাহ্মণগণ বসবাস করিতেন। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধল গ্রামনিবাসী ভবদেব ভট্ট। তিনি বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

পালরাজাদের সময়েও এদেশে বেদচর্চা হইত। ধর্মপাল দেবের সময় বরেন্দ্র ভূমির করঞ্জগ্রামে 'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপদপ্রবীণাঃ...স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ'।[১] দেবপাল দেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি বেদ চতুষ্টয়ে পারদর্শী ছিলেন। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্র চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি পান করিয়া উদ্গীরণ করিতে পারিতেন। কেদার মিশ্রের পুত্র ভট্ট গুরব মিশ্র ছিলেন 'বেদার্থ চিন্তা পরায়ণ'।[২]

সেন রাজারাও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। বিজয় সেনের রাজ্ঞী বিলাসবতীর 'কনক তুলা পুরুষ দান' ও 'হেমাশ্বদান' যজ্ঞ ইতিহাস-বিশ্রুত। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদার্থ ও স্মৃতির ব্যাখ্যাকার বলিয়া খ্যাত। বল্লাল সেনের অপর সভাপণ্ডিত ছিলেন ভট্ট গুণবিষ্ণু। ইনি 'ছান্দোগ্য মন্ত্র ভাষ্যে'র রচয়িতা। লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ভট্ট 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থে যজুর্বেদীয় ক্রিয়া-কর্মের মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু দ্বাদশ শতকের পর হইতে বাংলাদেশে বেদচর্চার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতপ্রবর দুর্গা মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, 'ভক্তিরসের

১। চতুর্ভুজ-বিরচিত 'হরি চরিত'। ২। ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি।

উন্মাদনায় বা নব্য ন্যায়ের উদ্দীপনায় বা অন্য কোন কারণে এই সময়ে বেদবিদ্যার হ্রাস হইয়াছিল।'[১] দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কেবল স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে' এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির 'সামগ মন্ত্র ব্যাখ্যানে' ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী বেদ ভুলিয়াছে, বেদের দোহাই দিয়া শত শত কুসংস্কারের অধীন হইয়াছে। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে পণ্ডিত ছিলেন, টোলও ছিল—কিন্তু তাহাতে প্রধানত চর্চা হইয়াছে স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের। ঊনবিংশ শতকে বাংলার পুনর্জাগরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বর্গের 'Oriental Researches' সুপ্তিমগ্ন জাতির প্রাণে নব চেতনা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় কম্বুকণ্ঠে আহ্বান করিয়া দেশকে বেদ-মুখী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে আধুনিক কালে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যযুগ পর্যন্ত বঙ্গে বেদ-চর্চার কথা স্মরণ করিলে, একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গে বেদচর্চা ক্রিয়া-যাজক ব্রাহ্মণ এবং কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ক্রিয়াজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদের যে অংশ লইয়া চর্চা করিয়াছেন, তাহা সংহিতা নয়, কর্মকাণ্ড। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে 'বেদাধ্যায়ী' ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল প্রয়োগ-বিধানের মধ্যে। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারে অর্থাৎ পৌরোহিত্য কর্মে যে মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়, বাংলাদেশে তাহাই অর্থসহ বিচারিত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব'-প্রণেতা হলায়ুধ ইহা স্বীকার করিয়াছেন,

রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈরধ্যয়নং বিনা কিয়দেক বেদার্থস্য
যজ্ঞেতিকর্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে। [ব্রাহ্মণ সর্বস্ব]

হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বলেন, 'In Bengal, however, the Brahmanas never memorised even one of the Vedas. They memorized only such of the Mantras as were used in their religious performances, but insisted on knowing their meaning'[২]

'But insisted on knowing their meaning'—শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তিও প্রাচীন বঙ্গের বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতগণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আধুনিক কালের

১। প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য [হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড]
২। 'প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা' প্রবন্ধের পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত।

সাধারণ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একথা খাটে না। হিন্দুর জাতকর্মে উপনয়নে, বিবাহে, পূজাহোমে ও শ্রাদ্ধাদিতে যে সকল বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, কর্মী পুরোহিতগণের অনেকেই তাহাদের অর্থ জানেন না, যজমানও না বুঝিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাংলার জনসাধারণের জীবনে ও সাহিত্যে বেদের তেমন প্রভাব নাই। জনসাধারণ বেদের দোহাই দেয়, কিন্তু তাহারা বেদজ্ঞানশূন্য। যাঁহারা নিত্য সন্ধ্যামন্ত্রে বেদ উচ্চারণ করেন, তাঁহারাও অনেকেই না বুঝিয়াই তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

(২) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈদিক ভাব

বাংলা দেশের ধর্মে, সংস্কারে ও সাহিত্যে বহুযুগের বহুধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাবই গুরুতর। এই লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার মাধ্যমেই বৈদিক ভাব বাংলা দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

ক. দেব সত্তার একত্ব, এককত্ব ও বহুত্ব কল্পনায় বৈদিক ঋষিদের দেব-কল্পনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙালী কবি যখন ধুয়া ধরেন, 'ভেদ জনু ভেদ জনু যো হরি সো হর এক তনু' [কবিকঙ্কণ], কিংবা কবি যখন বলেন, 'যেই জন ভগবতী সেই বিষহরী' [বিজয় গুপ্ত], কিংবা শাক্ত কবি যখন গান করেন, 'অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী'—তখন দ্রষ্টা ঋষির অমর বাক্য 'একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' [ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬], কিংবা 'দেবানাং নামধা এক এব' [ঋ. ১০. ৮২. ৩] প্রভৃতির প্রতিধ্বনি কানে বাজে। অবশ্য দেবতা সম্পর্কে এ দেশবাসীর এই ধারণা বহুকাল পূর্বেই একটি স্থিরবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। শঙ্কর-রামানুজের দেশে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নূতন কিছু নয়।

খ. বাংলার কাব্য-সাহিত্যে শক্তি দেবীর যে রূপটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে বেদের 'দেবীসূক্ত', 'রাত্রিসূক্ত' বা 'পৃথিবী-সূক্তে'র প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা হয়। দেবীসূক্তের সর্বাত্মিকা দেব-জননীর মূর্তি তন্ত্র পুরাণের মধ্য দিয়া বাঙালীর শক্তিভাবনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। অথর্ব-বেদের 'ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন তু বর্চসা সংবিদানা' [অ. ৬. ৩৮]—এই ধ্রুবপদান্তক সূক্তটির প্রভাবও কম নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বেদের পৃথিবীসূক্তে বা দ্যাবা-পৃথিবীর যুক্ত স্তুতিতে কিংবা অরণ্যানীসূক্তে যে 'বসুধানী' 'বিশ্বম্ভরা', 'অকৃষিবলা', সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী কল্যাণময়ী রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাংলার মঙ্গল চণ্ডীর কল্যাণদায়িনী রূপটি তাহারই প্রকার ভেদ।[১]

১। দ্রষ্টব্য 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ. কেহ কেহ মনে করেন, বেদের 'বিষ্ণুর্গোপা' বৈষ্ণব সাহিত্যের গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন। ডঃ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্তের ভিতরেই 'বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি'।[১] এই শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীই নানাপ্রকার লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মিশ্রণে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাভাবময়ী রাধারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বাংলার দেবদেবীর সহিত বেদের এই যোগাযোগ কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ নয়। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও রাধা এতই স্বতন্ত্র, এতই পরিবর্তিত যে বৈদিক দেবতার সহিত তাহাদের সাদৃশ্য-কল্পনা গবেষণাগারেরই বিষয় মাত্র। বাঙালী কবি যদিও বেদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, 'যাহা লিখি বেদবিধি মতে'—উহা কথার কথা মাত্র। বাংলাকাব্য প্রকৃতপক্ষে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির বাহন, বেদমূল সংস্কার এখানে যেরূপে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাও লৌকিক বা পৌরাণিক।

ঘ. বাংলার বাউলদের 'মনের মানুষ' যে উপনিষদের 'যদয়মন্তরতর আত্মা'—এই সত্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ। বস্তুতঃ বাউলের অন্বেষ্টব্য মনের মানুষটির সহিত উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার মিল আছে। শুধু তাই নয়, উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাণীর সহিত বাউলিয়া ভাবেরও বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একদিন সুফীধর্মে উপনিষদের এই ভাব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাউল গানে উপনিষদের ভাব সুফীমতের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

শুধু মনের মানুষের ব্যাপারে-নয়, বাউল গানের সনাতন মানবধর্মের তত্ত্বটির সঙ্গেও মরমিয়া মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন,—বৈদিক সূক্তাবলী মরমিয়া ভাবে পূর্ণ।[২] 'পুরুষ সূক্ত হইল বাউলদের মূলমন্ত্র', 'বাউলিয়া মতের গোরখনাথী ধাঁধা যজুর্বেদেও প্রচুর আছে', 'অথর্ববেদে বাউলিয়া মতের অজস্র ধারার মূল উৎস ও ভাণ্ডাগারের পরিচয় পাই', 'বাউলদের কথা 'যা আছে ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে'—'অথর্বেরও সেই একই কথা'। —কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, বেদের এই সকল মত 'আর্যেতর সব মতবাদী'দের দান।

ঙ. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বৌদ্ধ চর্যাগানে, সহজিয়া সাহিত্যে কিংবা বাউল সঙ্গীতে শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে যে তির্যক সমালোচনাত্মক মনোভাব দৃষ্ট হয়, তাহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে[৩]। কিন্তু আনুষ্ঠানিক

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২। বাংলার বাউল—শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।

৩। Obscure Religious cults—Chap. III. Dr. S. B, Dasgupta.

ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাত্মক মনোভাবটিও বেদের নিজস্ব নয়। যে লোকায়ত চিন্তাধারা চিরকাল বেদাদিব বিরোধী—বাংলার সহজিয়া সঙ্গীতে তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। চার্বাক দর্শনে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের প্রতি অতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 'বেদবিধিপার' বা 'অবৈধী' ভক্তি বা আচারে বেদ অপেক্ষা এই লোকায়ত ভাবের প্রভাবই গুরুতর বলিয়া মনে হয়।

চ. এই প্রসঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি মন্ত্র—মনসামঙ্গলের 'বিষ ঝাড়ন মন্ত্র', ধর্মমঙ্গলেব 'নিচুটিমন্ত্র', চণ্ডীমঙ্গলের 'বশীকরণ' পদ্ধতি ও ধাঁধাঁ-প্রহেলিকা স্বভাবতই বৈদিক সংহিতার কতকগুলি মন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

১. মনসামঙ্গলের 'বিষ অপনয়ন মন্ত্র' গুলিতে বিষকে দূরে, তাহার জন্মস্থানে পাঠাইবার ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়,

যা রে কালকূটি বিষ অশেষ পাতাল ॥
যা বে কালকূটি বিষ শুন্যা আন্ত কথা ॥ [রসিক মিশ্র]

—বৈদিক মন্ত্রেও অনুরূপ ইঙ্গিত—

দূরে বিষমাসজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।
সো চিন্নু ন মবাতি নো বয়ং মবাম
আবে অস্য যোজনং হরিষ্টা মধুত্বা মধুলা চকার ॥ [ঋ. ১. ১৯১]

—সুরা ব্যবসায়ীর গৃহে চর্মপুটক নিক্ষেপ করার ন্যায় এই বিষকে দূরে প্রেরণ করি ; সে যেন না মরে, আমরা যেন না মরি। বিষ এখন যোজন যোজন দূরে—মধু তোমাকে মধুময় করিয়াছে।

বেদে যে-কোন বস্তুর মূল জানার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে ; 'য এবং বেদ', সেই জয়লাভ করে, অমর হয়, অভীষ্ট অর্জন করে—এই ধরনের কথায় 'ব্রাহ্মণ' পূর্ণ। দুর্নিমিত্ত দূর করার মন্ত্রেরও একই অভিপ্রায়, যেমন, নির্ঋতি-অপসারণের মন্ত্রে যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি—'যাং ত্বা জনোভূমিরিতি প্রমদন্তে নির্ঋতিং ত্বাহং পরিবেদ বিশ্বতঃ' [শু. য. ১২. ৬৪]—চতুর্দিকে নির্ঋতির যে সকল জন ও ভূমি প্রিয়, আমি তাহাদিগকে জানিয়াছি। ঠিক এই সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে, বাংলা বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রগুলিতে।

২. ঋগ্বেদ [ঋ. ৭. ৫৫] এবং অথর্ববেদে [অ. ৪. ৫] একটি নিঁছুটি মন্ত্র আছে, তাহাতে নিদ্রা-মায়া বিস্তারের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়,

সহস্র শৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেন সহস্যেন বয়ং নি জনান্ স্বাপয়ামসি ॥
প্রোষ্ঠেশয়া তল্পেশয়া নারী র্যাবহ্য শীবরী।

স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধয়স্তা সর্বা স্বাপয়ামসি ॥
য আস্তে যশ্চরতি যশ্চ তিষ্ঠন্ বিপশ্যতি।
তেষাং সংদধ্মো অক্ষীণি যথেদং হর্ম্যং তথা॥ [অ. ৭. ১. ৩. ৫]

—সহস্র শৃঙ্গ সূর্য যিনি সমুদ্র হইতে উদিত হন, শত্রুর অভিভবকারী
সেই সূর্যের দ্বারা আমরা জনগণকে নিদ্রামগ্ন করাইব।
পালঙ্কে শয়ানা, তল্পে শয়ানা, বাহ্যে শয়না নারী—যে নারী
পুণ্য গন্ধা, তাহাদিগকে নিদ্রামগ্ন করাইব।
যে বসিয়া আছে, যে চলিতেছে, যে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—দৃশ্যমান্
হর্ম্য যেমন দৃষ্টিশক্তিহীন, সেইরূপ আমরা তাহাদের চক্ষু নিমীলিত করাইব।

ঠিক এই ধরনের 'নিঁদুটি মন্ত্র' পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে। কালী-ভবানীর দোহাই থাকায় এই মন্ত্র যে তন্ত্রের মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট—তথাপি বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনিটি লক্ষণীয়:

ইন্দুর মৃত্তিকা বাছা আমি নিঁদে চোর।
ময়না নগরেতে লাগাও নিন্দ ঘোর॥
শয়নে যেজন থাকে বসে যেবা খায়।
কালীর দোহাই আছে আগে ধর তায়॥
দোকানী পসারী যেবা পথে ফেরী যায়।
দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড তায়॥
যুবতীর দুই চক্ষু ধর দৃঢ় করি।
মনের আগুনে বাতি জাগে প্রহর চারি॥ [অনাদিমঙ্গল—রামদাস]

ঙ. বেদে সপত্ন (শত্রু)-বিনাশের মন্ত্র আছে, সপত্নী বিনাশের মন্ত্রও আছে—বিশেষতঃ আছে স্ত্রী-বশীকরণ-মন্ত্র [অ. ৩. ২৫]। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রাহ্মণী লীলাবতীর সহায়তায় লহনার পতি-বশীকরণের মন্ত্রনা। বৈদিক মন্ত্রপদের সহিত উহার মিল না থাকিলেও, উদ্দেশ্যের দিক হইতে সাদৃশ্য আছে। লোক সাহিত্যেও [পূর্ববঙ্গ গীতিকা] এই প্রকারের প্রচুর মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়।

চ. প্রহেলিকা বা ধাঁধাঁর আদি উৎস কি, তাহা আজ গবেষণার বিষয়। বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ-প্রসঙ্গে বা তত্ত্ব-বিচার প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মোদ্য' জাতীয় প্রহেলিকার অবতারণা করা হইত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও প্রচুর ধাঁধাঁ আছে: চর্যাগীতিকার 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ [চর্যা. নং ২];

গোর্খনাথের প্রহেলী—'পুকুরেতে জল নাই পাড় কেনে বুড়ে। বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেনে উড়ে।'; কিংবা কবিকঙ্কণের:

বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।
না চলে সাবধি তার পসারিয়া পা॥
হিঁয়ালী প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরিক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথী॥[১]

এই সকল প্রহেলিকা অবশ্য লোক-জগতের মাধ্যমেই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। প্রহেলিকাকে আমরা লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের একটি উক্তি অবশ্যই স্মরণীয়: 'পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ'—দেবতাগণ পরোক্ষ-প্রিয়, প্রত্যক্ষ তাঁহাদের প্রিয় নয়। সাহিত্যের প্রহেলিকা কি সেই পরোক্ষ-প্রিয়তার ফল?

বৈদিক ভাবের সহিত এই প্রকারে কতকগুলি দিক হইতে সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রাচীন বাংলায় বেদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও লোকসংস্কৃতির ধারা ধরিয়া কিছু কিছু বৈদিক ভাব সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার একটি কাব্য-ধারায় বেদের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহা ধর্মঠাকুরবিষয়ক কাব্য—বিশেষতঃ ধর্মপূজাবিধানবিষয়ক কাব্য। 'ধর্মপূজা পদ্ধতি', 'শূন্য পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকৃতি অনেকটা বেদের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের অনুরূপ। ইহাতে একদিকে আছে 'বিধি', আর এক দিকে 'পুরাকাহিনী'। বাংলা গদ্যের ভঙ্গিও ব্রাহ্মণ-সদৃশ। যেমন,

'এক ফুলে কি হইল? সত্ত্ব রজতম ত্রিগুণ স্বজিল।
সেই ফুলে ধর্মের পূজন করিল। থাকিল
ধর্মের এক ফুল হইল দ্রুফুল।' [ধর্মপূজা বিধান]

এই ধর্মঠাকুর কে, তাহা লইয়া বিতর্কের অবসর আছে। তবে প্রায় সকলেই বৈদিক কোন-না-কোন দেবতার সহিত ইহার যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পণ্ডিতবর বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, ধর্ম সম্প্রদায় সুপ্রাচীন 'রোহিত' দেবতার উপাসক 'লৌহিত্য সম্প্রদায়'।[২] অথর্ববেদে 'রোহিত' একটি প্রধান দেবতা [অ. ১৩]। আচার্য সায়ণের মতে ইনি 'উদ্যৎ সূর্য'। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে যম ও বরুণ দুজনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন…তাঁর পূজায় কূর্মদেবতা-পূজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতা সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা। ধর্ম ঠাকুরও অনেকটা তাই।'[৩]

১। কবিকঙ্কণের এই হেঁয়ালিটির উত্তর 'মন'।
২। রামদাস আদকের অনাদি মঙ্গলের ভূমিকা—শ্রীবসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৩। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন।

বস্তুতঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুর যে রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাতে বৈদিক যম, বরুণ, সূর্য ও বিষ্ণুর রূপ-গুণের মিশ্রণ আছে।

ধর্মপূজা-বিধানে যে রুদ্র ও সূর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার মূলেও বেদের প্রভাব বিদ্যমান। বেদে রুদ্র ওষধিপতি; 'হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্যাণি' [ঋ. ১১৪. ৫]—হাতে শোভমান বরণীয় ভেষজ। শূন্য পুরাণে (বাংলা শিবায়নেও) রুদ্রের এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। শূন্য পুরাণের সূর্যস্তবেও বৈদিক সূর্য-সূক্তগুলির প্রভাব বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, ধর্মবিষয়ক কাব্যের সৃষ্টি বর্ণনায়—'নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্'—প্রভৃতিতে ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র ধ্বনি রহিয়াছে।

শূন্য পুরাণে ও ধর্মমঙ্গল কাব্যাদিতে হরিচন্দ্র-লুইচন্দ্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র-রোহিত কাহিনীরই প্রকারভেদ [ঐ. ব্রা. ৩৩]। বরুণ-যাগের অঙ্গীকার করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র রোহিত নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন: ধর্মমঙ্গলেও হরিচন্দ্র ধর্মের 'মাননা উপদেশ'—'পুত্র হলে লুইচন্দ্র নাম তার থুবে। প্রথমত ধর্মের সেবায় বলি দিবে ॥'—স্বীকার করিয়া পুত্র লাভ করিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে পৌরাণিক দাতাকর্ণের কাহিনীর সংযোগ ঘটিয়াছে।

ধর্মপূজা-বিধানে বৈদিক 'ব্রহ্মোদ্যে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক যজ্ঞে যেমন হোতা-অধ্বর্যু-উদ্গাতা-যজমানের উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক সংবাদ পরিবেশন করা হইত, ধর্মপূজা-বিধানেও সেইপ্রকার প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন। যেমন,

প্রশ্ন। বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।
কন্ মূর্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ ॥
কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড়।
শিঘ্রগতি কহিলাম চতুরালি ছাড় ॥

উত্তর। বাড়ি মোর বল্লুকার। পুজি শ্রী নৈরাকার।
শূন্য মূর্তি ধ্যান করি। সাকার মূর্তি ভজি ॥
পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি।
শিঘ্রগতি কহিলাঙ্ চতুরালি ছাড়ি ॥…

প্রশ্ন। দে নাঞি দেহারা নাঞি চালে নাঞি খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম নাঞি কাথে করিবে গড় ॥

উত্তর। দে আছে দেহারা আছে চালে আছে খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম আছেন তাঁথে করিব গড় ॥ [ধর্মপূজা বিধান]

মোটের উপর ধর্মমঙ্গলাদি কাব্য নানাদিক হইতে বৈদিক সংস্কারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ইহার কারণ, ধর্মপূজার আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ছিলেন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নহেন, গায়ত্রী-পতিত ব্রাত্য। কিন্তু আথর্বণ ব্রাত্যের মতই তাঁহার অপরিসীম প্রভাব।

(ii) আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বেদ

বৈদিক সাহিত্য এদেশে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নব্যযুগে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সুপ্তিমগ্ন জাতির মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। আত্মমর্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ বাঙালী সেদিন স্বদেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নূতন আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সমাচার দর্পণ প্রকাশিত খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের যথাযোগ্য মূল্য বিচার করিতে গিয়া যুগন্ধর রাজা রামমোহন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বকে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার' রচনা করিলেন, বাজসনেয় সংহিতা, তলবকার সংহিতা, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। বৈদিক কর্ম অপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন জ্ঞানের উপর। রামমোহনের এই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আবার বৈদিক কর্মকাণ্ডের সারবত্তা প্রচারে ব্রতী হইলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রাচ্যবিদ্যা লইয়া আলোচনা শুরু করিলেন। ইহাও জাতির অন্তরে নব প্রেরণা সঞ্চার করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন। ঋগ্বেদের অনুবাদে ইনিই প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। মহর্ষির প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। বেদ-উপনিষদ্ মন্থন করাইয়া সে যুগের ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র ও ধর্ম-নীতির সার সংগ্রহ করাইয়া তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম'-মন্ত্র সঙ্কলন করাইলেন। এই বৈদিক মন্ত্র কেবল ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট করে নাই, বাংলা সাহিত্যকে নানাদিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। চিন্তায় ও কর্মে, অতীতধারার আবিষ্কারে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে তখন বেদ-চর্চার এক অভিনব প্রেরণা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বেদের আলোচনা প্রকাশ করেন; সত্যব্রত সামশ্রমী শুক্ল যজুর্বেদের অনুবাদ করেন। রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য' ও 'ভারত রহস্য' গ্রন্থে ভারতীয় পিতৃ-পিতামহের মহিমা-স্মারক বেদ, যাগ-যজ্ঞ, ধনুর্বেদ ও সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কীর্তিও অবিনশ্বর। **Maxmuller** ও **Muir** প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বর্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ও সায়ণ-ভাষ্যের সহিত

সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও 'হিন্দুশাস্ত্র' নামে দুইখণ্ড পুঁথিতে তিনি ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র ও কল্পসূত্র প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্রের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদ বাঙালীর বেদ-চক্ষু। দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতা ও তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। মহেশচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা বাঙালীকে নূতন করিয়া বেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এইরূপে নব্যবাংলা একটি অবিচ্ছিন্ন সনাতন ধারার সহিত যুক্ত হয়।

অতীতের সহিত পরিচিত হওয়া এবং অতীত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া অতীতকে মর্মে গ্রহণ করা ঠিক এক কথা নয়। অতীত-অবগাহনের ফলে মনের আনন্দ ও স্ফূর্তি সম্পাদিত হয়, অতীত-গৌরববোধে হৃদয় উদ্দীপিত হয়—কিন্তু অতীতকে যতক্ষণ অন্তরে গ্রহণ করিতে না পারি, ততক্ষণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, জীবনেরও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বৈদিক সংস্কারকে মর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ও কৃতিত্ব তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের। হৃদয়ের ক্ষেত্রে বেদ-বীজ বপন করিয়া তাঁহারাই বেদ-পুষ্প-কাননের কুসুম-সৌরভ ও ফলিনী বৃক্ষের ঐশ্বর্য-বঙ্গবাসীকে বিতরণ করিয়াছেন। ঠাকুর বাড়ীর দান এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। রাজা রামমোহন বেদের ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তাহাতে বীজ বপন করিয়াছেন, আর সেই ক্ষেত্রে পুষ্পবতী ও ফলিনী হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতি। নব্যবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বেদপাদপ কাননের কুসুম-সৌরভ। তিনি কোন বিশেষ সংহিতা বা উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বেদোপনিষদের রসদৃষ্টি তাঁহার রচনায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিচিত্র ভাব-রস সৃষ্টি করিয়াছে।

৭। রবীন্দ্রনাথ ও বেদোপনিষৎ ॥

রবীন্দ্র-মানস গঠনে যে কয়টি উপাদান বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেদোপনিষৎ একটি। তিনি আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট ও পরিবর্ধিত। মহর্ষির সাহচর্য, গায়ত্রী-দীক্ষা, ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশ, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের নিয়মিত অনুশীলন ও ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণার তারে একটি মহনীয় ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ঝঙ্কারের প্রকাশ দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সঙ্গীতে প্রবন্ধে—কবির আদর্শ ভারতের কল্পনায়, কর্মপ্রেরণায়, শান্তিনিকেতনের আশ্রম গঠনে, শিক্ষার ব্যবস্থাপনায়, জীবন-দর্শনে, অধ্যাত্মচিন্তায়, প্রকৃতিদৃষ্টিতে, পৃথিবীপ্রেমে

ও বিশ্বাত্মানুভূতিতে। উপনিষদের ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনিই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বেশি এবং স্বভাবতই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের রসপুষ্ট, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, বৈদিক সংহিতার প্রভাবও রবীন্দ্রনাথে কম নয়। অবশ্য সংহিতা-সুরভীর ক্ষীর-নির্যাস উপনিষৎ: উপনিষৎ বেদ-জ্যোতি, উপনিষৎ সমগ্র শ্রুতির প্রতিনিধি। উপনিষদ্-দুগ্ধ মন্থন করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সূত্রে রবীন্দ্র-রচনায় উপনিষদ্-বাণীর অনুরণন বেশি উঠিয়াছে। কিন্তু ঋক্-সংহিতা ও অথর্ব সংহিতার সহিত তাঁহার যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ঋক্-মন্ত্র ও আথর্বণ মন্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপনে।[১] ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত', 'হিরণ্যগর্ভসূক্ত', 'মধুশ্লোক,, উষা সূক্তাবলী', অথর্ববেদের 'পুরুষসূক্ত', [অ. ১০. ২], ও 'পৃথিবীসূক্ত' [অ. ১২. ১] প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেও বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-দৃষ্টি ও পৃথিবীপ্রেমে প্রথমতঃ অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সংহিতার ঋষি-কবির প্রকৃতি-প্রেম ও মর্ত্য-মমতা।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতির আদি কবি বৈদিক সূক্তের দ্রষ্টা ঋষিগণ। বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ-লীলা, দেবভূমিকায় প্রকৃতি-জীবনে মানবীয় ভাবের বিচিত্র প্রকাশ তাঁহাদের নয়নেই প্রথম মোহাঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ রিক্থসূত্রে শৈশব হইতেই সেই প্রকৃতি-দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। উদয়সূর্যের সৌন্দর্য, মেঘের খেলা বর্ষার আবির্ভাব, ঝটিকার তাণ্ডব শিশু কবির মনে অজ্ঞাতসারে সেই বহু যুগাতীত বৈদিক ঋষির বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেছেন,

> When I look upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors, and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost Beyond. [The Religion of Man-chp VI]

তখন বোধের সহিত বুদ্ধির যোগ অস্পষ্ট। তখন শুধুই বিস্ময়, শুধুই জিজ্ঞাসা। কিন্তু এই অস্পষ্ট বোধ একদিন স্পষ্ট বুদ্ধির আলোকে ধরা দিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত ঋষি কবির অন্তরাত্মার যে যোগাযোগ, সেই একই যোগকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নি-বায়ু-সূর্য চন্দ্র-মেঘবিদ্যুতকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি

১. দ্রষ্টব্য 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'আত্মপরিচয়', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি

ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তর-বীণায় নব নব স্তব-সংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে' [আত্মপরিচয়]

উত্তরকালে তাই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা তিনি সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; সাম্ভ প্রকৃতি তাহার মনে অনন্তের গূঢ় ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুপর্যায়ের গানগুলিতে ও ঋতু বিষয়ক নাটকগুলিতে এই প্রবুদ্ধ উপলব্ধির স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীপ্রেমের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পৃথিবী বিশ্বপ্রকৃতির একটি বিশেষরূপ অথবা বলা যায়, ধরিত্রী-মাতা বিশ্বপ্রকৃতির সন্ততি। বৈদিক সংহিতায় দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টির আদি জনক-জননী ['দ্যাবা পৃথিবী জনিত্রী' 'দ্যৌষ্পিতা পৃথিবীমাতা']। মাতা পৃথিবী অনন্ত স্নেহের আধার ; সন্তানের জন্য তিনি 'বহুলা' 'গভীরা' 'ঘৃতবতী' 'পয়স্বতী'। স্নেহে প্রেমে তিনি 'বিশ্বম্ভরা'। ঋষি কবির এই সকল বিশেষণ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথেও অজ্ঞাতসারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে : তাঁহার দৃষ্টিতেও 'পৃথিবী জীবধাত্রী জননী'। গোপন অন্তঃপুরে নীরবে এই পৃথিবী 'ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে' [অহল্যার প্রতি] ; 'বহুলা' পৃথিবীর রূপ দেখি 'বসুন্ধরা' কবিতায়—পৃথিবী সথানে মরুময়ী, শৈলাবৃতা, মেরুদেশে কুমারী ব্রত ধারিণী, অটবীতে মহাভয়ঙ্করী। পৃথিবীর বহু বিচিত্র মাতৃমূর্তি চিত্রিত হইয়াছে অথর্ববেদের ভূমি সূক্তে। উত্তরকালে এই সূক্তটি রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবি যখন বলেন, 'আমি পৃথিবীর কবি'—তখন তাহা আথর্বণ ঋষির 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'র অবিকল প্রতিধ্বনির মত শুনায় ; আর 'পৃথিবী' কবিতার [পত্রপুট] 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী,' 'মেঘলোকে উধাও পৃথিবী' পংক্তিগুলি যেন ভূমিসূক্তেরই প্রতিলিপি। মধুশ্লোকের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় : 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'

শুধু পৃথিবীর রূপগুণের আকর্ষণ নয়, রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-প্রেমের বীজটিও যে বৈদিক সংহিতায়, রবীন্দ্রনাথই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন :

'একদিন আমি বলেছিলুম :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।

ঋগ্‌বেদের কবি বলছেন :

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ

পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।

জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম

অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিও প্রাণ, দিয়ো ভোগ,
উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।' [আত্মচরিত]

এই সুন্দর শ্লোকটি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৫৯ নং সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র। পৃথিবীকে ভালবাসা, এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গভীর আকুতি বৈদিক সংহিতার বহু মন্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। স্বর্গ-কামনা বা মুক্তি-কামনা বৈদিক সূক্তে অতি অল্প, অধিকাংশ স্তুতি পার্থিব কামনায় পূর্ণ। অন্ন, ধন, জন, ঋদ্ধি, বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় গ্রাম সহ শতায়ু ঋষির প্রার্থনায়। উপনিষদে ঠিক এ ধরনের কামনা নাই; সেখানে আছে' 'ন হি বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ' কিংবা 'যেনাহং নামৃতং স্যাম্ তেনাহং কিমু কুর্য্যাম'। রবীন্দ্রনাথের মর্ত্য-প্রেমে শ্রী-কাম ঋষির আকুতি। শৈশবের অবচেতন মনে যে কামনা অজ্ঞাতসারে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, 'মরিতে চাহিনা সুন্দর ভুবনে', জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেই একই কামনা তিনি জানাইয়া গিয়াছেন বিভিন্ন বাণীভঙ্গিতে। উত্তরকালে সেই কামনা সুদৃঢ় হইয়াছে যেন ঋষিসুলভ ভাষায়,

১. দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে। [আকাশ প্রদীপ]

২. আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও। [রোগ শয্যায়]

৩. শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে।' [আরোগ্য]

উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ আরও ঘনিষ্ঠ; এই যোগ বুদ্ধির নয়, উপলব্ধির। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 'উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক' [আত্মপরিচয়]। এই আবৃত্তি তাঁহার বোধের রাজ্যে প্রথমে অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে যে দৃঢ় আসন পাতিয়াছিল, রবীন্দ্র-জীবনে তাহার প্রভাব সুগভীর ও সুদূর প্রসারী। গায়ত্রী-দীক্ষার সময় হইতেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রের তাৎপর্য না বুঝিয়াও তিনি মনকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন 'মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম' [জীবন-স্মৃতি]।

সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল কুসংস্কার ও সকল হীন বন্ধন হইতে মনের ও জীবনের এই সম্প্রসারণ সাধন করাই উপনিষদের মূল লক্ষ্য। উপনিষৎ বলে, সকলের উপরে আছেন অদ্বিতীয় এক —'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ; যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও নিগূঢ় প্রয়োজনে শক্তি যোগে বহুবর্ণ বিধান করেন [য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি—শ্বেতঃ ৪. ১] ; যাঁহা হইতে নিখিল ভূত উৎপন্ন হয়, জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রলয়ে লয় প্রাপ্ত হয় [যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যস্মিন্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—তৈ. উঃ. ৩. ১] ; যিনি অগ্নিতে, জলে, অখিল ভুবনে ওষধিতে বনস্পতিতে অনুপ্রবিষ্ট [যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ-শ্বেত ২. ১৭], যিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বভূতেষু গূঢ়, 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। ইনি ব্রহ্ম ইনি পুরুষ, ইনি আত্মা—নিত্য, অক্ষয়, অক্ষর, ভূমা—একাধারে বৃহৎ ও অণু—মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্, তমসার পরপারে তিনিই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ, তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় নিখিল বিশ্ব [তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি শ্বেত ৬.১৪ ; কঠ. ২.২.১৫], তাঁহা হইতে নিঃসৃত বলিয়াই বিশ্বজগৎ প্রাণ-স্পন্দিত [যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ. ২.৩.২], তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন [ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ—কঠ. ২.৩.৩]। এই অক্ষয় পুরুষেই ওতপ্রোত বিশ্বসৃষ্টি। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ [সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈ. উ. ২. ১], তিনিই অমৃত ও অভয়। তিনি রসস্বরূপ, জীব এই রসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয় [রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—তৈ.উ.২.৭.]। তিনি আনন্দস্বরূপ—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। তিনিই প্রিয়তম—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা' [বৃঃ আ. ১. ৪. ৮]। এই যে মহৎ, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নিত্য, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন, রসঘন, আত্মা বা ব্রহ্ম ইহাকে জানাই উপনিষদের আদেশ। 'তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব', তাঁহাকে জানিলেই আনন্দে ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' [তৈ. উ. ২. ৪]; তাঁহাকে জানিলেই জিত মৃত্যুব্যথা—'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা [প্রশ্ন. ৬. ৬]; শুধু তাই নয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য অন্য কোন পথও নাই—'তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় [শ্বেত. ৩.৮]

উপনিষদের এই সকল মন্ত্র আবাল্য রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতেন। অন্তরের অবচেতন স্তরে মন্ত্র-ধ্বনি আন্দোলন-সৃষ্টি করিতে করিতে অবশেষে মর্মে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং পরিশেষে স্বকীয় মনন ও স্বীকরণের ফলে মন্ত্রের সত্য তাঁহাকে নব নব সত্য আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছিল। ভারতাত্মার মর্মসত্য উদ্ঘাটনে, আদর্শ

মানবধর্মের উপস্থাপনে, অধ্যাত্ম ভাবনায়, সৃষ্টির রসাস্বাদনে ও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করিয়াছেন। আর্ষবাণীর সহিত নিজের বাণীকে যুক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উপনিষদের রবীন্দ্রায়ন রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিত্ব, কবিধর্ম ও জীবন ধর্মের পথে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্ নন, লোকোত্তর ব্যক্তি—সাধক নন, কবি—সন্ন্যাসী নন, জীবন-প্রেমিক। মন্ত্র উপনিষদের, ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের—সত্য উপনিষদের, উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের—আদর্শ উপনিষদের, প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের। চৈতালির যুগ হইতেই আরণ্যক-উপনিষদের শান্ত তপোবন-শ্রীও প্রাচীন ঋষির আত্মসমাহিত সরল অনাড়ম্বর জীবন সচেতনভাবে রবীন্দ্র-মানসে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। 'নৈবেদ্য'-এর যুগে (১৩০৮) এই ভাব কবিচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে পরাধীন ভারতের দুর্বল অসহায় মূর্তি, অপর দিকে মদমত্ত জিগীষু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার লোভ-লোলুপ রূপ কবির হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিতে থাকে। ইহার মধ্যে স্বের ও পরের আত্যন্তিক মিলন ও কল্যাণ সাধনে রবীন্দ্রচিত্তে ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় 'একের মন্ত্রে' উদ্দীপিত, ধ্যানে সুসমাহিত প্রাচীন ভারতের আদর্শ। শান্তশিবময় অদ্বৈতকে হৃদয়ে গ্রহণ করায় যে জীবন আঘাতে-সংঘাতে অচঞ্চল, অক্ষর অক্ষয় এক আত্মার দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া যে জীবন অশোক, অভয় ও মৃত্যুঞ্জয়, স্বদেশের ভীরুতা গ্লানি দূর করিতে পারে সনাতন ভারতের সেই আদর্শ, মৃত্যু-যন্ত্রনায় মুক্তি বিধান করিতে পারে উপনিষদের সেই 'তমেব বিদিত্বা' মন্ত্র। ঋষির ন্যায় উদাত্ত স্বরে তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন,

তার পানে চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি। [নৈবেদ্য]

পরম 'এক'-এর স্বীকৃতির মধ্যেই ভারতাত্মার ঐক্যের বাণীটি নিহিত। 'নে নানাস্তি কিঞ্চন'—এখানে 'নানা' নাই। বিভেদের মধ্যে অভেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে এই বোধের তুল্য অন্য বোধ নাই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষৎ হইতেই ভারতবর্ষের এই চিরকালীন আদর্শটি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধ্যান-তপোবন হইতেই এই আদর্শ উৎসারিত হইয়াছিল; 'বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।' ভারতের অধঃপতনে সেই একের মন্ত্রই ভারতকে রক্ষা করিবে; শুধু তাই নয়, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন যজ্ঞেও সেই মন্ত্রই কার্যকরী হইবে। পশ্চিম 'অপরা বিদ্যা'র উপাসনা করিতেছে, প্রাচীর লক্ষ্য 'পরাবিদ্যা'। রবীন্দ্রনাথ বলেন, কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়—মিলনের নির্দেশ রহিয়াছে উপনিষদে:

'পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন;

বিদ্যাং চাবিদ্যাং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্য-পীড়িত, সে নির্জীব; আর মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, নিরানন্দ।' [শিক্ষার মিলন]

মানুষের স্বরূপ প্রকাশের তত্ত্বটিও উপনিষৎ হইতে পাওয়া। স্বরূপতঃ মানুষ একেরই প্রকাশ। এই তত্ত্বটি না জানায় পাশ্চাত্ত্য দেশ অহমিকায়, আত্মদম্ভে, ঐশ্বর্যের লোভে উন্মত্ত; এই অজ্ঞানতা মানুষে মানুষে বিশ্লিষ্টতার মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের সর্বগ্রাসী লোভ-প্রমত্ততা ও ভেদজ্ঞানের সম্মুখে উপনিষদের এই পরম ঐক্যের আদর্শকে স্থাপন করিয়াছেন: 'প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন:

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।' [শিক্ষার মিলন]

উপনিষদের বাণী মন্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বীয় মননে নিজের অনুভবে এই যে 'প্রকাশতত্ত্ব'টির সন্ধান পাইয়াছেন, ইহারই উপর তাঁহার মনুষ্যধর্ম, অধ্যাত্ম ভাবনা, রসোপলব্ধি ও সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

উপনিষৎ বলিতেছে, সৃষ্টির মূলে আছেন এক সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বান্তর্যামী মহেশ্বর। তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, ভূমা, অনন্ত। তিনি নিত্য, অক্ষয়, অক্ষর। উপনিষৎ ইহাকেই বলিয়াছে ব্রহ্ম, আত্মা, পুরুষ বা ঈশা। বিশ্বসৃষ্টিতে তিনিই প্রকাশিত—অগ্নিতে, সূর্যে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে। তিনিই আবার 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' এক কথায় 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। উপনিষদ্‌মতে এই তত্ত্বের উপলব্ধিই মুক্তি—উপনিষদের আদেশ, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই প্রকাশতত্ত্বের বোধেই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, ভেদজ্ঞানের অপসারণ, নিখিল জগতকে আত্মার আত্মীয়-জ্ঞানে গ্রহণ ও ভূমার ভূমিতে জীবের সম্প্রসারণ সম্ভব—ইহাই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। সেই 'এক' বিশ্বে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণতার দিকে চালিত করিতেছেন, মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষকে মহত্তর আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে

চাহিতেছেন। 'মা গৃধ', 'মা হিংসীঃ', 'ভূমৈব সুখং', 'সত্যমেব জয়তি', 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' প্রভৃতি তাঁহারই ঘোষণা। মানুষের জীবন বাহিরের দিক হইতে অসঙ্গতিতে, অপূর্ণতায় ভরা। তাই নিগূঢ় পূর্ণ সত্যকে সে দেখিতে পায় না, তাঁহার ইচ্ছাকে বুঝিতে পারেনা; কিন্তু তিনি যে অন্তরে থাকিয়া অন্তরকে মহৎকাজে প্রেরিত করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের স্বার্থত্যাগে, আত্মবিসর্জনে ও লোককল্যাণকর কর্মে। নিজের জীবনে ঈশার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই মানুষের ধর্ম:

The Isha of our Upanishad, the Super Soul, which permeates all moving things, is the God of this human universe whose mind we share in all our true knowledge, love and service and whom to reveal in ourselves through rennuciation of self is the highest end of life [Religion of Man]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যিনি যে পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছেন, তিনি ততখানি মানব ধর্মকে সার্থক করিতেছেন। ইহাই ভারতবর্ষের মর্মবাণী, মানবধর্ম সাধনারও গূঢ় সত্য। এই যে 'ঈশা' বা পরিপূর্ণতা—ইনিই রবীন্দ্রনাথের ভগবান, অথবা পরিপূর্ণ মানবত্ব বা মহামানব। মহামানবের সহিত মানবের অব্যবহিত যোগকে আবিষ্কার করিয়া মহামানবের ধারায় নিজেকে নিমগ্ন করাই মানবতার সাধন, উহাই মোহ-মৃত্যুকে জয় করিবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সাধনায় ভগবান ও মহামানব এক হইয়া গিয়াছেন।

পূর্ণতার প্রকাশের এই যেমন একদিক, তেমনই আর একটি দিক আছে, তাহা আনন্দঘন, রসঘন আত্মার আনন্দ যোগে প্রকাশের দিক। রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনা ও নন্দনতত্ত্বের সহিত ইহার গভীর যোগ। উপনিষৎ বলিতেছে, সেই যে আত্মা, যিনি 'ভীষণ', যাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য কিরণ প্রদান করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, মৃত্যু আজ্ঞা পালন করিতেছে, তিনিই আবার রসঘন —'রসো বৈ সঃ'; তিনি আনন্দঘন—'আনন্দো ব্রহ্ম', তিনি 'মধু, অমৃত'। বিশ্বসৃষ্টিতে এই আনন্দ-রসময় প্রকাশিত হন আনন্দ যোগে 'রমণ'-ইচ্ছায়—'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ' [বৃ.আ. ১.৪.৩]। দ্বৈতের ভিতর অদ্বৈতের যে প্রকাশ, তাহা রসের, আনন্দের। এই প্রকাশ যদি আনন্দের না হইত, তবে, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' [তৈ. উ. ২.৭]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও রস-সাধনার সহিত উপনিষদের এই আনন্দ-ব্রহ্মের প্রকাশতত্ত্বের গভীর সামঞ্জস্য দেখা যায়। উপনিষদের সহিত গভীর যোগাযোগ থাকিলেও রস-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং চির 'সহজিয়া'। পৌরাণিক লীলাবাদের প্রভাবও ইহাতে বিধৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় অনুভবের ব্যাখ্যায় কবি উপনিষদের প্রসঙ্গই বিশেষ করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। বার্ধক্যে এই প্রকাশ-তত্ত্বটি চেতনার সর্বমূলে আসন পাতিয়াছে,

> জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
>
> ঋষির একটি বাণী দিনে দিনে চিত্তে মোর হতেছে উজ্জ্বল
>
> আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। [রোগ শয্যায়-২৫]

সাহিত্যের প্রকাশতত্ত্বে ও নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যাতেও কবি উপনিষদের এই রস-প্রকাশের তত্ত্বটিকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিশেষমনে বিশ্বরূপের প্রকাশই শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা। 'সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।' [সাহিত্য—সৌন্দর্যবোধ]। আরও বলেন, 'প্রকাশই আনন্দ। এইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন: আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়' [সাহিত্য—সৌন্দর্য ও সাহিত্য]। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, সাহিত্য-সৃষ্টি একটি ক্ষণিক উত্তেজনার সৃষ্টি নয়, ইহা একটি অনির্বচনীয় সত্যের প্রকাশ। এই সত্যটি 'একে'র প্রকাশ তত্ত্ব, বিশ্বজীবনের সহিত বিশ্বেশ্বরের ঐক্য উপলব্ধির তত্ত্ব। আনন্দরূপ এক যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তখন রূপদক্ষ তাঁহাকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; সেই প্রকাশই শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপে নানাদিক হইতে উপনিষদের সুনিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-মানস গঠনে উপনিষৎ নিঃসন্দেহে একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, একটি পুষ্পের প্রস্ফুটনে একটি মাত্র উপাদানই থাকে না: সূর্য হইতে সে আলো নেয়, বাতাস হইতে নেয় প্রাণ, মাটি হইতে রস। রবীন্দ্র-কুসুমের বিকাশ বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে। এই উপাদানগুলি স্থূল উপাদান রূপেই গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইয়াছে স্বীকরণের পথে। রবীন্দ্রনাথ বহুর সমবায়ে এক এবং অদ্বিতীয়।

॥ দর্শন ॥

১. ভূমিকা

মানব-চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দর্শন। দর্শনের একভাগে তর্ক-বিচার, অন্যভাগে মীমাংসা। মানুষের চিন্তাশক্তি যে কত সুদূর প্রসারী হইতে পারে, বিচার বিশ্লেষণ যে কত জটিল ও সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিতে পারে, আবার সংশয়-আবর্তের মুখে সন্ধানী দীপের মত জ্ঞান যে কিভাবে নিঃসীম শান্তির পথ দেখাইতে পারে, দর্শন তাহার দৃষ্টান্ত। সমস্যা-জটিল দুঃখক্লান্ত জীবনে দর্শন একটি আরাম ঘর।

'দৃশ্' (দেখা বা প্রত্যক্ষ করা) ধাতু হইতে দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন। উহা নানার্থবোধক। কেহ মনে করেন, যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা যে অবধারণ, তাহাই দর্শন; কেহ বলেন, সত্যের উপলব্ধি-জাত যে অনুভব, তাহাই দর্শন। যুক্তি-তর্কেই হউক বা অনুভবেই হউক, প্রত্যক্ষ করাই দর্শন। এই দর্শন একদিকে হইতেছে চর্মচক্ষু বা বহিরিন্দ্রিয় দিয়া, অপরদিকে হইতেছে অন্তর্চক্ষু বা অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া। বহুদর্শন, ভূয়োদর্শন ও অন্তর্দর্শনের ফলে সত্যের যে অববোধ, তাহাই প্রকৃত দর্শন।

প্রত্যেক দর্শনের মূল 'জিজ্ঞাসা'। কোন দর্শনে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা', কোন দর্শনে 'ধর্ম জিজ্ঞাসা'। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই নব নব বস্তুর সহিত পরিচয় হয়, জাগে বিস্ময়, জাগে জিজ্ঞাসা। সুখের ঘরে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠে, শান্তির ঘরে অশান্তির বিভীষিকা। তখন জিজ্ঞাসা আরও জটিল আকার ধারণ করে। জিজ্ঞাসা যে মনের ক্ষুধা। বিশেষতঃ জীবনের দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান মহাভয়াল মৃত্যু-দুঃখ মানুষকে একটি দুরূহ জিজ্ঞাসার দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়,—মৃত্যু কি? মৃত্যুর স্বরূপ কি? মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব থাকে কি না? যদি থাকে, তাহাই বা কি?—এইগুলিই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার মূল। দর্শন-শাস্ত্র এই সকল জিজ্ঞাসার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ ও উত্তর।

মানব-চিন্তার এই সুসূক্ষ্ম বিকাশ অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছিল। অন্যান্য দেশে যখন জ্ঞানালোক দেখা দেয় নাই, ভারতের জ্ঞান-সূর্য তখন উত্তুঙ্গ শিখরে সমারূঢ়।[১] স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীক দার্শনিকগণ

১। 'The lofty ideals they held aloft when Europe was plunged in barbarism' [A Lit. Hist. of India, Chap ix, R. W. Frazer]

ভারতীয় জ্ঞান-উৎস হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজেদের জ্ঞান-নির্ঝর পূর্ণ করিয়াছেন। মনীষী Maxmuller বলেন, ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শন অপেক্ষা অধিক জ্ঞান-গর্ভ। 'ভারতীয় দর্শন বুদ্ধির নির্মলতা সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের লীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয় রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।'[১]

২. ভারতীয় দর্শনের শ্রেণী বিভাগ

এদেশের দর্শন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। বহুখ্যাত ষড়্দর্শন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। সাধারণতঃ যাঁহারা ঈশ্বর ও পরলোক মানেন, তাঁহারা আস্তিক—যাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহারা নাস্তিক। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে আস্তিক-নাস্তিকের প্রয়োগ একটু স্বতন্ত্র। 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' বলা সত্ত্বেও সাংখ্য আস্তিক; পূর্ব-মীমাংসাতেও সাবয়ব ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই—তথাপি উহা আস্তিক। আবার জৈনগণ পরলোক মানিলেও নাস্তিক এবং বৌদ্ধগণও 'ভবচক্র' বা জন্মান্তর স্বীকার করা সত্ত্বেও নাস্তিক। দর্শনের রাজ্যে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক। 'চৈতন্য মহাপ্রভু ঠিকই বলিয়াছেন, 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।'

ভারতীয় হিন্দু জীবনের ভিত্তি ছয়টি আস্তিক দর্শন। এই ষড়্দর্শন তিন যুগলে শ্রেণীবদ্ধ—ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা। সাধনা ও প্রাপ্তির দিক হইতে এই শ্রেণী বিভাগ যেন ক্রমবিন্যস্ত, যেন নিম্ন সোপানক্রমে উপরের দিকে যাত্রা, যেন অপরাভূমি হইতে পরাভূমিতে প্রবেশের সঙ্কেত।

৩. দর্শন-পরিচয়: আস্তিক দর্শন

(i) ন্যায় দর্শন

ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম বা গোতম। তাঁহার অপর নাম অক্ষপাদ; এইজন্য ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদ-দর্শনও বলা হয়। ন্যায়ের আর এক নাম তর্কশাস্ত্র, কারণ, তর্ক বা বাদ-বিতণ্ডা এই দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। ইহাকে আন্বীক্ষিকীও বলে; অন্বীক্ষা (পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা) দ্বারা সত্য বিচারিত হয় জন্য এইরূপ নাম।

গোতম-প্রণীত ন্যায়সূত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি করিয়া আহ্নিক।[২] আহ্নিকগুলি আবার প্রকরণে বিভক্ত। আস্তিক দর্শন মাত্রেরই মূল

১। শ্রীগোপালবসু ফেলোশিপ লেকচার (১ম)—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
২। 'অহ্নানিবৃত্তো গ্রন্থ আহ্নিকঃ' অর্থাৎ গ্রন্থের যে অংশ একদিনের রচনা, তাহাই আহ্নিক।

প্রতিপাদ্য 'নিঃশ্রেয়স্' বা মুক্তি। সূত্রকার প্রথম সূত্রেই এই উপায় নির্দেশ করিয়াছেন,—

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প—

বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ [১.১.১]

ন্যায়মতে উপরিউক্ত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোলটি তত্ত্বের জ্ঞানেই মুক্তি। প্রথম অধ্যায়ে সামান্যভাবে প্রথম চোদ্দটি তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থান। নৈয়ায়িকের প্রধান অবলম্বন 'প্রমাণ' (—অবিসম্বাদি জ্ঞান)। এইজন্য ন্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধুই প্রমাণ-পরীক্ষা। ন্যায়মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান (সাদৃশ্য) ও শব্দ। শব্দ-প্রমাণ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়মতে শব্দ অনিত্য, কিন্তু বেদ নিত্য ও যথার্থবাদী। প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্বেদ যেমন প্রমাণ, তেমনই বেদের উপদেশ যথার্থ বলিয়া বেদ প্রমাণ—'আয়ুর্বেদবৎ প্রামাণ্যম্ আপ্ত প্রামাণ্যাৎ'।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে ন্যায় দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'প্রমেয় পরীক্ষা' [তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়]। এই অংশেই আত্মা, প্রপঞ্চসৃষ্টি, জীবের জন্ম, বন্ধন ও মুক্তির বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি গৌতমের মতে 'প্রমেয়' (—প্রকৃত জ্ঞান বা প্রমাণের বিষয়) বারটি: ১. আত্মা, ২. শরীর, ৩. ইন্দ্রিয়, ৪. অর্থ, ৫. বুদ্ধি, ৬. মন, ৭. প্রবৃত্তি, ৮. দোষ, ৯. প্রেত্যভাব, ১০. ফল, ১১. দুঃখ, ও ১২. অপবর্গ। 'আত্মা' নিত্য ও অবিনশ্বর; উহার আদি নাই, অন্ত নাই; উহা দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র। এই আত্মা একাধারে দ্রষ্টা ও ভোক্তা [ন্যা. সূ. ৩. ১. ৪]। আত্মার ভোগায়তন 'শরীর'। শরীর-ভেদে জীবাত্মা বহু। শরীরে ভোগ সাধিত হয় 'ইন্দ্রিয়' দ্বারে। ইন্দ্রিয়ের ভোগ-বিষয়ের নাম 'অর্থ'—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত হইতে উৎপন্ন। 'বুদ্ধি' মানে জ্ঞান, আর 'মন' স্মরণ, অনুমান, সংশয় ও সুখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের করণ। মনঃসংযোগেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞান হয়। মন অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য 'অণু' বিশেষ। তাহার গ্রাহ্য বিষয় অসংখ্য। 'প্রবৃত্তি' পাপপুণ্যাদি বা ধর্মাধর্ম সঞ্চয়ের কারণ। প্রবৃত্তির হেতু 'দোষ'; দোষ তিন প্রকার—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। প্রবৃত্তি ও দোষ হইতে 'প্রেত্যভাব' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ। দোষ ও প্রবৃত্তির আর এক পরিণাম 'ফল'—উহা সুখ-দুঃখাদির অনুভব বিশেষ। এই 'ফল' 'দুঃখময়'—সুখের অনুভবও দুঃখের। এই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের নাম 'অপবর্গ' অর্থাৎ মুক্তি। ন্যায়মতে—দুঃখের বিনাশেই মুক্তি। শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ ও বুদ্ধির সাহচর্যে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জীবের জন্ম-মৃত্যু-ভোগের

কারণ। লৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, দুঃখ বিনষ্ট হয় তত্ত্বজ্ঞানে। ন্যায়ের উদ্দেশ-সূত্রোক্ত ষোলটি তত্ত্বের জ্ঞান হইলে দোষ নষ্ট হয়, দোষ নষ্ট হইলে প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়, প্রবৃত্তি ধ্বংসে জন্ম-নিরোধ, জন্ম রহিত হইলেই ফল অর্থাৎ দুঃখের শেষ। ইহাই অপবর্গ।

দার্শনিক প্রসঙ্গ অপেক্ষা ন্যায়ের প্রধান আকর্ষণ তর্কের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'The Nyaya philosoppy is a system of logical realism' [Chatterjee & Datta]—উক্তিটি সত্য। ন্যায় ভাববাদী নয়, যুক্তিবাদী। সাধ্যকে সিদ্ধ করাই ন্যায়ের প্রয়োজন। এইদিক হইতে ন্যায়ের তর্কপ্রণালী বিস্ময়েব বিস্ময়। অনুমান-প্রমাণ বিষয়ে ন্যায়ের তর্ক-পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 'পর্বতো বহ্নিমান্'—পর্বতে বহ্নি আছে, ইহা একটি প্রতিজ্ঞা, ইহার প্রতিষ্ঠা এই পদ্ধতিতে :

প্রতিজ্ঞা : পর্বতো বহ্নিমান্ (পর্বতে বহ্নি আছে)

হেতু : কস্মাৎ? —ধূমাৎ (কি হেতু? ধূমহেতু।)

দৃষ্টান্ত : যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্। যথা মহানসম্।
(যাহা যাহা ধূমবান্, তাহাই বহ্নিমান্—যথা রন্ধনশালা)

উপনয় : বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ম্ (বহ্নিব্যাপ্য যে ধূম, পর্বত সেই ধূমে ধূমবস্ত)

নিগমন : তস্মাৎ বহ্নিমান্ (অতএব পর্বত বহ্নিমান্)

ন্যায়ের সিদ্ধান্ত-স্থাপন প্রণালী সর্বত্রই এইরূপ যুক্তিপূর্ণ। ন্যায়ের কচকচি নীরস বটে, কিন্তু যুক্তির পারম্পর্য ও সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলায় যে সৌন্দর্য আছে, তাহা উপেক্ষণীয় নয়। ন্যায়ের দৃষ্টান্তগুলিও সুন্দর ও সরস।

(ii) বৈশেষিক দর্শন

কণাদ মুনি বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার। কণাদ নামটি তাৎপর্যবোধক। ঋষি নাকি কৃষকগণের শস্যাহরণের পর প্রত্যহ ক্ষেত্র হইতে শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। তাই তাহার নাম 'কণভুক্' কণাদ এবং দর্শনের নাম 'কণাদ দর্শন'। কণাদ নামটি অন্য অর্থেও সিদ্ধ হইতে পারে। এই দর্শনে 'কণ' অর্থাৎ 'অণু'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; 'কণ-বাদ' (পরমাণুবাদ)-প্রচারক অর্থে কণাদ নাম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঋষির আসল নাম 'উলূক'—এইজন্য কণাদ দর্শন উলূকীয় দর্শন নামেও খ্যাত। বৈশেষিক দর্শন নামটিই বহু বিখ্যাত; এই দর্শনে 'বিশেষ' নামক একটি পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় এই নামটিই রূঢ়।

কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত : প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক। কুড়িদিনে কুড়িটি আহ্নিক রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম তিনটি সূত্রে দর্শনকার 'অদ্ভুত উপক্রমণিকা' করিয়াছেন :

১. অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

২. যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।

৩. তদ্‌বচনাদ্ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।

—ইহার পর ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। যাহা হইতে অভ্যুদয় (ঐহিক উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স্ (মুক্তি) সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম। তৎ-বচন (সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য) বলিয়া আম্নায় (বেদ) প্রামাণ্য।

ইহার পরেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য 'উদ্দেশ সূত্র' :

ধর্ম বিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং
পদার্থানাং সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাদ্ নিঃশ্রেয়সম্ [বৈ. সূ. ১.১.৪]।

—ধর্মবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বা নিষ্কাম কর্মোপার্জিত ধর্ম হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপ অর্থাৎ কোন্ ধর্ম কোন্ কোন্ পদার্থের সমানধর্ম, কোন্ ধর্মই বা কোন্ কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম তদ্রূপে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মুক্তি হয়' [অনুবাদ—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার]।

'ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া উপক্রমণিকা করিয়া সূত্রকার কতকগুলি 'পদার্থ' উদ্দেশ করায় অনেকে এই চেষ্টাকে সাগর গমনেচ্ছু ব্যক্তির হিমালয় গমনের ন্যায় উপহাসাস্পদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, দর্শনকারের উপক্রমণিকায় ও উদ্দেশ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের 'পদার্থ' বহুব্যাপক ; উহাই 'তত্ত্ব'—কারণ উহারই ভিতর সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবের বন্ধন ও মুক্তির বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈশেষিক মতে এই তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি ['তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্']।

ন্যায় দর্শন মতেও পদার্থ-জ্ঞানেই মুক্তি। ন্যায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্তও অনেকটা একপ্রকার। তাই নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিককে 'সমানতন্ত্র' বলিয়াছেন। তবে পার্থক্যও আছে। ন্যায়ে ষোড়শ পদার্থের (তত্ত্বের) স্বীকৃতি, বৈশেষিকে ছয়, মতান্তরে সাত ; ন্যায়ের প্রমাণ চারি প্রকার (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ), বৈশেষিকের দুই (প্রত্যক্ষ ও অনুমান) ; ন্যায়ে পরমাত্মার প্রসঙ্গ অস্ফুট, বৈশেষিকে স্ফুটতর ; সর্বাপেক্ষা বড় কথা—ন্যায়ে পরমাণুতত্ত্বের উল্লেখমাত্র আছে, বৈশেষিকে পরমাণুবাদ বিস্তৃত ও বিশিষ্ট ; বৈশেষিক দর্শনের অপর বৈশিষ্ট্য 'বিশেষ' নামক পদার্থের স্বীকৃতিতে।

কণাদ মতে পদার্থ ছয়টি[১] : দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। ইহাদের মধ্যে 'দ্রব্য'-বিচারই প্রথম, এবং একদিক হইতে প্রধানও বটে। কারণ, বৈশেষিকের সৃষ্টি, আত্মা ও পরমাত্মা প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব, দ্রব্য-তত্ত্বের অন্তর্গত। দ্রব্যই গুণ, কর্ম ও সমবায় কারণের আশ্রয়, দ্রব্য হইতেই পরমাণু-তত্ত্বের বিকাশ। দ্রব্য নয়টি—'পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি' [বৈ. সূ. ১. ১. ৫]: পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে 'পঞ্চভূত' বলা হয়; উহাদের গুণগুলি স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। কিন্তু 'আকাশ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ গুণ সম্পন্ন হইলেও স্বয়ং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু—স্থূল ও সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সাবয়ব, নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার: মহৎ পৃথিব্যাদির বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশই 'পরমাণু'; অথবা 'মহতো বিপরীতমণু' [বৈ. সূ. ৭. ১. ৭]। এই পরমাণু মহৎ বা স্থূলের বিপরীত বলিয়াই অবিভাজ্য নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয়; উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। পরমাণুকে আর ভাগ করা যায় না; উহারা সৃষ্টও হয় না, ধ্বংসও হয় না,। অতএব নিত্য। এই পরমাণুই 'রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী' [বৈ. সূ. ২. ১. ১.] অর্থাৎ সাবয়ব অনিত্য সৃষ্টির মূল উপাদান।

প্রশস্তপাদাচার্যের 'পদার্থধর্মসংগ্রহে' বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-সংযোগ সৃষ্টির রহস্যটি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রলয়কালে যখন মহেশ্বরের সঞ্জীহির্ষা (সংহারেচ্ছা) জাগে, তখন সাবয়ব সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়, শুধু অবশিষ্ট থাকে নিত্য পদার্থগুলি—পৃথিবী পরমাণু, জলপরমাণু, বায়ুপরমাণু, তেজপরমাণু এবং আকাশ, দিক্, কাল, মন ও 'অদৃষ্ট'-যুক্ত আত্মা। 'অদৃষ্ট' হইতেছে কর্মজনিত গুণ: ধর্মে শুভাদৃষ্ট, অধর্মে দুরদৃষ্ট। অদৃষ্টই কর্মের প্রেরক, ভোগের হেতু ও সৃষ্টির কারণ। প্রলয়ের অবসানে মহেশ্বরের সিসৃক্ষা-হেতু অদৃষ্ট-যুক্ত আত্মার সংযোগে বায়ুপরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। পরমাণু নিজে নিরবয়ব। কিন্তু একাধিক পরমাণুর মিলনে সাবয়ব পদার্থ সৃষ্টি হয়। দুইটি অণুর সংযোগে 'দ্ব্যণু' (দুইটি অণুর সমষ্টি), তিনটি দ্ব্যণুর সংযোগে 'ত্রসরেণু' (তিনটি দ্ব্যণুর সমষ্টি)[২]—এই প্রকারে স্থূল

১। উদ্দেশ্যসূত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ থাকায়, কেহ মনে করেন, বৈশেষিক 'ষট্ পদার্থবাদী'; কিন্তু 'অভাব' নামক আর একটি পদার্থের বিশদ আলোচনা থাকায় অপরদল মনে করেন, দর্শনকার 'সপ্তপদার্থবাদী'। নব্য ন্যায়ে সপ্তপদার্থেরই স্বীকৃতি।

২। ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে সূর্য-কিরণ প্রবেশ করিলে, তাহাতে ভাসমান যে ক্ষুদ্র ধূলিকণা দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাই 'ত্রসরেণু'। ত্রসরেণুতেই অবয়বধারার শেষ। ইহার ছয়ভাগের একভাগকে 'পরমাণু' বলে। উহা অদৃশ্য।

অবয়বের উৎপত্তি। প্রথমে পবন-পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন করে। এই বায়ু কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থান করে। তাহার পর জলীয় পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হওয়ায় জল-পরমাণুর সংযোগে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হয়। এইরূপে পৃথিবী-পরমাণুর দ্বারা পৃথিবী ও তেজ-পরমাণুর দ্বারা মহান্ তেজ উৎপন্ন হয়। তাহার পর মহেশ্বরের 'অভিধ্যানে' (সঙ্কল্প মাত্র) ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা মহেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া জীবের কর্মানুসারে সৃষ্টি পত্তন করেন। বৈশেষিক মতে পরমাণুই সৃষ্টির মূল উপাদান। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের Atomic Theory-র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

কণাদমতে প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) বহু। জীবের কর্মই অদৃষ্টের জনক। পরমাত্মার কোন ক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নাই। সমগ্র সৃষ্টি যেন 'অদৃষ্ট'-বশেই যন্ত্রের মত সৃষ্ট হইতেছে, ক্রিয়া করিতেছে ও সংহৃত হইতেছে। ['নোদনাদভিঘাতাৎ সংযুক্তঃ সংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম'— ৬. ২. ১.]। ন্যায়-বৈশেষিকে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইলেও ভক্তিবাদ এখানে দৃঢ়-মূল নয়। এই দর্শনে 'দুষ্ট ভোজন' নিন্দিত। হিংসাই দুষ্ট ভোজন—'দুষ্টং হিংসায়াম্' [৬. ১. ৭.]। সংযম-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। অসংযম অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধক—'অযতস্য শুচিভোজনাদভ্যুদয়ো ন বিদ্যতে' [৫. ১. ৩]।

নব্য ন্যায়

ন্যায়-বৈশেষিকের মিলিত সঙ্গম নব্য ন্যায়। গৌতমে ও কণাদে যাহার উদ্গম, নব্য ন্যায়ে তাহার বিস্তার। তবে ইহা বিস্তার মাত্র নয়, ন্যায়-বৈশেষিকের উন্নয়নও বটে। এইজন্য নব্য ন্যায়ের আবির্ভাবে প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিকের আদর কমিয়া গিয়াছে।

নব্য ন্যায় সপ্ত পদার্থবাদী। বৈশেষিকে ছয় পদার্থ ও 'অভাব'-এর আলোচনা আছে। নব্য ন্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় 'ভাব' (ইহার অন্তর্গত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) এবং 'অভাব' নামক পদার্থকে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার প্রমাণ-বিষয়ে ইহা প্রাচীন ন্যায়ের অনুসারী ; নব্য মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। নব্য ন্যায়ের প্রধান বিশেষত্ব পদার্থের বিষয়-বিশ্লেষণ। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে যতপ্রকার সম্ভাব্য প্রতিবাদ উত্থিত হইতে পারে, নব্য ন্যায়ে তাহার চুলচেরা বিচার। 'পর্বতো বহ্নিমান্'—প্রাচীন ন্যায়ের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠায় এই ন্যায় সত্যই বহ্নিমান্। প্রাচীন ন্যায় বলিল, ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়, কারণ, ধূম বহ্নিব্যাপ্য। নব্য ন্যায় আপত্তি তুলিল, হেতু থাকিলেই অনুমান হয় না, ধূম ছাড়াও বহ্নি থাকিতে পারে। প্রাচীন ব্যাপ্তিজ্ঞানকে তাঁহারা বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে বিচার করিলেন এবং

দেখাইলেন, যে সূত্র ধরিয়া অনুমান করিতে হইবে, তাহা যত বিচারিত হইয়া খাঁটি প্রমাণিত হইবে, তাহা তত গ্রহণযোগ্য হইবে। এই বিচার-বিতর্কই নব্য ন্যায়ের প্রাণ। তাই লক্ষণ-বাক্য নির্ণয়ে ইহার অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচারশীলতা বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। নব্য ন্যায়ের পরিভাষা শক্ত, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মতই বিষয়-নিবিষ্ট ও সত্যসন্ধ।

নব্য ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বাংলাদেশে। পূর্বে ন্যায় ছিল মিথিলার সম্পদ। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত 'তত্ত্ব চিন্তামণি' গ্রন্থে সর্বপ্রথম ন্যায়-সংজ্ঞার্থের পরিমার্জন করিয়া নূতন লক্ষণ-বাক্য নির্ণয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। মিথিলার কোন নৈয়ায়িক এই গ্রন্থ লিখিয়া আনিতে দিতেন না। ষোড়শ শতকে মিথিলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন পক্ষধর মিশ্র। বঙ্গের কুলতিলক রঘুনাথ শিরোমণি এই পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শিক্ষা করিতে গিয়া সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ফিরিয়া আসেন[১],

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি। [সত্যেন্দ্রনাথ]

রঘুনাথ হইতে বাংলাদেশে নব্য ন্যায় প্রচারিত হয়। তাঁহার 'চিন্তামণি-দীধিতি' বা দীধিতি ভারত-খ্যাত। রঘুনাথের সুযোগ্য শিষ্য মথুরানাথ তর্কবাগীশ। তাঁহার গ্রন্থাবলী 'রহস্য' নামে পরিচিত। ইঁহাদের পর জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। জাগদীশী 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' বহুখ্যাত গ্রন্থ। গদাধর 'নব্য ন্যায়ের বিগ্রহ'। তাঁহার 'ভট্টাচার্য টীকা' বহুল প্রচলিত।

নব্য ন্যায় বাংলার গৌরব। ইহা বাঙালীর সুসূক্ষ্ম বিচার ও আশ্চর্য ধী-শক্তির পরিচয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নব্য ন্যায়ের জটিল তর্কজাল ও পরিভাষার সংশোধন ও পরিমার্জনগুলির অসাধারণ মূল্য। নব্য ন্যায়ের বিচার এমন চুলচেরা যে, কিছুক্ষণ পাঠ করিলেই নাকি মাথা ঘুরিতে থাকে। নব্য ন্যায় তর্কেরই খেলা।

১। পক্ষধর মিশ্রের সহিত রঘুনাথের প্রথম পরিচয়-কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। রঘুনাথ ছিলেন কানা; তাঁহাকে দেখিয়া মিশ্র প্রশ্ন করেন,

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্বে কো ভবান্ একলোচনঃ॥

একজন বিশিষ্ট তার্কিকের মতই রঘুনাথ উত্তর দেন,

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ।
তর্কে বিলোচনা যূয়ং তত্রাহম্ একলোচনঃ॥

রঘুনাথের বক্তব্য এই যে, মিশ্রের নিকট তিনি শিক্ষার্থী।

(iii) সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন। ইহার প্রণেতা মহর্ষি কপিল। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে মহর্ষি কপিলের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখা যায়,—মহর্ষি কপিল প্রথম জাত, পরমাত্মা তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম দেখিয়াছিলেন ['ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ'—শ্বেত ৫. ২]। রামায়ণেও বাসুদেব কপিলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সেখানে তিনি সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্রের বিনাশকারী এবং 'যস্তোৎপত্তি র্ন বিদ্যতে' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সাংখ্যকার কপিল ভগবানের অবতার; ইনি মহর্ষি কর্দমের ঔরসে জননী দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জননীকে সাংখ্যযোগ উপদেশ করেন [ভাগ. ৩য় স্কন্ধ]। কপিল জ্ঞানীদিগের অন্যতম এবং সাংখ্য দর্শন জ্ঞানের সার—একথা পুরাণ-সম্মত।

মহর্ষি কপিল 'তত্ত্ব সমাস' নামক সাংখ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। এ সূত্র কাল-কবলিত। কথিত আছে, এই সূত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া কপিল ইহাকে বিস্তৃত করিয়া 'সাংখ্য প্রবচন সূত্র' রচনা করেন। সাংখ্য প্রবচন সুলভ। কিন্তু অনেকেই ইহাকে অপ্রাচীন বলিয়া মনে করেন। কপিল হইতে সাংখ্য দর্শন লাভ করেন আসুরি, আসুরি হইতে পঞ্চশিখ। আসুরি-পঞ্চশিখের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্য কারিকা' সাংখ্য দর্শনের একখানি প্রামাণিক ও অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত।

'সাংখ্য প্রবচন সূত্র' ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত: প্রথমে হেয় ও হেয়হেতু, এবং হান ও হানোপায় নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য, তৃতীয়ে প্রকৃতির স্থূল কার্যের বর্ণনা, চতুর্থে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কতকগুলি উপাখ্যানের সাহায্যে বিবেক-জ্ঞান সাধনের উপদেশ, পঞ্চমে পরমত খণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই দর্শনের সার সংগ্রহ। পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রবচন সূত্র হইতে 'সাংখ্য কারিকা' প্রাচীনতর। কারিকায় কোন অধ্যায়-বিভাগ নাই, ইহাতে সাংখ্য দর্শনের আখ্যায়িকা ও বিচার ভাগও পরিত্যাগ করা হইয়াছে; ইহা ৭২টি শ্লোকের সমষ্টি। বহু স্থলে কারিকা ও সূত্র যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি।

কেহ কেহ মনে করেন, 'সংখ্যা' হইতে 'সাংখ্য, শব্দের উৎপত্তি। ['সংখ্যোপসংগ্রহাৎ'—বেদান্তভাষ্য ১.৪.১১]। সাংখ্যের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে কতকগুলি সংখ্যায়। প্রথমতঃ দুই তত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতেই জড় বিশ্বের

সৃষ্টি। স্থূল সৃষ্টিতে প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে। অতএব সমগ্র সাংখ্য দর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি। সংখ্যা দ্বারা ইহার তত্ত্ব-সংখ্যান হওয়ায় 'সাংখ্য' নাম হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অপরে মনে করেন, সাংখ্য শব্দটি 'সম্যক্ জ্ঞান' অর্থেই সিদ্ধ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও সাংখ্যযোগের কথা বলিতে গিয়া ভগবান 'স্থিরপ্রজ্ঞা' বা 'ব্রাহ্মী-স্থিতি'র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যের সাধন জ্ঞান, না যোগ—এ বিষয়ে বিতর্ক আছে।

তত্ত্ব-সংখ্যার বিবৃতি ও ব্যাখ্যার মধ্যেই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, পুরুষের বন্ধনতত্ত্ব ও পুরুষার্থতত্ত্ব নিহিত। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-তত্ত্বই বিশিষ্ট। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই 'প্রধান', বস্তুজগতের আদিমূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না। গুণবৈষম্যে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। প্রকৃতির প্রথম বিকার 'মহৎ' বা বুদ্ধি, মহৎ-প্রকৃতি হইতে 'অহঙ্কার'; অহঙ্কার-প্রকৃতি হইতে 'মন', 'দশেন্দ্রিয়' (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ); পঞ্চতন্মাত্র-প্রকৃতি হইতে স্থূল পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম)। মূল প্রকৃতিসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই বস্তুজগতের কারণ। সকল কারণ কারণ প্রকৃতি। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে [১. ৬১-৬৫] অনুলোম-প্রতিলোম ক্রমে প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে :

> সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতো
> হহঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ
> স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ [প্রবচন সূত্র. ১. ৬১]

এই যেমন কারণ হইতে কার্যের ক্রম, তেমনই কার্যপরম্পরায় কারণের অনুমান। অর্থাৎ সাংখ্যকার বলিতে চাহিতেছেন, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে যাও—দেখিবে সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতেই স্থূলের উৎপত্তি, আবার স্থূলের কার্যক্রম দেখিয়া সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হও, দেখিবে প্রকৃতিতেই স্থূলের বিশ্রাম। অতএব প্রকৃতিই 'মূল', প্রকৃতিই 'প্রধান'। পরাপ্রকৃতি অব্যক্ত। প্রকৃতির বিকার বা পরিণামগুলি ব্যক্ত।

প্রকৃতি হইতে কার্য-কারণ পরম্পরায় এই যে সৃষ্টিক্রম, ইহা সাংখ্যদর্শনের একটি বিশিষ্ট দান।[১] সাংখ্যমতে সমগ্র সৃষ্টি কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ; একটি তত্ত্ব

১. The Samkhya system possesses a unique interest in the history of thought as embodying the earliest clear and comprehensive account of the process of cosmic evolution [Positive Sciences of the ancient Hindus—B. M. Seal.]

অপরটির সহিত সম্পর্কিত। সৃষ্টিটা বিবর্ত নয়, প্রকৃতির পরিণাম। এই পরিণামে একটা বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলা বর্তমান। ইহাতে কোন ফাঁক বা ফাঁকির স্থান নাই।

সাংখ্যমতে 'প্রকৃতি' সৃষ্টির মূল হইলেও, ইনি অচিৎ, অন্ধ এক জড়শক্তি। অচৈতন্য জড়শক্তির পক্ষে ক্রিয়া করা কি সম্ভব? প্রকৃতি অব্যক্ত, অব্যাকৃত; তিনি ব্যক্ত বা ব্যাকৃতই বা হন কি প্রকারে? ইহার উত্তরে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব 'পুরুষ'এর স্বীকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ এক বিচিত্র পদার্থ। ইনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; ইনি চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু নির্বিকার উদাসীন। পুরুষের অন্য কোন ক্রিয়া নাই; তিনি দ্রষ্টা ও ভোক্তামাত্র। এইদিক হইতে 'সাংখ্যের পুরুষ' নিতান্ত অপদার্থ। প্রবাদে-প্রবচনেও অকর্মা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, 'উনি সাংখ্যের পুরুষ'। সৃষ্টি পুরুষের নয়, কিন্তু পুরুষের ভোগের জন্য। তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, প্রকৃতির সৃষ্টি পুরুষের জন্য। শুধু তাই নয়, পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় ঘটে, এবং প্রকৃতির গুণগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া সৃষ্টি সুরু করে। পুরুষ স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃতি-সান্নিধ্যে তাঁহারও ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়। এই ভোগেচ্ছা ঠিক পুরুষের নয়, পুরুষে প্রতিবিম্বিত বুদ্ধির—যে বুদ্ধি পুরুষ-চৈতন্যের চৈতন্যে আভাসিত। চুম্বক সন্নিধানে লৌহে যেমন চুম্বক শক্তির আবির্ভাব হয়, তেমনই চেতন-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত বুদ্ধিতে চিৎশক্তির আভাস পড়ে ['তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ'—প্রবচনসূত্র. ১. ৯৬]। অথবা যেমন রক্ত জবাকুসুমের সন্নিধানে শুভ্র স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়, তেমনই প্রকৃতি-সন্তানের সান্নিধানে পুরুষের কর্তৃত্ব আভাসিত হয়। সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই সংযোগ প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্বটিকে সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করা হইয়াছে। প্রকৃতি অন্ধ জড়শক্তি, আর পুরুষ অকর্মা খঞ্জ। অন্ধ ও খঞ্জ কেহই একা একা কাজ করিতে পারে না। কিন্তু খঞ্জ যদি অন্ধের স্কন্ধারূঢ় হইয়া অন্ধকে চালিত করে, তাহা হইলে পথ চলা সম্ভব হয়।[১] ক্রিয়াটা প্রকৃতির, নিয়োগ পুরুষের। পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতির উদ্যম, পুরুষের ভোগান্তে প্রকৃতির বিশ্রাম, যেমন পুরুষের তৃপ্তি বিধান করিয়া নর্তকীর নৃত্য-বিরতি।[২] প্রাকৃত সৃষ্টিতে চিদ্‌ঘন পুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুন্দর একটি উক্তি করিয়াছেন, 'চৈতন্যের রোশনাই যেটা আছে বলিয়া সবই দেখা যাইতেছে,

১। 'পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃসর্গঃ' [সাংখ্যকারিকা, ২১]

২। (i) রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ॥ [সাংখ্যকারিকা, ৫৯]

(ii) 'নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ' [প্রবচন সূত্র. ৩. ৬৯]

যেটা না থাকিলেই সব আঁধার। আর সে আলোতে যা কিছু ভাসিতেছে, প্রকাশ হইতেছে বিচিত্রভাবে সেইটা প্রকৃতির বিকৃতি পরিণাম' [হিন্দু ষড্ দর্শন]।

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। পুরুষের দুই অবস্থা,—মুক্ত ও বদ্ধ। স্বরূপতঃ পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; বদ্ধ অবস্থা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হইলেই পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান। বস্তুতঃ প্রকৃতিবদ্ধ হইতে মুক্তিই সাংখ্যের সাধনতত্ত্ব। বিবেকজ্ঞান হইলেই প্রকৃতির বন্ধন অপসারিত হয়।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় নাই। যে সূত্রগুলিতে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইয়াছে, সেগুলিকে 'তামস সূত্র' বলে। তাহাতে আছে:

> ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরা ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।
> উভয়থাপ্যসৎকারত্বম্। [প্র. সূত্র. ১. ৯২-৯৪]
> —ঈশ্বর অসিদ্ধ। ঈশ্বরের মুক্ত বা বদ্ধ হওয়া—দুইই
> অসম্ভব। মুক্ত হইলে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না,
> বদ্ধ হইলেও তিনি অসর্বজ্ঞ হইয়া পড়েন।

ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় কপিলের সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত তবে শাস্ত্রে যে ঈশ্বর-বাচক ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা কি? সাংখ্য বলেন, মুক্তাত্মা সিদ্ধ যোগীরাই ঈশ্বর পদবাচ্য। কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্রও এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন কৃষ্ণের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায়। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে পূর্ণ মানবই ঈশ্বর। ইহা যেন সাংখ্যোক্তিরই প্রতিধ্বনি [প্রঃ সূঃ ১. ৯৫]।

সাংখ্যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও, বেদ সম্পর্কে স্থিরক মন্তব্যও আছে। বেদ পুরুষের নিঃশ্বসিত—সাংখ্য ইহা মানেন না। বেদ মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষের কৃত নয়; বেদ নিত্যও নয়। তবে বেদ প্রমাণ। বেদের প্রমাণ বেদ নিজে: 'নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্' [প্রঃ সূ' ৫. ৫১]।

সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্যে, পরিণামবাদে, পুরুষ বহুত্বে এবং অনীশ্বরতে অবৈদিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যও বেদান্তভাষ্যে [১. ৪] সাংখ্যের অবৈদিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনে হয়, সাংখ্য মূলে ছিল লোক-প্রচলিত দর্শন। পরবর্তীকালে ইহা বৈদিকভাব ও বেদান্তদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্য প্রবচনসূত্র এবং সাংখ্যকারিকাও বহুল পরিমাণে বৈদিকভাবে ভাবিত। প্রবচনসূত্রের 'আবৃত্তির-সকৃদুপদেশাৎ' সূত্রটি [৪. ৩] অবিকল বেদান্তসূত্রে [৭. ১. ১] আছে। প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যে প্রকৃতির ক্রিয়ায় পুরুষ-চৈতন্যের-প্রভাবটিও মূল সাংখ্যের বলিয়া মনে হয় না।

উপনিষদে, পুরাণে, মহাকাব্যে যে সাংখ্যদর্শন বিবৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে বিকৃত বলিয়া মনে করেন।[১]

পরিবর্তন যাহাই হউক, ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্যমতের গুরুত্ব অবিসংবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে' [বিবিধ প্রবন্ধ—সাংখ্যদর্শন]। এদেশের তন্ত্র, পুরাণ নানাদিক হইতে সাংখ্যমত দ্বারা প্রভাবান্বিত। প্রপঞ্চসৃষ্টির ব্যাপারে তন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যমতানুসারী। তন্ত্রের পরিণামবাদও সাংখ্যের। পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্যের প্রভাব বিদ্যমান। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বই পুরাণের শক্তিযুক্ত দেবকল্পনার উৎস। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। স্ত্রী যেমন সেবাযত্ন দ্বারা স্বামীর ভোগ সম্পাদন করেন, স্বামীর সংযোগে সন্ততি উৎপাদন করেন—সাংখ্যের প্রকৃতিও ঠিক তেমনই পুরুষের ভোগার্থ নিয়োজিত। পুরাণের ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, শিব-শিবাণী সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিরই প্রতিমা।

(iv) যোগদর্শন

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাধন 'যোগ'। ইহা হাতে-কলমে শিক্ষা। সাধন-বলে মানুষ যে অপরিমেয় অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ উপায় যোগ। সুপ্রাচীন কাল হইতেই যোগের সমাদর। কঠোপনিষদে যোগের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।[২] আথর্বণ-উপনিষদের অনেকগুলি গ্রন্থ যোগ-বিষয়ক। যে দেহ ও দেহস্থ নাড়ী, বায়ু প্রভৃতি লইয়া যোগের সাধন, যজুর্বেদে ইতস্ততঃ তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে পাই 'প্রাণ'-এর বন্দনা—'প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্'। শুধু তাই নয়, এই কাণ্ডের দশম সূক্তে শব-দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—যোগশাস্ত্রের 'ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড' এই সত্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরাণের দত্তাত্রেয়, কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন বিখ্যাত যোগী। যোগ নিঃসন্দেহে সাধনার একটি সুপ্রাচীন ধারা।

যোগদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি। ইঁহাকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কেহ কেহ যোগদর্শনকে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু কঠোপনিষদে যোগের প্রসঙ্গ আছে, বুদ্ধদেব আলার কলমের নিকট স্বয়ং যোগশিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যোগের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে

১। The original Samkhya came indeed to be perverted in the Svetasvatar, the Epic, and the Bhagvat Gita and later still in the Theistic yoga and the several sectarian and Vedanta-coloured Puranas—Belvalkar & Ranade [Hist. of Indian Philosophy].

২। 'তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্' [কঠ. ২.৩.১১]।

['আকাশে যন্তি ইদ্ধিয়া'-ধম্মপদ. শ্লোক. ৯]। কাজেই যোগকে অপ্রাচীনকালে টানিয়া আনিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষতঃ ধর্মসাহিত্যের উৎপত্তিকাল গভীর তিমির গর্ভে নিহিত।

পাতঞ্জল যোগদর্শন বহুখ্যাত। যোগ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'যোগী যাজ্ঞবল্ক্য', 'শিবসংহিতা', 'অষ্টাবক্র সংহিতা', 'গোরক্ষসংহিতা', 'হঠযোগপ্রদীপিকা', 'পবনবিজয়-স্বরোদয়' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। পুরাণেও নানাস্থলে যোগের প্রসঙ্গ আছে।

পাতঞ্জল দর্শন চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম 'সমাধিপাদ'। যোগ কাহাকে বলে, যোগের লক্ষ্য কি, কি প্রকারে যোগ হয়—তাহা সূত্রাকারে এই পাদে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 'সাধন পাদ' ; ইহাই মূল ক্রিয়াযোগ ; এই অংশেই যোগের অষ্টাঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় 'বিভূতিপাদ'; যোগপ্রভাবে কিরূপ অলৌকিক ঐশ্বয, শক্তি বা বিভূতি লাভ করা সম্ভব, এই পাদে তাহার বর্ণনা। চতুর্থ 'কৈবল্য পাদ' ; ইহাতে সমাধির বিভিন্ন স্তর (সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) আলোচিত হইয়াছে।

যোগের দর্শনাংশ সাংখ্যের অনুরূপ। পার্থক্য—সাংখ্য নিরীশ্বর, যোগ সেশ্বর (=স+ঈশ্বর)। যোগদর্শন স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে। যোগের ঈশ্বর সূত্রগুলি এইরূপ :

১. ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

২. তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।

৩. পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ [যোগ. ১. ২৪-২৬]

—'অবিদ্যাদি ক্লেশ, পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম, কর্ম ফলরূপ বিপাক বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকল আশয়—ইহাদের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অসংযুক্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।

তাহাতে অতীত, অনাগত ও বর্তমান বিষয়ে যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, সেই সর্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তিনি কপিলাদি পূর্ব পূর্ব গুরুগণের গুরু। কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ অনাদিকালের।'[১]

যোগদর্শনে পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। ঈশ্বরও পুরুষ-বিশেষ। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও অনাদি ; ইনিই স্বরূপ পুরুষ। আর এক প্রকারের পুরুষ আছেন, তিনি বহু। প্রত্যেক লিঙ্গশরীরে বা স্থূলশরীরে বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত যে পুরুষ—তিনিই এই পুরুষ। এই পুরুষ ব্যবহারিক পুরুষ ; ইনি বদ্ধ হন, মুক্ত হন। ইহাকে অধ্যাস পুরুষও বলা চলে। বহু পুরুষ সম্পর্কে এই ধারণা সাংখ্যে ও যোগে একপ্রকার। প্রকৃতিতত্ত্ব,

১। অনুবাদ শ্রীমন্ হরিহরানন্দ আরণ্য [পাতঞ্জল দর্শন]

সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, বন্ধন ও মুক্তিতত্ত্ব সাংখ্যে ও যোগে এক। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, **Yoga is applied Samkhya.**[1]

যোগের প্রধান ভূমিকা সাধন-রাজ্যে। যোগের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে 'পাওয়া' নয়, ঈশ্বরবৎ 'হওয়া'—জীবের অনন্ত সম্ভাবনাকে সম্ভব করিয়া তোলা। এই যোগ কি?—পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটিই তাহার উত্তর: 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম 'যোগ'। ইহাই 'হওয়া'র উপায়। 'হওয়া' তো সহজ নয়, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা অতিশয় কঠিন। পথে বহু 'যোগবিঘ্ন'। কাজেই যোগদর্শনে সাধনার পথে যাত্রা সুরু করা হইয়াছে একেবারে নিম্নভূমি হইতে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধান, 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' [১. ২৮], তপস্যা, স্বাধ্যায় এগুলিও চিত্তনিরোধের উদ্যোগ পর্ব। যোগের আসল উদ্দেশ্য 'দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্'—সেই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে হেয় (দুঃখ), হেয়হেতু (দুঃখের কারণ), হান (কারণ দূর হইলে যে দুঃখ নিবৃত্তি) এবং হানোপায় (বিবেকখ্যাতি) জানিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যোগদর্শন বলে, 'যোগাঙ্গ' অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয়, জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ এবং বিবেকখ্যাতি হয় [২. ২৮]।

এই 'যোগাঙ্গে'র অনুষ্ঠানই যোগের মুখ্য ক্রিয়া। ইহা দ্বারা আচ্ছন্ন পুরুষের কঞ্চুকাবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়, ক্রমে জীব ঐশ্বর্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐশ্বর্য ছাড়াইয় চৈতন্যের দীপ্তভূমি। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান সাধককে সেই ভূমিতে লইয়া যায়।

যোগের আটটি অঙ্গ: 'যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টা-বঙ্গানি' [সাধনপাদ. ২৯]। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি—যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম যোগের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ ক্রিয়া এবং শেষের চারিটি- প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের শেষ পর্যায় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ক্রিয়া। প্রত্যেকটি ক্রিয়ার ফল অসাধারণ।

'যম' বলিতে বুঝায়, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির অনুশীলন। কথায় বলে, 'যম অভ্যস্ত হইলে যমে পায় ভয়'। যমে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

'নিয়ম'ও কতকগুলি বাহিরের সাধন: শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান—এইগুলিই নিয়ম। নিয়মে ক্লেশাবরণ ক্ষয় হয়।

বহিরঙ্গ যোগের শেষ দুই অঙ্গ—'আসন' ও 'প্রাণায়াম'। ক্রিয়াযোগে ইহাদের অপরিসীম গুরুত্ব, এমন কি যোগ-সাধনায় এই দুইটিই কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য অঙ্গ। স্থিরভাবে সুখে উপবিষ্ট হওয়াই 'আসন' ['স্থিরসুখমাসনম্']। পরবর্তী যোগশাস্ত্রে

১। The Samkhy-yoga—Dr. Satkari Mookerji [Hist of Philo—Eastern & Western Vol I]

নানাপ্রকার আসনের উল্লেখ দেখা যায়—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি। পতঞ্জলি সুখাসনকেই আসন বলিয়াছেন। আসন স্থির হইলে কায়-ক্লেশ বিনষ্ট হয়, অঙ্গ হয় অচঞ্চল, চিত্ত ধীর। আসন স্থির হওয়ার পর 'প্রাণায়াম'। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদের নাম 'প্রাণায়াম'। দেহের জীবন-প্রবাহ বায়ুরই ক্রিয়া। মনের চাঞ্চল্যও বায়ুর প্রভাবে। বায়ুর স্তম্ভনে অস্থির মন সুস্থির হয়। প্রাণায়ামে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বার খুলিয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যোগের লক্ষ্য ঈশ্বরকে লাভ করাও নয়, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নয়, যোগের লক্ষ্য—বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মার মিথ্যা-বোধের অপসারণ ও জীবের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম দ্বারা তাহার ভূমিকা রচিত হয়। অন্তরঙ্গ সাধনে লক্ষ্যভেদ হয় অর্থাৎ সমাধি লাভ হয়। অন্তরঙ্গ যোগের প্রথম স্তর 'প্রত্যাহার'। যে ইন্দ্রিয় কেবল বিষয় চিন্তা করে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়, প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয়ের এই বৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়। ইন্দ্রিয় তখন শুদ্ধ চিত্তের বশীভূত হওয়ায়—কর্ণ আর শব্দ গ্রহণ করে না, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে না, চক্ষু রূপে আকৃষ্ট হয় না, জিহ্বা রসের জন্য লালায়িত হয় না, ত্বক স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হয় না; অন্তরিন্দ্রিয় মন তখন সঙ্কল্প-বিকল্পে অস্থির না হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্য ঐশ্বর্য-জ্ঞান মণ্ডিত চিত্তের বশীভূত হয়। এই অবস্থায় যাবতীয় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়; সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, আরাম-ব্যারাম তখন একাকার। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির এই নিরোধ চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের ভূমিকা।

ইহার পর 'ধারণা'। বিভূতিপাদের প্রথমসূত্র ধারণা-বিষয়ে—'দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা'—দেহের কোন কেন্দ্রে চিত্তের বন্ধই 'ধারণা'। ধারণার দেশ বা কেন্দ্র লইয়া তন্ত্রের 'ষট্‌চক্র নিরূপণ'। ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া একস্থানে সুনিবিষ্ট হয়।

ধারণার পর 'ধ্যান'। 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' [বিভূতি পাদ. ২], যাহাতে চিত্ত বদ্ধ হয়, তাহার চিন্তায় একতানতাই ধ্যান। ধ্যানে চিন্তাধারা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। ধ্যানের পরবর্তী অবস্থা 'সমাধি': সমাধি ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা, অর্থাৎ ধ্যানে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার স্থিরতা বা একতানতাই সমাধি। তখন স্ব লুপ্ত, প্রকাশিত স্বরূপ। জীবের পূর্ণতার প্রকাশ সমাধিতে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একীভূত অবস্থার নাম 'সংযম'। সংযমভূমিতেই বিভূতির প্রকাশ। সমাহিত সাধকের বিপুল বিভূতি। তিনি প্রজ্ঞালোক জয় করেন, জাতিস্মর হন, ইচ্ছামাত্র অদৃশ্য হইতে পারেন। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িতা সিদ্ধযোগী এই অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারী।

কিন্তু যোগীর লক্ষ্য ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি নয়, পূর্বের যে আদর্শ জীবের চরম প্রাপ্তি, তাহারই

সদৃশ হওয়াই যোগীর উদ্দেশ্য। সমাধির মধ্যেই এই পূর্ণতা। পূর্ণতারও স্তর ভেদ আছে: সমাধির তাই দুই স্তর—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (সবিকল্প সমাধি) ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি)। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদে সমাধির এই স্তরগুলির কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পুরুষ বস্তু-চেতনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু অন্তর্জগতের সহিত তখনও যুক্ত থাকে: অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের পরিপূর্ণ নিরোধ ঘটে, তখন অন্তর্জগতও লুপ্ত হইয়া যায়। তখন চিত্তও থাকে না, চিত্তের বৃত্তিও থাকে না। তখন পুরুষ স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ কেবল পুরুষের সদৃশ। এই অবস্থাতেই পরমার্থসিদ্ধি, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

যোগ ব্যবহারিক সাধনা, ইহার ফল প্রত্যক্ষ। এইজন্য ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মে যোগের স্থান আছে। কিন্তু এই যোগে স্পষ্টতঃ দুইটি ধারা লক্ষণীয়। একটি ধারার পরিচয় রহিয়াছে পাতঞ্জল দর্শনে এবং ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুরাণে—আর একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, লোক-প্রচলিত শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও নাথধর্মে এবং হঠযোগে। দ্বিতীয় ধারাটি লৌকিক ও প্রাচীনতর। মনে হয়, যোগ মূলতঃ ছিল লোক-জগতের সামগ্রী এবং পশুপতি ছিলেন পরম যোগী। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত পশুপতি যোগীর মূর্তি তাহার একটি প্রমাণ। যোগের অধীশ্বর যোগীশ্বর শিব—ইহা ভারতবর্ষের একটি সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাতঞ্জল যোগদর্শনে কোথাও শিবের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকায়ত ধর্মগুলিতে শিবই যোগের অধীশ্বর। দ্বিতীয়তঃ পাতঞ্জল দর্শনে 'যোগ' মানে চিত্তের বৃত্তিগুলির নিরোধ, কিন্তু লোকায়ত ধর্মে যোগ মানে 'মিলন' বা 'মেলন'। বাচ্যার্থে যোগশব্দের এই প্রয়োগ তন্ত্রের দান। আদিমতম সমাজে শিব ও শক্তি ছিলেন প্রধান দেবতা। শৈব ও শাক্তধর্মও ছিল শিব-শক্তির যুগনদ্ধ মূর্তির মত অবিনাভাবে যুক্ত। এইজন্য শৈবধর্মে যোগ যেমন তন্ত্র-স্পৃষ্ট, শাক্ত সাধনাতেও তেমনিই যোগ শৈবমত দ্বারা প্রভাবিত। শৈব যোগের আসন, প্রাণায়াম, দেহতত্ত্ব, ধ্যান তন্ত্রে পরিগৃহীত, তেমনই আবার যোগ-সাধনায় ষট্‌চক্রের কল্পনা, শিবের সহিত শক্তির মেলন বা কুণ্ডলিনীযোগ, নরনারীর দৈহিক মিলন-প্রক্রিয়ায় পরম সামরস্যের উৎপত্তি প্রভৃতি তন্ত্র হইতে আগত। যোগ-সাধনায় শিব-শক্তির এই যুগল ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে লোকায়ত ধর্মগুলিতে। নরনারীর মিলনে 'কায়া-সাধন' লোকায়ত যোগের মূল কথা। সেইজন্যই তাহাদের সাধন অতিশয় গুহ্য ও রহস্যাবৃত। 'কমল-কুলিশ যোগ' (বৌদ্ধ সহজিয়া), 'চন্দ্র-সূর্য-মেলন' (নাথপন্থ), 'রস-রতি যোগ' (বৈষ্ণব সহজিয়া) প্রভৃতি গূঢ় তাৎপর্যবোধক।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে রূপটি পাওয়া যায়, তাহা লোকায়ত যোগের

সংস্কৃত রূপ। উহাতে যোগের অর্থই স্বতন্ত্র। এই যোগ বেদান্তমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। সাংখ্য প্রবচনসূত্রে বলা হইয়াছে, 'সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা' [৫. ১১৬]—অর্থাৎ সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়।

পরবর্তীকালে বেদান্ত প্রভাবে 'সোহহম্'-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠাই যোগের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুরাণে এই লক্ষ্যটিই প্রধান, অর্থাৎ যোগী সেখানে সমাহিত স্তরে 'পরমাত্মনি লীয়তে'। পুরাণে তন্ত্রের মিলন-যোগ তত্ত্বটিও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে পাই,

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥ [বিষ্ণু. ৬. ৩. ৩১]

—এখানে যোগের অর্থ 'মেলন', ব্রহ্মে-মনে মিলন, বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। এখানে তন্ত্র ও বেদান্তের সন্ধি। পরবর্তী লোকায়ত ধর্মগুলিতেও যোগের এই মিশ্র রূপের প্রভাবই বিস্তৃত হইয়াছে।

(V) পূর্বমীমাংসা

বেদের কর্মকাণ্ড লইয়া যে দর্শন, তাহার নাম 'পূর্বমীমাংসা'। ইহাকে 'কর্ম-মীমাংসা'ও বলা হয়। বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বলা যায়, 'ক্রিয়াকর্মবারিধি'। এই অনন্ত কর্মসমুদ্রের কতকগুলি লহরী সূত্র-সাহিত্য—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও কল্পসূত্র। এই সকল সূত্রেরই আর এক প্রকারভেদ 'জৈমিনী-সূত্র'। ইহা বৈদিক কর্মের 'বিধি-বিবেক'। ক্রিয়ার প্রয়োজন কি, ফলশ্রুতি কি, কোন্ ক্রিয়া আবশ্যিক, কোন্‌টি ঐচ্ছিক—কর্ম-মীমাংসা তাহারই মীমাংসা। এই মীমাংসার পূর্বতন আচার্য ছিলেন, বাদরি, আত্রেয়, ঐতশায়ন। মহর্ষি জৈমিনী তাঁহাদের উত্তরসূরী।

জৈমিনীসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামী (খ্রীঃ ২য় শতক); ইহা শবর-ভাষ্য নামে খ্যাত। এই ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মীমাংসকদের মধ্যে দুইটি গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে—ভট্ট সম্প্রদায় ও গুরু সম্প্রদায়। কুমারিল ভট্টই ভট্ট মতের প্রচারক। গুরুমতের প্রবর্তক আচার্য প্রভাকর। ভট্ট ও গুরুমত দ্বারা মীমাংসার 'দর্শন'-ভাগ পরিপুষ্টি লাভ করে।

আদৌ কর্মমীমাংসায় দর্শনের ভাগ ছিল অল্প; ইহা ছিল প্রধানতঃ কর্মের বিচার। জৈমিনী-সূত্রেও দর্শন অপেক্ষা ধর্মের (= কর্মের) বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিচারের দিকটাই প্রধান। এই সূত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত: ১. প্রমাণ, ২. যাগ-দানাদি কর্মভেদ, ৩. শেষবিচার, ৪. পুরুষার্থ ও ক্রত্বর্থ কর্ম-প্রবৃত্তি, ৫. বিধির ক্রম, ৬. অধিকার,

৭. সামান্যাতিদেশ, ৮. বিশেষাতিদেশ, ৯. উহ ['অপূর্বোৎপ্রেক্ষণম্'], ১০. বাধ, ১১. তন্ত্র, ও ১২. প্রসঙ্গ।

কর্ম-মীমাংসার প্রথম সূত্র 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'। মীমাংসক 'ধর্ম' কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে একদিকে যেমন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকে বুঝায়, তেমনই বুঝায় 'কাম্যকর্ম'। ইহারই অন্তর্গত নৈতিক কর্ম, অভ্যুদয়-মূলক কর্ম। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের কর্তব্যও কর্মের অন্তর্ভুক্ত। বেদে সকলপ্রকার কর্মেরই নির্দেশ আছে। বেদ-বিধি-নির্দিষ্ট কর্মই 'ধর্ম' ['চোদনা-লক্ষণোঽর্থোধর্ম'—মীঃ. সূ. ১. ২]। মীমাংসা-দর্শনের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই কর্মেরই কথা। কর্ম অনেক প্রকার; যাগ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ), হোম (অগ্নি বা জলে আহুতি), দান প্রভৃতি। ইহাদের জন্য বহু 'বিধি', বহু 'নিষেধ', নানাপ্রকার বিচার। নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য—উহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, নৈমিত্তিক কর্মাদিরও সেই বিধি। কাম্যকর্ম ঐচ্ছিক। কর্মের লক্ষ্য অনুসারেও প্রকারভেদ আছে। পুরুষের জন্য যে কর্ম তাহা 'পুরুষার্থ', তাহা নিজের উপকারক। যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম 'ক্রত্বর্থ'। পুরুষার্থ ঐহিক-প্রতিকারী, আর ক্রত্বর্থ আমুষ্মিক। কর্মের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌টি গৌণ, তাহা লইয়াও বিচারের অন্ত নাই। যে কর্ম প্রধানের উপকারক তাহা 'পরার্থ', তাহাকে 'শেষ'ও বলে ['শেষঃ পরার্থত্বাৎ' ৩. ১. ২]। 'শেষ'এর বিচারে অনেক জটিলতা। কর্মের ক্রমভেদে বেদের নির্দেশই চূড়ান্ত। কর্মে অধিকারী ভেদ আছে। এই দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায় অধিকারের আলোচনা।

বস্তুতঃ জৈমিনী-দর্শনে কর্মেরই প্রতিষ্ঠা। কর্ম 'সর্বকাম-ধুক্'। কর্মেই অভ্যুদয়, কর্মেই নিঃশ্রেয়স্। কর্মমাত্রই ফলপ্রসূ। কেহ যদি পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করে, নিশ্চয় সে পুত্র লাভ করিবে, কেহ যদি বৃষ্টি কামনা করিয়া যজ্ঞ করে, নিশ্চয় সে বৃষ্টি লাভ করিবে; যিনি রাজ্য কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবেন, তিনি রাজ্য লাভ করিবেন। বেদ-বিধি অনুসারে কর্ম সম্পাদিত হইলে, তাহা হইতে 'অপূর্ব' (=কর্ম-জন্য শক্তি) সৃষ্টি হইবেই। এই 'অপূর্ব'-এর স্বীকৃতি কর্মমীমাংসার এক অপূর্ব বস্তু। কৃতকর্মের যে ফল দান শক্তি, তাহাই 'অপূর্ব'। 'অপূর্ব'বলেই কর্মপ্রবাহ চলে। মীমাংসামতে সৃষ্টির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই ['ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ'] জগৎ চিরকাল ধরিয়া বর্তমান।[১] 'অপূর্ব'-বলেই সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া

১। There is niether creation, nor destruction. The world is eternally there. This Mimansa view is unique in Indian Philosophy' [An Intro. to Indian Philo—Dr. S. C. Chatterjee & D. M. Dutta].

চলিয়া আসিতেছে। কর্ম সর্বশক্তিমান: 'It fully believes that 'karman' is all powerful and that even God, if He exists, can not interfere with its power'.[১]

মনীষী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্মমীমাংসার এই কর্ম-নিষ্ঠার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'কথাটা শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু একথা ঠিক যে, আধুনিক যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিন্তার তলে যে মনোভাব (attitude) রয়েছে, তার সঙ্গে মীমাংসার ভেতরকার মনোভাব মেলে। এককথায়, মীমাংসা একটা সায়েন্স' [হিন্দু ষড়্‌দর্শন]। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান, বৈজ্ঞানিকগণ ক্রিয়াকে মানেন, ক্রিয়ার ফলকে হাতে হাতে পাইয়া কর্মে বিশ্বাস করেন। অপরেও সেই ক্রিয়া বুঝিয়া হউক, বা না বুঝিয়া হউক পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করে। মীমাংসকেরও এই বিশ্বাস। কাহার উদ্দেশ্যে করা হইল, কেমন করিয়া ফল হইল, তাহা বিচারের আবশ্যকতা নাই, বৈদিক বিধি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া যন্ত্রের মত কর্ম করিয়া যাও, যন্ত্রের মতই ফল পাইবে। এই বিশ্বাসটাই কর্মবাদের মূল ভিত্তি।

কর্মের এই অবিসংবাদী 'অপূর্ব' স্বীকার করার ফলে, মীমাংসাদর্শনে—স্রষ্টা, সৃষ্টি, ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে জৈমিনী নীরব। জৈমিনী-মতে 'দেবতা'-সংজ্ঞাও অদ্ভুত। যজ্ঞকালে যাহার উদ্দেশ্যে যাগ (=ত্যাগ) করা হয়, তাহাই দেবতা। যেমন, যাগকালে বলা হয়, 'ইন্দ্রায় স্বাহা', 'অগ্নয়ে ইদম্‌' —এই চতুর্থ্যন্ত পদটিই 'দেবতা'। তাহা যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য ঘৃতাদির ন্যায় একটি অঙ্গ মাত্র। তাহা ভিন্ন সহস্রাক্ষ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের কল্পনা কেবল স্তুতি। আত্মা-প্রসঙ্গেও জৈমিনী-সূত্রে কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তী মীমাংসকগণ অবশ্য 'আত্মা' স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'আত্মা' নিত্য, এবং উহা দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, এমন কি জ্ঞানেচ্ছা হইতে ভিন্ন। এই আত্মাই কর্মের কর্তা ও ভোক্তা। মোটের উপর কর্মমীমাংসায় কর্মই মুখ্য—ঈশ্বর, দেবতা, আত্মা প্রভৃতির প্রশ্ন এখানে নগণ্য। এইজন্য কেহ কেহ জৈমিনী-দর্শনকে লোকায়ত (materialistic) দর্শন বলিয়াছেন।

তবে জৈমিনী-দর্শন নাস্তিক দর্শন নয়, কারণ, ইহাতে বেদকে প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসক বেদবাক্যকে বেদবাক্যই মনে করেন। তাঁহাদের মতে শব্দ নিত্য। শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র অন্যের নিকট অর্থ সুস্পষ্ট হয়, একই কালে উচ্চারিত

১। The Purva Mimansa—Ram Swami Iyer [Hist. of phil. Eastern & Western. Vol I]

শব্দদ্বারা বিভিন্ন লোক একই প্রকারে অভ্রান্ত প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে, শব্দের সংখ্যা-বৃদ্ধি নাই, বিনাশ-অনুমানের অবলম্বন নাই। কাজেই শব্দ নিত্য। বেদ এই নিত্য অভ্রান্ত শব্দের সমষ্টি। ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অগোচর বিষয়ের প্রতিপাদক, ইহা অব্যভিচারী, স্বাভাবিক, অপৌরুষেয় ও নিত্য। বেদবাক্যের প্রতি এই একনিষ্ঠা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস মীমাংসাদর্শনের অন্যতম বিশিষ্টতা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, দুইটি কথা স্মরণীয়: মীমাংসক বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলেন নৈর্ব্যক্তিক অর্থে —বেদ কোন পুরুষের বচন' নয়—ইহা ঈশ্বর বা প্রজাপতি—কাহারও রচনা নয়। দ্বিতীয়তঃ বেদবাক্যের সার্থকতা 'বিধায়ক' বাক্যে—অর্থাৎ বেদের যে বাক্যগুলি বিধি-বিষয়ক, যাহাতে কর্মের বিধান আছে, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ; বেদে বিধায়ক বাক্য ব্যতীত যে সকল 'অর্থবাদ' আছে, তাহা যতদূর বিধায়ক বাক্যের পরিপোষক, ততদূরই সার্থক। [মী. সূ. ১. ২. ১]

আচারনিষ্ঠ ভারতবাসীর জীবনে মীমাংসাদর্শনের প্রভাব অপরিসীম। বেদের প্রত্যেকটি বর্ণ, অক্ষর, শব্দ ও বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করার মূলে মীমাংসার প্রভাব বিদ্যমান। ভারতীয় জীবনে কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাসক্তিও মীমাংসার দান। পরবর্তীকালে 'স্মৃতি' মীমাংসার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় মীমাংসার প্রভাব অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াই মীমাংসা হিন্দু-জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। মীমাংসার নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মকে কেহই নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, যোগ ও জ্ঞানের ভিত্তিও কর্ম। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'য় 'অথ' শব্দটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উহা কর্মেরই ইঙ্গিত। কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কর্মমীমাংসার দ্বারা কিছুটা গোঁড়ামি ও সংস্কার হিন্দু সমাজে বিস্তৃত হইয়াছে বটে. কিন্তু সে দোষ মীমাংসার নয়। কর্ম মীমাংসা কর্মের মধ্য দিয়া সাংসারিক শৃঙ্খলার প্রতিই অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়াছে। কর্ম মীমাংসা ভাববাদী দর্শন নয়, প্রত্যক্ষবাদী। ইহা কর্তব্যকে অবহেলা করে নাই: **It emphaises the moral duties of man that he owes to himself, to his family and relatives and to his community and nation. [Ramswami Iyer]**

কর্ম জীবনের অঙ্গ, কর্মহীন বিষয়ীর কল্পনা অর্থহীন—এ সিদ্ধান্ত কর্ম মীমাংসার; কর্ম মীমাংসা এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, 'শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ' [গীতা ৩, ৮]; পুরুষার্থ কর্ম দ্বারা দ্রব্যার্জন বিহিত হইয়াছে; ইহা জীবিকা-অর্জনের উপায়। শুধু তাই নয়, কর্ম কেবল ব্যক্তির জন্য অপূর্ব প্রসব করে না, ব্যষ্টির কর্ম সমষ্টির জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে; ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এক কর্মবন্ধনে

শৃঙ্খলিত। কর্ম মীমাংসার তন্ত্রাধ্যায়ে [১১ অধ্যায়] অর্থশাস্ত্র, রাজনীতির বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। জৈমিনী মতে যে কর্ম বহুর উপকারক তাহাই তন্ত্র। নিষ্কাম কর্মবাদের উৎসও মীমাংসা দর্শন। মোটের উপর, কর্মমীমাংসার কর্মযোগ সক্রিয় জীবনাদর্শেরই প্রতীক। কর্মযোগীর কর্মপ্রেরণায় এ আদর্শ উপেক্ষণীয় নয়।

(vi) বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা

বেদের অন্তভাগ উপনিষদকে বলা হয় 'বেদান্ত'। বেদান্ত বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। বেদান্ত শব্দটি উপনিষৎ ও দর্শন—উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হয়। উভয়ের প্রতিপাদ্যও এক। তবু উপনিষদে ও দর্শনে পার্থক্য আছে। উপনিষদে জ্ঞানালোচনা বিস্তৃত, বিবিধ কাহিনী দ্বারা ব্যাখ্যাত—দর্শনে আলোচনা সূত্রিত, উহাতে কাহিনীর স্থান নাই। তাহা ছাড়া, উপনিষদে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায় যুক্তির স্থান অল্প, দর্শনের সিদ্ধান্ত যুক্তি-প্রধান।

বেদান্তদর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা; ইহা পূর্বমীমাংসার প্রতিযোগী। পূর্ব ও উত্তর শব্দ দুইটি কালবাচক নয়, উহা একই বেদের দুইটি দিক—একটি কর্মের, অপরটি জ্ঞানের। বেদের উত্তরাংশ জ্ঞানেরই আলোচনা, তাই জ্ঞান-প্রতিপাদক দর্শনের নাম উত্তর মীমাংসা। ব্রহ্মনিরূপণ ও ব্রহ্মোপাসনাই ইহার প্রতিপাদ্য—এইজন্য ইহাকে 'ব্রহ্মসূত্র'ও বলা হয়। ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণ ব্যাসদেবের রচনা।

এই সূত্রে চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া 'পাদ'। ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাস্য 'ব্রহ্ম': প্রথম সূত্রেই সেই জিজ্ঞাসা, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এই ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহারই উত্তর প্রথম অধ্যায়। সূত্রকার এই অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় দেখাইয়া, তাহাদের অভিধেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মই 'শাস্ত্রযোনি' [১. ১. ৩] শাস্ত্রসমূহের কারণ, শ্রুতিমন্ত্রে তাঁহারই গান ['মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে'—১. ১. ১৫]। কতকগুলি শ্রুতিবাক্যে ভেদ ব্যপদেশ থাকিলেও, অসামঞ্জস্য নাই। যেমন বলা হইল, তিনি 'অর্ভকৌক' [১. ২. ৭]—অর্থাৎ তিনি অল্পপরিমিত স্থানে থাকেন। উহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব বাধিত হইল না, কারণ, যে ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে হৃদ্‌পদ্মে (দহর-পুণ্ডরীকে) অবস্থিত, তিনিই আবার 'ভূমা', 'ব্যোমবৎ' (আকাশের মত বিরাট), তিনি আকাশ-অম্বর ধারণ করিয়া আছেন ['অক্ষরমম্বরান্তধৃতে'-১. ৩. ১০]। ব্রহ্ম সর্বমূল—'যোনিশ্চ হি গীয়তে' [১. ৪. ২৭]।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে—সাংখ্য, বৈশেষিক, সেশ্বর সাংখ্য (যোগ), ন্যায়, শৈব ও ভাগবতাদির মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ

পাদে জীব ও লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি বর্ণনা। প্রকারান্তরে ইহাই বেদান্ত দর্শনের 'সৃষ্টি-প্রকরণ'। সৃষ্টি ব্রহ্মময় : ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোমে ব্রহ্ম-লক্ষণ বিদ্যমান, জীবও ব্রহ্ম।

তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের সংসারগতির প্রকারভেদে জ্ঞান-বৈরাগ্য সাধন ও মুক্তিফলের বিষয় সূত্রিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম অব্যক্ত ['তদব্যক্তমাহ হি'—৩. ২. ২৩], তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন,—আবার ইহাও বলা হইয়াছে আরাধনাকালে তাঁহাকে ভক্তি ধ্যান ও একাগ্রতা দ্বারা জানা যায় ['অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌'—৩. ২. ২৪] এই সকল নির্দেশে কোন বৈলক্ষণ্য নাই—কারণ কর্ম ও জ্ঞানের সহযোগিতাতেই ফলোৎপত্তি। তবে বাদরায়ণমতে জ্ঞানেরই উৎকর্ষ।

চতুর্থ অধ্যায়ে এই জ্ঞান-সাধনার ফল বিচারিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারা অর্চিরাদি মার্গে গমন হয়, হিরণ্যগর্ভের সামীপ্য লাভ হয়—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল স্ব-স্বরূপে অবস্থান। তখন জীব চৈতন্যস্বরূপ ['চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ'—৪. ৪. ৬], স্বাধীন ['চানন্যাধিপতি ৪. ৪. ৯]। ইহাই যথার্থ মুক্তি। এরূপ অবস্থায় আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মসূত্রের সমাপ্তি এই ফলশ্রুতির প্রতিশ্রুতি লইয়া—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। দ্বিরুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে।

দর্শনের সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত, জটিল ও নানার্থবোধক। ভাষ্য ব্যতীত উহাদের মর্ম ভেদ করা দুষ্কর। কিন্তু ভাষ্যকারগণের স্ব স্ব ধারণা ও ধর্মবোধানুসারে ভাষ্য রচিত হওয়ায় একই সূত্রের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহার ফলে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠে। বেদান্তের দ্ব্যর্থক সূত্রাবলী অবলম্বন করিয়াও বহু বাদ সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান—শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ এবং নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

॥ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ॥

ভারতীয় মনীষার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি আচার্য শঙ্কর। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তিবলে তিনি তৎকাল প্রচলিত বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, কর্মমীমাংসা, শৈব, শাক্ত ও পঞ্চরাত্র মতবাদকে খণ্ডন করিয়া কেবল অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর তিনি যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা শারীরক ভাষ্য, বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ নামেও পরিচিত। শঙ্করাচার্যের মূল প্রতিপাদ্য—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

'ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌'। তাঁহার অংশ নাই, অংশী নাই—সজাতীয়, বিজাতীয় কিংবা স্বগত ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড এক এবং দ্বিতীয়রহিত। ব্রহ্ম নির্গুণ, অর্থাৎ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত ; তিনি নির্বিশেষ—তাঁহার কোন বিশেষণ নাই ; তিনি সর্বোপাধি বিবর্জিত অর্থাৎ নাম-রূপ-বিহীন। তাঁহার কোন ক্রিয়াও নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, এইজন্য তিনি অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয়। এই যে ব্রহ্ম, ইঁহাকে কোন কিছু দিয়াই বুঝানো সম্ভব নয়। তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ'। ব্রহ্ম কেবল 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ' অর্থাৎ তিনি সৎস্বরূপ (নিত্য), চিৎস্বরূপ (চৈতন্যঘন) এবং আনন্দস্বরূপ (আনন্দঘন)। নিত্যত্ব, চৈতন্য এবং আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নহে। গুণে ও স্বরূপে প্রভেদ এই যে, গুণ বস্তু-ভিন্ন ধর্মবিশেষ, আর স্বরূপ বস্তুগত। স্বরূপ বস্তুর সহিত অবিনাভাবে যুক্ত। গন্ধ পুষ্পের গুণ, কিন্তু মিষ্টত্ব চিনির স্বরূপ। এই যে নির্গুণ, নির্বিশেষ, নামরূপহীন, অকর্তা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয়, ইনিই শঙ্কর মতে ব্রহ্ম।

তাহা হইলে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের সগুণত্বের কথা বলা হইয়াছে, বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সর্বকর্মা, সর্বকাম—তাহা কি? শঙ্কর মতে শ্রুত্যুক্ত এই সকল বিশেষণ ও উপাধি ভক্তি অর্থাৎ ঔপচারিক। ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষণ-রহিত ও নির্বিকল্প, কোনক্রমেই তাহার বিপরীত নয়, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রত্যেকটি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ-নির্গুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] শঙ্কর আরও বলেন, উপাধিযোগেও নিরুপাধি ব্রহ্ম দ্বিরূপ হইতে পারেন না, স্বচ্ছ স্ফটিক কখনও অলক্তাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছ স্বভাব হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব কল্পনা কিংবা নিরুপাধি ব্রহ্মে উপাধিসংযোগ সব কিছুই মিথ্যা ও অবিদ্যাপ্রসূত—'ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধিনাঞ্চ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ' [শাঃ ভাঃ—৩. ২. ১১]।

অদ্বৈতবাদে এই অবিদ্যা বা ভ্রান্তির ভূমিকা সামান্য নয়। উহা মিথ্যা হইলেও উহার অসাধারণ শক্তি। ভ্রান্তিবশেই পরম সত্য আবৃত হয়, ভ্রান্তিবশেই মিথ্যা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। রজ্জু ও সর্প দুইটি পৃথক বস্তু, কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম একটি প্রাত্যহিক ঘটনা। অভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জু রজ্জুই, উহা সর্প নয় ; কিন্তু ভ্রান্তির এমনই কারসাজি যে, উহার ফলে রজ্জুকেই সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ভয় পায়, শিহরিয়া উঠে, চিৎকার করে। যতক্ষণ এই ভ্রান্তির খেলা, ততক্ষণ মানুষের স্বস্তি নাই, ততক্ষণ তাহার ভয়-শিহরণেরও অন্ত নাই। অদ্বৈতবাদমতে এই ভ্রান্তির পারিভাষিক নাম 'অধ্যাস'। যে বস্তু যাহা নয়, সেই বস্তুতে তাহার যে আরোপ—'অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ'—তাহারই নাম 'অধ্যাস'। অধ্যাসকে একেবারে

১। অন্যতর লিঙ্গ পরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষপাস্ত সমস্ত বিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে [শা. ভাষ্য ৩. ২. ১১]

মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবারও উপায় নাই; শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম বা বন্ধ্যার পুত্রের মত উহা অলীক নয়; মিথ্যা হইলেও উহা ক্ষণেকের জন্য সত্য, এমনকি অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে ইহা জন্মজন্মান্তর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

এই অধ্যাসের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা বা 'মায়া'। শঙ্করাচার্য তাহার ভাষ্যে এই মায়া সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন। মূল ব্রহ্মসূত্রে মায়ার কথা বলা হইয়াছে একটি সূত্রে ['মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত স্বরূপত্বাৎ'-৩. ২. ৩—স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টি মায়া মাত্র, সত্য নহে]। শঙ্করমতে এই মায়াই ভ্রম বা স্বপ্ন-সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মায়া মিথ্যা, কিন্তু অনাদিনিত্যা। মায়া 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী'; ইহাই সত্যকে আবৃত করে, মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপিত করে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তিতে রজতভ্রান্তিও মায়ার রচনা। জগৎ স্বাপ্নিক মায়া মাত্র। ['মায়য়া কল্পিতং জগৎ']। মায়ার এই বিশিষ্ট ভূমিকা হেতু শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 'মায়াবাদ' নামেও পরিচিত।

ব্রহ্ম ও মায়া, সত্য ও অধ্যাস, পারমার্থিক দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি—এইগুলিই অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা। শঙ্করমতে ব্রহ্ম অপরিণামী, অতএব জগৎ তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। তাহা হইলে জগৎ কি? শঙ্কর বলেন, উহা 'বিবর্ত' বা মিথ্যাবোধ মাত্র। সাংখ্যমতে জগৎ বা সৃষ্টি স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিণাম, যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তমতে সৃষ্টি ব্রহ্মের বিবর্ত, যেমন সর্প রজ্জুর বিবর্ত। রজ্জুই সত্য, রজ্জুতে সর্পকল্পনা একটা মিথ্যা ভ্রান্তি। তেমনই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ স্বাপ্নিক মায়া মাত্র। কিন্তু জগৎ মায়ার রচনা হইলেও, 'সৃষ্টি অনির্বচনীয়'। উহা সত্য না হইলেও ক্ষণেকের জন্য সত্য লোকব্যবহারের দিক হইতে উহা সত্য। তাই লোক-ব্যবহারের দিক হইতে এই মায়া-কল্পিত জগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হয়, শঙ্করাচার্য তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টিক্রমে অদ্বৈতমতে বিশেষত্ব আছে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নাই, জড় প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টির বিস্তার। শঙ্কর সেখানে বলেন, জড় প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, মূলতঃ ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ ['জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রঃ সূ. ১. ২]। কিন্তু ব্রহ্ম তো নিষ্ক্রিয়, অকর্তা—তাঁহার সৃষ্টির যোগ্যতা কোথায়? শঙ্কর বলেন, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ ও অকর্তা হইলেও লোকব্যবহারের জন্য তিনি সগুণ, কর্তা, নামময় ও রূপময়—'অধ্যারোপিত নামরূপ-কর্মদ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দিশ্যতে' [বৃহদারণ্যকোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য ২. ৩. ৬]। ব্যবহারিক স্তরে উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি অনন্ত গুণাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন; তিনি জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-পাতা, জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির কর্মফলদাতা। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম

ও ঈশ্বর অভিন্ন, কিন্তু ব্যবহারতঃ ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র: ব্রহ্ম মায়াতীত, ঈশ্বর মায়া-উপহিত; ব্রহ্ম এক, ঈশ্বর নাম-রূপ সংযোগে বহু; ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ঈশ্বর উপাস্য।

অদ্বৈত বেদান্তমতে জীবও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; জীবও ব্রহ্মের ন্যায় অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন; তাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; তাহা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ['তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবঃ। জীবস্যাপি নিত্য চৈতন্যস্বরূপত্বম্' শঃ ভাঃ ২. ৩. ১৮]। তথাপি জীবের যে জন্ম-মৃত্যু কল্পনা, তাহা ঔপচারিক কল্পনা মাত্র অর্থাৎ তাহা ব্যবহারিক ['ভাক্তস্তেব জীবস্য জন্মমৃত্যুঃ ব্যপদেশঃ'-শঃ ভাঃ ২. ৩. ১৬]। এই ব্যবহারিক স্তরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বহু ও সঙ্কুচিত; জীব অবিদ্যা-মায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, কর্ম ও কর্মফল ভোগ। যেদিন জীবের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মিথ্যাবোধ বিদূরীত হয়, সেদিন জীবের স্ব-স্বরূপে অবস্থান, সেইদিনই জীবের 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহম্' জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাবই বন্ধন, অধ্যাসই বদ্ধাবস্থা; যেদিন এই অধ্যাসের 'অপবাদ', সেইদিন জীবের মুক্তি।

ব্যবহারিক স্তরের দিক হইতেই জীবের সাধনা। এই সাধনার দুই অঙ্গ: কর্ম ও জ্ঞান। জ্ঞানই মুখ্য সাধন, কর্ম তাহার সোপান মাত্র। জীব দুই প্রকার: বদ্ধ ও মুমুক্ষু। বদ্ধজীবের জন্যই ক্রিয়াকর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা। মুমুক্ষু জীবের সাধন জ্ঞান। জ্ঞানের ভূমিতেই মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয়, অধ্যাস বিনষ্ট হয় এবং জীবে-ব্রহ্মে ঐক্য উপলব্ধি হয়। আত্মজ্ঞান দ্বারা এই মুক্তি লভ্য। সাধন চতুষ্টয়[১] হইতে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। অধিকারী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রমে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমিতে মুক্তি দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি ও ও বিদেহমুক্তি। জীবন্মুক্তির স্তরে জীবের দেহাবসান ঘটে না, সংসারে থাকিয়াও জীব তখন সংসার-বিষয়ে নিরাসক্ত থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি উদার, সর্বজীবে সমভাব, সুখে দুঃখে সমান অবিচলিত। বিদেহমুক্তিতে পরম মোক্ষ, তখন জীব ও ব্রহ্ম একাকার—জলবিম্বের মহাসাগরে বিলয়।

অদ্বৈতবাদের প্রভাব ভারতীয় জীবনে অপরিসীম। সংসার মায়া, সত্য ব্রহ্ম—এই বোধ প্রায় সর্বত্র প্রসারিত। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, শৈবদর্শন ও শাক্তমত অদ্বৈত বেদান্তের রঙে অনুরঞ্জিত। পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম কেবলমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এই প্রভাব বহুবিস্তৃত হইয়াছে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে।

---

১. সাধন চতুষ্টয়—(i) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (ii) ইহামুত্রার্থ ভোগবিরাগ, (iii) শমদমাদি ষট্‌ক সম্পৎ এবং (iv) মুমুক্ষুত্ব

অনেকে মনে করেন, অদ্বৈতবাদ দ্বারা এদেশে নিষ্ক্রিয়তা, ঔদাসীন্য ও সংসার-বিরক্তি প্রসার লাভ করায় ঐহিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মত ভিন্ন প্রকার। তাঁহারা বলেন, 'The greatness of Samkars metaphysical achievement rests on the intensity and splendour of thought with which the search for reality is conducted, on the high idealism of spirit with which he grapples the difficult problems of life and on the vision of consummation which places a divine glory on human life'.[১]

॥ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ॥

শঙ্করাচার্যের তিন শত বৎসর পরে আর একজন প্রতিভাধর আচার্য ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন। তিনি আচার্য রামানুজ। রামানুজ শঙ্করাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বেদান্ত-ভাষ্যকার। অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়া তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' নামে পরিচিত। রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব। রামানুজের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নূতন নয়। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নন, প্রচারক। শ্রীভাষ্যের ভিত্তি বোধায়ন বৃত্তি ও প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ্ মতে অদ্বৈত বিশিষ্ট, অর্থাৎ qualified ; ইহা চিদচিদ্‌বিশিষ্ট (চিৎ=জীব, অচিৎ=জগৎ) অর্থাৎ জীব-জগৎ বিশিষ্ট অদ্বৈত। এই মতে যিনি এক, তিনিই বহু।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সোঽহম্' মত ভ্রান্ত, অতএব 'অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব'। শ্রীভাষ্যে তিনি অদ্বৈত মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর পৃথক নহেন, ঈশ্বরই ব্রহ্ম। সবপ্রকার দোষবর্জিত ('নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধ'), সকল কল্যাণগুণের আকর ('সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক'), মহাবিভূতিসম্পন্ন সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ নহেন। তিনি সর্বপ্রকার কল্যাণজনক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আশ্রয়, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিতবৎসল ও পরম করুণাময় [শ্রীভাষ্য. ৪. ৪. ২২]। ব্রহ্মের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে সৎ, চিৎ, আনন্দ গুণ প্রধান। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়ও নহেন। জগতের সৃষ্টি ও সংহার, জীবের বন্ধন ও মুক্তি তাঁহারই

১। Vedanta (Samkar)—S. Radhakrishnan [Hist of phil. Eastern & Western Vol I]

কার্য। এক কথায় তিনিই 'সর্ব' ['পরমাত্মা সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য']। সর্বাত্মা এই পুরুষোত্তম ব্রহ্মে গুণ, বিশেষণ ও কর্মের স্বীকৃতিই রামানুজের বিশেষত্ব।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে জীব ও জগৎ যথাক্রমে চিৎ ও অচিৎ। পরমকারণ ব্রহ্ম এই চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ['কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরম পুরুষঃ'—শ্রীভাষ্য]; অথবা প্রকারান্তরে বলা যায়, চিদচিদ্বস্তু জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর। এইদিক হইতে ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন হইলেও স্বভাব বা ধর্মের দিক হইতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। কারণ জীব বা জগতের স্বভাব ব্রহ্মে সংক্রমিত হয় না। আবার জগতের স্বভাবও জীবে সংক্রমিত হয় না। রামানুজের এই মতের মধ্যেই ভেদাভেদবাদের বীজ নিহিত। ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন; ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু; ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব। দুঃখ ভোগের যোগ্য খদ্যোততুল্য জীব-চৈতন্যের উৎকৃষ্ট ও সর্বপ্রকার কল্যাণগুণের আধার ব্রহ্ম পদার্থের স্বভাব লাভ উপপন্ন হয় না। তেমনই ব্রহ্ম ও জগৎ। স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, অতি হেয় অচেতন কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদি পদার্থরূপ জগৎ অনিন্দনীয়, সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট, চৈতন্যময় ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্য ইহাদের ভেদ ও অভেদ, ব্যধিকরণ্য ও সমানাধিকরণ্য দুয়েরই নির্দেশ আছে [শ্রীভাষ্য ২. ১. ২৩]।

রামানুজমতে জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকার বিশেষ। অতএব ইহা 'বিবর্ত' (মিথ্যাবোধ) নয়, ব্রহ্মেরই পরিণাম। পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় এখানে জীব বা জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় নাই, ব্রহ্মের সহিত উহাদের নিত্য সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে। পরেশ্বর পুরুষোত্তম বিষ্ণু সর্বনিয়ন্তা, কাজেই তাঁহার সহিত জীবের উপাস্য-উপাসক সম্পর্ক।

জীব দুই প্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধ জীবের দুই প্রকারভেদ—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। বুভুক্ষুর সাধন সকাম কর্ম, ফল পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও পুনরাবর্তন। মুমুক্ষুর সাধন মুক্তির লক্ষ্যে, তাই তাঁহার সাধন নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের ফলে ঈশ্বর-ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিই মুক্তির সাধন। 'প্রপত্তি' (শরণাগতি) বিশিষ্ট-সাধন। শ্রুতিতে আছে 'যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ'—যাঁহাকে তিনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ['যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি'—শ্রীভাষ্য]। ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তি লাভ হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তিও রামানুজ মতে শঙ্কর মত হইতে ভিন্ন। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়াই মুক্তি; রামানুজ মতে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া মানে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে জীবত্বের চরম বিকাশে নিত্য বিষ্ণুপদ সেবার যোগ্যতা লাভ করা। দেহপাতের পূর্বে এ মুক্তি লাভ করা যায় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যুক্তি ও বিশ্বাসের ধর্ম ; ইহা যুক্তিগ্রাহ্য ভক্তির মার্গ। এখানে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। রামানুজের মতবাদে অদ্বৈত ও দ্বৈত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। রামানুজের বিষ্ণু—উপনিষদের ব্রহ্ম, পাঞ্চরাত্রের বাসুদেব ও পুরাণের ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ও রামানুজ ভারতবর্ষের দুই বিশিষ্ট গৌরব। এদেশের জীবনে উভয়মতের প্রভাবই অপরিসীম; উভয়ের মত-পার্থক্যও লক্ষণীয় :

"ইঁহাদের একজন অদ্বৈতবাদী, আর একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। একজন বলেন, একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপর সব অসত্য, অপরে বলেন, জীব ও জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন, ধারণাধ্যানসমাধিদ্বারা সেই তত্ত্বে প্রাণমন ঢালিয়া তাঁহাতে গলিয়া যাও, তাঁহাতে মিশিয়া যাও ; অপরে বলেন, তাঁহার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষস্থল সিক্ত কর, তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে ধন্য কর। একজন বলেন অভিন্নভাবে ব্রহ্মত্বের স্বরূপতা লাভেই মুক্তি ; অপরে বলেন, ভগবানের চিরকৈঙ্কর্যই মুক্তি। একজন বলেন, জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ, সুতরাং কর্ম জ্ঞানের সহায় ; অপরে বলেন, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন।"[আচার্যশঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

॥ মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ ॥

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য বেদান্তসূত্রকে ভিত্তি করিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ইনি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের উড়ুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর পুরাণে [৩৯-৪০ অধ্যায়] মধ্বাচার্যকে শবনিন্দক, হেতুবাদী বৈষ্ণব ও মহাদুষ্ট চার্বাক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ['প্রচ্ছন্নোঽসৌ মহাদুষ্টশ্চার্বাকো মধুসংজ্ঞকঃ']। মধ্বাচার্য কর্তৃক শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন এবং মায়াবাদের নিন্দাই সম্ভবতঃ এই অখ্যাতির কারণ। মধ্বাচার্য প্রবর্তিত মাধ্বিসম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মধ্যে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামে খ্যাত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিও অল্প নয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই মাধ্বিসম্প্রদায়ের একটি শাখা।

শঙ্করমতে 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা', অদ্বৈত ব্রহ্মই নিত্য তত্ত্ব ; মাধ্বমতে তত্ত্ব দুইটি—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। সর্বশক্তিমান্, স্বরাট্, সগুণ ভগবান বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব—'পরমেকো মহান্ বিষ্ণুঃ'। তিনি পরমকরণ-কারণ। তিনিই সর্বকর্তা, স্রষ্টা ও সর্বকর্মফলদাতা ('Doer and giver of all') ; তিনিই বন্ধনকর্তা, ত্রাতা, মুক্তিফলদাতা। জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র, তাহা বিষ্ণুকর্তৃক সৃষ্ট ও বিষ্ণুর অধীন। অধীন হইলেও এই অস্বতন্ত্র

জগৎও সত্য—'তস্মাৎ সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি'। এই তত্ত্বই মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদের ভিত্তি। অস্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইতে পৃথক ; বিষ্ণু বিভু, জীব অণু—বিষ্ণু কর্তা, জীব কার্য—বিষ্ণু সেব্য জীব সেবক—জীব সর্বথা পরতন্ত্র। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদও এই মতে অগ্রাহ্য। 'মিথ্যাভূতঃ প্রপঞ্চোঽয়ং মায়ানির্মিত ইত্যতে'—এই মত তাঁহাদের মতে ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন, 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্'। মধ্বাচার্যমতে বেদ নিত্য, নির্দোষ, স্বতঃপ্রমাণ ও অপৌরুষেয়—কিন্তু পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রই জীবের আশ্রয়। সাধন-ব্যাপারে পাঞ্চরাত্র মতকেই মধ্বাচার্য প্রাধান্য দিয়াছেন।

মাধ্বমতে স্বতন্ত্র, নিত্য, জগৎ-কারণ, সর্বশক্তিমান্, সর্বকর্তা, সর্বময় বিষ্ণুই একমাত্র ধ্যেয়—'বিষ্ণুরেকঃ পরো ধ্যেয়ো নান্যো দেবঃ কদাচন', সুন্দর কমলাপতি বিষ্ণুই সর্বদা আরাধ্য ['তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সদা সেব্যঃ সুন্দরঃ কমলাপতিঃ']। সব কিছু 'বিষ্ণ্বর্পিত'—জীব যখন এই সত্য ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া যায় যে—জীব বিষ্ণুর দাস, তখনই বন্ধন—তখনই মনে হয়, জীব কর্তা। ইহাই পতনের মূল। কিন্তু জীব যখন বিষ্ণুকেই সর্বময় বলিয়া জানে, জানে যে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি', তখনই জীবের বিকাশ ; তখন ভগবানের দাস্যই জীবের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে। দাস্যভাবে বিষ্ণুর প্রিয়ত্ব ও প্রসন্নতা অর্জন করাই জীবের সাধন। এই সাধনে ক্রিয়া-কর্ম পরিত্যাজ্য নয় ; অঙ্কন, নামকীর্তন, ভজন প্রভৃতি ক্রিয়া ভগবৎ-সেবার অঙ্গ। এই সেবাই মুক্তির সাধন। মাধ্বমতে সাযুজ্য মুক্তি কাম্য নয়, লয়-মুক্তির কথা কল্পনা মাত্র—সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিই পরমার্থ—উহাই জীবের অভীষ্ট। জ্ঞানমিশ্রা বৈধী ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় এখানে ভক্তি জ্ঞান-প্রহরায় সীমিত।

॥ নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ ॥

নিম্বার্ক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, অপর নাম নিম্বাদিত্য। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে ইহার আবির্ভাব। বেদান্ত সূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম 'চতুঃসন্' বা 'ঋষি'-সম্প্রদায়। সনকাদি মুনি ও ঋষি নারদ এই সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য।

নিম্বার্ক-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা ভক্তি ; কাজেই আচার্য রামানুজের ন্যায় তিনি সগুণ, সবিশেষ পুরুষোত্তমকেই 'ব্রহ্ম' অভিধায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো রমাকান্তপুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ' [নিঃ ভাঃ ১. ১. ১]ঃ ইনি স্বভাবতঃ অনন্ত অচিন্ত্য গুণশক্তিদ্বারা

সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববিভূতির আশ্রয়। অসংখ্যেয় নাম-রূপে তাঁহার প্রকাশ, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, সর্বজ্ঞ, অনন্ত গুণাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্তা।

'সর্ব ভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবঃ' [নিঃ ভাঃ ১. ১. ৪]—নিম্বার্ক মতে ইহাই প্রধান সূত্র। জীব ও জগৎ তাঁহার মতে যথাক্রমে চিৎ ও অচিৎ; এবং উভয়ই ব্রহ্ম হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। রামানুজমতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্মতঃ ভিন্ন। নিম্বার্কমতে ভগবান রমাকান্ত সর্বভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ স্বরূপে ও ধর্মে জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে যেমন ভিন্ন, তেমনই অভিন্ন। জীব-জগৎ ব্রহ্মের স্ব-গত ভেদ, কাজেই উভয়ের অংশ-অংশী সম্পর্ক; শুধু তাই নয়,—ব্রহ্ম জীব-জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ অর্থাৎ জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, অতএব উভয়ের অভেদসম্পর্ক। কিন্তু জীব অণুপরিমাণ, ব্রহ্ম বিভু—জীব দুঃখভাগী, ব্রহ্ম চির সুখময়—জীব পাপভাগী, আর ব্রহ্ম 'অপহত পাপ্মা' (অপাপবিদ্ধ); কাজেই 'জীব-পরমাত্মনোর্ভেদোঽস্তি' [নিঃ ভাঃ ১. ১. ৬.]। পুরুষোত্তম ব্রহ্মই দৃশ্য জড়বর্গ ও জীব চৈতন্য উভয়ের নিয়ন্তা-রূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, আবার তিনি উহাদের অতীত; শক্তিমান্ ব্রহ্ম স্ব-শক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগদাকারে নিজেকে পরিণমিত করিয়াও অব্যাকৃত ও জগদতিরিক্ত।

এই সর্বরূপময় অথচ সর্বরূপাতীত, সর্বজগতের আশ্রয় ও নিয়ন্তা, আনন্দময় ও রসময় ব্রহ্মকে ভক্তিদ্বারা লাভ করা সম্ভব। নিম্বার্ক মতে ভক্তি 'প্রেমবিশেষলক্ষণা'। এই ভক্তিই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। ইহাতে জগৎকে ব্রহ্মময়রূপে ভাবনা ও ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে অতিরিক্ত সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তারূপে ভাবনা করিতে হয়। প্রথম সাধন-অঙ্গদ্বারা চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয় ও শেষ অঙ্গদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থ লয়মুক্তি নয়, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের সামীপ্য ও সারূপ্য লাভ করা। এই অবস্থায় জীবের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং একমাত্র জগৎ-সৃষ্ট্যাদি শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্যও লাভ হয়। দেহপাতের পূর্বে অবশ্য এই মুক্তি লাভ করা যায় না। দেহলয়ের পর ভক্ত জন্মাদিবিকারশূন্য হন এবং নিজেকে স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সব বিভূতি সম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ মনে করেন।[১] এই অবস্থাতে মুক্তাত্মার রসরূপ ব্রহ্মলাভে রসময় আনন্দময় অবস্থায় প্রতিষ্ঠা—'রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। এই অবস্থায় পরম জ্যোতিস্বরূপপ্রাপ্ত সংসার-বিমুক্ত জীবের (প্রত্যগাত্মার) আর পুনর্জন্ম হয় না।

নিম্বার্কমতের সহিত আচার্য রামানুজের মতের সাদৃশ্য আছে। উভয় মতেই

১। জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি" [নিঃ ভাঃ ৪. ৪. ১৯]

ব্রহ্ম সগুণ, জীব-জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, মুক্তি দেহলয়ের পর, আর চরম মুক্তিতে জীবের পূর্ণত্ব ও ব্রহ্মসাদৃশ্য অর্জন। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও রহিয়াছে: রামানুজমতে জীব-জগৎ ধর্মের দিক হইতে ব্রহ্ম-ভিন্ন, স্বরূপতঃ অভিন্ন—নিম্বার্ক মতে জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্মতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্ন। রামানুজের ব্রহ্ম ঐশ্বর্যঘন বাসুদেব, নিম্বার্কের ব্রহ্ম রমাকান্ত পুরুষোত্তম—রামানুজের সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, নিম্বার্কের সাধন প্রেমভক্তি। নিম্বার্কের বৈষ্ণবধর্মই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

॥ নাস্তিক দর্শন ॥

বৈদিক সাহিত্যে, আস্তিক দর্শনে ও ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে এক শ্রেণীর লোকের সংবাদ পাওয়া যায়, যাঁহারা বেদ মানেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, দেহকেই সর্বস্ব বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ঐহিক সুখকে পরম সুখ এবং কামভোগকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। বৈদিক সাহিত্যে ইহারা দাস, অসুর প্রভৃতি নামে অভিহিত। তাঁহারা অব্রহ্ম', অযজ্ঞা, অব্রতা। তাঁহারা দেবতার অস্তিত্বেও ছিলেন সংশয়বাদী, পরলোকেও তাঁহাদের অবিশ্বাস। মনুস্মৃতিতে ইহাদিগকেই বলা হইয়াছে 'হৈতুকান্' [মনু. ৪. ৩০] অর্থাৎ হেতুবাদী। ইহারাই নাস্তিক।

নাস্তিক মত অতি প্রাচীন, এমন কি উহা বেদপূর্ব। উহার প্রচলিত নাম 'লোকায়ত', 'চার্বাক' বা 'বার্হস্পত্য'। লোকায়ত মানে 'লোকেষু আয়ত' অর্থাৎ যাহা লোক বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। কেহ বলেন, লোকজগৎ যাহার আয়তন বা ভিত্তি, তাহাই লোকায়ত।[১] চার্বাক নামটিও সুপ্রচলিত। মহাভারতে দুর্যোধনের এক বন্ধু ছিলেন চার্বাক। তিনি ব্রাহ্মণবেশী হইলেও ব্রাহ্মণ্য নীতি বিরোধী, নাস্তিক। আবার কেহ বলেন, চার্বাক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, চারু বাকই চার্বাক, অর্থাৎ যে বাক্য আপাতমনোরম ও হৃদয়গ্রাহী তাহাই চারুবাক্ বা চার্বাক। আবার অনেকে বলেন, বৃহস্পতির অপরনাম 'চারু'; পুরাণে চার্বাকমত বৃহস্পতির মুখেই উক্ত হইয়াছে।[২] অতএব চার্বাক দর্শন মানে বার্হস্পত্য দর্শন। লৌক্য বৃহস্পতি এই মতের আদি প্রবর্তক।

১। 'Lokayata directed to the world of sense, is the sanskrit word for matearialism'—Hist. of phil. Eastern & Western Vol I

২। পদ্ম, সৃষ্টি ১৩; বিষ্ণু, ৩য় অংশ ১৮.

'নাস্তিক দর্শন' নামে স্বতন্ত্র কোন আকর গ্রন্থ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় এবং উহা লইয়া গ্রন্থও রচিত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ নাস্তিকমত বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোন সুপরিকল্পিত গ্রন্থ নাই। বেদ ও উপনিষদের কতিপয় সংশয়-বাক্যে, নাস্তিক দর্শনকে খণ্ডন করিতে গিয়া আস্তিক দর্শনোক্ত কয়েকটি সূত্রে, বৃহস্পতি-সূত্র নামে পরিচিত কতগুলি খণ্ডিত উক্তিতে, রামায়ণের জাবালি-সংবাদে, মহাভারতের চার্বাক উপ-পর্বাধ্যায়ে, পুরাণের কিছু অংশে এবং সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিতে এই দর্শন সম্পর্কে খানিক আলোচনা পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই মতবাদ সম্পর্কে একটি ধারণা গঠন করা সম্ভব। পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য তাঁহার বিখ্যাত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থের আদিতে লোকায়ত ও চার্বাক মতের একটি আলেখ্য দিয়াছেন। অধুনা লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন এই 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-ধৃত বাক্যগুলি দ্বারাই বিচারিত হয়। তাহা হইতে জানা যায়:

১. চার্বাকগণ নাস্তিক। তাঁহারা বেদে বিশ্বাস করেন না, শ্রুতিকে অপৌরুষেয় বা প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্ত নিশাচরাঃ'।

২. তাঁহাদের মতে স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, আত্মা নাই, পরলোক নাই—'ন স্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ'। এক কথায় তাঁহারা নাস্তি বাদী।

৩. তাঁহারা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন; অনুমান আদৌ অগ্রাহ্য। তাঁহাদের মতে, 'প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্'।

৪. তাঁহারা বলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। দেহ-সংযোগেই জীবন। দেহের বিয়োগেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, মৃত্যুর পরে কেহ পুনরাগমনও করে না। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।'

৫. অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়াও ব্যর্থ—'গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্'; শ্রাদ্ধাদিতে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহার ভোজন হয়, তবে পর্যটকের পক্ষে পাথেয় রাখিবার প্রয়োজন কি?

৬. বর্ণাশ্রম ধর্ম বা যজ্ঞক্রিয়া কোন কিছুই ফলদায়ক নয়। যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান যজ্ঞে স্ব-পিতাকে বলি দেয় না কেন? ['পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্ব-পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥']

৭. যাগ-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধক্রিয়া লোভী ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি; জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই সকল ক্রিয়ার বিধান রচনা করিয়াছেন।

৮. জীবের সৃষ্টিব্যাপারে অলৌকিক কোন শক্তিই ক্রিয়াশীল নয়; স্ত্রী-পুং সংযোগে জীবের জন্ম হয়। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূতের সমষ্টি দেহ। দেহে চৈতন্যের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বও নাই। চতুর্ভূতের সমবায়ে মদে মদশক্তির ন্যায়, দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে:

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবায়নলা'নিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ ॥

৯. জীবের একমাত্র লক্ষ্য সুখভোগ। ঐশ্বর্য ও কামভোগ দ্বারা ঐহিক সুখভোগই এই ভোগের তাৎপর্য। এই সুখই পুরুষার্থ—'সুখমেব পুরুষার্থঃ': অতএব 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ'।

১০. এই পুরুষার্থরূপ সুখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে। তাই বলিয়া সুখরূপ পুরুষার্থকে অবহেলা করা উচিত নয়। ধান্যের সহিত তুষ থাকেই, মৎস্যে শল্ক ও কণ্টক থাকেই—তাই বলিয়া ধান্য ও মৎস্য ভোগকে কে ইচ্ছা না করে! অতএব দুঃখভয়ে অনুকূল-বেদনীয় সুখকে বর্জন করা অনুচিত, উহা ভীরুতা ও মূর্খতার লক্ষণ: 'তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্। যদি কশ্চিদ্ভীরুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ'।

উপরের উদ্ধৃত মতবাদ হইতে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার্বাকগণ কোন অনুমান প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ বস্তুই একমাত্র সত্য। অতএব অনুমান-নির্ভর পরমাত্মা, আত্মা, বেদ, পরলোক, স্বর্গ, নরক, যাগযজ্ঞাদি কর্মের ফল তাঁহাদের মতে অবিশ্বাস্য। 'নাস্তি নাস্তি'—ইহাই নাস্তিক্যবাদের মূল ভিত্তি। তাহা হইলে 'অস্তি' কি? অস্তি এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সংসার, অস্তি এই 'অহং'। ইহাই একমাত্র সত্য। কাজেই অহংকে পরিতৃপ্ত কর। অহংএর পরিতৃপ্তি ইন্দ্রিয়সুখে, ভোগে। অঙ্গনা-আলিঙ্গনের মত সুখ কোথায়? ভোগসুখের জীবনই সার্থক জীবন। ঐহিক সুখই পুরুষার্থ। অতএব 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' চার্বাক মতের আর একটি বৈশিষ্ট্য সংশয়বাদ বা হেতুবাদ। এই হেতুবাদে সব কিছুই অবিশ্বাস্য।

এইজন্যই অস্তি-বাদীদের নিকট ইঁহারা বহু নিন্দিত। ভারতীয় সাহিত্যে—বেদে, উপনিষদে, আস্তিক দর্শনে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, এমন কি অস্তিবাদী সংস্কৃত

সাহিত্যে নাস্তিকদের প্রতি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, নাস্তিকের ব্যঙ্গচিত্রে অনেকস্থলে হাস্যরসের খোরাক পর্যন্ত জোগাইয়াছে [দ্রষ্টব্য কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক]।

কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে বা সাহিত্যে যে চার্বাক মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, বা তাহার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ণাঙ্গ চার্বাক মত প্রতিফলিত হয় নাই। প্রতিবাদিগণ এই মতের মন্দ দিকটিই মাত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং কোথাও বা উহার কদর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। চার্বাকমতে সুখ, অর্থ ও কাম সম্পর্কে স্থূল চিন্তাধারা যাহাই থাকুক, ইহার কতকগুলি ভালর দিকও ছিল। সে দিকটি আজ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন চার্বাকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন।

১. একদল ছিলেন বিতণ্ডাবাদী চার্বাক। 'পরমতদূষণ ও খণ্ডনই ইহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল। ইহাদের স্বতন্ত্র কোন আগম বা উপদেশ ছিল না। ইহারা কোন তত্ত্বকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এমন কি চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক আচার্য বৃহস্পতির উপদেশকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, অদৃষ্ট প্রভৃতি ত দূরের কথা, সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেন না।' এই চার্বাকগণ ঘোর নাস্তিক, ইহারাই তথাকথিত বৈতণ্ডিক, হৈতুক ও তত্ত্বোপপ্লববাদী।

২. আর একদল চার্বাককে বলা হইত 'ধূর্ত'। ইহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী। ইহাদের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, দেহই আত্মা। দেহ চাতুর্ভৌতিক। চতুর্ভূতের মিলনে মদে মদশক্তির ন্যায় এই দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। দেহ-ধ্বংসই মৃত্যু, উহাই মোক্ষ। ইহারা বলেন, জন্মান্তর পরলোক, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর নাই—ইন্দ্রিয় ভোগরূপ সুখই পুরুষার্থ। এই সুখের লক্ষ্যেই অর্থ অর্জন করিতে হইবে ও জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই মতটিই প্রচলিত চার্বাকমত।

৩. বৈতণ্ডিক ও ধূর্ত চার্বাক ব্যতীত আর এক দল চার্বাক ছিলেন, তাহাদিগকে বলা হইত 'সুশিক্ষিত চার্বাক'। ইহারা লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা স্বর্গ, পরলোক, ঈশ্বর, কর্মফল মানেন না,—কিন্তু অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, গান্ধর্ববেদ ও শুক্রনীতিকে জীবনে অপরিহার্য মনে করেন। তাহাদের মতে অর্থ ও কাম পুরুষার্থ,—'অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ'। সুখও ইহাদের মতে পুরুষার্থ, কিন্তু সে সুখ পাশবিক ইন্দ্রিয়সুখ মাত্র নয়, উচ্চতর-

মানসিক সুখ। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর মর্ত্যের 'রাজা'। অর্থ ও কাম রাজার করতলগত, ঐশ্বর্য ও শক্তিতে রাজার তুল্য কে? কামোপভোগেও রাজার একচ্ছত্র অধিকার। রাজা 'সুখী'। কিন্তু রাজার হস্তে দণ্ড; দণ্ড-সংযত সুখ ও ঐহিক ভোগই রাজার সুখ। সুশিক্ষিত চার্বাক এই সুখবাদে বিশ্বাসী। এই সুশিক্ষিত চার্বাক সম্বন্ধে আর্যসাহিত্য একরূপ নীরব। মনে হয়, ভারতীয় রাজ-নীতিতে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে ও গান্ধর্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত চার্বাক মতের প্রভাব আছে। কিন্তু এই সকল বিদ্যা এমনই পরিবর্তিত ও আর্যীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের ভিতরকার লোকায়ত মতকে আর লোকায়ত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

পরলোকে বিশ্বাসী ধর্মভীরু ভারতবাসীর নিকট চার্বাক মত কোনদিনই তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। দেহাত্মবাদ ও অনাত্মবাদ পরমাত্মবাদের ঘোর পরিপন্থী, আসুরবাদ চিরকাল সুরবাদের বিরোধী। তাই দেবাসুরের সংগ্রাম চিরন্তন। কিন্তু, সুরাসুরের বিবাদ চিরন্তন হইলেও আস্তিকগণ নাস্তিকতার প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নাস্তিকমতের বিরুদ্ধে তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইলেও লোকায়ত তথা চার্বাক মত অনেক ক্ষেত্রেই আর্যমতের অঙ্গীভূত হইয়াছে। নাস্তিকের যুক্তি ও বুদ্ধির শৃঙ্খলা, নাস্তিকের তার্কিকতা বা হেতুবাদ, তাহার স্বাধীনচিন্তা ও বাস্তব বোধ, লোকায়ত অর্থ-কামের চর্চা, সর্বোপরি প্রত্যক্ষদৃষ্ট সংসারে সুখে কালযাপনের নীতি ও দৈহিক সামর্থ্য ও বুদ্ধিদ্বারা কণ্টক উন্মূলিত করিয়া বস্তুজগতের অধিনায়কত্ব অর্জন করার পদ্ধতি কোনদিনই অবহেলিত হয় নাই। পার্থিব জীবন-যাত্রায় উহাদের উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়াই শুক্রনীতি ও অর্থশাস্ত্র, কামন্দকী নীতি ও গান্ধর্ববিদ্যা আর্যসমাজেও গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে, যোগ-তন্ত্রে, সাহিত্যে ও জীবনে চার্বাক মত বা লোকায়ত মতের প্রভাব কোন ক্রমেই অল্প নয়।

বৈতণ্ডিক মত অবশ্য কোনদিক হইতেই গ্রাহ্য নয়, কারণ বিতণ্ডা নিয়মহীন কূট তর্ক, নীরস ও বিচারবাহ্য। কিন্তু এই বিতণ্ডারই আর এক দিক 'বাদ' বা নিয়মানুগ তর্ক। ইহাতে যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির স্থান আছে, কাহারও কাহারও মতে তাহাই ভারতীয় দর্শনের মূল। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, 'বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনমত দার্শনিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে যতই স্থূল বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, ইহার স্থান যতই নিম্নে হউক না কেন, ইহাই ভারতের 'আদিদর্শন'। এই দর্শন মতই ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথিকৃৎ...ইহাকে পূর্বপক্ষ রূপে পাইয়াই অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রগুলি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়াছে' [চার্বাকদর্শন—শাস্ত্রী]।

ধূর্ত চার্বাক মতের দানও অসামান্য। ধূর্ত চার্বাকের কেবল সুখবাদ নিন্দনীয়

হইলেও তাহাদের স্বাকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র অকাট্য প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমান-প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিতে নব্য ন্যায়কেও গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, ন্যায়দর্শনের বাদ-জল্প-বিতণ্ডায় নিঃসন্দেহে হেতুবাদী চার্বাকের প্রভাব পড়িয়াছে। বেদের অন্তভাগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পাণ্ডিত্য ও শ্রুতত্ত্বের বিরুদ্ধে যে তির্যক মনোভাব দেখা যায় তাহাতে চার্বাক মতের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। শঙ্করাচার্য সাংখ্যকে বলিয়াছেন 'অবৈদিক' [শ. ভাষ্য. ১. ১. ৫]। সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্যে এই অবৈদিকত্ব পরিস্ফুট। তন্ত্রশাস্ত্রও অবৈদিক। বিশেষতঃ তন্ত্রের ম-কার সাধনে ভুক্তির প্রতি যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তাহা নাস্তিক ভোগবাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও নাস্তিক মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

সুশিক্ষিত চার্বাক নাস্তিক সম্প্রদায়ের গৌরব। রুচি ও নীতিজ্ঞানের দিক হইতে ইহারা প্রায় আস্তিকের কাছাকাছি। ইহারা বুঝাইয়াছেন যে, পৃথিবী কেবল দুঃখময় নয়, এখানেও সুখ আছে, প্রাপ্তি আছে। বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা মানুষ এই সুখ লাভ করিতে পারে। এই মত ঐহিক উন্নতির সহায়ক, সংগ্রামের পথে সুখ-অর্জনের প্রেরণা। ইহারা নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা জানেন, জীবনে দুঃখ আছে ; সেই দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াই পথে যাত্রা করিতে হইবে। দুঃখের জীবনে সুশিক্ষিত চার্বাক যেন একটি স্বতঃস্ফূর্ত সুখের ধারা, যাহা দুঃখের উপল ঠেলিয়া দুর্বার বেগে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। মাটিকে স্বীকার করিয়াই ইহারা মাটির উপর প্রত্যক্ষ সুখের সৌধ নির্মাণে অগ্রসর হন। দুঃখ তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারে না। প্রাণের উদ্যম ও সুখের নেশা তাঁহার দুঃখের ঘরে চিরসুখের রঙীন মশাল জ্বালাইয়া রাখে। আঘাতে তাঁহার প্রাণ-চকমকিতে কৌতুক-হাস্যের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে। ভোগ, সুখ ও হাসি ইহাদের জীবনের প্রধান সম্পদ।

মনে হয়, এই সমস্ত দিক হইতে সমগ্র আর্য সাহিত্যে চার্বাক বা লোকায়ত মতের প্রভাব গুরুতর। আর্য সাহিত্যের ধর্মবাহ্য প্রেম, চটুল পরিহাসপ্রিয়তা, অর্থনীতি, গান্ধর্ববিদ্যা ও বস্তুতান্ত্রিকতায় লোকায়ত মতের প্রভাব কোনক্রমেই অল্প নয়। আর্যগণ রক্ষণশীল এবং সমস্তদিক হইতেই আস্তিক্যের পরিপোষক ; ধর্মবিরুদ্ধ যাবতীয় ভাব সেখানে ধিকৃত ও বহুনিন্দিত ; ঐহিক উন্নতির প্রতিও তাঁহারা বিতৃষ্ণ। অথচ এই আর্য সাহিত্যেই যখন দেখি, কামন্দকী নীতি, অর্থনীতি ও গান্ধর্ব নীতি স্বীকৃত, তখন স্বীকার করিতে হয়, এই সকল নীতিসূত্র তাঁহারা পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত করিয়া গ্রহণ

করিয়াছেন সেই লোকজগত হইতে, যাঁহাদের মহাবাক্য 'কাম এবৈক পুরুষার্থঃ'। চতুঃষষ্টি কলার চর্চায় ও নাগরকবৃত্তে সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।

৪. দর্শনশাস্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য

দর্শন তর্ক-প্রধান ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা। ইহাকে কাব্য-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত কি না? বস্তুতঃ দর্শনের বেশির ভাগ অংশ বিচারের মারপ্যাঁচ। বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি তপ্ত নিদাঘের মত নীরস ও ভয়ঙ্কর; তর্কের বেড়াজালের বাঁধনও অত্যন্ত জটিল। এইরূপ জটিলতা ও নীরসতার মধ্যে কাব্যের রস ও মাধুর্য আস্বাদনের আশা নিতান্তই দুরাশা। তথাপি উৎসাহী দার্শনিকগণ দর্শনকে কাব্যের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক রঘুনাথ নাকি বলিয়াছিলেন,

কবিত্বং কিমহো তুচ্ছং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীত কালকূটস্য হরেস্তেবাহিখেলনম্॥

—কালকূটপায়ী মহাদেবের পক্ষে সর্পধারণ যেমন তুচ্ছ ব্যাপার, চিন্তামণি বা ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে কবিতা রচনা করাও তেমনি একটা খেলা মাত্র।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তার্কিক সুলভ বিচারের পথে দর্শনশাস্ত্রের রস পরিণাম বিচার করিয়াছেন; এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

'যাহাতে রস আছে, তাহা সরস; যাহাতে রস নাই, তাহা নীরস। 'দর্শনশাস্ত্র নীরস' এই প্রবাদাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদস্রষ্টার মতে দর্শনশাস্ত্রে কোন রস নাই।...অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে 'অলৌকিক চমৎকার' রসের প্রাণ বা সার। চমৎকার একপ্রকার আনন্দ বা বিস্ময়। যাহার অপর নাম 'চিত্তবিস্তার'। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অনুশীলন বা পর্যালোচনায় সুখানুভব বা 'বিস্ময়' জন্মে, তাহা 'সরস', এবং যাহার অনুশীলন বা পর্যালোচনায় সুখানুভব বা বিস্ময় হয় না, তাহা 'নীরস'। এইখানেই 'দর্শনশাস্ত্র নীরস' এই প্রবাদাংশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যে তদ্দ্বারা নির্মল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব।...সত্য বটে, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ সুখানুভব করিতে পারেন না।...রসবিধায়িনী বাসনা না থাকিলে রসের আস্বাদন বা অনুভব হয় না।...যাঁহার বোদ্ধৃত্ব শক্তি নাই, তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।...এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দর্শনশাস্ত্রে যদি রস আছে, তবে ঐ রস কি নামে অভিহিত হইবে?

প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা 'অদ্ভুতরস' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। বিস্ময় বা চমৎকার যে রসের স্থায়িভাব, তাহার নাম 'অদ্ভুতরস'। স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধ উপলক্ষে দর্শনকারগণ যেরূপ অলৌকিক কৌশল ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্মিত বা চমৎকৃত হইতে হয়।'[১]

অবশ্য দর্শনশাস্ত্র হইতে এই প্রকারে রস আহরণের চেষ্টা অনেকটা কষ্ট-কল্পনা। এই মতের সহিত অনেকেই হয় তো একমত হইবেন না। কিন্তু এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দর্শনশাস্ত্রের সুশৃঙ্খল বিচারপদ্ধতিতে একটা সৌন্দর্য আছে। বুদ্ধির নির্মলতা, সূক্ষ্মগ্রাহিতা, যুক্তির পথে পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনের সৌন্দর্য যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দর্শনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিচারের পথে, সংশয়ের নিরসন হয় যুক্তি ও তর্কে। সমালোচনা সাহিত্য হিসাবে তাই দর্শন ও দর্শনভাষ্যের দাবি উপেক্ষণীয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় দর্শন সংক্ষিপ্ত ও সংহত সূত্রাকারে গ্রথিত। এই সূত্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত। বুদ্ধিদীপ্ত এই বাক্য আশ্চর্য দীপ্তির প্রকাশক। সূত্র স্বল্পাক্ষরা, কিন্তু অনেকার্থ বাচক।[২] প্রমিতাক্ষরা এই বাগ্‌বিভূতি দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম গৌরব। 'যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্'—এ উক্তিও দর্শন সূত্র সম্পর্কে সত্য।

তৃতীয়তঃ দর্শনের জীবন-নিষ্ঠা। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, ইহা জগৎ-পলাতক। সত্য বটে দুঃখের উপর এদেশের দর্শনে অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু জগৎ ও জীবনকে ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছে, এ অভিযোগ সত্য নয়। ইহলোক ও পরলোক, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্—দুইই দর্শনের বি. [illegible]। ভারতীয় কোন দর্শনই ইহকালের চিন্তাকে পরিহার করে নাই। বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই ইহা অবস্তুর আলোচনা করিয়াছে। বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দর্শনের সমীক্ষা সুগভীর মর্ত্য-প্রীতির পরিচয় বহন করে। ভারতীয় দর্শন জীবন-ভীরু, কর্ম-ভীরুর দর্শন নয়, ইহা জীবন-প্রেমিকের দর্পণ। সর্বোপরি দুঃখের কবল হইতে আত্যন্তিক মুক্তির লক্ষ্যে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা কর্মে, প্রেমে ও জ্ঞানে সুন্দর শান্ত শিবময় জীবনের প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাহ্য করেন নাই। সাহিত্যের লক্ষ্য যদি হয় কল্যাণময় জীবনের আদর্শ প্রচার, সে আদর্শ দর্শনশাস্ত্র যথাযথ প্রচার করিয়াছে। দার্শনিক Thoreau বলিয়াছিলেন, 'To be a philosopher, is not merely to have subtle thoughts

১। গোপালবসুমল্লিক ফেলোশিপ লেকচার (প্রথম লেকচার)—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

২। সূত্রের লক্ষণঃ লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥

nor to even found a school, but so to love wisdom as to live, according to its dictates a life of simplicity, independence, magnanimity and trust'[১]—ভারতীয় দর্শনেও শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, জ্ঞানময়, কর্মময়, প্রেমময়, উদার ও সুন্দর এই জীবনের ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই দর্শনের চরম প্রাপ্তি হওয়ার মধ্যে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ নির্মল, চিন্ময়, আনন্দঘন ও অনন্ত। কিন্তু মোহকঞ্চুকে এই সত্য-বোধটি আচ্ছন্ন। মানুষের এই মোহবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে স্ব-স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, সান্তের মধ্যে তাহার অনন্ত সত্তাকে উদ্বোধিত করাই এদেশের দর্শনের চরম লক্ষ্য। দর্শনের সত্যাববোধে উদ্বুদ্ধ মানব পূর্ণ মানব। দর্শন মানুষকে এই সুউচ্চ মানবতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। 'শিবেতর ক্ষতয়ে,' 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন চ রাবণাদিবৎ'—সাহিত্য মীমাংসার এই সকল নির্দেশ পালনের দিক হইতে দর্শনের সাহিত্যিক মূল্য তর্কাতীত।

চতুর্থতঃ প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই সূত্রাকারে কিছু কিছু কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। কাহিনীগুলি শ্রুতি বা লোকগাথা হইতে সংগৃহীত; পুরাণেও এসকল কাহিনীর বিবৃতি আছে। এগুলির গল্পমূল্য অল্প নয়। সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায় এই প্রকারের কতকগুলি কাহিনীর ইঙ্গিতে পূর্ণ, যেমন, 'নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ' [সাং সূঃ ৪. ১১], কিংবা 'তদ্‌বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ' [সা. সূ. ৪. ১৬]। সূত্রকার এস্থলে দুইটি কাহিনীর ইঙ্গিত করিয়াছেন:

(১) নিরাশ হইলে সুখী হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নাম্নী এক পণ্যাঙ্গনা অধিক পণ্য লাভের আশায় দয়িতের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রিজাগরণের ক্লেশ ভোগ করিল। আশার তাড়নায় দারুণ অস্থিরতার মধ্যে সে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিল। শেষ প্রহরে সে আশা ত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

(২) দ্বিতীয় কাহিনী-বীজের অবতারণা তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরণের প্রসঙ্গে। এক ভেকী রাজকন্যার বেশ ধারণ করিয়া বনমধ্যে বসিয়াছিল। এক রাজা বনে মৃগয়া করিতে গিয়া সেই কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ভেকীরূপিণী রাজকন্যা কহিল, জল দেখাইলেই আমি চলিয়া যাইব। রাজা সেই সর্তেই সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন অতিক্রান্ত হইতেই রাজা সর্ত বিস্মৃত হইলেন। একদিন ক্রীড়াশ্রান্ত রাণী রাজার নিকট জল প্রার্থনা করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরোবর দেখাইয়া দিলেন। রাণী অমনই ভেকীরূপ ধারণ করিয়া সেই জলে অন্তর্হিতা হইল।

১। The story of philosophy (Introduction)—Will Durant.

দর্শনশাস্ত্রের 'ন্যায়' এই প্রকারের অসংখ্য কাহিনীর কথা-বীজ। 'ন্যায়ে'র সাধারণ-অর্থ—যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তগুলি নিঃসন্দেহে কাব্যামোদীর আদরণীয়। এগুলি সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের মত উদ্ধৃত হয়: যথা, অন্ধ গোলাঙ্গুলন্যায়, অন্ধ-পঙ্গুন্যায়, অন্ধহস্তীন্যায়, উষ্ট্রকণ্টকভোজনন্যায় ইত্যাদি।

এই ন্যায়গুলির আর এক দিক দর্শনের উপমাগর্ভবাচন। এগুলিও দৃষ্টান্ত। বেদান্ত-ভাষ্যের বহুবিখ্যাত উপমা—রজ্জৌ সর্পভ্রান্তি, শশশৃঙ্গবৎ, খ-পুষ্পবৎ, লূতাতন্তুবৎ, ইত্যাদি; বেদান্তদর্শনের উপমা—'অবিরোধশ্চন্দনবৎ' [ব্রঃ সূঃ ২. ৩. ২৩], 'ব্যতিরেকো-গন্ধবৎ' [ব্রঃ সূঃ ২. ৩. ২৬]; ন্যায়-বৈশেষিকের উপমা—চালনীন্যায়, বীচীতরঙ্গন্যায়, বীজাঙ্কুরন্যায়, শতপত্রভেদন্যায়; সাংখ্যদর্শনের উপমা—কুসুমবচ্চমণি [সা. সূ. ২. ৩৫], ধেনুবৎ বৎসায়, [২. ৩৭], কুমারীশঙ্খবৎ [৪. ৯] প্রভৃতি।

দর্শনের শুষ্ক মরুভূমিতে এই ধরনের সরস দৃষ্টান্ত মনোহর মরূদ্যানস্বরূপ। এই সকল লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে অধ্যাত্মলোকবিহারী দর্শনকারগণের অতি সূক্ষ্ম বস্তু-দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই সম্ভবতঃ দার্শনিকগণ বলেন,

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে॥

৫. বাংলা সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে দর্শনের চর্চা প্রচলিত ছিল। ন্যায়-বৈশেষিক বাংলার নব্য ন্যায়ে বিশিষ্ট রূপান্তর লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে বেদান্তের চর্চাও অব্যাহত ছিল। এদেশে 'স্মৃতি' পূর্বমীমাংসার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এদেশের জনসাধারণ, তথা জনকেন্দ্রিক সাহিত্যে সাংখ্য-যোগের প্রভাবও অপরিসীম। একে একে এই প্রভাবগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ন্যায়-বৈশেষিক ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সেন-পূর্বযুগে বাংলাদেশে ন্যায়-বৈশেষিকের চর্চা প্রচলিত থাকিলেও, প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিককে গ্রাস করিয়া এদেশে বিস্তৃত হইয়াছে নব্য ন্যায়। নব্য ন্যায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত বাংলার রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গে ন্যায়ের প্রাধান্য' [সাংখ্যদর্শন—বিবিধ প্রবন্ধ]। বাঙালী জাত-নৈয়ায়িক।

শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বাংলায় ন্যায় গ্রন্থ অনূদিত

হইয়াছিল।[১] অনুবাদক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। গ্রন্থখানি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রথম সূত্রটির অনুবাদ এইরূপ :

প্রমাণ প্রমেয়গণ বাদজল্প প্রয়োজন
দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক-ছল।
বিতণ্ডা জাতি সংশয় অবয়ব বিনির্ণয়
হেত্বাভাস নিগ্রহের স্থল॥

ন্যায় গ্রন্থ রচনা বা তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাঙালীর চরিত্রে ন্যায়ের প্রভাব। ন্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য প্রতিবাদীর নিগ্রহ, স্বমত প্রতিষ্ঠা ও দিগ্বিজয়। ষোড়শ শতকের নবদ্বীপে এই দিগ্বিজয়ের সমারোহ দেখা গিয়াছিল। ন্যায়ের 'ছল'-এর বাংলা নামান্তর 'ফক্কিকা' বা ফাঁকি। স্বয়ং মহাপ্রভু পড়ুয়া অবস্থায় সহপাঠীদিগকে এই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন : 'পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়', কখনও দম্ভভরে বলিতেন, 'হেনজন দেখি ফাঁকি, বলুক আমার' [চৈঃ ভাঃ, আদি. ৭]। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নিগ্রহ ও সার্বভৌম-বিজয় মহাপ্রভুর জীবনের অন্যতম কীর্তি। বাংলায় তর্ক-প্রবৃত্তি ছিল সকলের উপরে। ব্যাকরণ হউক, কবিত্ব হউক, বেদান্ত হউক বিচার হইত তর্কশাস্ত্র অনুসারে।

ষোড়শ শতকেই বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্বভৌমের আবির্ভাব। এই শতকেই মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া বাঙালী মনীষা নব্যন্যায়কে এদেশের নিজস্ব সামগ্রী করিয়া তুলিল। সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়া নব্য ন্যায় আরও সূক্ষ্ম ও জটিল আকার ধারণ করিল। ফলে কুফলও দেখা দিল। বুদ্ধির সূক্ষ্মতা শুষ্ক মারপ্যাঁচে পরিণত হইল, বিশুদ্ধ 'বাদ'-এর স্থলে জল্প, ছল, বিতণ্ডা প্রধান হইয়া উঠিল। ন্যায়-বৈশেষিকের তত্ত্ব ডুবিয়া গেল, মুখ্য হইয়া উঠিল তর্ক। নব্য ন্যায়ে যুক্তিতর্ক এমন কূটতর্কে পরিণত হইল যে, 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল', কিংবা 'ঢিপ্ করিয়া তাল পড়ে, না তাল পড়িয়া ঢিপ্ শব্দ হয়'—এই অবাস্তব বিচারগুলি বড় হইয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, বিজয়ের মোহে যেন তেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষ নিগ্রহ করাই প্রধান লক্ষ্য হইল। এমনও শুনা গিয়াছে, 'অস্তি কিম্ বর্তি' (আছে, কি নাই) বলিয়া নৈয়ায়িকগণ তর্কে তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হাতাহাতিও বাদ যাইত না। এই ন্যায় চর্চা যে কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা নয়। শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, 'অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ-পরিচয়ের পরই অথবা সংস্কৃত

১. বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী [সাঃ পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, ...র্থ সংখ্যা]।

তাহার অতি সাধারণ জ্ঞান লাভের পরই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইত। সেইজন্য বোধ হয় ছড়া বাঁধিয়া ন্যায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। 'বান্ মান্ বর্জিয়া, সাধ্য আন গর্জিয়া' প্রভৃতি ছড়া আজ পর্যন্ত পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত।'

ন্যায়ের এই বিকৃত পরিণাম বাংলা সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের বিকৃত রুচির যুগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে ভাঁড়ামি প্রচলিত ছিল, তাহার প্রধান আশ্রয় ন্যায়ের 'ছল'; গোপালভাঁড়ের এই ছলাশ্রয়ী ভাঁড়ামিতে স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত বহুবার প্রতারিত হইয়াছেন। যেমন,

> একবার গোপালভাঁড়ের নির্দেশে তাহার পুত্র আসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বলিল, 'মহারাজ, আমার পিতার 'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি' হইয়াছে।' শুনিয়া রাজা দুঃখিত হইলেন, এবং শ্রাদ্ধাদি কার্যের জন্য ভাঁড়পুত্রকে অর্থ প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং গোপালভাঁড় একটি কৃষ্ণমূর্তি হাতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যে কহিলেন, মহারাজ আমার এই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়াছে।

ন্যায়ের ছল, জল্প ও বিতণ্ডার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে ও উনবিংশতকের প্রথমে প্রচলিত তরজা ও কবির লড়াইয়ে। এই সকল লড়াইয়ের দুই দল ন্যায়-সভার দুই বাদী ও প্রতিবাদী বা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ; ইহার চাপান ও উতোর হ'কর পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ; বাদ-প্রতিবাদের মুখ্য আশ্রয় ছল, জল্প ও বিতণ্ডা; ইহার লক্ষ্য প্রতিপক্ষের নিগ্রহ। এই বাগ্‌যুদ্ধ ন্যায়ের বাগ্‌যুদ্ধের মতই কৌতুকোদ্দীপক। ইহার প্রধান আকর্ষণ কথা-কাটাকাটি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ও ভোলা ময়রার লড়াই:

এ্যান্টনী: ভজন পূজন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি॥

ভোলা: তুই জাত ফিরিঙ্গি জবড়জাঙ্গ—
আমি পারব নাকে তরাতে।
যীশুখ্রীষ্ট ভজ গা তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥

এ্যান্টনী: সত্য বটে বটি আমি জাতিতে ফিরিঙ্গি।
(তবে) ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব এক নী॥

অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কবিয়ালদের আসরে ন্যায়ের এই বিকৃত পরিণাম নিশ্চয়ই নৈয়ায়িক বাঙালীর তেমন গৌরবের পরিচয় নয়। গ্রাম্য ন্যায়চঞ্চু বা তর্কপঞ্চাননগণও ন্যায়কে দলাদলি ও কথা-কাটাকাটির অস্ত্ররূপেই ব্যবহার করিয়াছেন [দ্রষ্টব্য শরৎচন্দ্রের

'ষোড়শী' নাটক]। কিন্তু এই ন্যায়ই বাঙালীকে সত্যকারের গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছে। বাঙালীর বিচক্ষণতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও চুলচেরা বিচারের মূলে নব্য ন্যায়েরই প্রভাব। বাঙালীর বাগ্মিতায় ন্যায়ের যুক্তি। নব্যযুগে বাঙালী যে সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতি, পরমতখণ্ডন ও স্বমতস্থাপনে যুক্তি-বিন্যাস বাঙালীর চিরাগত নৈয়ায়িক-বৃত্তিরই পরিচয় বহন করে।

॥ সাংখ্যমত ॥

বাংলায় সাংখ্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'যখন গ্রামে, নগরে, মাঠে, জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী পূজায় বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে' [সাংখ্যদর্শন—বিবিধ প্রবন্ধ]। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সাংখ্যদর্শনের উৎপত্তি বঙ্গদেশে; সাংখ্যকার কপিল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বঙ্গের অধিবাসী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই মতে বিশ্বাসী [দ্রষ্টব্য বৌদ্ধধর্ম—শাস্ত্রী]।

কিন্তু মনে হয়, বাংলায় সাংখ্যের প্রভাব সরাসরি সাংখ্য হইতে বিস্তৃত হয় নাই, বিস্তৃত হইয়াছে পুরাণ-তন্ত্রের মধ্যস্থতায়। বাংলা দেশ তন্ত্রের দেশ, বাঙালী মাতৃতান্ত্রিক জাতি। বাঙালীর চিন্তায় ও কর্মে শাক্তাচারের প্রভাব। এই তন্ত্রভাবের সহিত সাংখ্যের যোগাযোগ অতি নিবিড়। সাংখ্য প্রকৃতি-প্রধান, তন্ত্রও শক্তি-প্রধান; সাংখ্যে প্রপঞ্চসৃষ্টির মূল প্রকৃতি, তন্ত্রেও শক্তিই ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ শক্তি হইতেই সৃষ্টিপত্তন ও সৃষ্টির লীলা; সাংখ্যের পুরুষ অকর্মা ও উদাসীন—তন্ত্রোক্ত শিবও শুদ্ধ-শান্ত ও নিষ্ক্রিয়। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মনে করেন, এদেশের কালীমূর্তি সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের আদর্শেই কল্পিত [দ্রষ্টব্য 'তান্ত্রিক গুরু']। বাংলাদেশে সাংখ্য আসিয়াছে এই তন্ত্রের মাধ্যমে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও বলেন, 'The samkhya idea of Purusha and Prakriti was inherited by vernacular through the medium of Purana in a more anomalous form :[১]

বাংলা মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপত্তন অংশ বিশ্লেষণ করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তন্ত্রে প্রপঞ্চসৃষ্টির ক্রম অবিকল সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত; পুরাণে উহাই আবার বেদান্তাদি মতের সহিত যুক্ত হইয়া বিমিশ্র আকার ধারণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিবর্ণনায় এই বিমিশ্র ধারারই অনুসরণ। এই বিমিশ্র ধ্বনির মধ্যে সাংখ্যের ধ্বনিটি লক্ষণীয়, যেমন,

---

১। Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Dasgupta.

এক দেব নানা মূর্তি হৈল মহাশয়।
হেম হৈতে কুণ্ডল কভু ভিন্ন নয়॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান।
রূপবান্ হৈল তাতে তনয় মহান্॥
মহত্তের পুত্র হৈল নাম অহঙ্কার।
যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হৈতে হৈল পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥ [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]

—এখানে প্রকৃতি হইতে প্রপঞ্চ সৃষ্টির ক্রমটি অবিকল সাংখ্যের, পরিণাম-বাদটিও ['হেম হৈতে কুণ্ডল কভু ভিন্ন নয়'] সাংখ্যের—কিন্তু 'এক দেব নানামূর্তি হৈল মহাশয়'—ইহা বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশুদ্ধ সাংখ্য নয়, শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সাংখ্য দুই মিলিয়া বাঙালীর সৃষ্টি কল্পনা। ইহারই প্রকাশ দেখা যায় বাংলার শাক্ত গীতিতে :

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি॥
তুমি চিৎ-অভিমুখী, কাযহেতু চিৎ-বিমুখী।
চিদানন্দে পিছে রাখি চিত্তানন্দে উন্মাদিনী॥
ত্যজ্য করি নির্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে ;
সৃষ্টি কর সবিকারে বিকাররূপিণী॥ [রসিকচন্দ্র রায়]

এখানে সাংখ্যের সহিত অন্যান্য মতের মিশ্রণও লক্ষণীয়। বিমিশ্র সাংখ্যই বাংলার সাংখ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, এদেশের দুঃখবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাংখ্যজাত। কিন্তু এমত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। দুঃখবাদ কেবল সাংখ্যের নয়, সমগ্র আস্তিক দর্শনের। বৈরাগ্যও সাংখ্যের নয়, অদ্বৈত বেদান্তের। বরং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কারের মিল আছে। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই ; জ্ঞানে, কর্মে, ঐশ্বর্যে ও বৈরাগ্যে সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বর স্থানীয়। মনসামঙ্গল কাব্যের অমিত শক্তিধর মহাজ্ঞানী চন্দ্রধর এই ঈশ্বর-সংজ্ঞক পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ মানুষ-পুরুষই ঈশ্বর,—সাংখ্যের এই মত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে এই সাংখ্যমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচনা

করিব।' উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, 'উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র, সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ, ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার যোগযুক্ত তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তি দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন।' [কৃষ্ণ চরিত্র]। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সাংখ্য মতেরই প্রতিধ্বনি, যে সাংখ্য বলেন, ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইতেছে 'মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা' [সা: সূ: ১. ৯৫]। শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মনে করেন, বঙ্কিম চন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বই রসযোগে 'জীবন-কাব্য' হইয়া উঠিয়াছে।[১] 'মানব-বন্দনা'র কবি অক্ষয় কুমার বড়ালও ইউরোপীয় বিবর্তন বাদকে স্বীকার করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সাংখ্যকেই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের প্রভাব প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারার মত এদেশবাসীর অন্তরে প্রবাহিত—অলক্ষ্য, কিন্তু গূঢ়সঞ্চারী।

॥ যোগদর্শন ॥

ভারতীয় সাহিত্যে যোগদর্শনের প্রভাব অপরিসীম; এদেশের সাধন-জীবন যোগাশ্রয়ী। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই যোগের দুইটি ধারা—একটি আদিমতম যোগের ধারা, অপরটি বেদান্ত-রঞ্জিত যোগের ধারা। দ্বিতীয় ধারাটিই পুরাণাদিতে স্থান লাভ করিয়াছে; আর প্রথম ধারাটি তন্ত্রাচারের সহিত যুক্ত হইয়া হিন্দুতন্ত্রে, বৌদ্ধতন্ত্রে, নাথধর্মে এবং লোকসাধারণের মর্মে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। এদেশে যে রহস্যময় গুহ্যসাধনার ধারাটি প্রচলিত, তাহাতে আদিমতম যোগ-সাধনার প্রভাবই গুরুতর।

এই আদিমতম ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শিব-শক্তির যোগ। আদৌ শিবই ছিলেন যোগীশ্বর, তিনিই যোগশাস্ত্রের প্রচারক। কিন্তু কালক্রমে শিব শক্তির সহিত যুক্ত হইলেন, তন্ত্রধারা আসিয়া মিলিল যোগধারার সহিত। তাহার ফলে শক্তি-সাধনায় যেমন আসন-প্রাণায়াম, বায়ুধারণ প্রণালী গৃহীত হইল, তেমনই আবার তন্ত্রের ষট্‌চক্র, কুণ্ডলিনী শক্তি, হুঙ্কার বীজ, ও শক্তি-সহায়ে সাধনার পদ্ধতি যোগের সহিত যুক্ত হইল। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে যোগ ও তন্ত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গেল। শিব ও শক্তি

১. দ্রষ্টব্য 'বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস'—মোহিত লাল মজুমদার

যেমন যুগনদ্ধ, যোগ ও তন্ত্রও তেমনই যুগনদ্ধ হইল। প্রচলিত শৈব ও শাক্ত ধর্ম এই যোগ ও তন্ত্রের মিলিত রূপ।

এই 'যোগে' পাতঞ্জল দর্শনোক্ত 'যোগ' শব্দের অর্থ-বিকৃতি লক্ষণীয়। পাতঞ্জল দর্শনে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ; কিন্তু শৈব বা তান্ত্রিক যোগে যোগের অর্থ 'মিলন'। সহস্রারস্থিত শুদ্ধ শিবের সহিত মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীর মিলন বা যোগই তান্ত্রিক যোগ; আর শৈব যোগে নাদ-বিন্দু বা সূর্য-চন্দ্রের মিলন [নাদ=সূর্য—নারীরজঃ, বিন্দু=চন্দ্র (অমৃত)=পুরুষ বীর্য]। এই যোগে বাস্তব নরনারী, যাহারা যথাক্রমে শিব ও শক্তির প্রতীক, তাহাদের দেহগত মিলনও স্বীকৃত। বেদান্ত-প্রভাবে এই যোগই আবার জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনরূপে পরিগৃহীত। যোগের সাধনাও গুহ্য ও রহস্যময়। ইহার ক্রিয়া দেহকে লইয়া, দেহস্থ বায়ুকে লইয়া। প্রধান ক্রিয়া দেহে 'পবন বন্দী' করা ও বায়ু, মন ও শুক্রকে ঊর্ধ্বদিকে চালনা করা। ইহা 'কায়াসাধন', 'উল্‌টাবাওয়া', 'পলটযোগ' প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

যোগের শেষ লক্ষ্য সিদ্ধযোগী হওয়া। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকে বলা হইয়াছে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ ঈশ্বরবৎ হওয়া। বেদান্ত-প্রভাবে ইহাকে 'সোঽহম্' অবস্থা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শৈব বা শাক্ত মতে ইহা 'শিবোঽহম্' অবস্থা। ইহাই 'জ্যান্তে মরা' বা 'মহাজ্ঞান'-এর স্তর। কিন্তু এই স্তর শেষ লক্ষ্য হইলেও, জনসাধারণের ভিতর প্রচলিত যোগে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগ-বিভূতি লাভ করাই মুখ্য কাম্য। ইচ্ছামাত্র অন্তর্ধান হওয়া, যে-কোন রূপধারণ করা, ইচ্ছানুরূপ বস্তু লাভ করা প্রভৃতি অলৌকিক প্রাপ্তির জন্যই জনসাধারণের যোগ। ইহার অপর লক্ষ্য অমরত্ব অর্জন করা। যোগদ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়—ইহা লোকজগতের বদ্ধমূল ধারণা।

বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিকধর্মে ও সাহিত্যে এই মিশ্র যোগাচারের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ পন্থ, বাউল—সকলেই প্রকারান্তরে যোগী।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ নিজেদিগকে বলিয়াছেন, 'জোই' বা যোগী। 'কাহ্ন কাপালী যোগী' [১১ নং চর্যা]; অন্যান্য গানেও 'জোই' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। একটি গানে যোগীর বেশ বর্ণনা করা হইয়াছে:

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোক্ষ লবএ মুত্তিহার ॥

—আধ্যাত্মিক অর্থ বাদ দিলে, অর্থ দাঁড়ায়,—যোগীর চরণে নূপুর, কর্ণে কুণ্ডল,

কণ্ঠে মুক্তাহার, দেহে ভস্ম। ইহাই যোগীর সাধারণ বেশ। যোগীরা যে কণ্ঠে হাড়ের মালা ও হস্তে ডমরু ধারণ করেন, তাহার উল্লেখও পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সহজ সাধকগণ সহজ সুখ কামনা করেন। এই সহজ সুখের অথবা মহাসুখের অবস্থা, আনন্দঘন অদ্বয়জ্ঞানের অবস্থা। ভাব ও অভাব, লৌকিক দুঃখ ও সুখ এ অবস্থায় একাকার। যতক্ষণ চিত্ত চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ এ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না; চঞ্চল চিত্তেই কাল প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয়সংযোগে চিত্ত চঞ্চল হয় ও জীব জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। চর্যাকার বলেন,

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥ [১নং চর্যা]

চিত্তের এই চাঞ্চল্যকে দমন করিবার জন্যই যোগ। যে দেহে চিত্তের অবস্থান, তাহা বায়ুর বাহন। বায়ুই চাঞ্চল্যের কারণ। বায়ু নিরুদ্ধ হইলে, দেহের নিরোধ হয়, মন মরিয়া যায়, চিত্ত-চাঞ্চল্য দমিত হয়।[১] তাই সরহপাদ বলেন,

জহি মন-পবন ন সঞ্চরই
রবি শশী নাহি পবেশ।
তহি বট চিঅ বিসাম করু
সরহে কহিঅ উবেশ॥ [সরহপাদের দোহা]

—যেখানে মন-পবনের সঞ্চরণ নাই, যেখানে চন্দ্র সূর্যের প্রবেশ নাই, সরহ বলেন, সেইখানে চিত্তকে বিশ্রাম করাও।

এই স্থানটি দেহের সুষুম্নামার্গ বা দেহস্থ মধ্যপথ ('মঝ বেণী') বা সোজা পথ ('উজুবাট'): দেহ-মেরুর বামে ও দক্ষিণে যে নাড়ী আছে, তাহাতে বায়ু প্রবাহিত হইলে চিত্ত স্থির হইবে না; আঁকাবাঁকা পথে বায়ু বহিলে চিত্ত চঞ্চল হইবেই। চর্যাগানে ডাইনে-বাঁয়ের এই নাড়ীগুলি প্রায়ই নদী, খাল-বিখালের সহিত উপমিত হইয়াছে। ডাইনে-বাঁয়ের খাল ছাড়িয়া 'উজুবাটে' (সোজাপথে=সুষুম্নামার্গে) চলিতে হইবে অর্থাৎ বায়ু, শুক্র ও মনকে মধ্য নাড়ীতে চালনা করিতে হইবে:

বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥ [৩২ নং চর্যা]

বস্তুতঃ যোগের আসন, কায়া সাধন, পবন-বন্ধন প্রভৃতির উল্লেখ চর্যার বহুপদেই দৃষ্ট হয়। একটি পদে পবন মূষিকের সহিত উপমিত হইয়াছে। সাধক বলিতেছেন,

---

১। বায়ুশ্চরীরং বায়ুর্নিবাহনং ভবতি তাবৎ বায়ুনিরোধেন শরীরং নিরোধ্যতে মিয়তে বা [সরহ পাদের দোহার টীকা]

পবন-মূষিক দেহের অমৃত ভক্ষণ করিয়া লয়, অতএব, 'মাররে জোইআ মুসা-পবনা' [২১ নং চর্যা]

বৌদ্ধ সহজিয়ার সহযোগী নাথপন্থও যোগী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'The Nath cult is essentially a yogic cult'; উক্তিটি অতি সত্য। নাথধর্মের বিশিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ কৌলজ্ঞান নির্ণয়, হঠযোগ প্রদীপিকা, যোগচিন্তামণি, পবন-বিজয় স্বরোদয় প্রভৃতি। বাংলা দেশে প্রচলিত নাথ-সিদ্ধাই-গীতিকা গুলিও যোগের নানা কথায় পূর্ণ। এই ধর্মের মূল লক্ষ্য যৌগিক উপায়ে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা বা 'মহাজ্ঞান' বা মৃত্যুঞ্জয় যোগ-কৌশল আয়ত্ত করা। নাথ-গীতিকার সূচনা মহাদেবের প্রতি গৌরীর এই প্রশ্ন লইয়া :

তুমি কেনে তব গোঁসাই আমি কেনে মরি।
সেই তত্ত্ব কহ গোঁসাই যুগে যুগে তবি॥ [গোর্খ-বিজয়]

গৌরীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব যে তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা যোগ। মীননাথ, গোরক্ষ নাথ যোগসিদ্ধ। যোগ ভুলিয়াই মীননাথ বদ্ধ হইয়াছিলেন, যোগ-কৌশল দ্বারাই গোরক্ষনাথ গুরুকে মোহ-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মীননাথের প্রতি গোরক্ষের যাবতীয় উপদেশ যোগেরই উপদেশ,

নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর।
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর॥···
বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী·
মূল কমল মধ্যে বায়ুর বোঝ সন্ধি॥···
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা।
বঙ্কনালে সাধ গুরু না করিহ হেলা॥ [গোর্খ-বিজয়]

বাংলার বাউলও যোগপন্থ। এদেশের জনসাধারণের প্রত্যেকটি ধর্ম-সাধনায় অন্যান্য সাধনার মিশ্রণ ঘটিলেও পথ মূলত যোগের। বৈষ্ণব সহজিয়া, মুসলমান ফকির, এমন কি 'তিননাথের চেলা'—সকলেরই সাধন যোগ। লোকসাধারণের মধ্যে যোগের পারিভাষিক নামগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে, বটে, উহাতে তন্ত্রাচার ও বেদাচারের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছে, তথাপি যোগের মূল ক্রিয়া ও যোগ বিভূতি লাভের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ আছে। 'উজান বাওয়া', 'উল্টা বাওয়া' প্রভৃতি কথা যোগেরই কথা।

যোগ সাধনার প্রভাব অন্যান্য সাহিত্যেও সুস্পষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যোগ-প্রক্রিয়ার স্পষ্ট উল্লেখ দেখি রাধা বিরহ খণ্ডে। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,

অহোনিশি যোগ ধেয়াই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কমলে করিলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আম্মে ব্রহ্ম গেআন ॥

বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' কাব্যেও পদ্মার বিষঝাড়ন প্রক্রিয়ায় যোগের কথাই বলা হইয়াছে। বিষে ঢলিয়া পড়া মহাদেবকে পদ্মা বলিতেছেন,

মহাযোগী মহারুদ্র চিন্ত যোগাসন।
নিরঞ্জন-আদি ব্রহ্মতত্ত্বে দেহ মন ॥
খড়্গা ভেদি উঠে বিষ সুমেরু-শিখর।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা চিন্ত সমুদ্র ভিতর ॥
কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিস্মর।
মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ॥

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, কালকেতু-রূপী নীলাম্বর শাপমুক্ত হ'য়ে স্বর্গে গমন করিলে শিব তাঁহাকে 'অমরশিক্ষা' দিতেছেন। এই শিক্ষা যোগশিক্ষা :

শুন শুন কহি তত্ত্ব ওহে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত হইয়া অমর ॥
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীরেতে বৈসে।
ইড়া পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে ॥
জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরশান।
ভাটি বন্দি করিয়া জোয়ারে দিবে টান ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, লোকায়ত যোগ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে একদিকে পড়িয়াছে তন্ত্রের পঞ্চম ম-কারের প্রভাব। চন্দ্র-সূর্য মেলন বা মহারস পান উহার প্রকারভেদ। চন্দ্র হইতেছে রসাত্মক সোম বা শিব এবং সূর্য হইতেছে ধ্বংসশীল শক্তির প্রতীক; বিন্দু উভয়াত্মক অর্থাৎ পুরুষবীর্য ও নারীরজঃ-এর (শ্বেত ও রক্তের) মিলিতরূপ। লোকায়ত যোগে এই মেলনক্রিয়া ও তাহার ফলে মহারসোৎপত্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। এই রস বাহিরের রস নয়, লৌকিকভাবে নর-নারীর মিলনে যে বিন্দু উৎপন্ন হয়, সাধক পবন জয় করিয়া উন্টা সাধনায় তাহা সহস্রারে লইয়া যান এবং সহস্রার-ক্ষরিত সেই মহারসে সিদ্ধদেহ অভিষিক্ত করেন। লোকায়ত যোগের এই যেমন একদিক, তেমনই উহার অপরদিক 'মহাজ্ঞান' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ। ইহাতে

অদ্বৈত বেদান্ত মতের প্রভাব বিদ্যমান। বাংলায় যোগ-চর্যার লক্ষ্য ব্রহ্মাবস্থায় স্থিতি—উহাই 'জ্যান্তেমরা' বা জীবন্মুক্তির অবস্থা। অলৌকিক সিদ্ধিলাভ তো আছেই।

॥ বাংলায় মীমাংসাশাস্ত্র ॥

বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে বেদচর্চা প্রচলিত ছিল, তাহা কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী। এইজন্য মীমাংসার প্রভাব বাঙালী জীবনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেহ কেহ মনে করেন, প্রভাকর বা গুরু হইতে যে উদার মীমাংসাদর্শন প্রবর্তিত হয়, বাংলাদেশে সেই মত প্রচলিত ছিল। শালিকনাথ প্রভাকরের 'বৃহতী'র উপর পঞ্জিকা (টীকা) রচনা করেন; শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী।[১] কিন্তু এই মীমাংসা বাংলায় ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতির রূপ ধারণ করায়, এদেশে মীমাংসা স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়ন ইহার আভাস দিয়া বলিয়াছিলেন, 'গৌড়দেশে অপৌরুষেয় বেদ ও পৌরুষেয় মন্বাদিশাস্ত্রের মধ্যে ভেদবোধ নাই।' উক্তিটি অসত্য নয়। এদেশে মীমাংসা পৌরোহিত্য কর্মেরই অঙ্গীভূত। দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র, গুরব মিশ্র—ভট্ট গুণবিষ্ণু, ভট্ট ভবদেব, হলায়ুধ, রঘুনন্দন, শূলপাণি—প্রত্যেকের রচনা স্মৃতি-মিশ্রা মীমাংসার স্বাক্ষর বহন করে। বাংলায় নব্যন্যায় প্রচারিত হওয়াতেও মীমাংসার আদর অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে: কারণ ন্যায় মীমাংসার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে স্মৃতি, অপরদিকে ন্যায়—এই দুয়ের চাপে পড়িয়া মীমাংসা হীনবল হইয়া স্মৃতির অধীন হইয়াছে এবং এইভাবে বাংলায় মীমাংসা প্রবিষ্ট হইয়াছে পুরোহিত-দর্পণে। ক্রিয়ার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, ক্রিয়ার প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত যত্ন, একই মন্ত্র ভুল হইবার ভয়ে বারবার উচ্চারণ করিবার নিয়ম এবং অন্ধভাবে বিচারহীন আচার-নিষ্ঠতা—পরোক্ষভাবে মীমাংসকের মনোভাব মনে করাইয়া দেয়। ইহার ফলে সুফল অপেক্ষা কুফলই এদেশে বেশি দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ইঙ্গিত করিয়াছেন,—আচারের মরুবালিরাশি এদেশের প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা নিঃসংশয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও মীমাংসা দর্শনের পরোক্ষ প্রভাব।

॥ বেদান্তের প্রভাব ॥

ভারতবর্ষের ধর্মে, জীবনে ও সাহিত্যে বেদান্ত—বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদের প্রভাব অপরিসীম। এই দর্শন ভারতীয় জীবনের এক মহার্ঘ সম্পদ। কাজে-কর্মে যিনি যতই দ্বৈতবাদী হউন, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত মতবাদ। বহুদেবতার অন্তরালে এক দেবতার অবস্থান, সেই এক নির্বিশেষ, নির্গুণ, অনন্ত, অব্যয়, অক্ষর—এ

১. দ্রষ্টব্য 'চিন্ময়বঙ্গ'—ক্ষিতিমোহন সেন

বোধ সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই—গভীর দুঃখের দিনে এদেশবাসী সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে, সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে একের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারে এবং কর্মজীবনেও দুর্জয় শক্তির প্রেরণায় চালিত হইতে পারে। ঐশ্বর্য্য ও রিক্ততা, ভোগ ও বৈরাগ্য, শক্তি ও ক্ষমা মিলিয়া যে ভারতীয় জীবনকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মূল প্রেরণা অদ্বৈত দর্শন।

অন্যান্য দর্শনে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ আছে, মতখণ্ডন আছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তাহাদের উপরেও অদ্বৈত মতবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। যে সাংখ্য দর্শন অদ্বৈত বেদান্তের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহারও 'পুরুষ' বেদান্তের নিষ্কল ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন: নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ। যখন আমরা সাংখ্যের প্রকৃতির কার্যক্রমকে চৈতন্যের আলোকে বিচার করি, তখন অজ্ঞাতসারেই তাহার উপর বেদান্তের প্রভাব স্বীকার করিয়া লই। সাংখ্য-কারিকায় ও সাংখ্যসূত্রে বেদান্তের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান। সাংখ্যসূত্রের "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' [৪. ৩.] সূত্রটি অবিকল বেদান্তসূত্রে [৪. ১. ১] রহিয়াছে; সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে সাংখ্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ থাকা অনুচিত, সেই সাংখ্যসূত্রে বলা হইতেছে, সমাধি সুষুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় ['সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা'—সা: সূ: ৫. ১১৬]। ন্যায়-বৈশেষিকে পরবর্তীকালে 'আত্মা' দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন—আত্মা ও পরমাত্মা। ইঁহাদের স্বরূপ বেদান্তের জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয়।

দর্শন-সাহিত্যে তো বটেই, পুরাণেও—যেখানে বহুদেবতার স্বীকৃতি, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তি স্ব-স্ব মহিমায় ভাস্বর, যেখানে ভক্তিবাদের একাধিপত্য—সেখানেও নিষ্কল ব্রহ্মের প্রভাব বিস্তৃত। দেবতার ঐশ্বর্য ও গুণাবলী যতই থাকুক, প্রত্যেকেই যে স্বরূপতঃ নির্গুণ, নির্বিশেষ, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম, তাহা একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে।[১] তন্ত্রেও বেদান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। আদিতে তন্ত্র যাহাই থাকুক, তন্ত্রের পরমশিবতত্ত্বে বেদান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কল, নিস্পন্দ, নিরীহ শিব বেদান্তের ব্রহ্মসদৃশ। যদিও এই শিব 'শক্তি-বিশিষ্ট অদ্বৈত'—তথাপি ইঁহার বহির্লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তন্ত্রের পরাশক্তিও ব্রহ্মময়ী। তন্ত্রসাধনার শেষাবস্থা 'শিবোঽহম'-এর সহিত বেদান্তের ব্রহ্মাবস্থা 'সোঽহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মিল রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম বেদ স্বীকার করে নাই। কিন্তু বুদ্ধত্ব যে অদ্বয় জ্ঞানেরই অবস্থা, প্রাচীন

১। বিষ্ণুপুরাণে বাসুদেব বিষ্ণু 'তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষরমব্যয়ম্' [১. ২. ১০]। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে শক্তি হইতেছেন, নিত্যা, অক্ষরা, 'পরা পরাণাং পরমা' [চণ্ডী. ১. ৮২]।

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। বুদ্ধদেবের 'অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং' [ধর্মপদ. অপ্পমাদবর্গ. ১] প্রভৃতি উক্তি বেদান্তের প্রতিধ্বনি। পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন বেদান্তের এত নিকটবর্তী হইয়াছিল যে, নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকাকে শঙ্করমতের সহিত বিনিময় করা চলিত। নাগার্জুনের পারমার্থিক সত্য ও সাংবৃতিক সত্য এবং শঙ্করাচার্যের পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য এক। মায়ার কল্পনাও উভয়ক্ষেত্রে এক প্রকার। নাগার্জুন বলেন

যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্বনগরং যথা।

তথোৎপাদ স্তথা স্থানং তথা ভঙ্গা উদাহৃতাঃ। [মাধ্যমিক কা. ৭. ৩৪.]

—যেমন মায়া, স্বপ্ন ও গন্ধর্বনগর, তেমনই উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ। শঙ্করাচার্য্যও ঠিক এই উপমায় মায়াবাদ বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই শঙ্করের মতবাদ সম্পর্কে এই অভিযোগ উঠিয়াছিল, 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।'

॥ বাংলায় বেদান্ত ॥

অদ্বৈত বেদান্তমতের সার কথা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও পুরুষার্থলাভ জ্ঞানে। বাঙালীর আচার-আচরণে যে ভাবেরই প্রকাশ হউক না কেন, বেদান্তের এই মর্মসত্য এদেশের অন্তরে গ্রথিত।

বাংলা সাহিত্যের সূচনা বৌদ্ধ সহজিয়াগণের দোহা ও গান লইয়া। বজ্রাচার্যগণের শেষ প্রাপ্তি অদ্বয়জ্ঞান। এই মতের 'শূন্যতা' বা 'তথতা' বেদান্তের অদ্বৈতাবস্থা। বজ্রসত্ত্ব বোধিচিত্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ—নিত্য, অপরিবর্ত ্য ও প্রজ্ঞানঘন। অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহে ইহাকে বলা হইয়াছে 'অচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণ', 'অদাহী' ও 'অবিনাশী'। ইহা ব্রহ্মেরও লক্ষণ। নাগার্জুন ও বসুবন্ধুর রচনায় এই ব্রহ্মলক্ষণের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইহাদের প্রতীত্যসমুৎপাদের মূল সূত্রটিই ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত।

বৌদ্ধ সহজমান মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনেরই পরিণাম। কাজেই সহজিয়াদের দোহা ও গানেও অদ্বয় শূন্যতার কথা। নির্বাণরূপ 'মহাসুখে'র কল্পনায় বা 'মায়া'র কল্পনায় সহজ সাধক বৈদান্তিক। সহর পাদের দোহায় পাই,

অদ্বয়চিত্ত তরুঅরহ গউ তিহুবণে বিথার।

—অদ্বয়চিত্ত একটি বিরাট তরু; ত্রিভুবনে তাহার বিস্তার।

এই অদ্বয় অবস্থা নিষ্কল, নির্বিকার, 'উদয়াস্তং গমন রহিত' [কাহ্নপাদের দোহা. ২০]। এই অবস্থায় জন্ম মৃত্যুও থাকে না :

জইসে জাম মরণ বি তইসো।
জীঅন্তে মইলেঁ নাহি বিসেসো॥ [চর্যা. ২২]

—যেমন জন্ম, তেমনই মরণ ; জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় কোন বিশেষ নাই।

সহজ মতে ইহাই 'সহজ স্বভাব'-এর অবস্থা। এই 'সহজ' স্ব-সংবেদ্য ; এই অবস্থায় জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বোধও লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা বেদান্তের 'অবাঙ্মনসো গোচর' ব্রহ্মাবস্থা। এমন কি চর্যাগানে বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টান্তগুলি পর্যন্ত হুবহু গৃহীত হইয়াছে ; যেমন, 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' [২৯ নং চর্যা]—জলের চাঁদ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় ; 'রাজসাপ দেখি জো চমকই' [৪১ নং চর্যা]—রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকিত হয় ; 'বান্ধি সুআ জিম কেলি করই' [৪১ নং চর্যা]—বন্ধ্যার পুত্র যেমন কেলি করে। এই সকল উক্তি বেদান্তের 'অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ' [ব্র. সূ. ৩. ২. ১৮], বেদান্তসারের 'অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ' [বে. সা. ১২] বা শঙ্কর ভাষ্যের কতকগুলি উক্তির প্রতিধ্বনি।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সমসাময়িক কালেই বাংলাদেশে নাথপন্থ যোগীদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। নাথপন্থগণ শৈব যোগী—সাধন রহস্যময় যোগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন যোগের শেষ প্রাপ্তি 'স্ব-স্বরূপে অবস্থান'—পরবর্তীকালে বেদান্তের কেবলাবস্থার সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালে যোগের লক্ষ্যই হইয়া উঠিয়াছে 'জ্ঞান'। বাংলার নাথযোগীদের ভিতর পাই 'মহাজ্ঞান'-এর কথা। শিব মহাজ্ঞানী। মীননাথ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া শিবের নিকট হইতে এই 'মহাজ্ঞান' লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞানেই সিদ্ধি, এই জ্ঞান-বিস্মরণেই ভোগ ও মৃত্যু। গোরক্ষনাথ বিমুগ্ধ মীননাথকে এই জ্ঞানের কথাই স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন, 'মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান,' কিংবা 'জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল-কদলীত' [গোর্খ-বিজয়]। এই মহাজ্ঞানের জের আসিয়া ঠেকিয়াছে মনসা-মঙ্গল কাব্যেও। চাঁদসদাগর ছিলেন 'মহাজ্ঞানী', তাঁহার শক্তি 'মহাজ্ঞান'। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান বাংলাসাহিত্যে নানাভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে।

বাংলার শাক্ত সাহিত্যও বেদান্ত-প্রভাবিত। এই সাহিত্যের কাহিনীভাগ পুরাণাশ্রিত, সাধনভাগ তন্ত্রাশ্রয়ী এবং দার্শনিকতা তন্ত্র-পুরাণ মিশ্র। তন্ত্রে ও পুরাণে শক্তির প্রধানতঃ দুইটি রূপ—অপরা ও পরা। পরাশক্তি ব্রহ্মময়ী। তিনি ব্রহ্মের মতই সূক্ষ্ম, নিরাকার, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। মহাকালীর কৃষ্ণবর্ণ সেই নিরাকৃতির প্রতীক, উহাই মহাশক্তির স্বরূপ : মহাপ্রলয়ে কালী এই স্বরূপে অবস্থান করেন :

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।

বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ [মহানি. ৪. ৩৩]

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও দেবীকে 'নিত্যা পরমাত্মস্বরূপিণী' বলা হইয়াছে। বাংলার শাক্ত সাহিত্যেও পরাশক্তির এই ব্রহ্মময়ী রূপ স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইনি 'আদিদেবনিত্যশক্তি'। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী—যে-কোন শক্তি স্বরূপে ব্রহ্মময়ী। মহাশক্তির ব্রহ্মময়ী স্বরূপটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হইয়াছে বাংলার শাক্ত সঙ্গীতে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত—সকলেই ব্রহ্মময়ী মায়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন,

১. কে জানে গো কালী কেমন।

ষড়্দর্শনে না পায় দরশন ॥ [রামপ্রসাদ]

এখানে মায়ের অচিন্ত্য, অব্যক্ত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মও অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়। রামপ্রসাদের মতে 'কালী ব্রহ্ম'। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি সদা মুক্ত, কেবলা পুরুষ। তাঁহার সন্ধ্যা-বন্দনা নাই, ধর্মাধর্মের বিচার নাই। রামপ্রসাদও বলেন, 'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

২. 'কালী নিরাকার'—গোবিন্দ চৌধুরীর গানে পাই ইহার সুন্দর অভিব্যক্তি,

ওঙ্কার মূরতি রে মন, জান না কি উহারে ?...

তাই বলি এই কায়া, কিছু নয় শুধু মায়া,

ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঙ্কারে।

গানটির ভিতর 'মায়াবাদ' ও জ্ঞান-বাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

৩. অজ্ঞাতনামা কবির আর একটি গানে—শান্ত, নিস্পন্দ, 'অরূপা' শক্তির অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে,

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী ॥

অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে।

চির শান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি ॥

কমলাকান্ত জানেন, শ্যামা 'ব্রহ্ম সনাতনী', তিনি লিঙ্গ-বিবর্জিতা—কখনও মেয়ে, কখনও পুরুষ; তিনিই 'পরম কারণ'। এই কালীতে যখন মন তন্ময়, তখন জীবের সুখ-দুঃখ সমান, শুধু আনন্দের তরঙ্গ ['দেখ সুখদুখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে']।

শাক্ত সাধনার শেষ স্তর নির্গুণ, নিষ্কল, চিদ্ঘন আনন্দময়তার স্তর। কাজেই শক্তি-সাধক মাত্রই প্রকারান্তরে বৈদান্তিক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও একটি নূতন বেদান্ত-ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া যেমন শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ এবং নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ—তেমনই চৈতন্য মহাপ্রভুর 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ'।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূল উৎস কি, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা মাধ্বমতের প্রকারভেদ। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্যে' এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনী হইতে এই মত সমর্থিত হয় না। ডঃ সুশীলকুমার দে বলেন, 'বলদেবের উক্তি ভিন্ন চৈতন্যদেব ও মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।'[১] আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন,—মাধ্বমতে আরাধ্য হরি, পুরুষার্থ নিজসুখানুভূতিরূপ মুক্তি, সাধন বিশুদ্ধ ভক্তি, জ্ঞানের প্রমাণ বেদ : কিন্তু চৈতন্যমতে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন তাঁহার ধাম, পুরুষার্থ প্রেম, সাধন গোপীভাবে ভজন এবং প্রমাণ প্রধানতঃ ভাগবত।[২] উপরন্তু মাধ্বসম্প্রদায় শিখা-সূত্র বর্জন করেন না, চৈতন্যসম্প্রদায় শিখা-সূত্র পরিত্যাগী। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া মহাপ্রভু মধ্বাচার্যের স্থান 'উড়ুপ' গমন করিয়া মাধ্বমত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন,

> কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।
> কর্ম হইতে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি কভু নহে॥
> কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
> সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥...
> প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
> তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৯]

মনে হইতে পারে, শঙ্করমতের সহিত চৈতন্যমতের সাদৃশ্য আছে—কারণ, ঈশ্বরীপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু, আর কেশব ভারতী তাঁহার সন্ন্যাস গুরু। পুরী ও ভারতী—উভয় সম্প্রদায়ই শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, চৈতন্যদেব বহুস্থলে নিজেকে 'মায়াবাদী' সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ; রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন,

> অন্যের কি কথা মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
> আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ [চৈ. চ. মধ্য ৮]

কিন্তু শঙ্করমতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই মূল তত্ত্বই চৈতন্যমতে অস্বীকৃত। শঙ্করমতে সাধনায় প্রেম-ভক্তির কোন স্থান নাই, যাহা আছে—তাহাও পারমার্থিক

১। চৈতন্য সম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্রদায় [হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড]
২। বৈষ্ণব রস সাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সাধন নয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বেদান্ত-বিচারে চৈতন্যদেব শঙ্করমতকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করের নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থলে তিনি পরমতত্ত্বের সগুণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং জীবই ব্রহ্ম—এই মতের সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন :

ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥···
অপাণি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ স্বরূপ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁহে করহ নিশ্চয়॥···
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বরসনে করহ অভেদ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৬]

শঙ্করাচার্যের 'মায়াবাদ' ও 'বিবর্তবাদ'কেও তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন :

জীব নিস্তারের হেতু ভাষ্য কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥···
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছ কল্পনা করিয়া॥ [ঐ. মধ্য. ৬]

চৈতন্য-প্রবর্তিত মতের সমর্থন আছে রামানুজাচার্যের 'শ্রীভাষ্যে'। রামানুজ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম শ্রী-সম্প্রদায়। শ্রীভাষ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ মত প্রকাশিত হয় নাই; উহাতে শ্রীর প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীভাষ্যে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। শঙ্করাচার্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই রামানুজের আবির্ভাব।

রামানুজমতে ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, পুরুষোত্তম; ইনি শক্তি-বিশিষ্ট; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সগুণ উপাসনাও স্বীকৃত।

চৈতন্যমতের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য থাকিলেও, রামানুজ দেহপাতের পর যে মোক্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত চৈতন্যমতের মিল নাই। রামানুজ মুক্তির শেষস্তরে জীবের ব্রহ্ম-সারূপ্য স্বীকার করেন, মহাপ্রভুর ধর্মে এই ধরনের মুক্তি-কামনা অবাঞ্ছিত।

নিম্বার্ক-প্রচারিত ভেদাভেদবাদের (Identity-in-difference) সহিত চৈতন্য-প্রচারিত দার্শনিক মতের সাদৃশ্য বরং গুরুতর। নিম্বার্কের পরম তত্ত্ব রমাপতি সবিশেষ ও সগুণ; তিনি সৌন্দর্য, আনন্দ ও করুণার উৎস। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ও স্বরূপতঃ যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। নিম্বাদিত্যের সহিত চৈতন্যমতের মিল প্রধানতঃ 'লোকবত্তু লীলা'-কৈবল্যম্' [ব্র সূ. ২. ১. ৩৩]—লীলা প্রকাশের জন্যই ব্রহ্মের সৃষ্টি-কার্য এবং জীবকে ব্রহ্মের শক্তিরূপে স্বীকৃতিতে। ভক্তির কল্পনাতেও সাদৃশ্য আছে। নিম্বার্কমতে ভক্তি 'প্রেমবিশেষলক্ষণা' অর্থাৎ ভক্তি মাধুর্য-প্রধান। চৈতন্যমতেও ভক্তি মাধুর্য-প্রধান।

মিল থাকিলেও চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম স্বতন্ত্র। ইহা যেন একটি পৃথক ধারা। এই ধারা প্রবাহিত হইয়াছে শাণ্ডিল্যসূত্রে, নারদ পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতে; ইহার মিল রহিয়াছে দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের সহিত এবং বিল্বমঙ্গলের প্রেমসাধনার সহিত। বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থে এই প্রেমধর্মের আদি সূত্রধার বলা হইয়াছে মাধবেন্দ্র পুরীকে। চৈতন্য-ধর্ম মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমধারায় পুষ্ট, যে মাধবেন্দ্র পুরী 'মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন', যিনি 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ হে' বলিয়া কৃষ্ণ-বিরহে উদ্বেল। ভারতীয় ভক্তি-সাধনার অনেক ধারা আসিয়া মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ও প্রেমসাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, কিন্তু ভাব ও প্রেমের স্পর্শটি চৈতন্যদেবের একান্ত নিজস্ব।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব হইতেই দক্ষিণভারতে ভাব-প্রধান ভক্তিধর্মের বিকাশ ঘটিতেছিল। জ্ঞান-রাজ্য হইতে ভক্তি-কুঞ্জের দিকে যাত্রা শুরু হইয়াছিল। এই ভক্তি-ধারা পুষ্ট হইতেছিল ভক্তিমূলক পঞ্চরাত্র, ভক্তিসূত্র, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাবে। দক্ষিণভারতের শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক প্রভৃতি সম্প্রদায় এই ভক্তিধর্মের চর্চায় ছিল অগ্রগণ্য। এই সকল সম্প্রদায়ে জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তির দিকে এবং ভক্তি ক্রমশঃ প্রেমভাবের দিকে দিক্ পরিবর্তন করিতেছিল। এইরূপে ব্রহ্ম ক্রমশঃ বিষ্ণু এবং বিষ্ণু ক্রমশঃ কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইতেছিলেন—এবং ব্রহ্ম-শক্তি রূপে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী এবং আরও

পরে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার প্রাধান্য সূচিত হইতেছিল। সাধনাতেও ক্রমশঃ 'প্রেমলক্ষণা ভক্তি'র প্রসার ঘটিতেছিল। মায়াবাদকে অস্বীকার করা, লীলাবাদকে স্বীকার করা, বিবর্তবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া পরিণামবাদকে গ্রহণ করা এবং পরিণামবাদের মূলীভূত কারণরূপে ব্রহ্ম-শক্তি, বিষ্ণু-শক্তি কিংবা অন্তরঙ্গ শক্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া বৈষ্ণব আচার্যগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বস্তুতঃ এই সকল বিশিষ্টতার একটি সুষ্ঠু পরিণত রূপ। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমতত্ত্বে ও প্রেমধর্মে দক্ষিণী প্রভাব বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্য হইতেই তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা' ও বিল্বমঙ্গলের 'কর্ণামৃত' গ্রন্থ নকল করাইয়া লইয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার সাধ্য সাধনতত্ত্বেরও বিচার হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে, উপরন্তু যে পুরী-ভারতী সম্প্রদায়ের নিকট তিনি দীক্ষিত, তাঁহারাও ছিলেন দক্ষিণ দেশবাসী।

চৈতন্যদেব নিজে কোন ভাষ্য লিখিত আকারে রচনা করেন নাই। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যে-সকল বিচার ও আলোচনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ বেদান্ত সম্পর্কে বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার, রায় রামানন্দের সাহত সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা, কিংবা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি হইতে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

বেদবাক্য চৈতন্যমতে অভ্রান্ত প্রমাণ ['প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান']; প্রমাণ কখনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না ['শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ']। তিনি মনে করেন, বেদ 'আর্য বিজ্ঞ বাক্য', তাহা সর্বদোষ বর্জিত :

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা কারণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ [চৈ. চ. আদি. ২]

চৈতন্যমতে ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্র চারিবেদ ও উপনিষদের সার; এই সূত্র ঋক্-বিষয়ের সঞ্চয়। ব্যাসদেব স্বয়ং ভগবান, অতএব 'বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন'। কিন্তু বচনের অর্থ অতি গভীর ['ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ']। সে সূত্রের অর্থ কোন জীব অনুধাবন করিতে পারে না। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতমত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণায় সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষণায় অর্থ করিলে বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য হানি ঘটে :

স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ [ঐ. মধ্য. ৬]

মহাপ্রভুর মতে, উপনিষৎ শব্দের মুখ্যার্থই ব্যাসসূত্রে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য-মেঘে সেই মুখ্যার্থ আচ্ছাদিত।[১] শুধু আচার্য শঙ্কর কেন, সকলেই স্বমত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাসসূত্রের কল্পিত অর্থ করিয়াছেন। এ সকল অর্থ ভ্রান্ত। ব্যাসদেব নিজেও জানিতেন, সূত্রের অর্থ অতি গভীর। এইজন্য তিনি নিজেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা কোথায় আছে? —শ্রীমদ্ভাগবতে। স্বয়ং ঈশ্বর 'প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে হয়, তাহা 'চতুঃশ্লোকী'তে বিবৃত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদের নিকট প্রকাশ করেন। নারদ সেই ব্যাখ্যা ব্যাসদেবকে শুনাইয়াছিলেন। ব্যাসকৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই ব্যাখ্যার প্রকাশ।

অতএব শ্রীভাগবত ব্যাস-সূত্রের খাঁটি ভাষ্য। শুধু তাই নয়, শ্রীমদ্‌ভাগবত ভগবদ্বাক্য, কারণ, উহা বেদোপনিষদের শ্লোকবিগ্রহ :

চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে সেই ঋক্-বিষয় রচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ॥ [ঐ. মধ্য. ২৫]

তাই চৈতন্যমতে শ্রীমদ্ভাগবত অবিতথ প্রমাণ ['সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবত'মিষ্যতে']

চৈতন্যমতে কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব ['কৃষ্ণ তত্ত্ববস্তু']

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥[২] [চৈ. চ. আদি. ২]

প্রকাশ-বিশেষে তাঁহার বিভিন্ন নাম। তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই বলেন, 'যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্'। ব্রহ্মবিদ্ তাঁহাকে বলেন 'ব্রহ্ম', যোগিগণ বলেন, 'পরমাত্মা', ভক্তগণ বলেন, 'ভগবান'। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবত্তাই পূর্ণ। উপনিষদের ব্রহ্ম সেই ভগবানের 'তনুভা' (দেহকান্তি), যোগীর পরমাত্মা তাঁহার 'অংশ-বিভব' (অংশ-বিভূতি)। এই ভগবান কৃষ্ণ সবিশেষ। শ্রুতিতে তাঁহাকে 'নির্বিশেষ' বলা হইলেও সবিশেষ লক্ষণই বলবান্,

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্ধ্ব সমান॥ [চৈ. চ. আদি. ৭]

১। ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৬]

২। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥ [ব্রহ্মসংহিতা. ৫. ১]

চৈতন্যমতে কৃষ্ণ সবিশেষ, সগুণ ও সাকার। চৈতন্যদেব বলেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রহ্মসূত্রের এই বাক্যই প্রমাণ করে ব্রহ্ম সবিশেষ :

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবান্ সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥ [ঐ. মধ্য. ৬]

চৈতন্যমতে এই সবিশেষত্ব ভগবানের তটস্থ লক্ষণ নয়, স্বরূপ-লক্ষণ। ভগবানের 'গুণগণ' অনন্ত ; শ্রী, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট গুণ। অতএব ব্রহ্ম সগুণ ও বিশিষ্ট। তিনি নিরাকারও নহেন : 'ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার' তিনি কি নিরাকার হইতে পারেন ? মহাপ্রভু বলেন, 'তাঁহার বিভূতিদেহ সব চিদাকার'।

সৃষ্টি-লীলায় ভগবানের প্রকাশ বিবর্তমাত্র নয়, রজ্জুতে সর্পভ্রমও নয়। সৃষ্টি ঈশ্বরের পরিণাম। শ্রীভগবান্ 'অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত' ; এই অচিন্ত্য শক্তিবলে তিনি স্বেচ্ছায় জগৎ-রূপে পরিণত হন।[১] চৈতন্যমতে 'মায়াবাদ' ভ্রান্ত। বৈষ্ণব বৈদান্তিক মাত্রই মায়াবাদের প্রতিবাদী। মহাপ্রভুও মায়াবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, 'মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'। বস্তুতঃ ঈশ্বর নিঃশক্তি নন, তাঁহার স্বাভাবিকী তিন শক্তি ['স্বাভাবিকী তিন শক্তি যেই ব্রহ্ম হয়'] ; অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়া। ভগবান মায়াধীশ ও মায়াতীত। এই মায়া হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। জগৎ ভগবান হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। প্রাকৃত চিন্তামণি হইতে যেমন নানা রত্নরাশি হয়, অথচ চিন্তামণি অবিকৃত—তেমনই ভগবান ও জগৎ। জীবও ভগবান্ হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। অভিন্ন এইজন্য যে, তাঁহাদের অংশ-অংশী সম্পর্ক ; জীব অংশ, ভগবান অংশী :

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ [চৈ. চ. আদি. ৭]

আবার জীব চিৎকণ, ভগবান চিদ্‌ঘন—জীব মায়াবশ, ভগবান মায়াধীশ ; অতএব জীব ও ভগবান ভিন্ন। এই ভেদাভেদবাদের সহিত রামানুজ ও নিম্বার্ক মতের মিল আছে।

বৈষ্ণবমতের প্রধান বিশেষত্ব ঈশ্বরের 'অচিন্ত্য শক্তি'র পরিকল্পনায়। ঈশ্বরের

১। পরিণাম বাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৬.]

তিনশক্তি অন্তরঙ্গা, তটস্থা (জীব) ও বহিরঙ্গা (মায়া) স্বরূপগণের প্রকাশ' অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি (চিচ্ছক্তি) হইতে, ব্রহ্মাণ্ড বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব প্রকাশ, আর জীব এতদুভয়ের মধ্যস্থ (তটস্থা)। এই শক্তির প্রভাব 'অচিন্ত্য': How a Sva-rupa or essence which is inherently spiritual can yet appear as the insentience of a material world or how the infinite spiritual reality may yet split itself into innumerable limited spirits without prejudice to its integrity of being, is one of the mysteries of the Ultimate Reality which defies logical resolution"[১] শক্তির এই 'অচিন্ত্য' প্রভাবহেতু কৃষ্ণ এবং জীব ও জগৎ যুগপৎ ভেদাভেদ। চৈতন্য মহাপ্রভুর বেদান্ততত্ত্ব তাই 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নামে বিখ্যাত।

চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মে 'এহো বাহ্য'। এই প্রেমধর্মের অভিনবত্ব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের 'সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ', 'শৃঙ্গার রসরাজময়', 'অখিল রসামৃত মূর্তি'র স্বীকৃতিতে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিরূপে 'হ্লাদিনী', 'আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা', মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর স্বীকৃতিতে। সমগ্র জগৎ এই অদ্বয় দ্বৈতত্ত্বের আনন্দলীলা, জীবের পুরুষার্থ এই লীলার অনুভব ও আস্বাদনে।

॥ বাংলাদেশে লোকায়ত মত ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত মতের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। অবিমিশ্র চার্বাক মত কোনদিনই ভারতীয় জীবনকে তেমন প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। লোকায়ত প্রত্যক্ষবাদ, হেতুবাদ, ভোগবাদ—অর্থ ও কামের সেবা এবং ঐহিক সুখভোগ রূপ স্ফূর্তি ধর্মভীরু আস্তিক জীবনে আত্যন্তিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাংলাদেশেও তাহা পারে নাই।

তবে বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি ধর্মে লোকায়ত মতের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রভাবও প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট পূর্ব হইতেই নাস্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে একদিন বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করিতেন। সেইসূত্রে এদেশে লোকায়ত মতের কিছুটা প্রসার হওয়া অসম্ভব নয়।

১. বৌদ্ধ দোহা ও গানে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও আচারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ বর্ষিত হইয়াছে, বেদ-ব্রাহ্মণের নিন্দারও অসদ্ভাব নাই। কাহ্নপাদের মতে 'বাহ্ম

১। Chaitanya (Achintya Vedabhed)—Dr. S. K. Maitra [Hist. of phil. Eastern western vol I].

ছাড়িআ' সহজ-সুন্দরীকে স্পর্শ করিতে পারে না [১০ নং চর্যা]'; লুইপাদ বলেন, যাহার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ নাই 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী' [২৯ নং চর্যা]; দারিকপাদ বলিতেছেন,

কিন্তো তন্তে কিন্তো মন্তে
কিন্তোরে ঝাণবখাণে। [৩৪ নং চর্যা]

এই প্রতিবাদাত্মক মনোভাব আরও স্পষ্ট ও সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে দোহাগুলিতে। এই ধরনের প্রতিবাদ প্রথম লক্ষ্য করা যায় উপনিষদে—জ্ঞানবাদী ঋষিদের কণ্ঠে। কিন্তু উপনিষদেই দেখা যায়, একদল মানুষ ছিল স্বভাববাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া মানিতেন। মনে হয় উপনিষদের প্রতিবাদাত্মক মনোভাব সেই সকল লোকায়ত মতেরই প্রতিধ্বনি। হিন্দুমতে বৌদ্ধগণ ছিলেন নাস্তিক। কাজেই বৌদ্ধ সহজযানের এই প্রতিবাদী মনোভাবও তাঁহাদের সমানতন্ত্র লোকায়ত দর্শন হইতেই সমাগত। তাঁহাদের প্রতিবাদের ভঙ্গি, এমনকি কোন-কোন-স্থলে ভাষা পর্যন্ত বার্হস্পত্য দর্শনের অনুসারী।

২. সহজ সাধনায় প্রত্যক্ষ এই 'দেহে'র গুরুত্ব অসাধারণ। শুধু তাই নয়—স্ত্রী-পুং যোগে রহস্যময় গুহ্য সাধনও স্বীকৃত। এই সাধনার শেষ প্রাপ্তি 'মহাসুখ'। এই সকল দিক হইতে চার্বাকের দেহবাদ, ভোগবাদ ও সুখবাদের কথা স্বভাবতই মনে পড়িতে পারে।

কিন্তু মূলতঃ এগুলি লোকায়ত হইলেও সহজ সাধনায় এগুলি আসিয়াছে যোগ ও তন্ত্রের মধ্যস্থতায়—কারণ, বৌদ্ধ সহজমত হইতেছে 'O:‍ .hoot of Tantric Buddhism.'; সহজমতে কাম রহস্যময় যোগের নামান্তর, ইহার 'পরাবৃত্তিতে' পরম বিভুত্ব লাভ হয়।[১] অতএব এ কামকে লোকায়ত কাম বলা চলে না। সহজিয়াদের 'মহাসুখ'ও লোকায়ত সুখ হইতে স্বতন্ত্র।

আস্তিকতাই সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়ম অনুসারে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সেন আমল হইতে এদেশে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তৃত হয়, তাহা যাবতীয় নাস্তিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। বাংলাদেশ হইতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির ইহা একটি প্রধান কারণ। তারপর আসিল মুসলমান আক্রমণ। অত্যাচারে, অবিচারে বিপর্যস্ত মানুষ তখন ধর্মের দুয়ারে ধন্না দিল, দেবকৃপায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিল এবং দেবারাধনা

১। 'মৈথুনস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরম্'—মহাযান সূত্রালঙ্কার

খায়া ত্রিবিধ দুঃখকে দূর করিতে তৎপর হইল। এই ধর্মাচরণে প্রেরণা সঞ্চার করিল আগমবাগীশের তন্ত্রসার এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি। এইরূপে বাংলাদেশে নাস্তিক মত প্রবেশের সকল দুয়ারই রুদ্ধ হইয়া গেল।

তবে ইহারই ভিতর দেবধর্ম-বিরোধী, ভোগসর্বস্ব মানুষের আবির্ভাব বাংলা-দেশেও ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'পাষণ্ডী' ও 'নাস্তিক'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ অবশ্য নিজধর্ম ব্যতিরিক্ত সকলকেই 'পাষণ্ডা' বলিয়াছেন। চাপালগোপাল, জগাই-মাধাই 'পাষণ্ডী'র দলভুক্ত। ইহারা চিরকালের দুর্জন। 'পাষণ্ডী' ছাড়া নাস্তিকেরও অস্তিত্ব ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে সাক্ষী গোপালের কাহিনী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:

এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেই পারে॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৫]

ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী এই সকল লোক বস্তুতই নাস্তিক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এক শ্রেণীর সুখী নাগরিকের বর্ণনা পাওয়া যায়,—

নগরে নাগরজনা কানে লম্বমান সোনা
বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর বসন পরিধান॥ [কালকেতু-উপাখ্যান]

চিত্রটি অনেকটা ভোগবাদী সুখী চার্বাকের অনুরূপ। কামসূত্রেও নাগরিকের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।[১]

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধাবতার রামানন্দ যতির নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার মনোভাব অনেকটা নৈরাজ্যবাদী। রামানন্দ তান্ত্রিক বৌদ্ধ।

অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলার ধর্মীয় পটভূমিতে নৈরাজ্যের ছায়া নামিয়া আসে। একদিকে বাদসাহী বিলাস, নাগরবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল নবাবী মেজাজ, অপরদিকে নবাগত পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদ ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত হানিতে থাকে। ইহার ফলে নাস্তিকসুলভ সংশয়বাদ ও অবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই অবিশ্বাস-জনিত ব্যঙ্গ-শ্লেষের প্রকাশ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি অসমাপ্ত চণ্ডী নাটকে যে অসুর-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভোগবাদী নাস্তিকের চিহ্ন সুপরিস্ফুট: যেমন, প্রজার প্রতি মহিষাসুরের এই উক্তি:

শোনরে গোয়ারলোগ ছোড়্ দে উপবাস যোগ
মানহু আনন্দভোগ ভৈষরাজ যোগমে।···

১। কামসূত্র. ১. ৪. (নাগরকবৃত্তম্)

আপকো লাগাও ভোগ কামকো জাগাও
ছোড়্ দেও যোগ গো মোক্ষ এহি লোগ মে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দুর্যোগ আরও ঘনীভূত। তখন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান জনচিত্ত। ঠিক এই সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভুঁই-ফোঁড় জমিদার তথা 'বাবু' শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বাবুর চিত্র-চরিত্র অবিকল ধূর্ত চার্বাকের মত। ধর্মে তাহাদের মতি নাই, ভোগে পূর্ণ আস্থা, দেশীয় সংস্কারের প্রতি বিরূপ মনোভাব। ইহা পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এই বাবুদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে, হুতোম প্যাঁচার নকসায়। এই বাবুদের মধ্যেই আবার একদল ছিলেন 'পক্ষী'। এই পক্ষীর দলের সুখবাদ ও উন্নাসিক মনোভাব ধূর্ত চার্বাকদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পক্ষীর দলের একটি গানের কিছুটা অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতেছে, ইহা বিবেক-বৈরাগ্য না কটাক্ষ, সুধীবর্গ তাহা বিচার করিবেন :

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয়মদে চক্ষুমুদে শুয়ে আছ বেমালুম॥
ঐশ্বর্যের মাৎসর্যে তুমি মনে কর বাদসাক্রম্।
এ প্রপঞ্চ এক সাজে সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাথ্‌ম্ থুম্॥

নব্য বাংলায় লোকায়ত প্রত্যক্ষবাদ, বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদের প্রভাব দেখা যায় বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে। যদিও এ সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, তথাপি উহার বস্তুতান্ত্রিকতায় প্রাচীন লোকায়ত মতের প্রতিধ্বনি ও পুনরুজ্জীবন লক্ষণীয়।

॥ তন্ত্র ॥

১. সাধারণ পরিচয়

তন্ত্র বলিতে সাধারণ ভাবে বুঝায় 'সিদ্ধান্ত', ব্যাপকার্থে 'তন্ত্র' যে-কোন শাস্ত্র; কিন্তু সাহিত্যে ও সাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের অর্থ সীমাবদ্ধ। তন্ত্র শক্তি-সাধনা-সংক্রান্ত গ্রন্থ। এই অর্থেই তন্ত্র শব্দ রূঢ়।

তন্ত্রে অবশ্য বিবিধ পুরুষ দেবতার পূজা-অর্চনা বিধিও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ উহার বিষয় মাতৃ বা শক্তি-উপাসনা। তন্ত্র মতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে এক দেবতা লীলা করিয়া চলিয়াছেন, তিনি মহাশক্তি। তত্ত্বতঃ ইনি অব্যক্ত, গুণসাম্যের বহির্ভূত ও নির্বিশেষ—কিন্তু লীলায় তিনি অনন্তরূপিণী বা বিশ্বরূপা। সৃষ্টির অন্তরে বা বাহিরে, সীমায় বা সীমার অতীতে যা কিছু, সবই এই শক্তির প্রকাশ। বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্তিতে তিনি সংখ্যাহীন দেবশক্তি: তিনিই শিবশক্তি শিবা, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী ও ব্রহ্মাশক্তি ব্রহ্মাণী—তিনিই ঐন্দ্রী ও কৌমারী, তিনিই জগৎ-প্রসবিতা সাবিত্রী। পার্থিব জগতে প্রাকৃতিক শক্তিতেও তিনিই বিরাজমানা, তিনিই রাত্রি, তিনিই ঊষা, তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি। মানবদেহেও তিনিই নাদরূপ শব্দব্রহ্ম কিংবা কুণ্ডলিনী। বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি-যোনি শক্তি। তাই পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক অভিধাও শক্তিরই এক এক রূপ—মাতৃরূপে, ভার্য্যারূপে তাঁহারই জগৎ-লীলা। এই শক্তিই তন্ত্রের আরাধ্যা।

তন্ত্র সাধন-শাস্ত্র, শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ সাধনা বা ফলিত সাধনা। তাই যে-কোন তন্ত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সাধন, সাধনার ক্রম এবং সাধনার প্রণালী। ইহার ভূমিকা অনেকটা বৈদিক 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের বা কল্পশাস্ত্রের। তন্ত্র প্রধানতঃ উপাসনা-পদ্ধতি। যন্ত্র, মণ্ডল, আসন, মন্ত্র, ন্যাস, ধ্যান, যোগ, মুদ্রা ও পূজা—এই উপাসনার অঙ্গ।

অবশ্য এই সঙ্গে দর্শনের অংশও আছে। প্রাচীনতম তন্ত্রে দর্শনের অংশ ছিল নিতান্তই অল্প। পরবর্তী কালেও দর্শনাংশরূপে তন্ত্রে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাও ক্রিয়ারই অঙ্গ। ক্রিয়ার জন্যই তন্ত্র-দর্শন। নির্বিশেষ শক্তির তত্ত্ব কি, সেই শক্তি কিরূপে বিশেষিত হইয়া প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হন, কিভাবে শক্তির ছন্দে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত হয়—এইগুলিই শাক্ত দর্শনের আলোচ্য। তন্ত্রের দর্শনভাগে রহিয়াছে, শক্তির অবরোহণ-তত্ত্ব; ক্রিয়াভাগে আছে, পুনরায় শুদ্ধ শক্তির স্তরে আরোহণের উপায়।

জীবসত্তার স্থূল বা সঙ্কুচিত বা সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া শক্তিকে অখণ্ড করাই তন্ত্র সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য তান্ত্রিকগণ যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহাতে বিশেষত্ব আছে। যেমন পঞ্চ ম-কার সাধন (অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন-এর ব্যবহার), যন্ত্রাঙ্কন (সাঙ্কেতিক ত্রিভুজাকৃতি রেখা-চিত্র), মুদ্রা প্রদর্শন (হস্তাঙ্গুলির বিবিধ বিন্যাসদ্বারা ইঙ্গিতগর্ভ সঙ্কেত), মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রোচ্চারণ এবং ষট্‌কর্ম (মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়া)। এই সকল ক্রিয়া অতিশয় গুহ্য, গুরুমুখী ও রহস্যময়। প্রচলিত অন্যান্য পূজাবিধি ও সাধনা হইতে এগুলি স্বতন্ত্র এবং সাধারণ দৃষ্টিতে অদ্ভুত। অথচ এই রহস্যময় প্রক্রিয়াগুলিই তন্ত্র সাধনার প্রাণ এবং উহার ফলও প্রত্যক্ষ।

২. তন্ত্রসাধনার প্রাচীনত্ব

তন্ত্র-সাধনা কত প্রাচীন? ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী স্ত্রীমূর্তিগুলি প্রমাণ করে, শক্তিসাধনা বৈদিক যুগের বহুপূর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত।[১] আবার কাহারও কাহারও ধারণা তন্ত্র-সাধনা বেদ-মূলা; বেদাদিতে বিশেষতঃ অথর্ববেদে তন্ত্রাচারের বাহুল্য। তাঁহাদের মতে তন্ত্রমত অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে পরিগৃহীত। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আবার মনে করেন, তন্ত্র সাহিত্য বৌদ্ধদের সৃষ্টি। বুদ্ধদেব নিজে সর্বস্তরের মানুষকে স্বীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রচলিত যাবতীয় তন্ত্রগ্রন্থ মহাযান বৌদ্ধদের দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়—কালী, তারা প্রভৃতি শাক্ত দেবতাও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দেবতা।[২]

কিন্তু তন্ত্রাচার অপ্রাচীন নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, তন্ত্রাচার হিন্দুদেরও নয়, বৌদ্ধদেরও নয়—ইহার উৎস অতি আদিম। সেই আদিম উৎস হইতে দর্শন বা তত্ত্ব-বিরহিত তন্ত্রাচার অবিস্মরণীয় কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং যুগে যুগে প্রায় সকল ধর্মেই ইহা গৃহীত হইয়া—কোথাও বা হিন্দুতন্ত্রে, কোথাও বা বৌদ্ধতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।[৩]

বস্তুতঃ তন্ত্রাচার অপ্রাচীন নয়। বেদে উপনিষদে তান্ত্রিকতার স্বাক্ষর আছে।

১. Pre-historic ancient and Hindu India—R. D. Banerjee.

২. Introduction to Sadhan mala—Dr. B. Bhattacharjee.

৩. Obscure Religious cults—Dr. S. B. DasGupta.

পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে—শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তাচারের উল্লেখ অফুরন্ত। বৌদ্ধধর্ম ইহাদের পরবর্তী—বিশেষতঃ বেদ-উপনিষদের পরে তো বটেই। অতএব তন্ত্র-সাধনার প্রাচীনতাকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কেন, তাহারও বহু পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে স্থাপন করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহা আরও প্রাচীন। সিন্ধুউপত্যকাসভ্যতার 'অম্বা' মূর্তি এবং তন্ত্র-সাধনার যন্ত্র (চিত্র), মুদ্রা (হস্তাদির দ্বারা ভাষার মূকসঙ্কেত), হ্রীং-ক্লীং প্রভৃতি বীজমন্ত্র (একাক্ষরী শব্দের ভাষা)—মানব-সৃষ্টির অতি আদিম-স্তরের চিত্রাত্মক, মুদ্রাত্মক বা একাক্ষরাত্মক ভাষাব স্বাক্ষর বহন করে: ষট্‌ কর্মাদি আভিচারিক ক্রিয়াও আদিমতম বিশ্বাস ও ক্রিয়ার পরিচয়।

তবে তন্ত্র নামে যে বিপুল সাহিত্য বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের বয়স খুব প্রাচীন নয়। বীজ যেমন ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়—তেমনি মাতৃতান্ত্রিকতার আদি বীজ প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া বিপুল তন্ত্র-কল্পতরুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কেহ ইহাতে তত্ত্ব যোগ করিয়াছেন, কেহ বা ইহাতে বিধি ও বিধান, ভাব ও আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, কেহ বা বিশৃঙ্খল সাধন পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কালক্রমে তন্ত্রদেহ বিচিত্র আকারে আকারিত হইয়াছে। মনীষী Winternitz এই বিচিত্র মিশ্রণেব ইঙ্গিত দিয়া একটি অতি মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন: **In saktism and its sacred books, the Tantras, we find the loftiest ideas on the Deity and profound philosophical speculations, side by side with the wildest superstition and most confused occultism ; and side by side with a faultless social code of morality and rigid asceticism, we see a cult disfigured by wild orgies inculcating extremely reprehensible morals.** [A Hist. of Ind. Lit. Vol. I]

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একটি অতি আদিম ধারায় কালক্রমে বহু ধারার মিশ্রণের ফলে প্রচলিত তন্ত্র সাহিত্যের উদ্ভব।

৩. তান্ত্রিকতার কেন্দ্র: তন্ত্রগ্রন্থের তালিকা ও শ্রেণীবিভাগ

একটি অতি সুপ্রচলিত মত এই যে, তান্ত্রিকতার জন্মভূমি বঙ্গদেশ: 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। একথা ঠিক যে, প্রাচীনতম তন্ত্রগ্রন্থের অনেকগুলি বঙ্গদেশ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে—বঙ্গদেশীয় তন্ত্রে দর্শন-তত্ত্ব বিরহিত প্রাচীনতার চিহ্নও বর্তমান ; বাংলাদেশের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মাতৃভাবের প্রাধান্য—বাংলার ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আচার-

ব্যবহার, বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সাহিত্য মাতৃভাবে অনুরঞ্জিত; ভারতব্যাপী বিখ্যাত শাক্তপীঠের অনেকগুলি বঙ্গদেশে ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যমান। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিকতার কেন্দ্র হিসাবে চারিটি স্থানের নাম করিয়াছেন: কামরূপ, সিরিহট্ট, ওড্ডিয়ান ও পূর্ণগিরি—এগুলিও বাংলাদেশে ও বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

কিন্তু তন্ত্রাচার কেবল বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হিমালয় পর্বতের পাদদেশ ধরিয়া একটি রেখা টানিলে সমগ্র অঞ্চলটিকেই তান্ত্রিকতার বন্ধনী বলিতে হয়: উপরন্তু দাক্ষিণাত্যেও তন্ত্রাচার প্রচলিত। শৈবাচারের সহিত তন্ত্রাচার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শাক্তাচার মহাযান বৌদ্ধ কর্তৃক ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে: তিব্বত, চীন, জাপানেও তন্ত্রাচার সুপ্রতিষ্ঠিত।

তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার লীলাভূমিকে তিনটি কেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে: অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা।[১] বিন্ধ্যপর্বত হইতে কন্যাকুমারিকা অঞ্চল অশ্বক্রান্তা, বিন্ধ্য হইতে উত্তরস্থিত সমগ্র ভূভাগ রথক্রান্তা এবং বিন্ধ্য হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিষ্ণুক্রান্তা।

এই সকল কেন্দ্রে কত যে তন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। তন্ত্রশাস্ত্রে অবশ্য একটি সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে। তাহাতে অশ্বক্রান্তাদি প্রত্যেকটি কেন্দ্রের গ্রন্থ সংখ্যা চৌষট্টি—একুনে তন্ত্রের সংখ্যা একশত বিরানব্বই।

অশ্বক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত ৬৪ খানি তন্ত্র—তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি, গুপ্তদীক্ষা, শিবতন্ত্র, শিবার্চন, যোগতন্ত্র, বিন্দুতন্ত্র, শবর, শূলিনী, চূড়ামণি, বিশুদ্ধেশ্বর, চীন, ভূতেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত।

রথক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ খানি তন্ত্রের মধ্যে—মেরু, মহানির্বাণ, ভূতডামর, বৃহদ্গৌতমীয়, পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, পুরশ্চরণ রসোল্লাস, প্রপঞ্চসার, পিচ্ছিলা, স্বরোদয়, জ্ঞানভৈরব, কঙ্কালমালিনী, শক্তিসঙ্গম, সারদা, চীনাচার, যক্ষডামর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্ভূত ৬৪ খানির মধ্যে—কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, ফেৎকারিণী, শ্রীক্রম, সিদ্ধযামল, মৎস্যসূক্ত, সিদ্ধসার, বারাহী, যোগিনী, শিবাগম, মুণ্ডমালা, স্বতন্ত্র, সম্মোহন, তন্ত্ররাজ, বাধা, মালিনী, রুদ্রযামল, মালিনীবিজয়, সময়াচার, যোগনীহৃদয়, কুলচূড়ামণি, কামাখ্যা, ভূতডামর, যামল, ব্রহ্মযামল, বিশ্বসার, কুলোড্ডীশ, কুব্জিকা, কালীবিলাস, মায়াতন্ত্র প্রভৃতি বহুল প্রচলিত।

১। হিন্দুর মৃত্তিকাস্নান মন্ত্রেও এই তিনটি স্থানের নাম আছে:

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতংকৃতম্।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে তন্ত্রগুলি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত : আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে উহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহার বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী এবং যে মত বাসুদেবের, তাহাই আগম।[১] ইহাতে সাধারণভাবে সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম ও ধ্যানযোগের বিবৃতি থাকে।

শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রকে ডামর বলে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার ডামরের উল্লেখ আছে,—যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, সারস্বতডামর, ব্রহ্মডামর ও গন্ধর্বডামর; এগুলি ছাড়া ভূতডামরও একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

যামল শব্দের সাধারণ অর্থ 'যুগল'। ইহা তন্ত্রান্তর্গত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। ইহা অষ্টলক্ষণ যুক্ত। ইহাতে থাকে সৃষ্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্যকৃত্য, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্মের কথা। যামলের সংখ্যাও ছয়খানি,—ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল, রবিযামল ও আদিত্যযামল।

শাক্তগ্রন্থের বিশিষ্ট নাম তন্ত্র। ইহাতে সর্গ, প্রতিসর্গ, দেবতাসংস্থান, তীর্থবর্ণনা, আশ্রমধর্ম, যন্ত্রনির্ণয়, জ্যোতিষ, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণনা, ব্রতবিবরণ, শৌচাশৌচ, নরকবর্ণনা, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, প্রভৃতির বিবরণ থাকে।

তন্ত্রের সমার্থক আরও অনেক শব্দ আছে—নিগম, রহস্য, সংহিতা, অর্ণব ইত্যাদি। মোটের উপর এই সকল মিলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র সাগরের মতই অনন্ত ও অগাধ। শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় কর্তৃকও অসংখ্য তন্ত্র গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য শাক্ততন্ত্র।

ভাব, আচার ও কুলভেদে তন্ত্র সাধনায় নানা শ্রেণী বিভাগ আছে : তন্মধ্যে কালীকুল ও শ্রীকুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই দুই কুলকে আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে বহু সাধক, পণ্ডিত ও আচার্য আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিরাট তন্ত্রসাহিত্যের ভাণ্ডারে সেগুলিও অমূল্য রত্ন। এই নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১. শঙ্করাচার্যের প্রপঞ্চসার তন্ত্র এবং সৌন্দর্যলহরী, ২. লক্ষ্মণ দেশিকের সারদাতিলক, ৩. অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক, ৪. ভাস্কর রায়ের সেতুবন্ধ ও বরিবস্যারহস্য, ৫. সর্বানন্দের সর্বোল্লাসতন্ত্র, ৬. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার, ৭. ব্রহ্মানন্দগিরির শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ও তারা রহস্য, ৮. পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি (ইহার অন্তর্গত ষট্‌চক্রনিরূপণ) শ্যামারহস্য ও শাক্তক্রম এবং ৯. গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের তারারহস্যবৃত্তিকা।

১। আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

৪. কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয়

তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থগুলির সূক্ষ্ম প্রকারভেদ যাহাই হউক, প্রত্যেক তন্ত্রেরই বর্ণনীয় বিষয়—কিছুটা জ্ঞান (দর্শন) এবং বেশির ভাগ ক্রিয়া (পূজা, যোগ, চর্যা)। তন্ত্রে ক্রিয়াংশই প্রধান। তাই প্রত্যেক তন্ত্রেই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে দেবতার পূজা-প্রণালী। এক এক দেবতার এক এক প্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, ধ্যান ও অর্চন-পদ্ধতি। এই দিক হইতে তন্ত্রের বর্ণনা অত্যন্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। তবে কোন কোন গ্রন্থে বিশেষত্বও যে না আছে, তাহা নয়। এই বিশেষত্বগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এবং বাঙালীর তন্ত্রচর্যার সহিত সাদৃশ্য আছে, এমন কয়েকটি মূলতন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

॥ মূলতন্ত্র ॥

॥ কালীতন্ত্র ॥[১] কালীকুলের একটি বিখ্যাত তন্ত্র। ইহার আকার সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূজার ইঙ্গিত অত্যন্ত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। কালীপূজা বিষয়ে ইহাই প্রামাণিক মূলতন্ত্র। ইহা একাদশ পটলে বিভক্ত এবং হর-পার্বতীর কথোপকথন ছলে বিবৃত। মহাবিদ্যা কালিকার তত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী বর্ণনাই এই তন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এই তন্ত্রেই বহুবিখ্যাত দক্ষিণাকালীর 'কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্' ধ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে। এই ধ্যানের মূর্তিই বাংলাদেশের বহুখ্যাত ও সর্বজন পরিচিত কালীমূর্তি। দেবী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা। তাঁহার বামহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়; তিনি মহামেঘপ্রভা শ্যামা দিগম্বরী—ঘোরদংষ্ট্রা, কিন্তু হসন্মুখী; শবরূপে মহাদেব তাঁহার পদতলে পতিত। এই মাতৃসাধকের আচার কৌলাচার—অষ্টম পটলে সেই কৌলাচারের বর্ণনা। এই তন্ত্রে বলা হইতেছে:

> ন হি কালী সমা বিদ্যা নহি কালী সমং ফলম্।
> নহি কালী সমং জ্ঞানং নহি কালী সমংতপঃ॥ [নবম পটল]

॥ তারাতন্ত্র ॥[২] দশ মহাবিদ্যার দ্বিতীয়া বিদ্যা তারা; তারাতন্ত্র তারা বিদ্যা উপাসনার কথা। ইহাতে তারা-উপাসনার যাবতীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত হইলেও দেবীর ধ্যান প্রকাশ করা হয় নাই। তারার ধ্যান অবশ্য তন্ত্রান্তরে পাওয়া যায়। তারা পূজায় পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের প্রয়োগ বিহিত: এই পূজার সহিত চীনতন্ত্রের যোগ

১। Sanskrit Sahitya parishad Series No. 2.

২। Published by Varendra Research Society, Rajshahi.

স্বীকার করা হইয়াছে। তারাতন্ত্রে দেবীর নিকট নিজ দেহরক্ত প্রদানের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অন্য জন্তুর কলসপূর্ণ রক্তদান অপেক্ষা তিলপ্রমাণ নিজদেহরক্তদান অধিকতর প্রশস্ত :

জন্তুরক্তেন সম্পূর্ণ কলসাং পর্বতাত্মজে।
তিল প্রমাণং রুধিরং নিজদেহস্য শস্যতে॥ [পঞ্চম পটল]

তারা-অর্চনা বামাচার সাধনার অন্তর্ভুক্ত ; এইজন্য ইহা অত্যন্ত গুহ্য ও রহস্যঘন।

॥ **মহানির্বাণতন্ত্র** ॥ অনেকেই মনে করেন, এই তন্ত্রখানি অপ্রাচীন। কেহ কেহ আবার রাজা রামমোহন রায়কে ইহার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। হয়তো এই তন্ত্রের কিছু অংশ পরবর্তীকালের যোজনা, কিন্তু ইহাতে যে সুপ্রাচীন তান্ত্রিক উপাসনার বিষয়ই সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা চোদ্দটি উল্লাসে বিভক্ত এবং হর-পার্বতীর কথোপকথন ছলে বর্ণিত। ইহাতে বলা হইয়াছে, কলিকালে পশুভাবও নাই, দিব্য ভাবও নাই—তন্ত্রোক্ত বীরভাবই কলিতে অবলম্বনীয়। কলির মার্গ কৌলাচার—'কৌলধর্মাৎ পরো ধর্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে' [৪র্থ উল্লাস]। এই কৌলাচার শাম্ভবী বিদ্যার সার। আগমোক্ত বিধানেব শ্রেষ্ঠ পথ। মহানির্বাণ তন্ত্রে পরমাশক্তির প্রধানমূর্তি আদ্যামূর্তি : অপূর্ব এই মূর্তি—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্।
পানিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্ রক্তারাবিন্দ স্থিতাম্॥
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥ [৫ম উল্লাস]

—কালিকা দেবীকে ভজনা করি : তিনি মেঘাঙ্গী, চন্দ্র-মৌলি, ত্রিনয়না ও রক্তাম্বর পরিহিতা। তাঁহার দ্বিভুজে বর ও অভয়। তিনি রক্তপদ্মে অবস্থিতা, মধুর মাধ্বীক মদ্যপানে নৃত্যপর মহাকালকে সম্মুখে দেখিয়া হাস্যমুখবা।

এই শক্তি দেবীর পূজার উপকরণ পঞ্চ তত্ত্ব—'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ'। তত্ত্বহীন দেবীপূজা অভিচারমাত্র : 'পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।' মহানির্বাণ-তন্ত্রে বিস্তৃতভাবে এই পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'চক্রানুষ্ঠান' ক্রিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্বাণ-তন্ত্র প্রকৃতই তন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমধর্ম, রাজ্য শাসন প্রভৃতির কথাও আছে। নারী সম্পর্কে এই তন্ত্র অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥ [৮ম উল্লাস]

মহানির্বাণতন্ত্রের দর্শনাংশও অতি মূল্যবান্। শক্তিই পরমতত্ত্ব। একদিকে তিনি 'পরমা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ', অন্যদিকে তিনিই 'মহদাত্তণুপর্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্'। এই শক্তি জগতে অনন্তরূপিণী। তিনিই তারিণী, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, তিনিই ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তকা। উপাসকের কার্যার্থে তিনি বিশ্বরূপা। এই অনন্তরূপের মধ্যে কালী রূপটিই অশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত: কালীনামের তাৎপর্যও গূঢ়ার্থবোধক:

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কাল সংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী। [৪র্থ উল্লাস]

—সর্বভূতকে কলন করেন বলিয়া শিবের নাম মহাকাল; সেই মহাকালকে কলন করেন বলিয়া তিনি কালী: কালীই আদিরূপিণী।

॥ কুলার্ণব তন্ত্র ॥ কৌলমার্গের প্রশস্তি-জ্ঞাপক আগমজাতীয় তন্ত্র। এই তন্ত্রমতে কৌলাচারই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে অন্যান্য ছয় প্রকার আচারের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত 'কৌলাৎ পরতরং ন হি।' কৌল শ্রেষ্ঠ সাধক: ইনি কুল ও অকুল দুইয়েরই সন্ধান জানেন। কুল হইতেছে পরমা শক্তি, আর অকুল পরম শিব। কৌলগণ এই শিব-শক্তির সমযোগে কুশল:

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা।
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে॥

কৌলগণের সাধনাও অতি রহস্যপূর্ণ। কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চ মকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কৌল সাধকের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। পরিশেষে পঞ্চতত্ত্বের অতি সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও যোজিত হইয়াছে। স্থূল প্রবৃত্তির জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে তন্ত্র সাধনা কিভাবে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক জগতে পদার্পণ করে, কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমোল্লাস তাহার একটি দৃষ্টান্ত। শক্তিসাধনা যুগপৎ ভুক্তি ও মুক্তির সাধনা। ভোগের জগতকে অবলম্বন করিয়া ইহা মোক্ষের স্তরে গমন করে। সে স্তরে সাধক সহস্রারস্থিত মহাপদ্মবনের পথিক, তাঁহার মদ্য 'চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্য' (শিব ও কুণ্ডলীশক্তির মিলনরূপ সৌখ্য), তাঁহার মাংস জ্ঞান-খড়্গে নিহত পুণ্যাপুণ্য পশুর মাংস; তিনি ইন্দ্রিয়সংযমরূপ বর্ম করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করেন, প্রবুদ্ধশক্তিরূপ মুদ্রা গ্রহণ করেন -সর্বোপরি তিনি শিব-শক্তির মিলনানন্দে বিভোর—ইহাই তাঁহার অন্ত্য তত্ত্বাস্বাদন:

পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রী-নিষেবকাঃ॥ [পঞ্চম উল্লাস]

॥ রাধাতন্ত্র ॥ প্রাচীনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাকে তেমন প্রাচীন মনে হয় না। ইহার সিদ্ধান্তে একটু অভিনবত্ব আছে। এখানে রাধাকৃষ্ণলীলার একটি রহস্যময় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একদা বাসুদেব মহাদেবের নিকট ধর্ম উপদেশ চাহিলে তিনি তাঁহাকে ত্রিপুরা-উপাসনার নির্দেশ দেন। কৃষ্ণ সেই উদ্দেশ্য কাশীতে যাইয়া মহামায়ার অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন। মহামায়া তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলেন,

সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যাসহ তপোধন।
যোগং বিনা সুত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-সিদ্ধি র্ন জায়তে॥ [দ্বিতীয় পটল]

শক্তি-যোগে সাধনার নিমিত্ত কৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হইলেন। তথায় পূর্বেই দেবীর অংশভূতা পদ্মিনী রাধারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালিন্দীকূলে মাথুরপীঠ দেবীর সিদ্ধ কেশপীঠ। সাধনার জন্য কৃষ্ণ সেই পীঠে পদ্মিনী রাধার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলার গূঢ়তত্ত্ব। এই তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণের যে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে লৌকিক কথার সহিত কিছুটা ভাগবতকথারও প্রতিধ্বনি আছে। রাধাতন্ত্রে বৈষ্ণবীয় প্রেমলীলাকে শাক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

॥ তান্ত্রিক নিবন্ধ ॥

মূল তন্ত্রের তত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী বিষয়ে অনেকগুলি তান্ত্রিক নিবন্ধ পাওয়া যায়। নিবন্ধগুলি ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্কলন, কোথাও বা মৌলিক রচনা। রচনাকার অধিকাংশই সাধক ও পণ্ডিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই অল্পবিস্তর রচিত হইয়াছে। বাংলাদেশে রচিত বা সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি কালীকুলাশ্রিত। তাহাতে দর্শন-ভাগ অপেক্ষা ক্রিয়াকর্মের অংশই প্রধান। অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি শ্রীকুলাশ্রিত। তাহাতে দর্শনের আলোচনাই মুখ্য।

বাংলাদেশের নিবন্ধগুলির ভিতর সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (ষোড়শ শতাব্দ) তন্ত্রসার। ভারতবর্ষের সর্বত্র এই গ্রন্থের সমাদর। ইহাতে দীক্ষা, শাক্তের নিত্যকর্ম ও বিভিন্ন দেবতার যে পূজামন্ত্র ও বিধি সংগৃহীত হইয়াছে, হিন্দুর দীক্ষা ও কালী-তারাদি শক্তিপূজা তাহার অনুসরণেই অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মানন্দগিরির শাক্তানন্দতরঙ্গিণী আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ উল্লাসে বিভক্ত। ইহাতে জীবের জন্ম, দেহে নাড়ী-বায়ুর সংস্থান, শাক্ত-অর্চনার উপযোগিতা, শাক্তী দীক্ষা ও উপাসনার সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও সরল, সংগ্রহ-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শাক্তক্রম ও শ্যামারহস্য। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' Avalon-সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সপ্তচক্রের (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার) অতি সুন্দর সুশৃঙ্খল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শক্তি-সাধনার মূল ভিত্তি দেহ। ষট্‌চক্রনিরূপণে এই দেহতত্ত্বেরই বিশ্লেষণ।

বাংলার বাইরে যে সমস্ত তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের (অষ্টম শতাব্দ) প্রপঞ্চসার তন্ত্র ও সৌন্দর্য-লহরী বহুখ্যাত। প্রপঞ্চসার তন্ত্র মূল তন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত। সূচনায় শক্তির অবরোহণ-ক্রমের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাশক্তি 'অন্তরান্তর্বহিশ্চ দেহীনাং দেহপূরণী'। এই তন্ত্রখানি ৩৬ পটলে বিভক্ত। কেহ কেহ মনে করেন, পটল-সংখ্যা শক্তির ছত্রিশ তত্ত্বের নির্দেশক। সৌন্দর্য-লহরী বা আনন্দলহরী বস্তুতঃ একখানি কাব্য। ইহাতে ষোড়শী ত্রিপুরা মূর্তির যে অপূর্ব বর্ণনা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে Shelley-র Intellectual Beauty-র সহিত তুলনা করিতেন। দেবী-বর্ণনার মধ্যেই দেবীতত্ত্ব ও দেবাচনের ইঙ্গিত। কিন্তু তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া প্রকট হইয়াছে অপূর্ব কবিত্ব। যেমন দেবীর কৃষ্ণকুন্তলে সীমন্ত-সিন্দূরের এই বর্ণনা,—

> বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভার তিমির-
> দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
> তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য লহরী-
> পরীবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্ত-সরণিঃ॥ [সৌ. ল. ৪৪]

—হে দেবী, তোমার কেশ মধ্যস্থ এ সীমন্ত রেখা, যা তোমার বদন-সৌন্দর্য-লহরীর পরীবাহ-স্রোতঃপথের ন্যায় শোভমান; তাহা সিন্দূরচর্চিত হওয়ায় মনে হইতেছে, যেন শত্রু-কেশকলাপরূপ তিমির দ্বারা প্রভাতসূর্য বন্দীকৃত হইয়াছে; সেই সীমন্তরেখা আমাদিগকে ক্ষেম বিতরণ করুক।

সৌন্দর্যলহরীর মোট শ্লোকসংখ্যা ১০৪। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ তন্ত্রের সমগ্র তত্ত্বই কাব্যাকারে বিবৃত হইয়াছে। ষোড়শী দেবী বা শ্রীবিদ্যাই এই গ্রন্থের মহাবিদ্যা।

অন্যান্য নিবন্ধাবলীর মধ্যে অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক একটি সুবৃহৎ মূল্যবান গ্রন্থ। অভিনবগুপ্ত ছিলেন শ্রীবিদ্যার উপাসক, তিনি প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনবাদী। তন্ত্রালোক এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেরই কাব্যময় ব্যাখ্যা। তন্ত্রের দার্শনিক চিন্তা যে কত সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, তন্ত্রালোক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তন্ত্রালোকে কাশ্মীরীয় শৈব মতের প্রভাব আছে। এই মতে শিবই পরমতত্ত্ব, কিন্তু শিব সর্বদাই শক্তিযুক্ত—শক্তিদ্বারাই শিবের প্রকাশ। শিব যেমন নিত্য, শক্তিও তেমনি নিত্যা এবং তাঁহারা পরস্পর অবিনাভাবে

যুক্ত : 'শিবশক্ত্যবিনাভাবাদ্ধিতৈ্যকা মূলকারণম্' [তন্ত্রালোক. ৯. ১৫২]। অভিনবগুপ্ত দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

লক্ষ্মণ দেশিকের সারদাতিলক আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একাধিক টীকা রচিত হইয়াছে; বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নিবন্ধাবলীতেও সারদাতিলকের মত গৃহীত হইয়াছে। সারদাতিলক পঞ্চবিংশতি পল্লবে বিভক্ত। ইহার প্রথম পল্লবে সৃষ্টিতত্ত্ব, দ্বিতীয়ে বৈখরী সৃষ্টি, চতুর্থে দীক্ষাবিধি, পঞ্চমে হোমবিধি এবং তৎপরবর্তী পল্লবগুলিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনাপদ্ধতি। সারদাতিলকে সূক্ষ্ম শক্তির স্থূলাভিব্যক্তির ক্রমটি অতি সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে : পরমতত্ত্ব সচ্চিদানন্দবিভব ও স-কল ; তাহা হইতে শক্তি। শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি :

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ ॥ [প্রথম পটল]

এই বিন্দুরই প্রকারভেদ দেহস্থ শব্দব্রহ্ম। ইহাই কুণ্ডলীরূপে প্রাণীদের দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

তান্ত্রিক গ্রন্থাদির আব একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পণ্ডিত ভাস্কর রায়। [অষ্টাদশ শতক] ইনিও শ্রীবিদ্যাব উপাসক। বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে তিনি শ্রীবিদ্যার গূঢ় রহস্য উদঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার বহুবিখ্যাত গ্রন্থ বামকেশ্বর তন্ত্রের 'সেতুবন্ধ' নামক টীকা এবং বরিবস্যারহস্য নামক তান্ত্রিক নিবন্ধ। মহাশক্তির উপাসনা-যোগ্য রূপ সম্পর্কে তিনি সেতুবন্ধ টীকায় বলিতেছেন[১],—পরমেশ্বরীর উপাসনাযোগ্য তিনটি রূপ আছে— স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। প্রথমতঃ করচরণাবয়বযুক্ত স্থূলমূর্তি, দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রাত্মক মূর্তি, তৃতীয়তঃ মানসধ্যানযোগ্য মূর্তি। এই তিনের অতীত আর এক রূপ আছে, তাহা বাঙ্মনের অতীত।

৫. শাক্তদর্শন ও শক্তিসাধনার মূলকথা

পূর্বে আলোচিত মূলতন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধাদির আলোচনা প্রসঙ্গে মোটামুটিভাবে শাক্তদর্শনের একটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। অতি আদি স্তরে সাধনায় দর্শনের স্থান ছিল নিতান্ত গৌণ, সাধনই ছিল মূল লক্ষ্য। বঙ্গদেশীয় তন্ত্রাদিতে দর্শনাংশ খুবই কম।

১। উপাস্যায়াঃ পরমেশ্বর্য্যাস্ত্রীণি রূপাণি উপাস্তিযোগ্যানি স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চেতি। তত্রাদ্যং করচরণাবয়বশীলং মন্ত্রসিদ্ধিমতাং চক্ষুরিন্দ্রিয় পানীন্দ্রয়য়োগ্র্াহ্যম্।...দ্বিতীয়ং মন্ত্রাত্মকং পুণ্যবতাং শ্রবণেন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয়য়োর্যোগ্যম্। তৃতীয়ং বাসনাত্মকং পুণ্যবতাং মনসোযোগ্যম্।...এতত্ত্রিতয়াতীতন্তু বাঙ্মনসাতীতং মুক্তৈরহস্যাহমনুভূয়মানমখণ্ডং রূপম।"

কাশ্মীরীয় তন্ত্রে দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা আছে। পরম তত্ত্ব, জীব ও সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই দার্শনিকতার ভিত্তি। এ সম্পর্কে বঙ্গদেশীয় তন্ত্রে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা আছে, তাহার মূল কথা এই যে,—শক্তিই পরমতত্ত্ব; তিনি ব্যক্তাব্যক্তরূপিণী—মহাদাস্তন্ত-পর্যন্ত চরাচরজগৎ তাঁহারই সৃষ্টি। জীব শক্তির সঙ্কুচিত প্রকাশ। শক্তির উপাসনা করিয়া সঙ্কুচিত জীব মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শিব হইয়া যাইতে পারে। জীবই শিব—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শক্তিসাধনার লক্ষ্য।

শাক্তদর্শন কালক্রমে সূক্ষ্ম ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। সে দর্শনের মূলভিত্তি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলির মধ্যেই পরমতত্ত্ব ও সৃষ্টিরূপে তাহার অভিব্যক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব হইতেছে,—১. শিব, ২. শক্তি, ৩. সদাশিব, ৪. ঈশ্বর, ৫. বিদ্যা, ৬. মায়া, ৭. অবিদ্যা, ৮. কলা, ৯. রাগ, ১০. কাল, ১১. নিয়তি, ১২. জীব, ১৩. প্রকৃতি, ১৪. মনঃ, ১৫, বুদ্ধি, ১৬. অহঙ্কার, ১৭—২১ পঞ্চতন্মাত্র, ২২—৩১ দশেন্দ্রিয় ও ৩২—৩৬ স্থূল পঞ্চভূত। শিবই শাক্তের পরমতত্ত্ব; এই শিব নিরীহ, নিস্পন্দ, গুণাতীত কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ইনি শক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—অদ্বৈত হইলেও শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত: ইনি নির্বিশেষ শিব। শক্তি হইতেছেন এই শিবেরই স্বাতন্ত্র্যশক্তি, অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে শিবের ইচ্ছাশক্তি। এই শক্তিই শিবের প্রকাশ—যেমন সূর্যের প্রকাশ তেজ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, মণির মণিদ্যুতি। এই শক্তি হইতেই সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা প্রভৃতি তত্ত্বের আবির্ভাব। এগুলি শিব-শক্তির অতি শুদ্ধ, অতি স্বচ্ছ প্রকাশ—অর্থাৎ শক্তির অন্তর্মুখী পরিণাম। শক্তির বহির্মুখী পরিণাম মায়া হইতে স্থূল পঞ্চভূত পর্যন্ত তত্ত্বগুলি। তন্মধ্যে মায়া হইতে নিয়তি পর্যন্ত তত্ত্বগুলি অন্তর্বাহ্য লক্ষণ মিশ্রিত। জীব শিবেরই অংশ, কিন্তু আচ্ছন্ন, কঞ্চুকাবৃত, মলাকীর্ণ—জীব মায়া, অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল ও নিয়তির অধীন,—এই জীবেরই স্থূলদেহ মহৎ হইতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক ভোগদেহ,—যাহার মূল প্রকৃতি। অতএব তন্ত্রমতে শিব হইতে জীব বা সৃষ্টি পর্যন্ত সমস্ত কিছুই শক্ত্যাত্মক। কোথাও শক্তির প্রকাশ সুপ্ত বা মগ্ন, কোথাও স্বপ্নের মত, কোথাও শক্তি অতিশয় স্থূলভাবে ক্রিয়াশীল। জীবদেহে এই শক্তি রহিয়াছেন মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তিরূপে। শক্তি এখানে জট পাকানো—তাই তিনি কুণ্ডলীরূপা।

(শাক্তমতে সাধনা জীবকে কেন্দ্র করিয়াই। জীব শিবাংশ হইলেও মায়াচ্ছন্ন। অবিদ্যায় জীবের শিবভাব আবৃত। বিষয়ের প্রতি রাগ (আসক্তি) তাহারই। জীব কালের অধীন, তাহার বিনাশ আছে এবং সে নিয়তি-তাড়িত। অতএব জীবের

দুঃখের অন্ত নাই। সে মোহভ্রান্ত, বিষয়াসক্ত, মৃত্যুভয়ে ভীত। দুঃখের কবল হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে শিব-স্বরূপে, আনন্দঘন নিত্য চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করাই শাক্ত-সাধনার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গিয়া শাক্তগণ জীবদেহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন, দেহভাণ্ড একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু দেহে বর্তমান—'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।' এই দেহে লক্ষকোটি নাড়ী ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে ও প্রাণ-অপানাদি বায়ুর ক্রিয়ায় জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। শুধু তাই নয়, জীবদেহে আছে ছয়টি চক্র বা পদ্ম—গুহ্যমূলে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা। উপরন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখে রহিয়াছে সহস্রার পদ্ম। জীবদেহে পরম শিব রহিয়াছেন সহস্রার পদ্মের কর্ণিকাবিন্দু পরম শিবপুরে, আর শক্তি রহিয়াছেন সুপ্তাবস্থায় মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত কমলগুলি সুষুম্না নামক নাড়ীতে গ্রথিত। সুষুম্নার দুই পার্শ্বে আরও দুইটি নাড়ী—দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামে ইড়া। শক্তির স্রোত মূলাধার হইতে সুষুম্নাবর্ত্মে সহস্রার পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। মূলাধারের কুণ্ডলীশক্তি জাগ্রত হইয়া এই পথেই ঊর্ধ্বচারী হইয়া সহস্রার কমলের কেন্দ্রাবস্থিত পরম শিবের সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির এই মিলনে অপূর্ব আনন্দময় সামরস্যের উদয় হয়। এই সামরস্য পানে বিভোর হওয়া বা নিজে সমরসীভূত হইয়া যাওয়াই সাধকের পুরুষার্থ। শক্তি-সাধনার ইহাই চরম প্রাপ্তি। ইহা রসাস্বাদজনিত এক অনির্বচনীয় মাধুর্যঘন অবস্থা।

শাক্ত সাধনা তন্ত্রের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শাক্তদর্শনে যে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের ক্রমাভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে জানিয়া একে একে সকল তত্ত্বকে লয় করিয়া শেষতত্ত্বে অর্থাৎ শিবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার সাধন। দর্শনে শক্তির অবরোহণ, সাধনায় রহিয়াছে শক্তির ক্রমারোহণ।

শক্তি-সাধনা ক্রম-বিন্যস্ত। অধিকারীভেদে ইহার ভাব ও আচার ভিন্ন ভিন্ন। এ সাধনায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম সমসূত্রে গ্রথিত। শাক্তসাধনার আরম্ভ ভক্তিতে, ইহার সাধন ক্রিয়ায় এবং ইহার প্রতিষ্ঠা শিব-শক্তির অদ্বৈত জ্ঞানে। অধিকারীভেদে এই সাধনার সাতটি আচার—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার ও কৌলাচার। এই আচারগুলি আবার তিনটি ভাবে বিধৃত—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের, সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্ভুক্ত।

পশুভাবের উপাসনা অতি সাধারণ জীবের। তাহাদের জন্য স্থূল উপাসনা-মূর্তিপূজা,

বাহ্যধ্যান, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি। বীরভাবের উপাসনা অতি দুরূহ। ইহাতে জৈবিক সত্তার অতি কঠোর পরীক্ষা। ইহাতে স্থূল পঞ্চ ম-কার গ্রহণ করা হয় এবং শ্মশানে বা নির্জনস্থানে সাধনা চলিতে থাকে। সাধক প্রয়োজনবোধে ইহাতে মারণ-উচাটনাদি ষট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভাবের সাধনা বীরেরই যোগ্য সাধনা—যিনি বলিষ্ঠ, নির্ভীক, শক্তি-সম্পাতে ক্ষুব্ধ ও সঞ্চালিত। কিন্তু শক্তি-সাধনার অত্যুত্তম স্তর দিব্যভাবের সাধনা। ইহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-যোগীর সাধনা—অতি গুহ্য, অতি রহস্যময়, কিন্তু আনন্দঘন। দিব্যমন্ত্রীর আচার কৌলাচার। কৌলের সাধনায় মূর্তির প্রয়োজন হয় না, বিশ্বজগৎ মাতৃমূর্তি—বাহ্যপূজাও নিরর্থক, কারণ সাধক এখানে অন্তর্যাগে মগ্ন। এ স্তরের পঞ্চ ম-কার সাধনাও আধ্যাত্মিক ভাবের। দিব্যভাব 'সর্বভাবোত্তমোত্তমম্'।

শক্তি-সাধনার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত পরিচয় না থাকার দরুণ সমাজে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা মদ্যপানের সাধনা, ভোগের সাধনা, ব্যভিচারের সাধনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার কোনটিই সত্য নয়। শক্তি-সাধনা জৈবিক সত্তাকে জাগ্রত করিবার সাধনা, দেহস্থ নিমীলিত পদ্মকোরককে উন্মীলিত করিবার সাধনা—কমল-সৌরভে ও শক্তির ছন্দে জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার সাধনা। এ সাধনায় সংসার-ত্যাগের উপরেও জোর দেওয়া হয় নাই। সংসারে থাকিয়া ত্যাগী হইবার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এখানে ভোগকেও বিসর্জন দিতে বলা হয় নাই, ভোগপঙ্কে পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করার শিক্ষা নির্দেশিত হইয়াছে। যে-কোন মানুষ শক্তি-সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে এবং পরম কৌলের ম[illegible] লাভ করিতে পারে। ইহাতে জাতি বা বর্ণবিচারের প্রশ্নও নাই। ইহা প্রকৃত সমন্বয়বাদের সাধনা। সকল প্রকার আচারই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে,—তাই ইহাতে ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নই উঠে না। অদ্বৈত তত্ত্ব লক্ষ্য হওয়ায় এখানে সঙ্কীর্ণতাও প্রশ্রয় পায় না।

তবে এই সাধনায় পতনের আশঙ্কা প্রচুর। স্থূল পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত অনেকেই অনুধাবন করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই পতনও খুব সহজে ঘটে। এইজন্যই এই সাধনার প্রতি বহিরঙ্গ জনের তির্যক্ কটাক্ষ বর্ষিত হয়। তাহা ছাড়া শাক্তের আভিচারিক ক্রিয়াও বহু নিন্দিত কিন্তু যাঁহারা পতনের পথ রোধ করিয়াছেন, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সাধনা আশীর্বাদ। সিদ্ধির আনন্দ ও ঐশ্বর্য অতি সহজে তাঁহাদের করতলগত হয় এবং প্রবর্ত সাধকের মত নানাভাবে তাঁহারা জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

৬. তন্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য

তন্ত্র ক্রিয়া-প্রধান। অধিকাংশ দীক্ষাপদ্ধতি, মন্ত্র, মন্ত্রোদ্ধার, যন্ত্রাঙ্কন, ন্যাস, ধ্যান ও পূজাপদ্ধতির বিবরণে পূর্ণ। সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার লক্ষণ নাই বলিলেও চলে। তথাপি কয়েকটি দিক হইতে তন্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য বিচার্য্য।

প্রথমতঃ তন্ত্রসাধনা মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবের দেহ, জৈবিক বৃত্তি ও মানবমনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই শাস্ত্রে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রহিয়াছে, তাহার আকর্ষণ কম নয়। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তন্ত্রের মূল্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্বোপরি তন্ত্রে মোহ-ভ্রান্ত জীবের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার কারুণ্য বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় করুণ। সূতিবায়ুর বেগে পীড়িত জীব জন্মমাত্র রোদন করিতে থাকে, দুঃখকে সাথী করিয়াই তাহার জন্ম। তাহার পর ক্রমে বড় হয়, ক্রমে বন্ধন বাড়ে—দেহ, ধন, স্ত্রীপুত্রাদির বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়: 'অপত্যং মে, কলত্রং মে' বলিয়া অস্থির হয়—কিন্তু দেখে না, যম তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, বুঝে না:

> পাপশূলবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা।
> রাগদ্বেষানলৈঃ পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্॥ [শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ১ম উল্লাস]
>
> —পাপের শূলে বিদ্ধ করিয়া, বিষয় ঘৃতে সিক্ত করিয়া, রাগদ্বেষের অনলে পক্ব করিয়া মৃত্যু মানবকে ভক্ষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রসাধনায় নরনারীর জৈবিক সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া যে রহস্যময় সাধনের ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং তাহাতে যে একটি গূঢ় অনির্বাচ্য ভাবের বিলাস আছে, তাহাও সাহিত্যের দিক হইতে কম আকর্ষণীয় নহে। তন্ত্রের শবসাধন, লতাসাধন, চক্রানুষ্ঠান ভয়াবহ ও অদ্ভুত। সাহিত্যে বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুত রস সৃষ্টিতে এগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ভবভূতি প্রমুখ কবি এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে ভয়ানক ও অদ্ভুত রস পরিবেশন করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রে, বেতালপঞ্চবিংশতির কথারম্ভে, বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে, সুবন্ধুর বাসবদত্তা গদ্যকাব্যে এবং কথা সরিৎসাগরের কতিপয় কাহিনীতে তন্ত্রের এই রহস্যময় সাধন-প্রক্রিয়া লইয়া যে বিচিত্র রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার আবেদন উপেক্ষণীয় নহে। বস্তুতঃ তন্ত্রসাধনার গুহ্য রহস্যময়তা সাহিত্যের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে একটি প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ তন্ত্রের কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা কবিত্বময়। ষট্চক্রের বর্ণনায়, কুণ্ডলিনীশক্তির চিত্রাঙ্কনে ও সহস্রার পদ্মের বিবরণে সাধক যেন কবি হইয়া উঠিয়াছেন। অলঙ্করণে ও উক্তি-বৈচিত্র্যে এই সকল অংশ অতীব হৃদয়গ্রাহী। 'শশি-মিহির' রূপা ইড়া-পিঙ্গলা,

আর সুষুম্না 'বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা' [বিদ্যুৎ-বরণী, সূত্রের মত সুসূক্ষ্মা]। কুণ্ডলিনীর বর্ণনাও অপূর্ব—

তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তুসোদর লসৎসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী
ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ম্।
শঙ্খাবর্তনিভা নবীন চপলামালাবিলাসাস্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিবোপরি লসৎ সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ॥
কূজন্তী কুলকুণ্ডলিনী চ মধুরং মত্তালিস্ফুটম্
বাচঃ কোমল কাব্যবন্ধ রচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধাযতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী॥ [ষট্চক্রনিরূপণ ১১-১২]

—তাহার উর্ধ্বে পদ্মতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ভুবনমোহিনী মুখদ্বারা ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করিয়া শঙ্খাবর্তাকারে সর্পের মত সার্দ্ধত্রিবলয়ে শিবের উপর সুপ্ত রহিয়াছেন। নানাছন্দে চারু কাব্য রচনা করিয়া, মত্তালির মত মধুর কূজন করিয়া, শ্বাসোচ্ছ্বাসছলে জীবের জীবন ধারণ করিয়া তিনি মূলাধারে প্রোদ্দাম দীপ শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

শাক্তসাধকের কবিত্ব চরমে পৌঁছিয়াছে পরম শিবপুরী সহস্রদল সহস্রার পদ্মের বর্ণনায়: এই পদ্ম 'দশশতদলং পূর্ণ-পূর্ণেন্দুশুভ্রম্'। শূন্যে অবস্থিত অধোমুখ এই পদ্মের পরাগ বালসূর্যের ন্যায় অরুণ ['তরুণরবি-কলাকান্ত কিঞ্জল্কপুঞ্জম্']; ইহারই কর্ণিকাবিন্দুতে পরম রমণীয় শিবপুরী:

সহস্রারং শিবপুরং রম্যং দুঃখ বিবর্জিতম্।
সর্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দিব্যৈ র্নিত্য পুষ্পফলৈর্দ্রুমৈঃ॥
পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ পার্বতি।
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পং মনোহরম্॥ [গন্ধর্বমালিকাতন্ত্র]

শুধু ষট্চক্রের বিবৃতিতে নয়, যে কোন দেবতার ধ্যান-রচনায় শাক্তসাধক কবিত্বের ভাণ্ডার উজার করিয়া দিয়াছেন। দেবমূর্তি সাধকের সৃষ্টি নয়, তপোজ্যোতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। মগ্নসাধকের হৃদয়বেশ্মে প্রথমে জাগে ধূম্রজ্যোতি—তাহারই মধ্যে ক্রমে প্রকাশিত হয় আলোর বিন্দু; ক্রমে সেই বিন্দু স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়—দেখা দেয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত অপূর্ব দেবমূর্তি। সাধক তখন তন্ময়, বাহ্যজ্ঞানরহিত। তাঁহার অনুভূতিও অনির্বচনীয়। সেই সুদিব্য গূঢ় অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ শক্তির ধ্যান। শক্তমূর্তি সাধকের 'ধেয়ানের ধন'—এইজন্যই উহা স্বাভাবিক কবিত্বে মণ্ডিত। তন্ত্রগ্রন্থের

পরিচয় প্রসঙ্গে, এইরূপ কং ক্টি ধ্যান-মূর্তির বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে—একটি কালীতন্ত্রের কালীর ধ্যান, অপরটি মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত আদ্যার ধ্যান। দুইটিই অপূর্ব বর্ণনা। যে-কোন ধ্যানেই এই বর্ণনা-চাতুর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শক্তিমূর্তি সর্বত্রই যে কোমল, স্নিগ্ধ ও সুন্দর তাহা নহে। কোন কোন মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর, কোন কোন মূর্তি রুদ্রত্বের ভীষণ প্রতিমা। সাধক কবি তাহাতেও সৌন্দর্যের ছটা বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন; যথা ছিন্নমস্তা দেবীর বর্ণনা: অর্দ্ধবিকশিত শ্বেতপদ্মের কোরকে সূর্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাকুসুমের ন্যায় অরুণ, সেই রক্তবর্ণ কর্ণিকায় দণ্ডায়মানা মহাভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা:

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটি সমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্র জিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥ [তন্ত্রসার]

এ মূর্তি যে-কোন দর্শকের চিত্তপটে চিরকাল মুদ্রিত হইয়া থাকিবার মত অতি ভীষণ অথচ অতি সুন্দর একখানি আকর্ষণীয় মূর্তি।

তন্ত্রের অভিষেক, শান্তিমন্ত্র এবং অন্তর্যাগের মন্ত্রগুলিও কাব্যগুণ সমন্বিত। এ সকল স্থলে শব্দশক্তি এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, মন যেন কোন্ এক সুদূর লোকে চলিয়া যায়। মন্ত্রের বাচ্যার্থ কিছুই নয়, 'সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়:', কিংবা 'সমুদ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা', কিংবা 'নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসাস্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহম্॥'—কিন্তু শাব্দী-ব্যঞ্জনা অতি অদ্ভুত। পরিবেশ, মন ও শব্দমন্ত্র যেন একসঙ্গে ক্রিয়া করিতে থাকে।

তন্ত্রোক্ত স্তব-স্তুতিগুলিও আশ্চর্য আবেগ-কম্পিত। কতকগুলি স্তবে স্পষ্টত: গীতিকবিতার ঝঙ্কার ও মন্ময়তা ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি স্তবই ভক্তি ও অনুভূতি-বিলসিত। সাধক ইহাতে দেবতার নিকট নিজের হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন বলিয়াই গীতিকবিতার মর্মসুরটি বাজিয়া উঠে। অবশ্য অগণিত স্তবে যে গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা নাই, তাহা নহে—তথাপি স্থানে স্থানে অন্ধকারে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত উহার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। যেমন শঙ্করাচার্যের প্রপঞ্চসারতন্ত্রোক্ত প্রকৃতি-স্তবের এই অংশটি:

লসৎশঙ্খচক্রা চলৎখড়্গভীমা
নদৎসিংহবাহা জলত্তুঙ্গমৌলিঃ।
দ্রবদ্দৈত্যবর্গা স্তুবৎসিদ্ধসংঘাঃ
ত্বমেবেশি দুর্গাপ সর্গাদিহীনে॥

কিংবা সাধক সর্বানন্দ-কৃত আন্তাস্তবের এই স্তবকটি :

অসুরক্ত গলিতবক্ত্র চলদলক্ত রাগিণী।
ধরণিলিপ্ত কুটিলমুক্ত চিকুরনক্ত কারিণী।
কলিতখণ্ড বিকৃতচণ্ড দনুজমুণ্ড মালিনী
বিগতবস্ত্র নিশিতশস্ত্র কুণপমত্ত ধারিণী।। [সর্বানন্দ-তরঙ্গিণী]

এ সকল স্থলে ছন্দে ও অলঙ্কারে সচেতন শিল্পীর সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস আত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৭. ধর্মে ও সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব

মন্ত্রশক্তির প্রতি বিশ্বাস, রহস্যময় যৌগিক উপায়ে মন্ত্রের সাধন, নরনারীর মিলনে গুহ্য কৌশলে শক্তির উদ্বোধন, অলৌকিক শক্তিদ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া ও সিদ্ধির মধ্যে এমন একটি সুতীব্র আকর্ষণ আছে যে, ইহা যুগে যুগে প্রায় সকল ধর্মকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই আকর্ষণকে নিছক ইন্দ্রিয়জ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই, ইহার মধ্যে আছে একটি সহজ সত্য, সহজ সিদ্ধি ও সহজ আনন্দ। ইহার ফলও প্রত্যক্ষ। এইজন্যই তান্ত্রিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া এত জনপ্রিয় যে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় কোন-না-কোন আকারে তান্ত্রিকতাকে নিজেদের ধর্মে-কর্মে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। ইহা দ্বারা তন্ত্র যেমন নিজে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অপরকেও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

ক. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবাদ

শিব ও শক্তি বেদপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক দেবতা। আদৌ আর্য-সাহিত্যে ইহাদের স্থান ছিল নগণ্য, তন্ত্রাচারও ছিল বহুনিন্দিত। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় বৈদিক সাহিত্যেও ইহারা কালক্রমে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, উপনিষদে শক্তিবাদের প্রভাব কম নয়। ঋগ্বেদের 'গৌরী, [১. ১৬৪], 'গায়ত্রী', [৩. ৬২. ১], নবম মণ্ডলের 'সোম' ['উময়া সহ বর্তমানঃ'] 'দেবীসূক্ত' [১০. ১২৫] এবং 'রাত্রিসূক্ত' [১০. ১২৭] প্রভৃতি শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বশীকরণাদি ষট্কর্ম তান্ত্রিক ক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহাও ঋগ্বেদে ইতস্ততঃ ছড়ানো। অথর্ববেদ তো 'শান্তি-পৌষ্টিকাভিচারাদিকর্ম প্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব' [প্রস্থানভেদ]। কেনোপনিষদের 'উমা-হৈমবতী' উপাখ্যান বহুবিখ্যাত—উহাতে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদতত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা ছাড়া

মুণ্ডকোপনিষদের 'কালী করালী' প্রভৃতি নাম, যাজ্ঞিকা-উপনিষদের 'দুর্গাগায়ত্রী', হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে 'ভদ্রকালী'র উল্লেখও শক্তিবাদের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাণে শক্তিদেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পুরাণের সকল দেবতাই শক্তিযুক্ত। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী সাবিত্রী ও গায়ত্রী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী লক্ষ্মী, শিবের শক্তি শিবানী মহেশ্বরী। শক্তিই এখানে ক্রিয়াশক্তি। শক্তির প্রভাবেই লীলা, শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। পুরাণে পরমতত্ত্ব সর্বত্রই নির্গুণ, নির্বিশেষ। তিনি সগুণ বা বিশিষ্ট হন অন্তর্নিহিত শক্তিযোগে: **'It is the unique inscrutable power inherent in the nature of the supreme Spirit, which makes really possible what appears to be logically impossible to our discursive knowledge'**[১]—এই সিদ্ধান্ত শাক্ততন্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে অভিন্ন।

রামায়ণেও শক্তিবাদের প্রভাব কম নয়। রাক্ষসকুল শিবের বরেই বলীয়ান কেহ কেহ 'নিকুম্ভিলা' দেবীকে শক্তি দেবী বলিয়া মনে করেন: সুরা ও মাংসে তাঁহার পূজা। মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞও আভিচারিক ক্রিয়া-প্রধান। রাক্ষসগণ মায়াশক্তি সম্পন্ন—তাঁহারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টিতে নিপুণ। উত্তরকাণ্ডে নানা প্রসঙ্গে শিব-শক্তির কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের জন্য যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাও 'অথর্ব শিরসি প্রোক্তৈ র্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ' [বাল. ১৫]

মহাভারতে শক্তিবাদের প্রাচুর নানাদিক হইতে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহাতে দুইটি 'দুর্গাস্তব' স্থান পাইয়াছে, একটি বিরাট পর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠির-কৃত—অপরটি ভীষ্মপর্বে অর্জুন-কৃত। এই স্তবে দেবীর 'কালী', 'কপালী', 'করালী', 'ভদ্রকালী', 'মহাকালী', 'চণ্ডী', 'তারিণী' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা নামগুলি শাক্তহোমে ব্যবহৃত হয়—মহাভারতে ইহারা কাশীরাজদুহিতা। মহাভারতে মন্ত্রপ্রভাব ও আভিচারিক ক্রিয়ার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়—১. ব্রাহ্মণের বরে কুন্তীর দেবতাবশীকরণের মন্ত্রলাভ ['মন্ত্রগ্রামং...অথর্বশিরসি স্থিতম্'—বন. ২৫৯], ২. যক্ষ স্থূণাকর্ণের সহিত দ্রুপদ-দুহিতা শিখণ্ডিনীর স্ত্রী-পুং স্বভাব বিনিময় [উদ্যোগ. ১৮২], ৩. মগধরাজ বৃহদ্রথের গৃহে মাংস-শোণিতভোজিনী 'জরা' কর্তৃক তৎপুত্রের মাংসপিণ্ড সন্ধিতকরণ [সভা. ১৮], ৪. বনপর্বের স্কন্দোপাখ্যানে অতি ভীষণ মাতৃকাগণের উল্লেখ এবং স্কন্দের বরে মাতৃকাগণের ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরীর অনুরূপ মর্যাদা লাভ ও স্কন্দাপস্মারের উৎপত্তি [বন.

১। **The Puranas by A. K. Banerjee [Hist. of philosophy Eastern & western]**

১৯০][1] প্রভৃতি তান্ত্রিকতার দিক হইতে অত্যন্ত ইঙ্গিতগর্ভ। মহাভারতে উমা-মহেশ্বর সংক্রান্ত বহু বিচিত্র উপাখ্যান পাওয়া যায়। বনপর্বের তীর্থ-প্রকরণে শক্তিতীর্থ হিসাবে 'দেবিকা' (কামাখ্যা) 'যোনি', 'শাকম্ভরী', 'ধূমাবতী', 'স্তনকুণ্ড', 'কালিকা-সঙ্গম' (কৌশিকী ও অরুণার সঙ্গম), 'শ্রীপর্বত' (এখানে মহাদেবের সহিত দেবী প্রীতিপূর্বক বাস করেন) ও 'মণিকর্ণিকা' প্রভৃতি তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের 'রক্ষামন্ত্র'গুলিও তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইয়া দেয়, যেমন অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর এই বাক্যটি :

প্রয়াহ্যবিঘ্নেনৈবাশু বিজয়ায় মহাবল।
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্॥
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তি র্ধৃতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মী সরস্বতী।
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয়॥ [বন. ৩৩]

খ. বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্র

বৌদ্ধদের মধ্যেও অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, বুদ্ধদেব নিজেই নিম্নাধিকারীর পার্থিব ঋদ্ধি লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রাচারের স্থান করিয়া দিয়াছিলেন ; 'ব্রহ্মজাল সুত্তে' দেখা যায়, ভিক্ষুগণ কপালমালা, কপালপাত্র ধারণ করিয়া 'ইদ্ধিপাদ' এর চর্চা করিতেছেন।[2] কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়, কারণ, বৌদ্ধ ধর্মসাধনায় যোগের প্রভাব এবং ঋদ্ধিলাভের ইঙ্গিত থাকিলেও, বুদ্ধদেব নিজে তান্ত্রিকতা প্রচার করিয়াছিলেন, এমন কথা কোথাও নাই। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়াছিল ইতিহাসের অন্য এক সূত্র ধরিয়া এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রসার ঘটিয়াছিল বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে।

বুদ্ধদেব সঙ্ঘে সকলেরই প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। তাহাতে শূদ্র-ব্রাহ্মণ, নারী-পুরুষের বিচার ছিল না। এই সূত্রে কতিপয় মাতৃতান্ত্রিক জাতি—বৃজি ও লিচ্ছবি, বহু নারী ও শূদ্র স্থানীয় 'কম্মারধিয়া' (কর্মকার দুহিতা), 'মিগলুদ্দক' (মৃগলুব্ধক—ব্যাধ) সঙ্ঘে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্মে কতকগুলি লৌকিক আচার প্রবিষ্ট হয় এবং বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে পরেই সঙ্ঘে ভেদ

১। এখানে শিবা-অশিবা লোকমাতৃগণের নামগুলিও অদ্ভুত :

কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিলা তথা।
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ॥ [বন. ১৯০. ৯]

২। Introduction to Sadhan Mala. Vol II (Gaekwad's Oriental series No. XLI

সৃষ্টি হয়। এই ভেদকে কেন্দ্র করিয়া কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে দুইটি প্রধান শাখার উৎপত্তি হয়—হীনযান ও মহাযান। হীনযান সংরক্ষণশীল, আচারনিষ্ঠ ও আদি বৌদ্ধ-মতের সমর্থক: সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক চারিটি আর্যসত্য ['চত্তারি অরিয় সচ্চানি'—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখবিনাশ ও দুঃখবিনাশের উপায়] মানিয়া অষ্টাঙ্গিকমার্গে (অট্ঠঙ্গিকমগ্গং—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি) বুদ্ধত্ব অর্জন বা নির্বাণ লাভ করাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁহাদের প্রমাণগ্রন্থ পালিতে গ্রথিত বুদ্ধবচন 'ত্রিপিটক'। কিন্তু মহাযান উদার মতের পরিপোষক; সংরক্ষণশীলতা নয়, অন্য ধর্মমতকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা ও উহার সহিত নিজধর্মের সমন্বয় সাধন করা মহাযানের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের আপাত লক্ষ্য বুদ্ধত্ব অর্জন করাও নয়, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উন্নীত হওয়া। বুদ্ধদেব স্বয়ং বুদ্ধ হইবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন: এই বোধিসত্ত্বরূপে জগৎ-কল্যাণ ও 'কল্যাণ-মেত্তির' চর্চা করা মহাযানীদের জীবনের মূলাদর্শ।

খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতক হইতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে মহাযান শাখা প্রবল হইয়া উঠে। এই শাখায় মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুইটি মত প্রাধান্য লাভ করে। মাধ্যমিক দর্শনের আদিগুরু নাগার্জুন। নাগার্জুনের পরে আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি ও শান্তিদেব প্রমুখ আচার্যগণ দ্বারা মাধ্যমিক মত পরিপুষ্টি লাভ করে। এইমতে 'স্বভাবশূন্যতা'ই একমাত্র সত্য; উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—কর্মও নাই, কারকও নাই—পরমার্থতঃ কিছুই নাই। এই স্বভাবশূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্বাণ। ইহা অনেকটা বেদান্তের ব্রহ্ম বা তন্ত্রের পরম শিবের অবস্থা। মহাযানের দ্বিতীয় মত যোগাচার। ইহা চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মাধ্যমে বিস্তৃত হইতে থাকে। অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং বসুবন্ধুর 'মধ্যান্ত বিভঙ্গ' যোগাচারের বিখ্যাত গ্রন্থ। মাধ্যমিক দর্শনের ভিত্তিতেই যোগাচারে উৎপত্তি। মাধ্যমিক শাস্ত্রের 'স্বভাব শূন্যতা' যোগাচারে হইয়াছে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'। তাঁহারা বলেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই শূন্যতা; এই বিজ্ঞান 'দুর্লক্ষ্য' ও 'অভূত পরিকল্প' (অবাঙ্-মনসো গোচর)। বিজ্ঞপ্তি মাত্রতায় অবস্থিতিই নির্বাণ। বহির্মুখী চিত্তকে প্রতিলোম গতিতে পরাবৃত্ত করিয়া স্বস্থানে ফিরাইয়া আনাই যোগাচারের ক্রিয়াংশের মূল কথা। এই ক্রিয়ায় তান্ত্রিক যোগের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মাধ্যমিক শাস্ত্র ও যোগাচারের ভিত্তিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রসার লাভ করে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, During the time of the Palas, however, a

tendency towards esoterism was manifest and Buddhism very soon underwent another great change from Mahayana to Vajrayana[১].—এই বজ্রযান শাখা হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তার। পাল আমলে যে-সকল বিহার সুসংস্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। 'আদিদেব' বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শক্তি 'আদিদেবী', বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার শক্তি, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁহাদের শক্তি—এবং আরও অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের এই শাখাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'মন্ত্রযান'। মন্ত্রযানেরই প্রশাখা বজ্রযান ও কালচক্রযান। এই শাখায় কত যে দেবদেবী আছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এই সকল দেবদেবীর মন্ত্র ও সাধন প্রণালী লইয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাই বৌদ্ধতন্ত্র।

বৌদ্ধতন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য। ধর্মপাল ও শীলভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কমলশীল, অতীশ-দীপঙ্কর সকলেই তন্ত্রের চর্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে তিব্বতে, চীনে, জাপানে তান্ত্রিকমত প্রচারিত হইয়াছে এবং বহু তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল তন্ত্রগ্রন্থের অধিকাংশই আজ লুপ্ত, কিন্তু যাহা আছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। চর্যাপদের টীকায় কতিপয় তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়—সমাজতন্ত্র, হেবজ্র, হেরুকতন্ত্র, আগম, সম্পুটোদ্ভব তন্ত্ররাজ, রতিবজ্র, যোগরত্নমালা প্রভৃতি। এই সকল তন্ত্র হইতে টীকায় উদ্ধৃতিও সংগ্রহ করা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশেষে যে 'বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গ্রন্থকার-নাম-সূচী' দিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে বিপুল তন্ত্ররাজি আজ কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ, ডাকার্ণব, গুহ্য সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় দুইখানি অতি মূল্যবান বৌদ্ধতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন—১. সাধনমালা ও ২. নিষ্পন্ন যোগাবলী। নিষ্পন্ন যোগাবলী অভয়াকর গুপ্তের রচনা; তাঁহার 'বিমলপ্রভা' বা 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'ও বহু বিখ্যাত। এই সকল গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং অগণিত দেবদেবীর মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ও পূজাপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত হিন্দুতন্ত্রের নানাদিকে সাদৃশ্য আছে। হিন্দুতন্ত্র যেমন দেবদেবীর মন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা ও সাধনার কথা, বৌদ্ধতন্ত্রও তেমনি মন্ত্র, মুদ্রা ও মূর্তি-প্রধান। হিন্দু শক্তি দেবতার কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতির সহিত কয়েকটি বৌদ্ধ দেবতার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। তবে বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে অত্যুগ্র ভীষণতার ভাব বেশি এবং আকার-

১। Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Dasgupta.

ক্রিয়াও অদ্ভুত। হিন্দুর ষট্চক্র বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি চক্রে বা তিনটি কায়ে [নির্বাণকায়, ধর্মকায় ও সম্ভোগকায়] পরিণত হইয়াছে। উত্তরসাধিকা গ্রহণ, মদ্যপান প্রভৃতি উভয়ত্রই দৃষ্ট হয়। কুলশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম শূন্যতা বা শিবত্ব লাভের উপায়টিও একপ্রকার। হিন্দুতন্ত্র হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের পার্থক্য প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে। বৌদ্ধতন্ত্র বৌদ্ধধর্মসাধনার ভিত্তি, উহার দর্শনভাগও বৌদ্ধদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম লক্ষ্য 'শূন্যতা' বা নির্বাণ। মাধ্যমিক শাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে 'স্বভাবশূন্যতা' এবং যোগাচারে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'। এ অবস্থায় জ্ঞেয় থাকে না—গ্রাহ্য থাকে না, গ্রাহক থাকে না। কিন্তু এই অবস্থায় পৌছাইতে হইলে প্রয়োজন 'বোধিচিত্ত'। বোধিসত্ত্বের চিত্তই 'বোধিচিত্ত'। ইহা শূন্যতা ও করুণার একটি যুগনদ্ধ মিলিতরূপ ['শূন্যতা করুণাভিন্নং বোধিচিত্তম্ ইতি স্মৃতম্'—শ্রীগুহ্য সমাজতন্ত্র]। এই শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপের পূর্ণতাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা চরম শূন্যের অবস্থা। অতএব মাধ্যমিক বা যোগাচার মতাবলম্বীদের সাধন হইল শূন্যতা ও করুণার মেলন। এই মেলনক্রিয়ায় যোগাচারে স্ত্রী-পুং যোগের রূপক গৃহীত হইয়াছে।

বজ্রযান শাখারও সাধনার মূল ভিত্তি গুহ্য যৌগিক উপায়ে শূন্যতা ও করুণা বা রহস্যময় স্ত্রী-পুং যোগ। বিজ্ঞানঘন চরম শূন্যতার অবস্থাকে তাঁহারা বলেন 'বজ্রসত্ত্ব'—যাহা দৃঢ়, সার, নিশ্চল, অবিকম্প ও বজ্রের ন্যায় কঠিন।[১] এই সত্ত্বের আবোহভূমি 'বোধিচিত্ত'। তাঁহারা মনে করেন, 'বোধিচিত্ত' গঠনে মন্ত্রসাধনও একটি উপায়, অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা শূন্যতা ও করুণার যোগসাধন সম্ভব। এই মন্ত্রেরই ঘনীভূত রূপ দেবতা। অতএব দেবতার উপাসনা দ্বারাও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বজ্রযানে দেবপূজার উদ্দেশ্য আর একটি দিক হইতেও বিচার্য। তাঁহাদের মতে সর্বশূন্য বুদ্ধই আদিদেবতা—তিনি বজ্রসত্ত্ব। তাঁহাকে হেবজ্র বা হেরুকবজ্রও বলা হয়। এই আদিদেবের শক্তি, আদিশক্তি। বজ্রসত্ত্ব শক্তি-আলিঙ্গিত অর্থাৎ যুগনদ্ধ। মূলতঃ ইনিই উপাস্য। কিন্তু বজ্রসত্ত্বকে উপাসনা করিবার পথে অনেক বাধা। প্রধান বাধা শূন্যের পরিণামী শূন্যোদ্ভব পঞ্চস্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান; এইগুলিই রাগদ্বেষাদির উৎস। এইগুলিকে জয় করিতে না পারিলে শূন্যতায় পৌছানো অসম্ভব। বজ্রযানে এই পঞ্চস্কন্ধ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধরূপে কল্পিত। তাঁহাদের নাম বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। ইহারা প্রত্যেকেই শক্তিযুক্ত: শক্তিগণের নাম

১। দৃঢ়ং সারং অসৌষীর্যম্ অচ্ছেদ্যাভেদ্য লক্ষণম্
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে।—অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ [চর্যাপদের টীকায় ইহা 'যোগরত্নমালা'র উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে]।

যথাক্রমে মামকী, তারা, পাণ্ডরা, বজ্রধাত্বীশ্বরী ও লোচনা। ইহারা এক একজন এক এক কুলের প্রধান দেবতা। যেমন রূপস্কন্ধের প্রতীক বৈরোচন মোহকুলের, বেদনার প্রতীক রত্নসম্ভব চিন্তামণি কুলের, সংজ্ঞার প্রতীক অমিতাভ রাগকুলের, সংস্কারের প্রতীক অমোঘসিদ্ধি সময়কুলের এবং বিজ্ঞানের প্রতীক অক্ষোভ্য দ্বেষকুলের। তাঁহাদের বর্ণ, মূর্তি, মন্ত্র, মুদ্রা ও অর্চন-পদ্ধতি পৃথক পৃথক। উপাসনা দ্বারা এই সকল দেবতাকে আয়ত্ত করিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়াই বজ্রযানের ক্রিয়া।

বজ্রযানে দেবতার সংখ্যা অসংখ্য।[১] প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক বলিয়া তাঁহাদের মূর্তিগুলিও অতি ভয়ঙ্কর এবং উগ্র। অবশ্য মহাকারুণিক মূর্তিও আছে। আদিবুদ্ধ কিংবা তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি শান্ত। ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তিগুলিও প্রশান্ত এবং মূর্তিগুলি প্রায় এক প্রকারের; কেবল তাঁহাদের বর্ণ ও মুদ্রা পৃথক। বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলিও সৌম্য, শান্ত, সুন্দর। বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির মধ্যে 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্তিটি বিখ্যাত। ইনি শুভ্রবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, বামে পদ্ম। ইনি করুণার প্রতিমূর্তি, জগতের দুঃখে বিগলিত চিত্ত। অপর বোধিসত্ত্ব মূর্তি 'মঞ্জুশ্রী'। ইনি পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত জ্ঞান-অসি, বামে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

অধিকাংশ দেব-দেবতার উদ্ভব পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কুল হইতে। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডতা ও উগ্রতা, মূর্তিগুলিও প্রকৃতির অনুরূপ। অক্ষোভ্যকুলের বহুবিখ্যাত ভয়ঙ্করী মূর্তি 'মহাচীন তারা'। ইনি একমুখ, চতুর্ভুজা—দক্ষিণ করদ্বয়ে তরবারি ও কর্ত্রি, বাম করদ্বয়ে উৎপল ও কপাল। ইনি প্রত্যালীঢ়পদে শবের উপর দণ্ডায়মানা। এই মূর্তির অনুরূপ আর একটি দেবী 'একজটা'। তাঁহার কেশকলাপ অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গল ও ঊর্ধ্বোত্থিত। এই কুলের অপর দেবতা 'জাঙ্গুলী'। ইনি সর্পের দেবতা, শুক্লসর্পধারী। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, 'হিন্দুদের মনসাদেবীকে জাঙ্গুলীর প্রতিরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।' অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে বৈরোচন কুলের 'বজ্রবারাহী' ও 'চুন্দা'—রত্নসম্ভবকুলের 'বজ্রতারা' ও 'বজ্রযোগিনী' (হিন্দু ছিন্নমস্তার অনুরূপ)—অমোঘসিদ্ধিকুলের 'পর্ণশবরী' (মারীভয় প্রশমনের দেবতা) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ডাকিনীরও নানারূপ—'কায়ভাবস্য ভেদস্য ডাকিন্যনন্তরূপকম্' [ডাকার্ণব]।

বৌদ্ধ শক্তিমূর্তিগুলির প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য একটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তাহা বৌদ্ধতন্ত্রের পরবর্তীকালে রচিত। তিনি আরও বলেন, **Hindu goddesses like Mahachintara, Chinnamasta**

১। দ্রষ্টব্য বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য।

Kali etc were originally Buddhists.[১]: কিন্তু এই মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ-যোগ্য নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, একদিন তান্ত্রিকবৌদ্ধ ও তান্ত্রিকহিন্দু একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে দেখা যায়, হিন্দু করালা দেবীর উপাসিকা কপালকুণ্ডলা এবং বৌদ্ধ সিদ্ধা সৌদামিনী উভয়েই কাপালিক ব্রতধারিণী—কিন্তু ক্রিয়া ও আচরণের দিক হইতে উভয়ে স্বতন্ত্র। হিন্দুগণ বৌদ্ধগণ হইতে দূরে থাকিতেন এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। কথিত আছে শঙ্করাচার্য নিজেও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান ইতিহাস-বিখ্যাত। কাজেই বৌদ্ধ তন্ত্রদ্বারা হিন্দুতন্ত্র প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

হিন্দুর প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যার অন্তর্গত তারা, ছিন্নমস্তা, কালী বৌদ্ধতন্ত্র হইতে পরিগৃহীত এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। 'তারা'—'জিন-সিদ্ধান্ত-স্থিত' দেবতা—এরূপ ইঙ্গিত পাই আচার্য গোবর্দ্ধনের আর্যাসপ্তশতীতে।[২] কিন্তু এই তারাকে হিন্দুগণই বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, না বৌদ্ধগণই হিন্দু-পরিকল্পনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্ন। হিন্দুদের নিকট 'তারা' নাম অজ্ঞাত ছিল না। তারা দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী—ইহা অতি প্রাচীন পৌরাণিক উক্তি। রামায়ণে আর এক তারার উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি—বালীর স্ত্রী মদবিহ্বলা ও নয়কুশলা। নক্ষত্রদেবতা রূপে তারা হিন্দুর মধ্যে বহুকাল পূর্ব হইতে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। উপরন্তু দেবমূর্তির কল্পনা আদৌ হিন্দুর, বৌদ্ধদের নয়। হিন্দু তারা মূর্তি ও বৌদ্ধ মহাচীনতারা বা একজটা মূর্তিতে পার্থক্যও আছে। উভয় মূর্তির অক্ষোভ্য, পঞ্চপট্টিকা প্রভৃতির ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র। ছিন্নমস্তা দেবী সম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তি প্রযোজ্য। কালীমূর্তি হিন্দুর একান্ত নিজস্ব, উহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের কষ্টকল্পনা করা অবান্তর।[৩] বরং এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত যে, তন্ত্রসাধনার ধারাটি সুপ্রাচীন। হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন, কিংবা অন্যধর্মাবলম্বী যে কেহই হউন, সকলেই সেই সুপ্রাচীন ধারাটি স্ব স্ব ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

১। Foot note: Introduction to Sadhan Mala—Dr. B. Bhattacharya.

২। অতি পূজিত তা রেয়ং দৃষ্টিঃ শ্রুতিলঙ্ঘনক্ষমা সুতনু।
জিন-সিদ্ধান্তস্থিতিরিব সবাসনাং কং ন মোহয়তি॥ [আর্যা সপ্তশতী]

৩। দ্রষ্টব্য শাক্ত পদাবলী ও শক্তি-সাধনা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

গ. বৌদ্ধ সহজিয়া

কালক্রমে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা তন্ত্রের ব্যাপক পূজা-অর্চনার প্রতিক্রিয়ায় আর একটি রূপান্তর লাভ করে। ইহা সহজযান। সহজযানীদের বলা হয় বৌদ্ধ সহজিয়া।

এই মতে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনার স্বীকৃতি নাই। অদ্বয়তত্ত্বই পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্ব মাধ্যমিক সর্বশূন্যতা কিংবা যোগাচারের বিজ্ঞপ্তিমাত্রতারই নামান্তর। ইহা এক মহাসুখময় সহজানন্দের অবস্থা—অনির্বাচ্য, 'বাক্‌পথাতীত'। ইহাই চরম বুদ্ধত্ব। এই সহজানন্দের অবস্থান 'সহজকায়ে'। সহজকায়ের কল্পনা সহজমতে নূতন। বৌদ্ধ তন্ত্রে ছিল ত্রিকায়—নাভিতে নির্মাণকায়, হৃদয়ে ধর্মকায় ও কণ্ঠে সম্ভোগকায়। সহজিয়াগণ বলিলেন, মহাসুখ বা সহজানন্দ থাকে চতুর্থকায়ে-শীর্ষে বা উষ্ণীষকমলে। তাহাই বজ্র বা সহজকায়। অন্যান্য কায়ের তুলনায় ইহার শূন্যতা ও আনন্দবোধও পৃথক। শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া সহজ কায়ের সর্বশূন্য; প্রথমানন্দ, পরমানন্দ ও বিরমানন্দ অতিক্রম করিয়া সহজকায়ে সহজানন্দ। এখানে চিত্তের মহাসুখে বিশ্রাম। এই চিত্তকে কেহ বলেন 'মন', কেহ বলেন 'শুক্র'। মহাযানে—কি মাধ্যমিক শাস্ত্রে, কি যোগাচারে 'চিত্ত'-এর পরিকল্পনা রহস্যময়। যতক্ষণ এই চিত্ত বা মন বা শুক্র চঞ্চল, ততক্ষণই দুঃখ—সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্কন্ধের খেলা—'ভবচক্রে' গতাগতি ও আবর্তন—অবিদ্যার কুহক ও জন্ম-মৃত্যুর বোধ। এই চিত্ত যখন স্থিরস্বভাব, তখনই পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ, ভববাসনার ক্ষয়, জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ ও সুখময় অবস্থার উদ্ভব। এই স্থিরস্বভাব চিত্তের নাম 'বোধিচিত্ত'। কায়ভেদে ইহার শূন্যতা ও আনন্দের ক্রমভেদ। সহজকায়ে ইহা সর্বশূন্য ও পূর্ণানন্দ।

রহস্যময় যৌগিক কৌশলে এই বোধিচিত্ত গঠন এবং সেই চিত্তকে নিম্নতর কায় অতিক্রম করাইয়া সহজকায়ে উন্নীত করাই সহজসাধনার লক্ষ্য। বোধিচিত্ত বস্তুতঃ করুণা-উদ্দীপ্ত শূন্যতা বা শূন্যতা ও করুণা কিংবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত অবস্থা। সহজযানে ইহারা যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষরূপে কল্পিত। এই কল্পনা বাস্তব ও অতিশয় গুহ্য। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহা বাস্তব। ইহার ফলে যে চিত্ত (মন বা শুক্র) উৎপন্ন হয়, তাহার দুই গতি—অধোগতি ও ঊর্ধ্বগতি। গতিভেদে চিত্তের দুই সংজ্ঞা—'চিত্তসংজ্ঞা দ্বিবিধা লৌকিকী লোকোত্তরা চ'। যেটি লৌকিক তাহা বিকল্প লক্ষণযুক্ত, যেটি লোকোত্তরা তাহা নির্মল, দৃঢ়, অচ্যুত, সারযুক্ত ও নির্বিকল্প সুখযুক্ত। ইহাই বোধিচিত্ত। অতি গুহ্য বজ্রাব্জ, কমল-কুলিশ বা বোল-

কোমল যোগ দ্বারা এই চিত্ত নির্মিত হয়। ইহা অনেকটা বিষদ্বারা বিষ-ক্ষয়ের কৌশল, অতি রহস্যময় অথচ 'সহজ'। সহজমার্গ গুরুগম্য। ইহাতে তান্ত্রিক যোগের প্রভাব অপরিসীম।

সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সহজিয়া বীরাচারী তান্ত্রিক। দেহে নাড়ী ও বায়ুর কল্পনা, কায় বা চক্রের কল্পনা তন্ত্রেরই অনুরূপ ; পার্থক্য—তন্ত্রে ষট্‌চক্র, সহজে চারিচক্র। সহজ সাধনার ডোম্বী, শবরী, চণ্ডালী তন্ত্রের উত্তরসাধিকার প্রতীক। মদ্যপানের উল্লেখ ['আসব-মাতা'] উভয়স্থলেই আছে। সহজানন্দের 'মাতা' (মত্ততা) তন্ত্রের সামরস্য-পানোন্মত্ততার প্রতিরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় সহজিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রের দিব্য সাধক। তাঁহার বাহ্য অনুষ্ঠান নাই, পূজা-অর্চনা নাই। সহজস্তরে চিত্তরূপ অদ্বয়তরুতে করুণার ফুল ফুটে, পর-উপকার ফল ধরে। তান্ত্রিক দিব্য মন্ত্রীর নিকটও 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'।

ঘ. নাথপন্থ

নাথপন্থ যোগীদের উপরেও তান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষণীয়। কেহ কেহ বলেন, 'নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।'[১] এই ধর্মমতের উৎপত্তি যেখানেই হউক, একদিন ইহা সমগ্র উত্তর-পূর্বভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুতানা, গুজরাট, পাঞ্জাব, নেপাল ও বঙ্গ—সর্বত্রই 'কন্‌ফট্', 'মচ্ছেন্দ্রী' বা 'নাথযুগী' আছেন। ইহাদের প্রধান আচার্যগণ নাথ-উপাধিতে ভূষিত, তাই এই সম্প্রদায় নাথ-পন্থ নামে পরিচিত।

নাথ-পন্থের কিছু গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে : তন্মধ্যে প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া 'গোরক্ষবোধ', 'হঠযোগ-প্রদীপিকা', 'শিব সংহিতা', যোগচিন্তামণি', 'পবনবিজয়স্বরোদয়' এবং বাংলা 'গোর্খ-বিজয় ও 'মীনচেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে নাথসিদ্ধাচার্যদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী এবং সাধন-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধ আচার্যদের মধ্যে প্রধান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি। মৎস্যেন্দ্রনাথই মীননাথ কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রহিয়াছে। ডঃ কল্যাণী মল্লিক মনে করেন, 'লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন, বাঙালি মৎস্যেন্দ্রই নেপালে নামান্তরে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আরও একটি নাম মীননাথ।'[২] মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথ হইতে পারেন, কিন্তু লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন নহেন : লুইপাদ বৌদ্ধ সহজযানী আর মীননাথ নাথযোগী : বৌদ্ধ চর্যাগানের [২১ নং]

১। নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য—ডঃ সুকুমার সেন [বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'গোর্খবিজয়]
২। নাথপন্থ—শ্রীকল্যাণী মল্লিক [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ]

টীকায় বৌদ্ধ আচার্যের পদের ভাব বুঝাইতে গিয়া মীননাথের উক্তি 'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'—'তথাচ পরদর্শনে মীননাথঃ' বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে: সম্প্রদায় ভিন্ন না হইলে মীননাথের দর্শনকে 'পরদর্শন' বলা হইবে কেন? তবে একথা ঠিক যে, বৌদ্ধ সহজিয়া এবং নাথযোগীদের সাধন ক্রিয়ায় সাদৃশ্য আছে। তাহার কারণ উভয় ধর্মই এক সাধারণ তন্ত্রের উৎস হইতে উৎসারিত। কালক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের সিদ্ধাই-কাহিনীও একত্র যুক্ত হইয়া গিয়াছে—বাংলায় রচিত গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য তাহার প্রমাণ।

নাথপন্থের দার্শনিক মত এবং সাধন পদ্ধতি নানা দিক হইতে তন্ত্র-তত্ত্ব ও তান্ত্রিক যোগ দ্বারা প্রভাবান্বিত। নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ যোগী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের 'প্রধান সিদ্ধা' মহাদেব ['আস্তে গুরু মহাদেব পিছে আর সব']। ইনিই আদিনাথ: ইনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুতন্ত্রের শিব: 'Adinath is none but Siva of the Hindus' [Obscure religious cults—Dr. S. B. Dasgupta]: ইঁহার পত্নী জন্ম-মরণশীল গৌরী। নাথ সম্প্রদায়ের তত্ত্ব হিন্দুতন্ত্রের মত শিবশক্তির কথোপকথনছলে বর্ণিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ মীনরূপ ধারণ করিয়া গৌরীর নিকট কথিত শিবের যোগ-তত্ত্ব শ্রবণ করেন।

শিব-প্রোক্ত তত্ত্বটি 'মহাজ্ঞান' বা মৃত্যুঞ্জয় যোগ। এই যোগ-প্রভাবে নাথ-যোগিগণ কালদণ্ড খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে পারেন ['খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে' [হঠযোগ-প্রদীপিকা]। বস্তুতঃ জীবনে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া বিচরণ করাই নাথযোগীর লক্ষ্য, তাঁহাদের কাম্য 'সিদ্ধদেহ'। সে দেহে জরা নাই, মৃত্যু নাই, চাঞ্চল্য নাই, উহা 'কাষ্ঠা সমতুল'। এই অবস্থায় দেব-দেবী যো একাকার—ধ্যান নাই, ধ্যাতাও নাই: সাধক এখানে—

স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিষ্যঃ স্বয়ং গুরুঃ।
স্বয়ং ধ্যানং স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতা॥ [কৌলজ্ঞাননির্ণয়]

ইহা প্রকৃত পক্ষে তান্ত্রিক দিব্য যোগীর শিবাবস্থা: তিনিও মহাজ্ঞানী, মৃত্যুঞ্জয়ী এবং স্বয়ং শিব। তন্ত্রোক্ত জীবন্মুক্তিই নাথযোগীর 'জ্যান্তেমরা' সিদ্ধাবস্থা।

এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য নাথযোগীর যে সাধন, তাহা 'কায়াসাধন'। কায়াসাধনের ব্যাপারে নাথ-পন্থ সম্পূর্ণরূপে তন্ত্র-পন্থী। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'ত্রৈলোক্যে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে', নাথযোগীও তেমনি বলেন, 'ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড'। দেহ সাধনীয় জন্যই তান্ত্রিক সাধক দেহস্থ নাড়ী, বায়ু, কুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতির সংস্থান বুঝিয়া ক্রিয়ায় অগ্রসর হন,—নাথপন্থ যোগীরাও তেমনি দেহস্থ নাড়ী, বায়ুর প্রকৃতি বুঝিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকেন:

ভাঙ্ক্বা সুষুম্নাসন্ভেদং কৃত্বা বায়ুং চ মধ্যগম্।

স্থিত্বা সদৈব সুস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধয়েৎ॥ [হঠযোগ-প্রদীপিকা]

নাথপন্থে নানাভাবে 'উল্টা সাধন' বা 'উজান বাওয়া'র ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। উল্টা সাধন প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির স্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া নিবৃত্তির পথে বায়ু, শুক্র ও মনকে চালনা করা। তান্ত্রিক কুণ্ডলিনী-যোগও প্রত্যারোহ। নাথপন্থে এই প্রত্যারোহেরই বিশেষ গুরুত্ব.

উজান ভাঙ্গিয়া কর অমনাতে মন।

তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন॥ [গোর্খবিজয়]

নাথপন্থে ব্রহ্মচর্যের উপর ও দৃঢ়ভাবে শুক্রধারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—বার বার বলা হইয়াছে, 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'। নারীসম্পর্কেও তীব্র কটাক্ষ করা হইয়াছে, নারীকে বলা হইয়াছে 'বাঘিনী'। মীননাথ নারী-সঙ্গে প্রমত্ত হইয়া যখন মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন শিষ্য গোরক্ষনাথ এই নারী ও ভোগ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'শরীর শুখাইল গুরু হারাইলা পরাণ'। কিন্তু কায়া-সাধনে বা উল্টাযোগসাধনে যে-সকল ইঙ্গিতময় প্রক্রিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শক্তি-যোগকে অস্বীকার করা হয় নাই। নাথযুগীদের দেহস্থ 'চন্দ্র-সূর্য' বা 'গঙ্গা-যমুনা' নর-নারীর প্রতীক। হঠযোগদ্বারা চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রধান সাধন-ক্রিয়া। চন্দ্র হইতেছে পরম বিন্দু বা অমৃত: ইহা সহস্রার কমলে অধোমুখে অবস্থিত: ইহাই শিব। এই শিবরূপ চন্দ্র হইতে যে অমৃতবিন্দু নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে, তাহাকে পান করাই মহারস পান। মহারস পানের জন্য প্রয়োজন সূর্য বা শক্তি। ইহা মূলাধারে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অবস্থান করে। ইহা প্রবৃত্তিমুখী, মৃত্যুশীল ও মরণ-কারণ। এই শক্তিকেই গুরুর নির্দেশে যৌগিক কৌশলে শিবের সহিত যুক্ত করিতে হয়। ইহাই যোগের শেষ কথা;

বিন্দু শিবো রজঃ শক্তিঃ চন্দ্রো বিন্দু রজো রবিঃ।

অনয়ো সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥ [গোরক্ষ-পদ্ধতি]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'Thus it seems that the conception of the moon and the sun has been associated with that of Siva and Sakti, and metaphysically the moon and the sun represent the nature of Sivà and Sakti respectively'.—তিনি চন্দ্র-সূর্য মেলন ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি লক্ষণীয়, 'The combination of the sun and the moon implies secondly the yogic practice

in which the male and the female unite and the combined substance of the seed and the ovum is sucked within by the yogin or yogini, as the case may be through some secret yogic processes.'[১] বস্তুতঃ নর-নারীর স্থূল মিলন যেমন তন্ত্রে স্বীকৃত, আবার উহা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত, নাথ-পন্থের কায়া-সাধনেও এই ব্যাপারটি আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকার বজ্রোলামুদ্রা সাধনে স্পষ্টতঃ এই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ঙ. বৈষ্ণব সহজিয়া

বৈষ্ণবধর্মেও শক্তিবাদের প্রভাব গুরুতর। প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থের বাসুদেবাদি-তত্ত্বে শক্তিতত্ত্বের প্রভাব তো আছেই, এমন কি মহাপ্রভু-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বেও শক্তিবাদের প্রভাব আছে। ডঃ সুশীল কুমার দে মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীমতীকে স্বরূপ শক্তিরূপে গ্রহণ এবং সাধন-ব্যাপারে কামগায়ত্রী গ্রহণের মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব রহিয়াছে।[২] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতেও বৈষ্ণবধর্ম তন্ত্রস্পৃষ্ট।[৩] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 'কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি রাধার হ্লাদিনীরূপ' শক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যদিচ প্রেমে ও সৌন্দর্যে বৈষ্ণবের রাধা তন্ত্রাদিবর্ণিত শক্তি হইতে অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, সে রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই—তথাপি রাধাতত্ত্ব আসলে শক্তিতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।[৪] গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হ্লাদিনীশক্তিরূপা মহাশক্তি যে তন্ত্রেরই মহাশক্তি রূপগোস্বামীও তাহা বলিয়াছেন,

> হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
> তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ [উজ্জ্বল নীলমণি, রাধাপ্রকরণ]

পঞ্চরাত্র, পুরাণ, গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিলে এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে ও সাধনায় তন্ত্রমত গভীরভাবে যুক্ত। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে 'ব্রহ্মসংহিতার' কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আর এই সংহিতার সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবগণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও শক্তিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট: এখানে সহস্রার পদ্মকেই 'গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্' বলা হইয়াছে, এই পদ্মেরই কর্ণিকার মহাযন্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ জ্যোতীরূপ কামবীজ দ্বারা মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে বাস করেন।[৫]

১। Obscure Religious cults—Dr. S. B. Dasgupta.

২। Early History of the Vaishnaba faith & movement—Dr. S. K. De.

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ৪। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।

৫। কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্। ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যাপুরুষেণ চ। প্রেমানন্দমহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্॥ [ব্রহ্মসংহিতা]

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই সকল দিক হইতে তন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও, ইহার প্রেমভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধন স্বতন্ত্র। নিজদেহকে সিদ্ধদেহ মনে করিয়া, গোপী-অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা ভাবনা করাই বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ সাধনা। এখানে সাধকের ভূমিকা দ্রষ্টার বা সখীর বা লীলাশুকের। ভক্তের ভাব গোপীর অনুগত ভাব অর্থাৎ রাগানুগামার্গে ভজন। রাগাত্মিক ভজন সাক্ষাৎ গোপীর, ভক্ত কদাচিৎ সে স্তরে উন্নীত হইয়া থাকেন; সাধারণভাবে ভক্তের পক্ষে রাধাস্তরে উন্নীত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না, কৃষ্ণ হইয়া যাওয়ার প্রশ্ন তো একেবারেই নয়। লয়মুক্তিতে ভক্ত চিরবিরক্ত। সাযুজ্য মুক্তি দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কিন্তু তন্ত্রের শেষস্তরে অদ্বৈত-সাযুজ্য। দ্বৈতবোধ তন্ত্রসাধনার পাদপীঠ, সিদ্ধপীঠে তান্ত্রিক সাধক অদ্বৈত 'শিবোঽহং' বোধে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু কি তত্ত্বের দিকে, কি সাধন-পদ্ধতিতে সহজিয়া বৈষ্ণব শাক্তের সগোত্র। বৈষ্ণব সহজ মত কত প্রাচীন, বলা দুষ্কর। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, মুসলমান সুফীমতের সহিত মিশ্রণে বৈষ্ণব সহজ মতের উদ্ভব। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া মতে এ মত আরও প্রাচীন। মুসলমান-পূর্ব যুগে বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, জয়দেব-পদ্মাবতী ছিলেন সহজ পথের পথিক। যে পরকীয়া প্রেম সহজ সাধনার প্রাণ, সহজিয়াগণ তাহাকে সুদূর দ্বাপরের ব্রজলীলার যুগে টানিয়া লইয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই সাধনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্রজলীলারও পূর্ববর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। সর্বপ্রথম 'এই ধর্ম যাজন কর্যাছিল ভরতমুনি' [আনন্দ ভৈরব]। আখ্যানটি এইরূপ[১]: ব্রহ্মা ও তাঁহার মানসকন্যা হইতে মনু ও ভরতের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সৃষ্টির আদেশ দিলে মনু হইতে বহুতর সৃষ্টি পত্তন হয়। কিন্তু ভরতমুনি তপস্যায় মন দেন। রেবা নদীর তীরে বেতবন, তাহার ভিতর রহস্যময় এক কুঞ্জ। তপস্যানিরত ভরত এইখানে এক অদ্ভুত নায়ক-নায়িকাদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেন—গোপরূপে পরকীয়া-সঙ্গম। বিভ্রান্ত ভরত এই বৃত্তান্ত নিত্য বৃন্দাবনের গোলকনাথের নিকট নিবেদন করেন, 'নর-মানুষের লীলা দেখি সর্বোত্তম'। গোলকনাথ শুনিয়া বলেন, এই পরকীয়া লীলার ইন্দ্রিয়কাম অতি গোপনীয়, কিন্তু অতিশয় আনন্দপূর্ণ, 'সে কাম সাক্ষাৎ কবি রহে আনন্দরূপে'। ভগবানের বাক্য শ্রবণে ভরত সেই লীলা-সাধনে মন দিলেন। এদিকে ভরতমুনির মুখে নররূপে পরকীয়া লীলার প্রসঙ্গ শুনিয়া কৃষ্ণের মনে লোভ হইল,

> এই কথা ভরত কহিল যেই মাত্র।
> তখনে ভগবান লোভ ধরিল একান্ত॥

১। সহজিয়া সাহিত্যে এই কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 'আনন্দ ভৈরব', 'রতিবিলাস-পদ্ধতি' ও 'সুধামৃত কণিকা' গ্রন্থের অনুসরণে কাহিনীটি বিবৃত হইল।

গূঢ়রূপে মানসে আস্বাদন ইচ্ছা হইল।
ভরত প্রতি ভাব তবে গোপন করিল॥ [রতি-বিলাস-পদ্ধতি]

এই ইচ্ছার প্রকট প্রকাশ ব্রজারণ্যের পরকীয়া লীলা। সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধন-প্রমাণ ব্রজের পরকীয়া ভাব এবং ভরতমুনির সাধন।[১] সুদূর দ্বাপর যুগের কথা বাদ দিলেও, যে ভরতমুনির প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ সহজিয়া সাহিত্যে উল্লেখিত হইয়াছে এবং যিনি এই রস প্রথম যাজন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস, তিনি যদি রসশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনি হন (এবং তাহা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়), তাহা হইলে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারাকে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে স্থাপন করিতে হয়।

কিন্তু যত প্রাচীনই হউক সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের পুঁথিগুলি পাওয়া যাইতেছে চৈতন্য-পরবর্তী যুগ হইতে। ভরতমুনি সংস্কৃতে যে সহজ-রস প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লুপ্ত। ইতস্ততঃ দুই একটি শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে মাত্র। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রাগাত্মিক পদগুলি ব্যতীত প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের কোন নিদর্শন নাই। এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কিনা সে সম্পর্কেও অনেকে সংশয় পোষণ করেন। সহজিয়াগণ উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃতকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। উপরন্তু এই গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—১. অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'আগম', 'আনন্দ ভৈরব' ও 'অমৃতরসাবলী' (এই গ্রন্থগুলি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত), ২. কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত 'আত্মতত্ত্ব', 'রসভক্তি চন্দ্রিকা', 'রসকদম্ব কলিকা' ৩. নরোত্তম দাসের 'আত্মতত্ত্ব' (দেহ-কড়চা) ও 'রাধারসকারিকা', ৪. লোচনদাসের 'দুর্লভসার' ও 'পদাবলী' ৫. বীরভদ্র গোস্বামীর 'শিক্ষাকড়চা' ৬. হরিদাস গোস্বামীর 'রাগময়ী কণা' ৭. রসিকদাস গোস্বামীর 'রতিবিলাস-পদ্ধতি' 'রসতত্ত্বসার' ৮. মুকুন্দদেব গোস্বামীর 'ভৃঙ্গ রত্নাবলী', 'অমৃত রত্নাবলী' ৯. লক্ষ্মীকান্ত দাসের 'সুধামৃত কণিকা' ১০. কবিরাজ ঘনশ্যাম দাসের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' ১১. অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত-বিলাস' এবং অন্যান্য বিবিধ সহজিয়া পদাবলী। এগুলি বিপুলকায় বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য ও রসনিবন্ধাদির সামান্য দিগ্‌দর্শনমাত্র।

ইহাদের অনুসরণে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা শাক্তসিদ্ধান্তের নির্যাস লইয়াই রচিত বিশেষতঃ উহার সাধন-পদ্ধতি শিব-শক্তি যোগের মতই গুহ্য ও রহস্যময়। স্থূল দেহ ও কাম উভয় সাধনার ভিত্তি, উভয় স্থলেই নারী সাধন-সঙ্গিনী। তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া উহার প্রকাশের

১। নদ্যাঃ সমীপে কুঞ্জে বৎ নিভৃতং পরমং বনম্।
তস্য কুঞ্জে নায়িকায়াঃ মিলনং ভরতস্য হি॥

ভঙ্গী যেমন সঙ্কেতময় এবং নানাপ্রকার জটিল রূপকাবরণে আবৃত, বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধন-সঙ্কেতও তেমনি অতি গূঢ় বলিয়া প্রকাশ সাঙ্কেতিক, পরিভাষাও ইঙ্গিতময়।

আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সহজিয়া সাহিত্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; কি তত্ত্বে, কি সাধনার বিষয়ে উহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের—শ্রীরূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির বাক্য প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে ওই সকল বাক্যের অর্থ স্বতন্ত্র, ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র। সহজিয়াগণ মনে করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং, ষট্‌গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাসাদি বৈষ্ণবগণ সকলেই সহজ সাধক; তাঁহাদের পরকীয়া সঙ্গিনীদের একটি তালিকাও 'বিবর্ত-বিলাস' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বিবর্ত-বিলাসকার মনে করেন, বাক্যে ও আচরণে গোস্বামিগণ সহজ-সাধনার গূঢ়তত্ত্বের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিটি বাক্যেরই দুই অর্থ—বাহ্য ও অন্তর। অন্তরঙ্গ অর্থটিই গূঢ় ও সহজমতের পরিপোষক। চৈতন্যদেব স্বয়ং যেমন 'এক কারবারে প্রভু অন্য কার্য করে'—তেমনি গোস্বামিগণ একই সিদ্ধান্ত বাক্যে সহজ মর্মার্থ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধ্য ও সাধনার ব্যাপারে সহজিয়া বৈষ্ণবের অবলম্বন চৈতন্যচরিতামৃতধৃত এই মহাবাক্য,—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ [চৈ. চ. মধ্য ৮]

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের এই 'নবীন মদন'ই পরমতত্ত্ব। তিনি 'নিত্যানন্দ দেহ', 'মহামধু হইতে মধুর'। তিনি পূর্ণ, অখণ্ড ও এক। এক হইলেও এই তত্ত্ব অনির্বচনীয় 'মধুর যুগল'। একই দেহে ইহা পুরুষ ও প্রকৃতি, রস ও রূপ, রাগ ও রতি। ইহারা নিত্যের দেশে নিত্যকালের রাধাকৃষ্ণ,—

রাগবস্তু মহাভাব শ্রীরাধিকা রতি।
স্বয়ং রাধা তার নাম স্বয়ং প্রকৃতি॥
কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সেই রাধার প্রকাশ।
গোবিন্দ-নন্দিনী রাধা প্রেম-বিলাস॥ [রসকদম্ব কলিকা]

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন 'নিত্যের দেশ'। সেখানে কালস্রোত নাই, মধু ঋতুর শেষ নাই, রস-রতির অন্ত নাই। সেখানে নিত্য দীপ্তি, নিত্য পুষ্পবিকাশ, নিত্য মধুরলীলা। স্বতঃসিদ্ধ 'রসমূর্তি' চিরকিশোর কৃষ্ণ এই ধামে নিজ প্রকৃতির সহিত নিত্যলীলায় নিজের রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করিতেছেন, 'আপনি আপন প্রেম, করে সদা আস্বাদন, আপনি আপনা হয় বশ' [বিবর্ত-বিলাস]।

সহজিয়া সাহিত্যে এই অনির্বচনীয় 'যামল তত্ত্ব'টিকে নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রশ্নোত্তর ছলে 'আত্মতত্ত্ব' গ্রন্থের বর্ণনা,—

> স্বতঃসিদ্ধ গোলোক নিত্য বৃন্দাবন।...নিত্য বৃন্দাবনে কে থাকেন? শ্রীব্রজনাথ। সেখানে হয় কি? নিত্য রাস হয়, নিত্য মহোৎসব হয়। নিত্যং বৃন্দাবনং নাম নিত্য রাসমহোৎসবম্।...করেন কি? শৃঙ্গার রস আন্দোলন করেন।. রত্ন বেদীতে...কিশোর-কিশোরী বিরাজমান। নায়কের কামরতি। নায়িকার প্রেমরতি। [আত্মতত্ত্ব]

নিত্যধামের রসকুঞ্জে রসরাজের এই যে কেলি, এই যে রাগ-রতির যোগ, নিত্যরাস বা স্বরূপের সহিত স্বরূপের লীলা, ইহারই প্রাকৃত প্রকাশ দ্বাপরের বৃন্দাবন-লীলা। অদ্বৈত এখানে স্পষ্ট দ্বৈতে প্রকট—রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ। শুধু তাই নয়, স্বকীয়া এখানে পরকীয়া। যদিও তত্ত্বটি যোগমায়াশ্রিত, তথাপি উহার প্রাকৃতত্ব স্বীকৃত। কৃষ্ণ-ভরতমুনি সংবাদে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, এক ও অখণ্ড তত্ত্বের দুইয়ে প্রকাশ প্রধানতঃ দুই কারণে,—১. মানুষ আকারে প্রেম আস্বাদনের জন্য, এবং ২. পরকীয়া নায়িকা সহায়ে কিভাবে সিদ্ধরতি সাধন করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য [ভৃঙ্গ-রত্নাবলী]

সিদ্ধদেহে সিদ্ধরতির সাধনাই এই লীলার মূল লক্ষ্য। ব্রজলীলার এই সিদ্ধান্তের সহিত রাধাতন্ত্রের সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাধাতন্ত্র মতেও, শক্তিসহায়ে সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ ব্রজধামে পদ্মিনী রাধার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন—'কুলাচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পদ্মিনীসঙ্গমগতঃ' [রাধাতন্ত্র. ১৩ পটল]। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সহজের আর এক সহজমানুষরূপলীলা। উহাই সহজ-সাধনার প্রত্যক্ষ আদর্শ।

সহজমতে জীবের পরিকল্পনাও তন্ত্র হইতে অভিন্ন। জীব নানা প্রকার। তন্মধ্যে বিশিষ্ট তটস্থ জীব। ইহার অবস্থান দেহভাণ্ডে। দেহভাণ্ড পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও ষড়রিপুর সমষ্টি। ইহাদের রাজা মন। মন ইন্দ্রিয়বর্গের চালক। এই ভাণ্ডে জীবাত্মা রহিয়াছেন গুহ্যদেশে, চতুর্দলপদ্মে, শুক্লাসনে; আর পরমাত্মা রহিয়াছেন সহস্রদলের উপরে শূন্যে শোণিতাচ্ছন্ন অবস্থায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভাবেন, আর পরমাত্মা জীবাত্মাকে হরণ করেন। তাহাতে জীব পরমানন্দ হয় ও পরমাত্মার স্বরূপ হয়। রূপ (জীবাত্মা) ও স্বরূপ (পরমাত্মা) তত্ত্বতঃ অভিন্ন—'স্বরূপ ও রূপ এক বস্তু কভু ভিন্ন নয়'। কিন্তু সাধারণতঃ জীবে এই স্বরূপ মায়াচ্ছন্ন ও মোহাবৃত। জীবের সাধন স্বরূপ হওয়ার লক্ষ্যে।

সহজিয়া সাধন দেহকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহারা বলেন, 'দেহের ভিতর আছে

সকল সংসার।' দেহেই নিত্য বৃন্দাবন, দেহেই মর্ত্য-বৃন্দাবন, দেহেই 'গুপ্তচন্দ্র' দেশ। তাই তাঁহাদের নির্দেশ, 'জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে।' মানুষ জানিয়া এই দেহেই মানুষের তত্ত্ব করিতে হয়। মানুষ তিন প্রকার—সহজ মানুষ, অযোনি মানুষ ও সংস্কারা মানুষ। স্বতঃসিদ্ধ সহজ মানুষের স্থান গোলোক বা নিত্য বৃন্দাবন। অযোনিসম্ভব মানুষ ইহার নিম্নে পরমব্যোমে ও চৌদ্দভুবনে অবস্থান করেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি অযোনি-সম্ভব। যোনি-সম্ভব মানুষের স্থান গোকুল বৃন্দাবন, ইনি ব্রজের নরাকার কৃষ্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সামান্য মানবও যোনিসম্ভব। এই মানুষ যদি সহজ মানুষ হইয়া ভজন করিতে পারে, তবেই তাহার সহজপ্রাপ্তি হয়। 'সহজ মানুষেই সহজ বর্তে।' কিন্তু সেই সহজ মানুষ হওয়া সহজ কথা নয়। চণ্ডীদাস বলেন, 'মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে মানুষ নিগূঢ় কথ', আর সে মানুষ 'ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গুটিক হয়।' সামান্য মানুষের মধ্যে থাকিলেও, 'যোনিতে জনম তাঁহার নয়, তাঁহার জনম রাগেতে হয়' [চণ্ডীদাস]; তিনি 'জ্যান্তে মরা'—'মানুষ বলি যারে, জীয়ন্তে সে মরে, সেই সে মানুষ হয়'।

বস্তুতঃ কামকে সহজ প্রেমে উন্নীত করা, জৈবিক সত্তাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নিশ্চল সহজ প্রেমসত্তায় পরিণত করাই সহজ সাধনা। সহজ হইলেও ইহা সহজ নয়। প্রাকৃত জগতের নায়ক, প্রাকৃত জগতের নায়িকা এবং প্রাকৃত জগতের কাম ইহার বিষয়, আশ্রয় ও অবলম্বন। এখানে কাম ও প্রেম একই আধারে যুক্তবেণীর মত অবস্থান করে—'প্রেম অমৃত কাম রহে এক ঠাঁই।' বিষ লইয়া, আগুন লইয়া সহজ-সাধন। পদে পদে পতনের আশঙ্কা। তাই বারবার সাবধানী বাণী—একটু এদিক ওদিক হইলে 'ভীমরুল বরুল' উঠিবার ভয়।

তাই এই সাধনায় 'আরোপ'এর গুরুত্ব। আরোপ দ্বারা প্রাকৃত বিষয়, আশ্রয় ও কাম অপ্রাকৃত সহজ অবস্থায় পরিণত হয়। আরোপের প্রধান বিষয়াশ্রয় পুরুষ ও নারী: এ সাধনার গায়ত্রী কাম গায়ত্রী ['কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ'], ইহার বীজ কামবীজ 'ক্লীং'। সবই প্রাকৃত, সবই লৌকিক, কিন্তু বিশেষ আরোপ-কৌশলে—সবই হয় অপ্রাকৃত, অলৌকিক ও বিশুদ্ধ।

সহজ সাধনায় পুরুষের ভূমিকা বস্তুতঃ প্রকৃতির। সহজ স্বভাবে পুরুষ যখন কাম গ্রহণ করেন, তখন বিশেষ আরোপ প্রণালীতে তিনি প্রকৃতিই হইয়া যান। সাধনরাজ্যে এই প্রকৃতিই প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়—'প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতির সঙ্গ' [আত্মতত্ত্ব]। এই সাধনার অন্যতম আশ্রয় যে প্রকৃতি, তিনিও অসামান্যা। তিনি স্বরূপতঃ 'মহাভাবশিরোমণি' রাধার আর এক বিগ্রহ। রাধারাণী

যেমন রাগময়ী দেহ, তাঁহার রতি যেমন 'সমর্থা রতি', তিনি যেমন স্থিরবস্তু:—সাধন-সঙ্গিনী-নায়িকাও সেইরূপ,—

বস্তু নহে কৃষ্ণ যেতা মন রাধিকার।
টলাটল ছাড়া এদেশের বিচার॥ [বিবর্তবিলাস]

এই প্রকারের নায়ক-নায়িকার দ্বারে সহজের রস-সাধনা। দেহের নাড়ী, বায়ু, চক্র প্রভৃতির অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি বুঝিয়া রতিরূপ আত্মাকে শোধন করিয়া বাণরূপ অগ্নিদ্বারা মন্ত্রের যাজন করিতে হয়। ইহা যেমন রহস্যময়, তেমনই দুরূহ :

অত্যন্ত রহস্য কহি প্রাকৃত শৃঙ্গারে।
রতিরণে জয়ী তারে করি নমস্কারে॥ [বিবর্তবিলাস]

সহজ সাধনায় গুরুর স্থান অতি উচ্চে। গুরু আনন্দময়, নিত্যচৈতন্য পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। তিনিই জীবকে চৈতন্য দেন, সহজবস্তু জানাইয়া দেন এবং সহজস্বরূপ হইবার কৌশল শিক্ষা দেন। গুরুই নায়ক, শিষ্য নায়িকা। নিত্য বৃন্দাবনে যেমন স্বতঃসিদ্ধ সহজ মানুষ (শৃঙ্গাররসমূর্তি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ) স্ব-শক্তিসহ কামগায়ত্রী কামবীজে নিত্য শৃঙ্গার আন্দোলন করিয়া পরমানন্দ হইয়া থাকেন, সেখানে যেমন নিত্য রাস হয়, নিত্য মহোৎসব হয়—আবার গোকুল বৃন্দাবনে যেমন রসরাজ কৃষ্ণ পরকীয়াভাবে রাধাসহ প্রেমচর্চা করিয়া সেই নিত্য সহজধারাকে মর্ত্যে প্রকট করেন—তেমনই ভাণ্ডস্থ জীব (স্বরূপের রূপ) প্রথমে গুপ্ত বৃন্দাবনে, পরে মনোবৃন্দাবনে গুরু সহায়ে (গুরুই নায়ক, তিনি পুরুষই হউন আর প্রকৃতিই হউন, তিনিই মর্ত্যের সহজপুরুষ) নিজেকে প্রকৃতি ভাবিয়া (শিষ্য নায়িকা ; তিনি পুরুষই হউন বা নারীই হউন, শিষ্য চির প্রকৃতি-স্বভাব) কামগায়ত্রী কামবীজ দ্বারা শৃঙ্গার আন্দোলন পূর্বক সেই নিত্য রাস, নিত্য মহোৎসবে মগ্ন হন। রূপের ভিতর স্বরূপের আস্বাদন বা রূপের স্বরূপে স্থিতিই সহজ-সাধনার শেষ প্রাপ্তি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সহজিয়া সাহিত্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'অনেকের বিশ্বাস যে সহজিয়ারা তান্ত্রিক প্রথায় সাধনা করেন।... এই মত সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সহজিয়ারা তন্ত্রের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধন-ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী।' মন্তব্যটি বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। অধ্যাপক বসু স্বীকার করিয়াছেন, সহজিয়া মার্গে দেহের বিশ্লেষণ তন্ত্রেরই অনুরূপ, কেবল চক্রাদি স্থলে সরোবরের কল্পনা এবং শিব-শক্তি স্থলে রসরূপ কৃষ্ণ ও রতিরূপ রাধার কল্পনা। তাঁহার মতে সহজিয়ার সাধনা ভাব-কল্পনা। কিন্তু তাহা নয়।

সহজ সাধনায় সাধকের তিন প্রকার ভেদ—প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—তাহাদের সাধনও তিন প্রকার :

ভাবাশ্রয় রসাশ্রয় আর প্রেমাশ্রয়।
প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনে তিন হয় ॥ [অমৃতরত্নাবলী]

প্রবর্তের আশ্রয় 'ভাব'; ইহা নিম্নাধিকারীর করণ। ইহা সাধকের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার সোপান মাত্র, অনেকটা তন্ত্রের পশুভাবের সাধনার অনুরূপ। কিন্তু যে অবস্থায় মন্ত্রাশ্রয়ে সাধকের 'গোত্রান্তর' হয় বা 'দেহান্তর' হয়—তাহা তো ভাবসাধনা মাত্র নহে : 'রসাশ্রিত' সাধন ক্রিয়ামূলক—তাহার আলম্বন 'দেহ', তাহার আশ্রয় 'নায়ক-নায়িকা' এবং উদ্দীপন 'কাম'। প্রকৃতিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ 'অগ্নিকুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ আবর্তন'—আর অগ্নিকুণ্ড আছে প্রকৃতির অঙ্গে। যে 'গুপ্তচন্দ্রপুর' ক্রিয়া-সাধনের স্থান, তাহা অবলার অর্দ্ধঅঙ্গ—'অবলার অর্দ্ধ অঙ্গ গুপ্তচন্দ্র দেশ'। এই সাধনা অত্যন্ত গুহ্য বলিয়াই অতিশয় সঙ্কেতময় ; করণের ভাষা ও পরিভাষাও সাঙ্কেতিক। ইহা তান্ত্রিক মুদ্রা গ্রহণ ও পঞ্চম ম-কার সাধন হইতে স্বতন্ত্র নয়। অতএব 'সাধন-ব্যাপারে তাঁহারা (সহজিয়ারা) ভিন্নপন্থী'—এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রেম ইহার শেষ লাভ, বিশেষ প্রক্রিয়ার কাম সেই প্রেমলাভের আরোহ-সোপান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বলেন, 'A close study of the literature of the vaishnava Sahajiyas will leave no room for doubting the clear fact that it records the spirit and practices of the earlier Buddhist and Hindu Tantras, of course in a distinctly transformed form wrought through the evolution of centuries in different religious and cultural environments. [Obscure Religious cults].

চ. বাউল

তন্ত্র সাধনা যে উচ্চকোটির হিন্দুধর্মেই শুধু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে—এ দেশের নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে ইহার প্রভাব আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। সমাজের নিম্নস্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে গুহ্য, রহস্যময় সাধনার ধারা রহিয়াছে তাহার পরিমাপ করা কঠিন। তাহাদের কোনটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোনটি অতি ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, কোনটি বা অপাংক্তেয় হইয়াও লোকজীবনের মধ্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান আছে। তন্ত্র-সাধনা লৌকিক ; আদৌ উহা জন-জীবনের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তারপর উহা

উচ্চ কোটির অনেক ধর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, অনেক ধর্মকে নিজের প্রবাহে মিলাইয়া লইয়াছে। কিন্তু উহার সর্বাধিক প্রভাব রহিয়াছে লৌকিক ধর্মমতে ও আচরণে। বাংলার বাউল তাহাদের মধ্যে একটি।

বাউল একটি বিচিত্র সম্প্রদায়। লোকালয়ে তাঁহারা বড় থাকেন না। তাঁহাদের স্থান নির্জন আখড়া বা দরগা। তাঁহাদের জাতিবিচার নাই। নানারঙের বিচিত্রিত কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা দিয়া তৈয়ারী তাঁহাদের পরনের লম্বা আলখাল্লা। আচার-আচরণে ইঙ্গিতময়তা ও স্বল্পভাষণই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের প্রধান সম্পদ সহজ সরল কথায় গভীর অনুভূতিমূলক গান। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বালাই তাঁহাদের নাই, পুঁথিগত পাণ্ডিত্যকেও তাঁহারা বড় আসন দেন না। তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য 'মনের মানুষ'-এর অনুসন্ধান। সে সন্ধান মন্দিরে-মসজিদে নয়, নিজের দেহ-দেবালয়ে। তাঁহাদের জীবনের প্রধান আশ্রয় গুরু, আর তাঁহাদের আনাগোনা সাধারণ মানুষের সমাজে। বাউল গান যেন আমাদের দেশের ভুঁইচাঁপা ফুল,—মাটির খুব কাছাকাছি, সহসা নজরে পড়ে না; অলক্ষ্যে ফোটে, সুদূর আকাশের আলোর পানে পাঁপ'ড়ি মেলিয়া ধরে, আপন মনে বাতাসে দোল খায়, খুসীর মৌজে নিজের মধ্যেই নিজে ডুবিয়া থাকে; নিটোল তাহার স্বাস্থ্য, আর অঢেল সৌন্দর্য।

'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাগল [< হি° বাউরা] বা ব্যাকুল; ইহার সহিত 'আউল' [< আকুল] কথাটিও প্রায় একার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রেমময় ভগবান বা 'মনের মানুষ'-এর জন্য যাঁহারা আকুল, পাগল, ব্যাকল—তাঁহারাই বাউল। ইহাদের ধর্মমত ও সাধনার সহিত ভারতের উত্তরাঞ্চলের 'সন্ত সাধুদের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। বাংলাদেশে যে বাউল সম্প্রদায় দেখা যায়, তাঁহারা যদিও জাতি মানেন না, তথাপি তাঁহাদের কেহ বৈষ্ণব সহজপন্থী—কর্তাভজা, ন্যাড়া, সহজী, বলরামী প্রভৃতি; আবার কেহ মুসলমান—ফকির, দরবেশ, সাঁই। ইহাদের মধ্যে একদিকে আসিয়া মিশিয়াছে চিরাচরিত লৌকিক গুহ্য তন্ত্র সাধনা বা সহজ সাধনার ধারা, আর আসিয়া মিশিয়াছে মুসলমান সুফীমত এবং হিন্দু বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারা।

বাউলিয়া মত খুব প্রাচীন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার 'দীক্ষাবক্তৃতা'য় বলিয়াছেন যে, বাউলের 'প্রেমতত্ত্ব', বাউলের 'আভাস-রহস্য' (Mystery), তাঁহার 'ভাবের ইঙ্গিত (Symbolism) ও হেঁয়ালি' ['ডালপাছে শোলের পোনা শিয়ালে ধরে খায়'], তাঁহার 'মনের মানুষ' [বেদের 'পুরুষসূক্তে' যাঁহাকে বলা হইয়াছে, 'এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ'—ঋ. ১০. ৯০.] এবং তাঁহার 'মরমী সংকেত' (Mystic message) প্রভৃতির ছায়া বেদে ও উপনিষদেও আছে; তিনি একথাও বলিয়াছেন

যে, এই সকল ভাব আর্যেতর সমাজের ভাব: 'অনেক পরে বেদের শেষভাগে ও উপনিষদে এইসব মতবাদও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত হইল। দেখিলাম, সত্যই তো, সেখানেও যাগযজ্ঞের উপরে ক্রমশই নানাভাবের 'মরমী' মতবাদ আসিয়া যেন ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে।' [বাংলার বাউল—ক্ষিতিমোহন সেন]

বাংলাদেশেও 'মরমী' মতবাদ প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া ও নাথপন্থ যোগীদের ধর্মমতের সহিত বাউলিয়া মতের সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের গানগুলিকেও বাউল গানের সহিত বিনিময় করা চলে। চৈতন্যযুগে যে এদেশে 'বাউল' সম্প্রদায় ছিল 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে [অন্ত্য. ১৯ পরিচ্ছেদ] তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। চৈতন্য পরবর্তী যুগে সহজিয়া বৈষ্ণব ও সাঁই-ফকিরদের মিশ্রণে ও পোষকতায় ইহা নূতন প্রেরণায় জাগ্রত হয়। জনশ্রুতি এই যে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দের আদেশে মাধব বিবির নিকট এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধব বিবির শিক্ষায় দেহ-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, 'কায়ানুগা ভজে যেই সেই সুপণ্ডিত'। উহাতে হিন্দু-মুসলমানী ভাবের মিশ্রণও লক্ষণীয়।[১]

বস্তুতঃ হিন্দু মুসলমান-মিশ্র ভাব বাউল সম্প্রদায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল্ জুল্‌কে কর সাঁইজীকা কাম॥[২]

মুসলমান-বিজয়ের পর হইতেই এদেশে পীর-ফকিরদের আবির্ভাব হইতে থাকে। তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল অলৌকিক এবং অনেকেই ছিলেন সুফীমতাবলম্বী। তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রেম ও যোগসিদ্ধির সহিত এদেশের যোগপন্থদের সাদৃশ্য থাকায় অতি সহজেই তাঁহাদের মিশ্রণ সম্ভব হয়। গোর্খ পীর, সত্যপীর, মানিকপীর এই মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় চৈতন্য-পরবর্তী যুগে। একদিকে শাহ্ জালাল, শাহ্ সুলতান প্রভৃতি 'অলী'দের [< আউলিয়া = ভক্ত] প্রভাব, অপরদিকে কুতবন, দৌলতকাজী, আলাওল, আলীরাজা ও সৈয়দসুলতান প্রভৃতি সুফী মতাবলম্বী কবিদের হিন্দুভাব এবং সহজিয়া বৈষ্ণবগণের ফকিরী-সাধন। ইহার ফলেই হিন্দু-মুসলমান মিশ্র 'বাউল' সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হইবার সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু বাউল সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হইলেও উহার ভাব শিক্ষিত

১। আগু সঙ্গী বিবি আমি শ্রীরাধা মোর নাম।
মক্কা মদিনা হয় ব্রজভূমি ধাম॥ [বীরভদ্রের শিক্ষা—মূলকড়চা]

২। দ্রষ্টব্য 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার দত্ত।

উচ্চকোটির হিন্দুকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। ফকিরী সাধন বা বাউল সাধনা প্রধানতঃ কর্তাভজা, ন্যাড়া প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণব এবং সাঁই-দরবেশ জাতীয় মুসলমান ফকিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের নিম্নকোটিকে আশ্রয় করিয়াই প্রচলিত ছিল। লোকে তাঁহাদের গান শুনিত, সহজ কথায় সহজ প্রাণের সুরও হয়তো মর্ম স্পর্শ করিত—তথাপি উচ্চবর্ণের সমাজে তাঁহারা ছিলেন অপাংক্তেয়। অবশ্য পংক্তিভুক্ত হইবার আগ্রহও বাউলদের ছিল না। সমাজের নিম্নস্তরেই তাঁহারা আনাগোনা করিতেন; সমাজের বাহিরে নির্জন নদীতীরে বা বিশাল বন-প্রান্তরের প্রবেশ-মুখে তাঁহাদের আখড়া বা দরগা; সেইখানেই নিজদলীয় মনের মানুষদের সহিত তাঁহারা সংবেত হইতেন। রাত্রের চলিত নেশার মৌজ, আর কথার ফাঁকে ফাঁকে সাংকেতিক বা হৃদয়ের আকূতি-প্রকাশক গান। গভীর নিশীথে সে গানের ঝঙ্কার অন্তরতল হইতে দূর আকাশের পানে যাত্রা করিত—সুরে সুরে কাঁপিত দূর গগনের তারা, রাত্রির অন্ধকার, আর নিঝুম বাতাস; কিন্তু লোকালয়ে, বিশেষতঃ শিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন, অভিজাত মানুষের দরবারে তাহা প্রবেশ পথ পাইত না। মূর্খ, নিরক্ষর বলিয়াও বটে, আর দুষ্ট-আচারী বলিয়াও বটে, বাউলের গান বহুদিন পর্যন্ত এইভাবেই অনাদৃত ছিল।

উনবিংশ শতকে যেদিন দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িল, সেদিন অসামাজিক এই মরমিয়া সঙ্গীত অবহেলিত রহিল না। সেদিন অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে ফকির সম্প্রদায়ের কথা প্রকাশ করিলেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী 'বাউলবিংশতি' রচনা করিলেন, হরিনাথ মজুমদার 'কাঙাল' বা 'ফিকির চাঁদের' ছদ্ম নামে বাউলগানে দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গ ভারতীর শ্রেষ্ঠ সেবক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি বাউল সম্প্রদায়কে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন, এবং বাউলগানের গূঢ় মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Hibbert Lectures 'The Religion of man' (1930) গ্রন্থে বাউল গানের প্রসঙ্গ বাউল-প্রীতির এক অভিনব স্বাক্ষর। এই প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর উদ্যমও প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা বক্তৃতা'য় (1949) তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলার বাউল'।

বাউল গানগুলি নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পর্কে একটি মতবাদ দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে, বাউলের সাধ্য হইতেছেন উপনিষদের 'ব্রহ্ম' এবং বাউলের সিদ্ধি জীব ব্রহ্মের একত্বে বা ব্রহ্মসাযুজ্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউলতত্ত্বের এই গূঢ়ভাব

প্রকাশ করেন। তাঁহা মতে, বাউলের 'মনের মানুষ' উপনিষদের 'অন্তরতর যদয়মাত্মা'। তিনি বলেন,

"আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে॥

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানবার, সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।'[১]

'Religion of Man' গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ 'The man of my heart' কে উপনিষদের প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্মবস্তু' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার উপায় যে 'যোগ'—বাউলের যাহা সাধন—তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'The special mental attitude which India has in her religion is made clear by the word 'yoga' whose meaning is to effect union. Union has its significance not in the realm 'to have', but in that 'to be'. To gain truth is to admit its separateness, but to 'be' true is to become one with truth'[২]—অর্থাৎ কবি স্বীকার করিতেছেন, মনের মানুষের সহিত মিলিত হওয়া মানে, 'সোঽহম্' হইয়া যাওয়া, ইহা যোগেরও লক্ষ্য, বাউলেরও লক্ষ্য। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বাউলের সিদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন, 'The Bauls also speak of love and union, but this love means the love between human personality and the Divine Beloved within and in this love man realises his union

১। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত (১৯৪২ কঃ বিশ্ববিদ্যালয়) 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।

২। Religion of man (Spiritual union)—Tagore.

with the Divine, or in other words he merges his personal existence in the Beloved that resides within this temple of the body'[১]

কিন্তু, বাউল সাধনার শেষ লক্ষ্য 'to become one with truth'[Tagore], কিংবা 'he merges his personal existence in the Beloved' [Dr. Dasgupta] কিনা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বাংলার বাউল গানে এত বিচিত্র রকমের প্রতিধ্বনি আছে যে, অনায়াসে একটি মতকে আর একটি মত দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাহাতে সাধ্য ও সাধনে সাঙ্কর্য দোষ ঘটে। বাউলের 'মনের মানুষ'কে অনেক ক্ষেত্রেই উপনিষদের 'ব্রহ্মবস্তু', 'অন্তরতর আত্মা' বা 'সর্বভূতান্তরাত্মা' বলা হইয়াছে। দেহস্থ আত্মাই বাউলের মনের মানুষ: বাউল বলেন, 'আত্মা খোঁজ নিজ মোকামে।' উপনিষদের মতে এই আত্মাই 'ব্রহ্ম' ['অয়মাত্মা ব্রহ্ম']: উপনিষদের উপদেশ, 'তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব'-তাঁহাকে জান: তাঁহাকে জানিলে এই বোধ হইবে, 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' [ঈশ. ১৬]—যিনি এই পুরুষ, আমিও সেই।

বাউল গানেও এ ধরনের উক্তি প্রচুর আছে, 'আপনাকে যে জেনেছে নিগূঢ়তত্ত্ব সেই পেয়েছে', কিংবা, 'আপনাকে আপনে যেজন জানে, আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে' [লালন সাঁই]। কিন্তু এই নিগূঢ়তত্ত্ব লাভ করিলে কি অবস্থা হয়, বাউলগানে তাহার বর্ণনা অল্প। বাউলগানে 'মনের মানুষ' কিরূপ, তিনি কোথায় থাকেন, কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে; মনের মানুষকে পাইবার নিমিত্ত আন্তরিক আবেগ-আকুলতা ও মর্মভেদী ক্রন্দন আছে; কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিত হইলে কি অবস্থা হয়, সাধক তখন কি হইয়া যান, তাহার বর্ণনা একরূপ নাই বলিলেও হয়। বাউল বিরহের বর্ণনায় মুখর, মিলনের বর্ণনায় মূক। মিলনের বর্ণনা যাহা আছে, তাহাও অতিশয় রহস্যময়:

সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল হয়,
সে প্রেম সামান্যে কি জানা যায়? [লালন]

আর একটি গানে ['হল আল্লা-নবী যুগল মিলন' হারামণি. ১৭ নং] আরও একটু স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে: সেখানে মহামিলনে 'মনের উল্লাসে প্রেমের বশে প্রেমে মিশে গেল দুইজন', কিন্তু 'রইল চিহ্নভিন্ন ধন্য ধন্য উভয়ে আত্মসমর্পণ।' এখানে প্রেমে মিশামিশি আছে, তন্ময়তা আছে—কিন্তু ঠিক অদ্বৈতবোধের কথা নাই। 'রইল চিহ্ন ভিন্ন' বাক্যাংশে দ্বৈতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমাদের মনে হয়, বাউলের

১। Obscure Religious cults—Dr. S. B. Dasgupta

প্রেম-যোগ-সাধনায় উপনিষদের ব্রহ্ম-সাযুজ্যের কথা নাই ; মিলনে যে অদ্বয়বোধ জন্মে তাহাও লয়মুক্তি নয়। প্রেমরসে তন্ময় হইয়া দর্শন, আলাপন ও আনন্দ-রসাস্বাদন করাই বাউলের কাম্য। ইহা উপনিষদের 'সোঽহমস্মি' অবস্থা নহে। তাহা ছাড়া, উপনিষদের জ্ঞান-সাধনাও বাউলে অনুপস্থিত। উপনিষদের রসঘন প্রিয়তম ব্রহ্মকে জানিবার উপায় জ্ঞান ; বাউলের প্রেমময় 'মনের মানুষ'কে পাইবার উপায় প্রেম। বাউলের সাধন প্রেম-যোগ।

বস্তুতঃ রস-সম্ভোগের ক্ষেত্রে 'দুয়ের'ই স্বীকৃতি, একাকী রস-সম্ভোগ হয় না। বাউলের সাধনা এই রস-সম্ভোগের সাধনা। কাজেই বাউল গানে মন ও মনের মানুষ—এই দুইকে স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য রস-সম্ভোগের অতি নিবিড় স্তরে মন যখন একান্তই রসে মশ্‌গুল্, তখন অনির্বচনীয় এক আনন্দ-মুদিত অবস্থা। সে অবস্থায় আত্মহারা ভাব। কে ভোগ্য, কে ভোক্তা এ জ্ঞানও থাকে না, থাকে শুধু আনন্দের অনুভব। বাউল গানে কোন কোন স্থলে জটিল রূপক ও রহস্যময় ভাষায় এই অনিবচনীয় ভাবতন্ময়তার যে ইঙ্গিত দেওয়া হইযাছে, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতের এক আশ্চর্য সম্মিলন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'দুই না হইলে প্রেম হয় না। আবার দুই মিলিয়া এক না হইলেও প্রেম হয় না। কাজেই দুই যখন এক হয়, তখনই প্রেমের উদয়। বাউলেরা বলেন, 'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।' [বাংলার বাউল]। বাউল সাধনার ইহাই মূলতত্ত্ব। বাউল প্রেমপন্থ যোগী।

সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, বাউলের তত্ত্বে সুফীমত ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার প্রভাব গুরুতর। এই দুইটি প্রেম-সাধনার ধারাকে বিশ্লেষণ করিলেও বাউলের প্রাপ্তি যে অতি সাত্ত্বিক দ্বৈতবোধের প্রাপ্তি, তাহা প্রমাণিত হয়।

(i) সুফী মত ও পথ : সুফী মতেও নানা মতবাদের মিশ্রণ আছে। সুফীদেরও নানা শ্রেণী,—চিশ্‌তি, সুরাবর্দী, কাদিরী, মাদারী প্রভৃতি। প্রাচীন সুফীমত হইতে আধুনিক সুফী মতের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যাহাই থাকুক, সুফীর সাধ্য বস্তু প্রেমময় আল্লাহ্। ইসলামের তৌহিদ—আল্লাহর একত্ব ['লায়েলাহা ইল্লাল্লা'] সুফীমতেও স্বীকৃত। তৌহিদ বলে, খোদা এক এবং একমাত্র উপাস্য : খোদার দোসর নাই, তিনি 'লাশরীক'—তিনি নিরাকার বিশ্বস্রষ্টা। খোদার 'নূর' বা জ্যোতি হইতেই সৃষ্টির পয়দা। এই নূরের এক প্রকাশ 'নবী বা পয়গম্বর' ; তাঁহারা ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রেরিত পুরুষ। নবী বা পয়গম্বর কখনও ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের দাস বা দোস্ত সম্পর্ক। হযরত মহম্মদ (দঃ) শেষ নবী, তিনিও খোদা-দোস্ত। মানুষও ঈশ্বরের সৃষ্টি। 'আদম' জগতের প্রথম মানুষ। মানুষেরও

আরাধ্য ঈশ্বর। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইসলামের 'তৌহিদ' বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং তদনুসারে প্রেমময় আল্লাহর 'যেকের' অর্থাৎ স্মরণ, 'ফেকের' অর্থাৎ 'মনন', 'মুরাকেবা' অর্থাৎ ধ্যান, এবং 'মুশাহেদা' অর্থাৎ দর্শন—সুফীর সাধন। সুফীর স্মরণ-মনন-ধ্যান ও দর্শনের সহিত বেদান্তের সাধনের যোগ অতি অল্প; বরং উহার সহিত যোগ, বিশেষতঃ তান্ত্রিক যোগ এবং সহজ সাধনার সাদৃশ্য আছে। কারণ, দিব্য দৃষ্টির বলে আল্লাহর চিরন্তন অনুগ্রহ ও নৈকট্যলাভই হইল 'সুফীতরিকা' বা সুফী পন্থার উদ্দেশ্য ও নীতি। সুফীর জীবনব্যাপী সাধনা প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও তাঁহার সহিত মিলন। সুফীগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ এই দেহের মধ্যেই আছেন, দেহতত্ত্ব জানিলে তাঁহাকে জানা যায়, পাওয়াও যায়। সুফীদের ভিতর একটি অতি প্রচলিত বাণী আছে,—'মান্ আরাফা নাফছাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'—যে খুদকে জানে, সেই খোদাকে জানে। তাই সুফীদের তত্ত্বানুসন্ধান দেহের মধ্যে, তাঁহাদের যাত্রা মানব-কায়ার অন্তর-অনন্তের পানে: For the Sufis spiritual life became a journey (safar) along the road (Tariqua, Suluk) which led to the goal or union with God. The journey has many stages and each stage (Maquam) has its corresponding state (Hal)—achievement of certain virtues. For the traveller along the road there is a definite course of discipline which the adepts know. This knowledge (Marifat) however, is different from the ordinary knowledge (ilim , for this is the wisdom of the heart (ilim Ul Qutub) as the other one is the product of intellectual processes, and no one can acquire it without the special signs (Fawaid) of the grace of God (Faiz). The object of the knowledge is the attainment of cosmic consciousness, beatific vision, absorption in ecstatic union with the Truth.[১]

এখানে যে মিলনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আছে অতি সুখদ দিব্যদর্শন ও মিলন-জনিত অতি উল্লাসকর মগ্নতার কথা। ইসলামে ও সুফী মতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক ব্যাপ-ব্যাপক সম্পর্ক। 'কুল্লে সাইন মহিৎ'—ঈশ্বর সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন, ইহা কুরাণ শরিফের একটি মহাবাক্য। সুফীর আত্মদর্শন এই

১। Growth of Islamic thought in India—Dr. Tarachand-History of Philosophy Eastern & Western]

ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্পর্কের অববোধ ; এই জ্ঞান রহস্যময় দ্বৈতাদ্বৈতের জ্ঞান। ঈশ্বর 'লা শরীক'—তাঁহার অংশীদার নাই—এ জ্ঞান অদ্বৈত জ্ঞান ; কিন্তু মানুষ, নবী, বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি এবং তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরের প্রেমের সম্পর্ক—এইখানেই দুয়ের স্বাকৃতি, প্রেমের যোগ। বাউল গানেও এই প্রেমের যোগ।

(ii) বৈষ্ণব সহজিয়া: বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও দুয়ের স্বীকৃতি ও দেহতত্ত্বের প্রাধান্য। সহজিয়া মতে পরম 'এক' দুয়ের যুগল। সেখানেও মিলনে এক হইয়া যাওয়া নহে, রসাস্বাদনের কথা। যুগল প্রেমের পরমানন্দ স্বাদ লাভ করাই সহজিয়া মতে পার্থিব যুগল-সাধনার শেষ লক্ষ্য। শেষ স্তরেও যুগলবোধ লুপ্ত হইয়া যায় না। কারণ, দুয়ের অস্তিত্ব (তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্ব হইতে পারে) না থাকিলে রসের আস্বাদন হয় না। সহজিয়ারা বলেন,

মনের রতন বাহির না কর
যতন করিয়া রাখ।
বিরল পাইলে কপাট খুলিয়ে
নয়ান ভরিয়া দেখ॥ [চণ্ডীদাস]

বাউলের প্রেম-সাধনায় এই যুগলের প্রভাব কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনার কথা লইয়া কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। বাউলগণ পুঁথি ও পাণ্ডিত্যের বিরোধী। উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মুসলমান সুফী কবিরা 'প্রেমপন্থ যোগী' সম্পর্কে কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাউলদের মত ও পথের পরিচয় পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা', আলীরাজার 'জ্ঞানসাগর' ও আলাওলের কিছু রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাউলের মনের কথা ছড়াইয়া আছে তাঁহাদের মুখের গানে। কিন্তু এই সকল গান বহুদিন পর্যন্ত লোকের মুখেই ছিল। লোকের মুখে মুখে তাহা বিকৃত হইয়াছে, অনেক গান লুপ্তও হইয়া গিয়াছে। বাউল গানের সংগ্রহপ্রয়াস জাগ্রত হইয়াছে কবি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কিছু কিছু বাউল গান প্রকাশ করিয়াছেন। বাউল গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের উদ্যমও প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হারামণি' গ্রন্থখানি তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি।

এই সকল উপাদান হইতে বাউলের ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু এ ধারণা গঠনে একটু বিপদও আছে। কারণ সংগৃহীত বাউল গানে মুসলমানী পরিভাষা ও প্রচুর আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মুদ্রণ-

প্রমাদও সামান্য নয়। অনেকস্থলে অর্থভেদ করাই কঠিন। তাহা ছাড়া বাউলের বহু বিচিত্রিত পরিধেয় বস্ত্রের মত বাউলের ধর্মে নানা ধর্মের ছাপ পড়িয়াছে। উপনিষৎ, বেদান্ত, যোগ, তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, বৈষ্ণব প্রেমধর্ম, সহজধর্ম, সুফীমত প্রভৃতির প্রতিধ্বনি বাউল গানে দুর্লভ নয়। তবে সব কিছু মিলাইয়া এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, বাউলধর্ম মানুষকেন্দ্রিক প্রেমের ধর্ম, উহার সাধন প্রেম ও রহস্যময় যোগের পথে, উহার সিদ্ধি পরমানন্দে।

বাউলের সাধ্যবস্তু 'মনের মানুষ' : 'সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ বস্তু একজনা' [হারামণি, ৪নং গান]। এই মানুষ বাউলের 'কামধেনু', 'কল্পতরু' ; ইনি 'রূপের জ্যোতি', 'রূপের ফুল'—ইনি 'প্রেমরতন', 'পরশমণি', 'অমূল্যধন'। সম্প্রদায়ভেদে বাউলগণ এই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মুসলমান ফকির-দরবেশের দৃষ্টিতে ইনি 'লাশরিক আল্লাহ্', ইনিই 'নূর' (পরম জ্যোতি) ; বৈষ্ণব বাউলের নিকট ইনি পরপ্রেমিক কৃষ্ণ, বা সহজ মানুষ—কাহারও নিকট তিনি নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গ।

বাউল এই মনের মানুষের জন্য পাগল। তিনি কাছেই আছেন, আছেন এই দেহের মধ্যেই—কিন্তু 'অধরা' : 'আছে সে গুপ্তভাবে ব্যক্ত হয়ে'। তিনি সহজলভ্য নহেন বলিয়াই বাউলের সমগ্র জীবনটাই তাঁহার অনুসন্ধান। চিরজীবন ধরিয়া বাউল যাত্রী বা পথিক। তাঁহার বিরহ-দুঃখও নিঃসীম। বাউলগান দুঃখ-বেদনায় ভরা, ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে হৃদয়ের কান্না, অশ্রুর উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাউল এই দুঃখকে বরণীয় বলিয়াই মনে করেন, তাঁহারা বলেন,

সুখ-মর্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন্।
বন্ধ্যাজনে নাহি জানে প্রসব-বেদন ॥ [আলাওল]

তাই 'ফকিরী হালে' দুঃখের মূল্য অসীম। ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা বস্ত্র তাঁহাদের আদরণীয়। তাঁহারা বলেন, 'দুঃখের অন্তরে সুখ বিধি রাখিয়াছে' [জ্ঞান-সাগর][১]। এইজন্যই বাউলের প্রতিটি কথায় আক্ষেপ, সুরে উদাসকরা বৈরাগ্য। না-পাওয়ার বেদনাই সর্বাধিক। বাউলের দুঃখ-ব্রতে প্রেমের আসন অতি উচ্চে, কারণ তাঁহারা মনে করেন, "প্রেম দুঃখপন্থ'। প্রেম তো সহজ নয়, শুধু সুখের নয়—গাঙ্গা বিষ, তাহাতে বহ্নি-দহন। বাউলের তনু-মন এই অগ্নি-দহনে প্রোজ্জ্বল।

বাউলের প্রেমতত্ত্ব এক অপূর্ব সামগ্রী। বাউলের মনের মানুষ পরম প্রেমিক। বাউলগণ বিশ্বাস করেন, প্রেমরসে ডুবিয়াই প্রেমিক ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব জুড়িয়া প্রেমের আসন, বিশ্বের অণুতে-পরমাণুতে প্রেমের বন্ধন :

১। জ্ঞানসাগর—আলীরাজা [আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত]

প্রেমের আসনে জুড়ি আছে ত্রিভুবন।
প্রেমরসে বন্ধন আল্লার সিংহাসন ॥ [জ্ঞানসাগর]

সৃষ্টির মূল বৃক্ষ প্রেম। প্রেমেই জীবের জন্ম, প্রেম-বিহনে মৃত্যু : 'প্রেমমূলে জগতের জীয়ণ-মরণ'। আলীরাজা বলেন, 'প্রেম বিনু জন্ম নাই ভাব ক্রিয়া রস', আলাওল বলেন, 'ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ।' যে ফুলে প্রেমরূপ মধু থাকে, সেই ফুলেই মনের মানুষ রূপ ভ্রমর আসিয়া উড়িয়া বসে। তাই বাউল বলেন, 'অনুরাগের ঘরে জ্বালায়ে বাতি সাধনে মতি পাওয়া যায়' [হারামণি]। বাউলমতে 'সকল রসের মূল পিরীত-ভজন'।

প্রেমকে স্বীকার করিয়া লইয়া বাউল 'যুগল'কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যুগল ছাড়া প্রেম হয় না, রূপ ছাড়া রতির প্রকাশ ঘটে না। সৃষ্টিই যুগলের। 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থে এই যুগলের সুদীর্ঘ প্রশস্তি রহিয়াছে। ঈশ্বর প্রথমে একা ছিলেন, প্রেম জানাইবার জন্য তিনি দুই হইলেন, কারণ, 'একাএকি প্রেম না হএ কদাচন'। সৃষ্টির প্রথম যুগল 'ভাবক আর ভাবিনী' : লাশরিক আল্লাহ ভাবক, আর 'খোদা-দোস্ত' ভাবিনী। এই যুগলকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টিতে ভক্তি, ভাব ও প্রেমের প্রকাশ। যুগযুগ ধরিয়া যুগল প্রেমের মধ্যেই বিশ্বলীলা চলিতেছে : হর-গৌরী, রাধাকৃষ্ণ, সীতা-রাম, সন্ধ্যা-ব্রহ্মা, রোহিণী-চন্দ্র, ছায়া-সূর্য্য, হাওয়া-আদম, আয়েসা-মহম্মদ, জোলেখা-ইছুপ সকলেই যুগল। প্রকৃতি জগতেও যুগলে মিলিয়াই পূর্ণতা—বহ্নি-বায়ু, মাটি, জল, স্বর্গ-মর্ত্য দুয়ে মিলিয়া যুগল। এই যুগলের প্রেমে চন্দ্র বন্দী আকাশে, জল বন্দী সাগরে, মীন বন্দী জলে, ভ্রমর বন্দী কমলে : সর্বত্র যুগল, সর্বত্র যোগ। তনুর সহিত যুক্ত মন, মনের সহিত যুক্ত পবন। বাউল বলেন, 'নাহিক সিদ্ধির পন্থ এই যুগ বিনে'।[১]

যুগলতত্ত্ব হইতেই বাউলের যোগতত্ত্ব। যুগলে যুগল-সাধন করেন বলিয়াই বাউলের আর এক নাম 'যুগী' বা 'যোগী',

এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগিকুল।
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্বমূল ॥ [জ্ঞানসাগর]

বাউলের সাধনায় স্পষ্টতঃ দুইটি দিক রহিয়াছে—(১) প্রেম, ও (২) যোগ : প্রথম সাধন-পীঠ প্রেম, তাহার পর যোগ। দুইটি সাধনই দেহকে কেন্দ্র করিয়া। প্রেম বা যোগ 'দুই'কে লইয়া। এই যোগ হয় দেহে। দেহই যুগল-যোগের স্থান। দেহেই রূপ

১। ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় রাধাতন্ত্রে,
সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যা সহ তপোধন।
যোগং বিনা সুত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসিদ্ধির্ন জায়তে ॥ [রাধাতন্ত্র, ২য়পটল]

দেহেই 'যুগ'। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দুই প্রকার : সূক্ষ্মদেহ শূন্যাকার, স্থূলদেহ রূপাগার। সূক্ষ্ম শূন্য-দেহ অব্যক্ত, স্থূল রূপ-দেহ ব্যক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের প্রকাশ—'শূন্য সিন্ধু হৈতে ব্যক্ত রূপের সাগর'; আবার এই রূপ-কায়ার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম কায়া। আদি 'নূর' হইতে 'রূপ হইল নরের আকার'; আবার নর-দেহেই নূরের প্রকাশ। বাউল ধর্মে তাই দেহের শ্রেষ্ঠত্ব। দেহ মৃত্তিকার ভাণ্ড বটে, কিন্তু অমূল্য :

মৃত্তিকার ভাণ্ড বটে অমূল্য রতন।
মৃত্তিকার ভাণ্ড মূলে আছে নিরঞ্জন॥ [জ্ঞানসাগর]

মানব ও মানব-দেহ তাই প্রিয়। বাউল মানব প্রেমিক। তাঁহারা বলেন,

আপনার ভাণ্ড ছেড়ে
কেন খুঁজে বেড়াও জগৎজুড়ে?
আপনার ভাণ্ড খোঁজ রূপস্বরূপে দেহ মাঝ
যাতে প্রেমের অঙ্কুর হয়। [হারামণি ৭৫ নং]

তাঁহারা জানেন, যেমন সুফীরা জানেন, 'ইশ্‌কে মজাজী (মানবীয় প্রেম) শেষে ইশ্‌কে হকিকী (ঐশী প্রেম) হয়' [মনসুর উদ্দীন]।

প্রেমিক বাউলের যাত্রা তাই দেহ-রূপকে কেন্দ্র করিয়া। স্থূল রূপকে আশ্রয় করিয়াই আছে অরূপের রূপের ঝলক। রূপের পদ্মেই অরূপের প্রেম-মধু। 'যার হৃদয়ে এই প্রেমের পরশ লাগ্‌ল, সে ত হল বাউল। রূপের ঔজ্জ্বল্য প্রেমিককে হাজারধার ছুরিকাঘাতে কতল্‌ করল। একবার যার চোখে লাগল রূপের মাধুরী, সে হল দিওয়ানা। তাকে ভুলে থাকা কি সম্ভব? বিশ্বভুবন তার রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল :

সেই কি পাসরিতে পারে,
সেই কি ঘরে রইতে পারে জীবন থাকিতে?
লেগে গেছে রূপ যার নয়নে।'[১]

প্রেম সাধনায় দেহই যেমন আশ্রয়, যোগসাধনাতেও তেমনই দেহই প্রধান আশ্রয়। যোগের ব্যাপারে বাউলের সহিত তন্ত্রের বিচিত্র যোগ। তান্ত্রিকের মত বাউলও বলেন, 'আন্ত অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।' যে-কোন যোগপন্থ সাধকের এই মত—কি তান্ত্রিক, কি বৌদ্ধ সহজিয়া, কি সুফী, কি বৈষ্ণব সহজিয়া। দেহস্থ ষট্‌চক্র (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) এবং সহস্রার কমল,

১। 'ধানের মঞ্জরী'—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ।

তিন নাড়ী (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) এবং বিবিধ বায়ু (প্রাণ-অপানাদি) তন্ত্রের বিষয়। সুফী ধর্মেও দেহের মধ্যে 'ছয় লতিফা' বা ছয়টি আলোক কেন্দ্রের কল্পনা আছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, উহা তন্ত্র হইতেই গৃহীত। বাউলগণ নিরক্ষর, মূর্খ হইলেও এই সকল দেহতত্ত্বের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় তাঁহাদেরও অজানা নয়। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে মিলাইয়া দেখিলে চক্রের নাম ও স্থান অনেক ক্ষেত্রেই মিলে না, কিন্তু যোগ-পদ্ধতি যে এক, প্রক্রিয়া যে এক—তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সাক্ষর ব্যক্তিগণ এক প্রকার রূপ ও রূপকে যাহা বলিয়াছেন, নিরক্ষর জনগণও তাহাই বলিয়াছেন লোকজগতের রূপ ও রূপকের মাধ্যমে। তাঁহাদের সহজ ভাষা, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাও সহজ।

কায়া-সাধনই বাউলের সূক্ষ্মসাধন বা সূক্ষ্ম যোগ। এই যোগে তন্ত্রের প্রভাব গুরুতর।

(i) তন্ত্রে বলা হইয়াছে, যতক্ষণ বায়ু বা মন ইড়া-পিঙ্গলায় বিচরণ করে, ততক্ষণ মন অস্থির : সুষুম্নামার্গে বায়ুকে চালিত করিয়া মনকে স্থির করিতে পারিলে, সত্য লভ্য হয়। বাউলগণও বলেন,

> একদম হাওয়ায় চলে একদম ঘুরছে কলে
> আর একদম সত্য হলে অনায়াসে মিলে। [হারামণি. ৬৮]

(ii) বায়ুর জোয়ার ভাটা বুঝিয়া মনকে সুষুম্না বর্ত্মে ঊর্দ্ধপথে চালনা করিতে হয়। তান্ত্রিক 'ভূতশুদ্ধি' বা কুণ্ডলিনী যোগ' এই প্রক্রিয়া লইয়া। বাউলেরা ইহাকে বলেন, 'পলটুযোগ' বা 'উল্‌টাসাধন'। বাউলমতে উল্‌টাসাধনের নানা অর্থ। যোগীর ভোগ, আচার, আচরণ—সবই উল্‌টা। যোগীরাও ভোগ করেন, সে ভোগ সাধারণ মানুষের মত নয়। তাঁহারা দিনে ঘুমান, রাত্রে জাগেন—তাঁহাদের পিরীতি 'পল্‌টা পিরীতি' (অর্থাৎ স্বকীয়ার সঙ্গে নয় পরকীয়ার সঙ্গে)—তাঁহাদের 'কাকড়-মাকড়' যোগও রহস্যময়, গুহ্য ও জটিল। বাউল সাধনায় সর্বত্র এই 'উল্‌টা'র প্রশংসা। দেহে যে গাছের কল্পনা করেন, তাহারও 'উল্টা গঠন' :

> উলট্‌গাছের ডাল ছাড়া পাতা,
> আসমানে তার গাছের গোড়া জমিনে তার ডাল—
> রে ক্ষেপা জমিনে তার ডাল।
> গাছের মূলে গেলে রত্ন মিলে
> অখণ্ড গোলকধাম। [হারামণি. ২১১]

'উল্‌টা সাধনেরই আর এক রূপক 'উজান বাওয়া',

উজান স্রুতে নৌকা দিতে
কত সাধু বসে ভাবছেন ভাই,
ধার চিনে ধার ধরতে পারলে,
তার নৌকা কি মারা যায়? [হারামণি. ২৪১]

(iii) সুষুম্নামার্গে এই উল্‌টা পথেই দেহস্থ চক্র বা পদ্ম। শাক্তের মহাশক্তি এই পথে চক্রে চক্রে বিচরণ করেন। বাউলের 'মনের মানুষ'ও পদ্মে পদ্মে সঞ্চরণশীল। বাউল কখনও বলেন,

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায়রে।
ও ধারার সনে আছে মানুষ ধরো সে ধারায় রে। [হারামণি. ২৭৮

আবার কখনও বলেন,

দুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে,
লুকিয়ে রোল কে রে! [হারামণি, ২১৪]

(iv) তন্ত্রে দেহের ভিতর সূক্ষ্ম নাদ-বিন্দু ধারণার উপদেশ আছে। হয় জ্যোতির আকারে, না হয় ধ্বনির আকারে দেহমধ্যে মহাশক্তি বিরাজ করেন। বাউল গানে বহুস্থলে এই রূপ ও নাদের প্রসঙ্গ। রূপকে তাঁহারা বলেন 'ফুল'। দেহের রূপ-নগরে বা রূপ-সরোবরে ফুলের আকারে রূপের ছটা:

একটি ফুল ফুটেছে কদম গাছে
যমুনা আলো করে।...
সেই ফুল দিনে দেখা যায় জগৎ লুকায়
আর দেখা যায় হৃদ্‌মাঝারে। [হারামণি ২৭]

সুফীগণও মনে করেন, নূর (=জ্যোতি) হইতে সৃষ্টি পয়দা। মানুষের দেহঘরেও এই নূরের খেলা। দেহের রূপ-নগরে এই নূর বা জ্যোতি, দেহের রূপ-সরোবরেও ফুলরূপে এই জ্যোতি, দেহ-কুঞ্জে উল্‌টা গাছের কুসুম রূপেও এই জ্যোতি। সে জ্যোতি—

'আঁধার পসর করে শরীর মাঝার॥' [জ্ঞানসাগর]

বাউল এই জ্যোতির ধ্যানে তন্ময়। চরম প্রাপ্তিতে এই জ্যোতির তরঙ্গে মগ্নতা।

(v) তন্ত্রের নাদতত্ত্ব বাউলদের ভিতর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শক্তি নাদরূপিণী। নাদের চারিটি অবস্থা—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। বৈখরী স্থূল নাদ—উহা মানুষের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনি। এই স্থূল ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম বা পরানাদকে ধারণা করা যায়। বাউলগণ নিজেদের গান সম্পর্কে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রের এই নাদধারণার প্রভাব অতি গভীর। বাউল বলেন, 'মধুর সুস্বর তান প্রাণের

আহার' [তোহ্‌ফা—আলাওল]। মনের খাদ্য গীতধ্বনি, গান মনের আনন্দ ও তৃপ্তি। গানই বাউলের সর্বস্ব। গানেই বাউলের জিজ্ঞাসা, গানেই বাউলের তর্ক, উত্তর, মীমাংসা। সুখেও গান, দুঃখেও গান। গান মহামন্ত্র—'মহামন্ত্র গান যন্ত্রতত্ত্ব ব্রহ্মনাম'। বাউল বলেন, তনের অন্তরে মন, মনের অন্তরে জ্যোতি, জ্যোতির অন্তরে ধ্বনি। সে ধ্বনির নাম 'অনাহত'। কমলকলির মত যে দিল্‌ (হৃদয়), তাহার মূলে এই ধ্বনি উঠে; তাহাতে কখনও নূপুরের শিঞ্জন, কখনও বা মুরলীরব। ইহা 'ঋতের ঝঙ্কার'। গান 'ঋত', গান পরম সত্য। দেহস্থ চক্রে চক্রে এই ঋতের ঝঙ্কার উঠিতেছে :

চক্রমূলে বংশী ফুকারে ষষ্ঠ ঋত।
তবে চক্রমূলে বাজে সব যন্ত্রগীত ॥ [জ্ঞানসাগর]

হৃদয়স্থ কমলকলির অন্তরে এই যে ধ্বনি, কলি বিকশিত না হইলে সে ধ্বনি জাগে না। তাই আগে চাই কমল-কলির বিকাশ, মুদ্রিত দলের প্রস্ফুটন। পদ্ম দল মেলিলেই সুগন্ধি মাধুরী ছড়ায়, অলি গুঞ্জরিয়া উঠে। যিনি সত্যের ধ্যানে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরেই ধ্বনির জাগরণ, তাঁহার কণ্ঠেই গান। গান সত্যের ঋতম্ভরা বাণী। ইহাই বাউলগানের মূলতত্ত্ব সহজ ও সংহত ভাষায় ইহা গভীর সত্যের দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়'।[১]

বস্তুতঃ বাউলের গান অগভীর কোন আবেগের প্রকাশ নয়, ইহা অনুভূত সত্যের মূর্ত প্রকাশ, সিদ্ধ-সাধনার বিভূতি—ইহা প্রস্ফুটিত কমলে 'ঋতের ঝঙ্কার'। জ্ঞান-ধ্যান শুদ্ধ না হইলে এ গান জাগে না :

জ্ঞান-ধ্যান শুদ্ধ যে করে তত্ত্বমূলে।
অবশ্য নিঃসরে গীত হৃদয়-কমলে ॥ [জ্ঞানসাগর]

ধ্যানে দেহে ধ্বনির কম্পন অনুভূত হয়। তখন ধ্বনির প্রকাশে কাঁপে তনু, কাঁপে মন, কাঁপে কণ্ঠ। সুরে সুরে প্রকাশিত বাউল গান দেহস্থ কমল-কলিতে উত্থিত নাদের বহিঃপ্রকাশ। নাদ-গীত সম্পর্কে বাউলের এই যে তত্ত্ব, ইহা তন্ত্রেরই তত্ত্ব। তন্ত্র বলে, কুলকুণ্ডলিনী মত্ত অলির ন্যায় যে মধুর কূজন করেন, তাহাই কাব্য-গীতির মূল :

কূজন্তী কুলকুণ্ডলিনী মধুরং মত্তালিস্ফুটম্‌।
বাচঃ কোমল কাব্যবন্ধ রচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ ॥ [ষট্‌চক্রনিরূপণ]

(vi) বাউলের গুরুবাদেও তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। গুহ্য সাধন সংক্রান্ত যাবতীয়

১। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' হইতে উদ্ধৃত।

বিষয় গুরুমুখী। এইজন্য রহস্যময় সাধনায় গুরু নিত্যসঙ্গী। বাউলগণ মনে করেন, সেহেতু 'অধরা'কে গুরুই ধরিয়া দিতে পারেন,

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে
অমূল্যধন সেই সে হাতে পাবে। [লালন]

গুরু সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি মানুষরূপে স্বয়ং নিরঞ্জন। গুরু যে 'মন্ত্রের মন্তরী', 'তন্ত্রের তন্তরী', 'যন্ত্রের যন্তরী', গুরুরূপে তিনিই নিরূপ-মানুষ:

গুরুরূপে যে দিয়েছে নয়ন,
সে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
গুরুরূপে সেই নিরাঞ্জন। [হারামণি. ২৩]

তাই বাউলের উপদেশ,

আগে মুর্শিদ ধর জেনে শুনে।
রূপের জ্যোতি জালিয়ে বাতি
গুরুর রূপ ধিয়ানে॥ [হারামণি. ৩]

বাউলধর্মে গুরু-শিষ্য একতনু, একমন। শিষ্যের অন্তরে গুরুরূপের ঝলক। ভালমন্দ যা সবই গুরু। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কও অতি রহস্যময়। কারণ গুরু যে প্রেমেরও গুরু, রসের সঙ্গী। তিনি মহাভাবের মানুষ। বাউল ধর্মে যে যুগলের ও যুগলভজনের এত প্রশস্তি, যাহার সম্পর্কে বাউল বলেন, 'নাহিক সিদ্ধির পন্থ এই যুগ বিনে', সেই যুগের প্রথম যুগল গুরু-শিষ্য: 'রূপ গুরু আনল সেবক হএ প্রেম' [জ্ঞানসাগর]। এই যুগল প্রেম হইতে মহাপ্রেমের বিকাশ হয়। এ যেন আগুনের পরশমণি। শিষ্য সেই প্রেম লইয়া মহাপ্রেমের সন্ধানে যাত্রা করেন। তাই বাউলের প্রেম-সাধনায় কিংবা যোগ-সাধনায় গুরু অপরিহার্য।

তন্ত্রসাধনা লোক-জগতেরই সাধনা, বাউল ধর্মেও তাই তন্ত্রের এত প্রভাব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, বাউলের অনুরাগ-তত্ত্ব বৈষ্ণবধর্ম ও সুফীবাদ হইতে গৃহীত। বাউলের রসাস্বাদনের পদ্ধতিও বৈষ্ণবীয় রসাস্বাদনের অনুরূপ। উপনিষদের 'সোঽহমস্মি', বা তন্ত্রের 'শিবোঽহম্' তত্ত্বদ্বারা উহার ব্যাখ্যা না করাই সঙ্গত।

ছ. বাংলাদেশ ও তন্ত্রসাধনা

অনেকেই বলেন, তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান গৌড়বঙ্গভূমি: 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। উক্তিটিকে সত্য মনে করিবার কারণও আছে। বাঙালী 'মা-পাগল' জাতি। মাতৃ-উপাসনা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও উহা এই দেশেরই একটি

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর দীক্ষা, পূজা-অর্চনা, আচার-আচরণ ও লোকব্যবহার তন্ত্রপুষ্ট। এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম—বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়া, শৈবধর্ম ও বাউল মত তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট। সমাজের নিম্নস্তরে তো বটেই উচ্চস্তরেও শক্তি-সাধনার প্রভাব গুরুতর। পুরাণ প্রসিদ্ধ একান্নটি শাক্তপীঠের ভিতর অনেকগুলি—করতোয়া, কালীঘাট, চট্টল, ক্ষীরগ্রাম, ত্রিপুরা, নলহাটি, বক্রেশ্বর ও অট্টহাস প্রভৃতি বাংলাদেশে অবস্থিত। শক্তির প্রচলিত মূর্তিগুলির মধ্যে কালী বাঙালীর নিজস্ব। গ্রাম-বাংলার স্থানে স্থানে কত যে বিচিত্র শক্তি-মূর্তি, কত যে বিচিত্র শাক্তপীঠ আছে, বাংলাকাব্যের 'দিগ্‌বন্দনা' অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্গভীমা, কিরীটেশ্বরী, বিশালাক্ষী, বুড়ীমা, রঙ্কিণী প্রভৃতি শক্তিদেবতা বাঙালীর শাক্তপ্রীতির পরিচয় বহন করে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ বেদাচারভ্রষ্ট মাতৃ-তান্ত্রিক মানুষের বাসস্থানরূপে পরিগণিত। আচারভ্রষ্ট হইয়া ঋষি দীর্ঘতমা এই দেশেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন; অভিশপ্ত দস্যুভূয়িষ্ঠ বৈশ্বামিত্রদেরও নির্বাসন-স্থান বঙ্গদেশ। তারা-সাধক বসিষ্ঠাদি মুনির কথা বাদ দিয়াও দেখা যায়, গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই দেশে মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর, সাধক চন্দ্রশেখর, চাঁদরায়-কেদার রায়ের গুরু রত্নগর্ভ, মিতরার অর্দ্ধকালীবংশের প্রবর্তক রাঘবরাম, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও পাগল বামাক্ষেপার মত বিভূতিসম্পন্ন শক্তিসাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। মাতৃভাব বাঙালীর মজ্জাগত। যুগপ্রাচীন এই শক্তি-সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে সংস্কৃতে ও বাংলায় বিপুলায়তন শাক্তসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশে রচিত মূল তন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। বাংলার চর্যাগান, নাথ-সাহিত্য, সহজিয়া বৈষ্ণবপদাবলী ও বাউলগান তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। এগুলি ছাড়া বাংলায় আরও কিছু শাক্ত সাহিত্য আছে, সেগুলিতে শক্তি-সাধনার বিভিন্ন ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।

শক্তি-সাধনা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু প্রাচীনকাল হইতে বাংলাদেশে শক্তি-সহায়ে গুহ্য বীরভাবের সাধনা প্রচলিত ছিল। সেন আমলে শাক্ত সাধনায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় বীরাচারী সাধনা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। সিদ্ধ সাধকদের মধ্যে ইহার প্রভাব কোন কালেই কম ছিল না।

বৈষ্ণবধর্মের প্রাদুর্ভাবকালেও যে বিচিত্র বীরাচার প্রচলিত ছিল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তম বিলাস, ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সাধনার সঙ্কেত অতি গোপনীয়। সাধন-প্রণালীও রহস্যময় ও গুহ্য; এইজন্য বীরাচার শক্তি-সাধনা লইয়া বহুকাল ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। একমাত্র বাংলা কালিকামঙ্গল কাব্যে এই সাধনার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে পশ্বাচার প্রাধান্য লাভ করায় বর্ণহিন্দুদের ভিতর সাধারণভাবের শক্তি আরাধনাই প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধারণ শক্তি-আরাধনা মানে ধাতু-পাষাণ-মাটির প্রতিমায় সাড়ম্বরে নৈবেদ্য, বলি ইত্যাদি উপচারে শক্তিপূজা। এই পূজাগুলির মধ্যে প্রধান দুর্গোৎসব। ইহা এক প্রকার পৌরাণিক পদ্ধতির পূজা। রামচন্দ্রের অকাল-বোধনকে কেন্দ্র করিয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। 'রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ'-দেবীর অকালবোধনের এই কথা কোন প্রাচীন পুরাণে না থাকিলেও কালিকাপুরাণে ও দেবী ভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ আছে। কৃত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলা রামায়ণে, বিশেষতঃ অদ্ভুত রামায়ণে (জগদ্রামী বা রামপ্রসাদী রামায়ণে) এই অকালবোধন উপলক্ষ্যে পঞ্চরাত্র বা নবরাত্র দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'চণ্ডীসপ্তশতী', দেবী ভাগবত ও কালিকাপুরাণের অংশ বাংলায় অনূদিত হয়। এইগুলিই বাংলার পৌরাণিক দেবীমঙ্গল-কাব্য। এগুলিতে একদিকে আছে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের বর্ণনা এবং সেই প্রসঙ্গে পৌরাণিক দেবীমাহাত্ম্য; অপরদিকে আছে নবরাত্রকল্প বা পঞ্চরাত্রকল্প দেবীপূজার বিধান। পূজাপদ্ধতি সাধারণ পশুভাবের। বাংলার শাক্ত সাহিত্যে এগুলির স্থান নগণ্য নয়, সংখ্যাধিক্যও বিপুল। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পিতাম্বর দাসের 'মার্কণ্ডেয় কথা', দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল', রামশঙ্কর দেবের 'অভয়ামঙ্গল' এবং বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের 'দুর্গাসপ্তশতী'। এগুলি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুকরণে রচিত। দেবীভাগবতাদি অবলম্বনে দেবীলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এই সকল কাব্যে—দুর্গাপঞ্চরাত্রি—জগৎরাম, দুর্গাপুরাণ—মুক্তারাম নাগ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী—দ্বিজ রামনিধি, গৌরীমঙ্গল—পৃথ্বীচন্দ্র, দুর্গামঙ্গল—রামচন্দ্র মুখুটি এবং কালী কৈবল্যদায়িনী—নন্দকুমার কবিরত্ন।

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে লৌকিক দেবীমঙ্গল কাব্যদ্বারা। লৌকিক মঙ্গলকাব্যোৎপত্তির একটি ইতিহাস আছে। বাংলাদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে অপাংক্তেয় সমাজ ও মহিলামহলকে আশ্রয় করিয়া একধরনের লৌকিক দেবদেবীর ব্রত ও পূজা প্রচলিত ছিল: এই ব্রতপূজার উপাস্য দেবতা মঙ্গলচণ্ডী, মনসা বা ডাকিনী জাতীয়া দেবতা। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে ইঁহারা অপরিচিত ও অবহেলিত ছিলেন। 'ডাইনীকল্প'ও নিন্দনীয় ছিল। কেহ মনে করেন, এই সকল দেবতা অনার্য দেবতা, কেহ কেহ বলেন—বৌদ্ধ দেবতা। কারণ ইঁহাদের পরিচয় প্রাচীন কোন পুরাণে নাই। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিকট ইঁহারা অবজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ-

চতুর্দশ শতকে নববিশ্বেৎ। মুসলমানদের আত্মকলহে ও অত্যাচারে যখন লক্ষ্ণৌতি, সপ্তগ্রাম, সোনার গাঁ 'বাদ ‍'কপুরে' (বিবাদপুরীতে) পরিণত হইয়াছিল, তখন সেই দুর্যোগের সুযোগে লৌকিক চণ্ডী ভয়হারিণী ও মঙ্গলকারিণী দেবতারূপে বর্ণহিন্দুসমাজে পরিগৃহীতা হইয়াছিলেন এবং পুরাণের আত্তাশক্তি মহিষমর্দ্দিনী দেবীর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন ['মূর্তিভেদেন সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী'] ; ইনিই 'মঙ্গলচণ্ডী'—লৌকিক মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতা। 'বিজুবনে' ইনি সিংহবাহিনী, কালীদহে 'কমলেকামিনী'। মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা এই দেবীরই কায়বূহ, তাঁহারাও মূলশক্তি হইতে অভিন্না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই দেবীসত্ত্বকে লইয়া অসংখ্য চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, ও শীতলামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এই সকল কাব্যে দেবীর মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে দেবীসত্ত্বেব যে মানবলীলা ও পূজাপদ্ধতি এবং মন্ত্রশক্তির যে অলৌকিক ক্ষমতার কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর শাক্ত সংস্কার ও বিশ্বাসের একটি দিকের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবতা ও পূজাপদ্ধতির উপর যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রলেপ মাখাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি উহাদেব অন্তরালে শক্তির আদিমতম রূপ ও শক্তিপূজার আদিমতম পদ্ধতি লক্ষণীয়। বৃক্ষে, প্রস্তরে ও তির্যক প্রাণীতে দেবসত্তার কল্পনা প্রাগার্য জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যেব মঙ্গলচণ্ডী কোথাও বনদেবতা, কোথাও বর্তুলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড—মনসাদেবীর অধিষ্ঠান কেয়াপাতে বা সিজবৃক্ষে, পঞ্চফণ সর্পরূপেও তিনি প্রপূজিতা ['পঞ্চনাগের মা জয়দেবী মনসা'] ; এই সকল দেবতার পূজাও আড়ম্বরহীন, পূজা 'অষ্টদূর্বাতণ্ডুলে', প্রার্থনা 'চৌতিশাস্তবে'। বাংলা দেবীমঙ্গল কাব্যের 'চৌতিশা স্তব' (চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের এক একটিকে আদ্যক্ষর করিয়া যে স্তব) শক্তিসাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা প্রকৃতপক্ষে স্থূল বর্ণাত্মক ধ্বনি অবলম্বনে সূক্ষ্ম নাদ ধারণা করিবার ইঙ্গিত। 'দেবী বর্ণময়ী প্রোক্তা'—কারণ, নাদশক্তির প্রকাশ অক্ষরবর্ণে ; এইজন্য শক্তিপূজায় অঙ্গে অঙ্গে বর্ণন্যাস। ইহাদ্বারা সাধক নিজদেহকে শক্তিময় বা বর্ণময় করিয়া তুলেন। চৌতিশা স্তবে একসঙ্গে ন্যাস, ধ্যান ও প্রার্থনাব কাজ হয়। বর্ণ-পুটিত এই স্তবের পরিকল্পনাটি অভিনব এবং উহার শক্তিও অসাধারণ।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥ লৌকিক মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গল। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত : দেবখণ্ড (দেবীর পৌরাণিক লীলা), আখেটি খণ্ড (ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী) এবং বণিকখণ্ড (ধনপতি-শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান)। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই—তবে মালদহের কবি মানিক দত্তকে

(পঞ্চদশ খ্রীঃ) গীতপথের পথিকৃৎ বলা হয়।[১] কাব্যখানি মানিক দত্তের 'দাঁড়া' (বাঁধা পালা) নামে পরিচিত। এই কাব্যে লোক-সংস্কারের প্রভাব লক্ষণীয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম (১৫৭৭): বাঁকুড়ার ভূস্বামী রঘুনাথ রায়ের অনুজ্ঞায় তিনি এই কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরামের শাক্তাচার প্রধানতঃ বৈষ্ণবাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। উমাপদে তাঁহার মতি 'গোবিন্দ ভকতি'র উদ্দেশ্যে। তাঁহার অভয়া দুর্গা 'গোকুল রক্ষিণী জয়া যশোদানন্দিনী', তিনি বিষ্ণুমায়া। চৌতিশা স্তব ব্যতীত দেবীর পূজাপদ্ধতিও পৌরাণিক। খুল্লনার চণ্ডী পূজায় কিছুটা লোক-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়: 'ধূপ দীপ নানাবিধ নৈবেদ্য পাচলা, খুল্লনা পূজেন ঘটে শ্রীসর্বমঙ্গলা'। দেবী-পূজায় তন্ত্রাচারের কিছুটা প্রভাব দেখা যায় পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজমাধবের কাব্যে (১৫৭৯)। কবির চণ্ডী 'যন্ত্রিকাদেবী যন্ত্রস্বরূপা': পূজায় বীজাক্ষর স্মরণের ইঙ্গিতটিও তাৎপর্যপূর্ণ। খুল্লনার দেবীপূজার পদ্ধতি আড়ম্বরহীন, তাহাতেই দেবীর তুষ্টি: 'অঙ্গ শুচি হইয়া রামা করয়ে দেবার্চা, সাক্ষাতে হইল ভানে দেবী দশভূজা।' দ্বিজমাধবের কাব্যে দেবীর মঙ্গলচণ্ডী নামের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, 'মঙ্গল দৈত্যে বধি মাতা হৈলা মঙ্গলচণ্ডী'। মঙ্গলচণ্ডী নামের এই ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত আরও দুইখানি কাব্যে—দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' (১৬৪৯) এবং মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' (১৭৭৪)। মুক্তারামের কাব্যে দেবী 'নব কাদম্বিনী কালী'রূপে শ্রীমন্তের মশানে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই কাব্যে অসুর-রুধিরে রঞ্জিত শ্যামার রসকেলির বর্ণনাটিও অভিনব। দেবীর পূজাও তন্ত্রাচারে,—'মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া পূজে তন্ত্রের বিধানে।' আরও বহু কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন; দ্বিজ হরিরামের 'অম্বিকামঙ্গল' (সপ্তদশ), গঙ্গাধর দাসের 'কিরীটি মঙ্গল' (১৭৬৪) ও ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা (১৭৭৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে যে শক্তিপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট। এখানে শাক্তাচার পশুভাবের অনুরূপ।

॥ মনসামঙ্গল ॥ শক্তি-সঙ্ঘের অন্যতমা দেবী মনসা। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মনসা-মন্ত্রে সিদ্ধ মন্ত্রী ধন্বন্তরী সদৃশ। মনসার নামভেদ—বিষহরি, পদ্মা, কেতকা ও জগৎগৌরী। এই সকল নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদে বিষ-অপনয়নের মন্ত্র আছে: ঋগ্বেদের খিলসূক্তে অজগর, কালিক, কর্কোটক প্রভৃতি সর্পের নাম পাওয়া যায়। অন্য একটি খিল সূক্তে জরৎকারু, জরৎকন্যা ও আস্তীকের নাম

১। মানিক দত্তেরে আমি করিলুঁ বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥ [কবিকঙ্কণ]

আছে। বাংলায় লোক-সমাজের মনসা এই জরৎকারুর সহিত যুক্ত হইয়া দেব-মর্যাদা লাভ করিয়াছেন: এখানে তিনি স্বয়ং ভগবতী—'যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি'। এই দেবমর্যাদা লাভ করিতে দেবী মনসাকে যে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, বাংলা মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনীতে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এ কাহিনীও কোন সংস্কৃত পুরাণে নাই। বাঙালী আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া চাঁদবেনের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সতী বেহুলার কাহিনী রচনা করিয়াছে। প্রত্যেকটি মনসা মঙ্গল কাব্য বীর ও করুণরসের যুক্তবেণী। মনসামঙ্গল নামটি বেশি প্রাচীন নয়: প্রথম দিকের কাব্যগুলিকে বলা হইয়াছে পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান। মনসা শক্তি-তত্ত্বের দেবতা; তিনি সর্পের মতই ক্রূরকুটিলা। কিন্তু এই বিভীষণ দেবতার অন্য একটি দিকও আছে—বিষনয়নী দেবী অমৃতনয়নাও বটেন। অমৃতনয়নে যখন তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহা অশেষ কল্যাণ-মঙ্গলের আকর হইয়া উঠে। মনসার এই শক্তিই তাঁহাকে মঙ্গলদেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্পভয়-ভীত মানুষ ভয়েই এই দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছে।

বাংলাদেশে শতাধিক কবি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছেন। যদিও কাব্যের দিক হইতেই মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠত্ব, তথাপি শক্তিসাধনার কতকগুলি দিক হইতেও ইহার মূল্য কম নয়। বিষ-ঝাড়ানের মন্ত্রগুলিতে তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় রহিয়াছে। চাঁদের 'মহাজ্ঞান', হংস-পবনের যোগ প্রভৃতিও তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত' (চতুর্দশ শতক) বলিয়া প্রসিদ্ধি। কিন্তু হরিদত্তের রচনার কয়েকটি ছিন্ন অংশ ব্যতীত আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও আসামে 'সুকবিবল্লভ' নারায়ণ দেবের নাম বহু বিখ্যাত। বরিশাল ফুল্লশ্রী গ্রামের প্রসিদ্ধ কবি বিজয় গুপ্ত (১৭৯৪): 'সোনার খাটে বৈসে দেবী রূপার খাটে পা'—এই সকল বর্ণনায় রূপকথার প্রভাব আছে। নাদুড্যা বটগ্রামের বিপ্রদাস চক্রবর্তীর (১৫৯৩) কাব্যও প্রাচীন। এই কাব্যে বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রে 'কামরূপা চন্দ্রসূর্য', 'হংস' ও 'মন-পবন'এর উল্লেখ লোক-প্রচলিত তান্ত্রিক যোগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মনসামঙ্গলের খ্যাতিমান কবি বর্ধমানের কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ (সপ্তদশ)। কবি কেতকা বা মনসার দাস, তাই নাম কেতকাদাস। ক্ষেমানন্দের কাব্য রচনা-গৌরবে উৎকৃষ্ট: পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এই কাব্যের যথেষ্ট সমাদর। অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বীরভূমের বিষ্ণুপাল (সপ্তদশ), গৌড়ের কালিদাস (১৬৯৭) ও উত্তরবঙ্গের কবিদ্বয় জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয় (১৭৪৪)। মনসা মঙ্গলের সংগ্রহ গ্রন্থও পাওয়া যায়, উহাকে 'বাইশা' বলা হয়। 'বাইশা'য় একই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা একত্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পালার রূপ দেওয়া হয়।

॥ **ষষ্ঠী ও শীতলামঙ্গল** ॥ ষষ্ঠী ও শীতলা দেবীও শক্তিব্যূহের দেবতা। লোক-সংস্কৃতিতে শক্তিদেবীর মহিমা যে কি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বাংলার এই অবান্তর মঙ্গল কাব্যগুলি তাহার প্রমাণ। শক্তির প্রভাব দিগন্তপ্রসারিত। বৃক্ষে, শৈলে, সরিতে, সরোবরে, পথের চৌমাথায়, গৃহের আনাচে কানাচে কোথায় তিনি নাই! জাতহারিণী দেবীরূপে শক্তি, শিশুর রক্ষাকর্ত্রীরূপে শক্তি, রোগদাত্রীরূপে শক্তি, রোগ মুক্তিরূপে শক্তি। তিনিই ভয়, তিনিই অভয়। বাঙালীর অস্থিমজ্জায় এই বিশ্বাস সংক্রামিত। তাই বাংলায় শক্তিদেবতার এত সংখ্যাধিক্য। ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, শুভচণ্ডী (সুবচনী), বনবিবি—কত যে শক্তিদেবতা, সংখ্যা করিবে কে? ষষ্ঠী ও শীতলা দেবীও মাতৃকাশক্তি। অবশ্য ষষ্ঠী দেবী প্রাচীন। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালের হইলেও বাংলার লোকসমাজে বিশেষতঃ মহিলা-মহলে ষষ্ঠীদেবীর প্রতিষ্ঠা সুচিরকালের। মহাভারতে, ভবিষ্য পুরাণে ও দেবীপুরাণে ষষ্ঠীপূজার প্রসঙ্গ আছে। কানিংহাম প্রদত্ত Archiological Reports Vol. iii হইতে জানা যায়, মদনপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে একটি ষষ্ঠী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ষষ্ঠীর কল্পনায় স্কন্দমাতা ষট্‌মাতৃকার প্রভাব আছে। স্কন্দের বরে তাঁহারা প্রধান দেবীসঙ্ঘে উন্নীত হইয়াছিলেন [মহা. বন. ১৯০]। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও ষষ্ঠীদেবী পরাশক্তি হইতে অভিন্না। বাংলায় কৃষ্ণরাম দাস (সপ্তদশ), রুদ্ররাম চক্রবর্তী প্রভৃতি ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠীদেবী প্রধানতঃ শিশুর রক্ষাকর্ত্রী।

বসন্ত-বিস্ফোটকের দেবী শীতলাও 'শঙ্কর-গৃহিণী শৈলসুতা'। শীতলা মঙ্গলের অন্যতম কবি কৃষ্ণরাম দাস (সপ্তদশ)। স্কন্দপুরাণে শীতলাদেবীর ধ্যান আছে।[১] বাংলাদেশে শীতলা-সেবকদের শীতলা পণ্ডিত বলে। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই এই দেবীর ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয়।[২]

॥ **কালিকামঙ্গল** ॥ পূর্বেই বলিয়াছি বাংলাদেশে বীরাচার শক্তিসাধনার একদিন যথেষ্ট প্রসার ছিল। কালক্রমে ইহার উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আঘাত লাগিয়াছে; বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানে ইহাকে আর একটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তথাপি শক্তি-সহায়ে ও মন্ত্রাদি সহযোগে শক্তি-উপাসনার প্রভাব কোন কালেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সাধনার প্রণালী অত্যন্ত রহস্যময় ও গুহ্য,—এইজন্য ইহা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাভাষায় বীরাচার শাক্ত সাধনা লইয়া কোন গ্রন্থ

১। নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনী কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃত মস্তকাম্॥ [শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত]

২। দ্রষ্টব্য 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার দত্ত।

রচিত হয় নাই। তবে এই সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থ যোগী, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে এবং তাহা লইয়া সাহিত্যও সৃষ্টি হইয়াছে। বীরাচার শক্তি-সাধনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাংলা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যগুলিতে। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে এদেশে যে কাপালিক ধর্ম প্রচলিত ছিল, যাহার পরিচয় রহিয়াছে ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে, বাণভট্টের কাব্যে ও দণ্ডীর দশকুমারচরিতে—ঈষৎ পরিবর্তিত কাহিনী সমেত তাহারই জের আসিয়া পৌছিয়াছে বাংলার কালিকামঙ্গল কাব্যে। এই কাব্যের প্রধান উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। শক্তি-সাধনার ব্যাপারে এই কাহিনী নূতন কিছু নয়। হরিবংশের ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীতে এই কাহিনীর বীজ আছে: বেতাল পঞ্চবিংশতির কয়েকটি গল্পে, কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে এই একই বিষয়ের প্রতিলিপি পাওয়া যায়। তন্ত্রের চক্রানুষ্ঠান ও লতা-সাধনাদির ব্যাপারে সাধন-সঙ্গিনীই ভগবতীর প্রতিমা। তন্ত্রাচারের এই গূঢ়, জটিল ও রহস্যময় বিষয়টিই কালিকামঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। এখানেও আছে বীরাচারসম্মত কামকলাবিলাস, দেবীও এখানে কালের কামিনী—তাঁহার কৃপায় নায়ক অবৈধ উপায়ে নায়িকাকে লাভ করিতে পারেন। বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যার সহিত সুন্দরের অবৈধ মিলন, সুন্দরের আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থক বাক্যে বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে সুন্দরের শ্লোক রচনা[১] দক্ষিণ মশানে সুন্দরের চৌতিশা স্তুতি এবং সর্বশেষে ঘটা করিয়া দক্ষিণাকালিকার পূজা ও শ্মশানে শবসাধনা—সমস্ত কিছুই বামাচার শক্তি-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিতবহ। সুন্দর দেবীর বরপুত্র শক্তিসাধক। তাঁহার সাধনা জটিল ও রহস্যময়, বিদ্যার সহিত তাঁহার সম্পর্কটিও অতি জটিল। এই বিদ্যাকেই আত্মপরিচয় প্রদানকালে সুন্দর যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সমানভাবে মানুষী বিদ্যা ও মহাবিদ্যার প্রতি প্রযোজ্য। তন্ত্র সাধনার একটি অতি গূঢ় মূল রূপ ও আকৃতি কালিকামঙ্গল কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে। রূপটি সঙ্কেতময় ও গূঢ়ার্থবোধক। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা অশ্লীল ও রুচিগর্হিত। অথচ এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলেন রামপ্রসাদের মত সাধক কবি, ভারতচন্দ্রের মত শক্তিমান শিল্পী। অনেকেই এই কাব্য দুইটিকে অষ্টাদশ শতকের বিগর্হিত রুচির রূপায়ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু

১। অদ্যাপি তাং কনক চম্পকদামগৌরীম্
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীম্
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি॥ ইত্যাদি [দ্রষ্টব্য বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা]

মনে হয়, কালিকামঙ্গল কাব্যের এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক সঙ্গত ব্যাখ্যা নয়। রুচির প্রশ্ন তুলিলে শক্তিসাধনাকেই নস্যাৎ করিয়া দিতে হয়,—তন্ত্রশাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতে হয়,—সহজ-সাধনার সমগ্র সাহিত্য-কৃতিকে অস্বীকার করিতে হয়: সর্বাপেক্ষা বড় কথা বাঙালীর অতি সাধের প্রতিমা 'কালীমূর্তি'কেও তাহা হইলে চিরতরে বিসর্জন দিতে হয়। ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া শক্তি সাধনাকে বিচার করিলে উহার প্রতি অবিচারের সম্ভাবনাই অধিক। সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে সাধনার বিচার হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল্যও বিচার করিতে হইবে তন্ত্রসাধনার আলোকে। ইহা বামাচার শক্তিসাধনা বিষয়ক কাব্য। আচার বাম বলিয়াই ইহার কাহিনী অদ্ভুত, সাধন তির্যক ও সিদ্ধি অতিলৌকিক। এই সাধন সম্পর্কে সাধক রামপ্রসাদের বাক্যেরই পুনরুক্তি করা যাইতেছে:

> জ্ঞাত নাহি বল্যে কেহ না করিবে হেলা।
> বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়ে খেলা॥ [কালিকামঙ্গল-রামপ্রসাদ]

বিদ্যার সহিত ভবানীভক্ত সুন্দরের মিলন-রূপকটিও বিষম বিষয়। কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই গোপনীয় গূঢ় বিষয়কেই গল্পাকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী লইয়া অনেক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। সম্রাট ফিরুজশাহের অনুগ্রহপুষ্ট কবি শ্রীধর (১৫৩২) প্রথম কালিকামঙ্গল রচনা করেন বলিয়া বিশ্বাস। কেহ কেহ মনে করেন, ময়মনসিংহের কবি কঙ্ক (আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী) প্রথম বিদ্যাসুন্দর পালা রচনা করেন: উহাতে সত্যপীরের মহিমা ও বিষ্ণু মাহাত্ম্যের কথা আছে। ইহার পরে গোবিন্দদাস (ষোড়শ), প্রাণরাম চক্রবর্তী (১৬৮৬), কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬) ও কবিশেখর বলরাম (অষ্টাদশ) প্রভৃতি কালিকামঙ্গল রচনা করেন। কাব্য হিসাবে এগুলি অকিঞ্চিৎকর। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল (অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক) তান্ত্রিক সাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাব্যেই সর্বপ্রথম ভাষাছন্দে বীরাচার শব-সাধনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে: কালীমূর্তির ব্যাখ্যাও তন্ত্রসম্মত: 'নাম নিত্য' নৃত্যতি নিখিলনাথ উরে, বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে।' বিদ্যাসুন্দরের বিচার প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ যে কথাটি বলিয়াছেন, বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী প্রসঙ্গেও সে উক্তি প্রযোজ্য:

> কালী-কিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
> বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার॥ [কালিকামঙ্গল]

কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁহার কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫১) তিনখণ্ডে বিভক্ত: শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল-বিদ্যা-

সুন্দর ও মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। ভারতচন্দ্রের কাব্য মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অতুলনীয় কীর্তিস্তম্ভ। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি, তাঁহার বর্ণনা রাজসিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক; তিনি পণ্ডিত, তাঁহার কাব্য পাণ্ডিত্যের প্রকাশে ঝলমল। শক্তিতত্ত্বেরও বহু কথা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে জানা যায়। তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যার বাংলা রূপ-বর্ণনা[১] ভারতচন্দ্রের কাব্যেই প্রথম পাওয়া যাইতেছে: দক্ষযজ্ঞে যাইবার প্রাক্কালে সতী মহাদেবকে এই রূপ দেখাইয়াছিলেন। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভারতীয় শাক্ত পীঠমালার তালিকাও ভারতচন্দ্র ভাষাছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: পীঠগুলির সহিত তত্তৎপীঠের ভৈরব ও দেবীর নামও উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পীঠমালার যথাযথ বর্ণনা এই প্রথম।[২] অন্যান্য কাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে পীঠের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও পাঁচমিশাল। ভারতচন্দ্রের অক্ষর-পুটিত স্তবেরও বিশেষত্ব আছে। কবিকঙ্কণের চৌতিশায় বত্রিশ অক্ষরের তালিকা পাওয়া যায়; রামপ্রসাদ যদিও বলিয়াছেন,—'চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি'—কিন্তু আসলে উহাতে আছে ত্রিশাক্ষরা স্তব; ভারতচন্দ্রের স্তব পঞ্চাশাক্ষরা—'সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে' [ভারতচন্দ্র ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা পুটিত স্তব রচনা করিয়াছেন]। তন্ত্রশাস্ত্রে ভারতচন্দ্রেব সুগভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহাব কাব্যে। ভারতচন্দ্রের দেবী-ভক্তিও আন্তরিকতাহীন নয়,—যেমন,—

একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়াচ্ছায়া॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপম কায়া।
ত্রিগুণ জননী পুনঃ ত্রিদেবের জায়া॥
ইহলোকে পরলোকে তুমি যে সহায়া।
ভারত কহিছে মাগো দেহ পদছায়া॥ [অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড]

শাক্ত পদাবলী: বাংলা দেশে শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের সমাদর কোন দিনই ম্লান হয় নাই। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভুর প্রেম-প্লাবনে গোটা ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছে, সত্তের শতকে দ্বিতীয় চৈতন্য শ্রীনিবাস আচার্যেব ভাবোন্মাদনায় ও খেতরীর মহামহোৎসবের মৃদঙ্গঝঙ্কারে বৈষ্ণবভাব ও রসকীর্তন আশ্চর্য ভাবাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে —তথাপি বাংলা দেশে শাক্ত প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার',

১। দশ মহাবিদ্যা: কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী।

২। একান্নটি শাক্ত পীঠের মধ্যে ভারতচন্দ্র বিয়াল্লিশটির নাম দিয়াছেন।

রঘুনন্দন ও শূলপাণির 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব' বাংলার শক্তি-সাধনার ধারাকে জীবন্ত রাখিয়াছে। সমাজের নিম্নস্তরে সহজ সাধনার সহিত শাক্তাচার যুক্ত হইয়াছে, বামাচার চলিয়াছে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে এবং পশ্বাচারী সাধনা চলিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে। বাংলার বারভূঞা এবং আঞ্চলিক রাজা ও জমিদারবৃন্দও শক্তিপূজার পোষকতা করিয়াছেন। অবশেষে অষ্টাদশ শতকে শক্তিপূজা ও শাক্ত সাহিত্য নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহা বাংলার শাক্ত সঙ্গীত।

দুঃখ-মুক্তি, অভেদবুদ্ধি ও মুক্ত জীবনের আকূতি লইয়া বাঙালীর মর্মকেন্দ্র হইতে অতি সুন্দর বৈরাগ্য-মধুর শাক্তগীতির উৎসার। তখন বাংলাদেশে নবাবী আমল। 'বাদশাহের রাজস্ব ও মারাঠী চৌথের চাপে নবাবগণ বিপর্যস্ত, জমিদারগণ নবাবের চাপে সশঙ্ক, আর সাধারণ প্রজা 'মসিলে তসিলে'র চাপে অস্থির। সকলেই বিপন্ন, সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রসারিত দুঃখ। তখনকার বৈষ্ণবধর্ম এই বিপদে মানুষকে আশ্বস্ত করিতে পারিতেছিল না। ধর্মের দিক হইতেও নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা আচারসর্বস্বতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছিল। ইহারই প্রতিবাদে বাংলার মর্মকেন্দ্র হইতে শাক্তাগম সম্মত দিব্যভাবের মহিমা ঘোষণা করিয়া অভিনব সঙ্গীত মূর্তিতে শ্যামাসঙ্গীত বা শাক্তগীতাবলী ঝঙ্কৃত হইল। দুঃখ, অনাচার ও অত্যাচারের পটভূমিকায় এই মাতৃসঙ্গীত এক স্বর্গীয় মূর্ছনা।

শাক্ত গানের প্রধান বিশেষত্ব দিব্যভাব। এই ভাব শক্তি-উপাসনার চরম ভাব ও সকল দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ। শাক্তের অতি সরল পশ্বাচার ও অতি জটিল বামাচারের উপরে দিব্যাচার একটি অতি সুন্দরভাব। ইহাতে স্থূল পঞ্চ ম-কারের প্রয়োগ নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, আচার-বিচারের কাঠিন্য নাই। দিব্যভাব বাহিরের সামগ্রী নয়, অন্তরের সামগ্রী। ইহা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক সুন্দর সমন্বিত রূপ। ইহাতে জ্ঞানী দিব্যজ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠিত, কর্মী দিব্যকর্মের সাধনায় তন্ময়, ভক্ত ভক্তির পরম প্রাপ্তিতে মুদিত। দিব্য ভাবের সাধনায় মানুষের মধ্যেই দিব্যভাবের জাগরণ, অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চার। বাংলার শাক্ত সঙ্গীত এই স্বর্গীয় দিব্য ভাবের কথায় মুখর, উহা শক্তির সামগান।

এই সঙ্গীতের পথিকৃৎ হালিসহরের সাধক কবি রামপ্রসাদ; তাঁহার গান সাধনার সিদ্ধি ও প্রকাশের আনন্দে পরিপূর্ণ। 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই' বলিয়া তিনি শাক্তের তেজ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাক্তের কর্ম, শাক্তের ভক্তি, শাক্তের 'সাধন-সমর', শাক্তের সিদ্ধি-বিভূতি ও আত্মসমর্পণে রামপ্রসাদের গান বাংলার নবাগম, নূতন তন্ত্র। তাঁহার আকুল করা মা ডাকে সকল হীনতা ও দীনতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে;

'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়া তিনি মুক্তি-রত্ন আহরণের কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তন্ত্রের যাবতীয় দিব্যভাব—মনোদীক্ষা, অন্তর্যাগ ও শ্রেষ্ঠ পূজার আদর্শ এবং জীবন্মুক্তির ফল প্রসাদী সঙ্গীতে প্রমূর্ত হইয়াছে।

রামপ্রসাদকে অনুসরণ করিয়া কত কবি যে শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তি-সাধনার বিপুল প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশ যেন শাক্তের দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সাধক কমলাকান্ত, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, ভক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরী ও রামলাল দাসদত্তের গান অপূর্ব্ব। কমলাকান্তের কবিত্ব ও ভাষাসম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীর 'রসনারোচন' বাচনভঙ্গীর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার 'মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে' প্রভৃতি গান ছন্দের ঝঙ্কারে ও ভাবের গাঢ়তায় শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। গোবিন্দ চৌধুরীর গানেও কবিত্বের অনন্ত সুষমা। অষ্টাদশ শতকের বহু রাজা, জমিদার ও দেওয়ান তত্ত্ব-গভীর শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কুমার শম্ভুচন্দ্র ও নরচন্দ্র—মহারাজ নন্দকুমার, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ, নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ অতি সুন্দর শাক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মহাতাব চাঁদের অনূদিত মাতৃধ্যানগুলি অমূল্য সম্পদ। দেওয়ান রঘুনাথ রায় ও রামদুলাল নন্দীর গানও খুব উপভোগ্য।

শাক্ত সঙ্গীতের প্রধান দুইটি ভাগ: লীলা সঙ্গীত (আগমনী ও বিজয়া) এবং সাধন-সঙ্গীত (মনোদীক্ষা,. ভক্তের আকূতি প্রভৃতি)। রামপ্রসাদ উভয়প্রকার গানই রচনা করিয়াছিলেন। ক্রিয়া-প্রধান শক্তি-সাধনায় অন্তরঙ্গ ভাবের প্রতিষ্ঠা রামপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্ব। রামপ্রসাদই বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসকে নূতন করিয়া শক্তি-সাধনার অঙ্গীভূত করিয়াছেন: তাঁহার সাধন-সঙ্গীত প্রতিবাৎসল্য রসে ভরপুর, তাঁহার লীলাসঙ্গীত বাৎসল্য রসের নির্ঝর। কমলাকান্তে এই নির্ঝরের সাবলীল গতি ও বিস্তার। অবশ্য সাধক কবিদের রচনায় লীলা অপেক্ষা সাধন-সঙ্কেতেরই প্রাধান্য। লীলাগান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কবি-আখড়াই-পাঁচালি গানে। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমে শাক্ত সঙ্গীত কবি, আখড়াই ও পাঁচালি গানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে উহা যাত্রা, নাটক পালায় সন্নিবেশিত হইতে থাকে। লৌকিক প্রমোদ-কৌতুকের ক্ষেত্রে লীলাগানগুলিই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছিল। হরুঠাকুর, রামবসু, নীলমণি পাটুনি, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধুবাবু, কালি মির্জা, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাদ পক্ষী, দাশরথি রায়, রসিক রায়, নীলকণ্ঠ, মদন মাষ্টার প্রভৃতির গানে লীলার মানবীয় ভাব ও পারিবারিক জীবনের

স্বল্পাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা লক্ষণীয়। অবশ্য দাশু রায়ের সাধনসঙ্গীত—'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি', কিংবা রসিক রায়ের সাধন-সমরের গান 'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি, মা হারে কি ছেলে হারে' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গান। 'কণ্ঠের গান'ও (নীলকণ্ঠের গান) ভক্তিবিলসিত ও অতি মধুর।

॥ নব্য বাংলায় শক্তি-চেতনা ॥ বাঙালীর জীবনে শক্তি-সাধনার আবেদন গূঢ়সঞ্চারী। বাংলাদেশে শক্তি-সাধনার কেন্দ্রের অপ্রতুলতা নাই। মেহার, কিরীটেশ্বরী, কঙ্কালিতলা, তারাপীঠ, কালীঘাট, ভবানীপুর ও সেরপুর শক্তিসাধনার বিশিষ্ট কেন্দ্র। বাংলার গ্রামে গ্রামে কালীপূজার ধুম। বংশানুক্রমে এখানে সর্বানন্দী বংশ, মিত্রার অর্ধকালী বংশ, মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ, আন্দুলের প্রেমিক-গোষ্ঠী শক্তির সাধক। বাঙালীর শাক্ত চেতনা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নব্য বাংলার কাব্য-গানেও উহার প্রভাব বিদ্যমান। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র আগমনী-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন। দশমহাবিদ্যার রূপগুলিকে ভিত্তি করিয়া সভ্যতার বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার সরকার করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তচেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। শক্তির রূপ স্বদেশ জননী, শক্তির রূপ দেশের নারী-সমাজ। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্যে শক্তির এই রূপান্তর লক্ষণীয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও দেশকে শক্তিমায়ের বিগ্রহ ভাবিয়া 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। স্বদেশজননীকে জগজ্জননীর রূপে অভিষিক্ত করিয়া স্বদেশপ্রেমমূলক গান রচনা করিয়াছেন, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলি, কালিপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি। দেশাত্মমূলক শাক্তগীতিকে বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচার করেন চারণ কবি মুকুন্দদাস। তাঁহার 'জাগো গো, জাগো গো জননী' গানগুলি আশ্চর্য উন্মাদকর। কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতও প্রাণময়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মুসলমান কবির ভিতর এই শাক্ত চেতনা জাগিল কোন্ সূত্র ধরিয়া; ইহা কি সুফী প্রভাব, না বাউলের প্রভাব, না হিন্দু প্রভাব? না, ইহা বাঙালীর মজ্জাগত শাক্ত চেতনার প্রকাশ? অবশ্য গীতের রাজ্যে নাদশক্তির প্রভাব তানসেনাদির গানেও আছে। দরাপ্ খাঁর গঙ্গাস্তোত্রও বহুবিখ্যাত।

নব্যযুগের 'গীতিকবিতার আর একজন পূর্বসূরী বিহারিলাল চক্রবর্তী। তাঁহার 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্য তন্ত্রের মূলতত্ত্বের নির্যাস লইয়া রচিত। 'সারদামঙ্গল' যেন বাংলার 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্য-লহরী'। শঙ্করাচার্য একদিন "আনন্দলহরী' কাব্যে ষোড়শী দেবীর সৌন্দর্য-মূর্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন: সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীই নবরূপে বিহারীলালের 'সারদা'। তিনি সৌন্দর্য-প্রতিমা—'উদার সৌন্দর্য রাশি', তিনিই আবার 'মূর্তিমান্ প্রেমানন্দ'—'জননী, পিতা, নন্দিনী, রমণী, মিতা', তিনিই আবার—

কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকেব প্রাণ
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ [সাধের আসন]

বিহারীলালের শাক্ত চেতনা শ্রীবিদ্যাকুলানুসারী। তাঁহার আরাধ্যা দেবী সারদা। শক্তিতত্ত্বের সুসূক্ষ্ম রহস্য ও শক্তি-সাধনার লতাসাধন বা যোগিনী-সাধনের অতি জটিল গুহ্য বিহারীলালের কাব্যে প্রেমযোগে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রেমের ভাবটি বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা হইতে ভাবমুগ্ধ কবির চিত্তে অজ্ঞাতসারেই আসন করিয়া লইয়াছে। অবশ্য শক্তি-সাধনার শেষ স্তর মাধুর্যেই অবসিত: শিবশক্তিযোগের সামরস্যাস্বাদন বা সেই মহারসে সমরসীভূত হইয়া যাওয়া সাধকের চরম লক্ষ্য: এই অবস্থায় সামরস্য-সম্ভূত অমৃতধারায় দেহ আপ্লাবিত হওয়ায় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যান। বিহারীলালে তাহারও আভাষ আছে—

তোমারে হৃদয়ে রাখি'
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয়, সারা দিবা-রজনী। [সাধের আসন]

বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশের দিক হইতে বিহারীলাল 'বাউল', প্রাপ্তির দিক হইতে শ্রীবিদ্যাকুলের কৌল সাধক। তিনি আত্ম-সমাহিত ধ্যান-তন্ময় যোগী।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে শক্তি-সাধনা নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাধনায়। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন তন্ময় মাতৃসাধক। গন্ধর্ব-নিন্দিত কণ্ঠে তিনি নিজে প্রাচীন শাক্ত সঙ্গীত গান করিতেন এবং সেগুলিকে আস্বাদন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। শাক্ত চেতনাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। আজিও দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে এইভাবের সাধনা চলিতেছে। ঠাকুরের ধর্ম ছিল ভাবের ধর্ম। ভাব দিয়াই তিনি 'অভাব'কে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'রসে-বশে রাখিস মা'—ইহা শক্তি-সাধনার আর একদিক। ঠাকুরের প্রভাবে শাক্তভাব আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারই প্রভাবে বিবেক-বীর বিবেকানন্দের কর্মে ও বাক্যে এইভাব অদ্বৈত বেদান্তের সহিত যুক্ত হইয়া এক অপূর্ব যুক্তবেণী সৃষ্টি করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রও এই যুক্তবেণীর ধারায় স্নাত। বস্তুতঃ শাক্তচেতনাকে ভিত্তি করিয়া বাঙালী যে কত ভাবের সাধনা করিয়াছে, কত বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাতৃভাব অতি বিচিত্র।

॥ পুরাণ ॥

পুরাণের অর্থ ও লক্ষণ

পুরাকাল হইতে লোকপরম্পরায় যাহা ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাই পুরাণ—"পুরাপরম্পরাং ব্যক্তিং পুরাণং তেন বৈ স্মৃতম্‌' [পদ্ম. সৃষ্টি. ২]। অথর্ববেদে 'পুরাণবিৎ' শব্দটির নিরুক্তি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদেও পুরাণের উল্লেখ আছে। বৈদিক-সাহিত্যে পুরাণের কাহিনীর বীজ ইতস্ততঃ ছড়ানো। অতএব পুরাণ চির পুরাতন।

কিন্তু যে আকারে পুরাণগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহা খুব প্রাচীন নয়। পুরাণের আদি সঙ্কলক ছিলেন বেদব্যাস। সে সঙ্কলনের অল্পই অবশিষ্ট আছে। গুপ্তযুগে পুরাণ নূতন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল। বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলি গুপ্তযুগেরও পরবর্তী, কোথাও বা আরও পরবর্তী। ফলে সূতাদির বিবৃতি বলিয়া 'পুরাণ' নামে যে বিশাল পল্লবিত সাহিত্য আজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের নানা স্তর সংযোজিত হওয়ায় বিষয়-বৈচিত্র্যে তাহা বহু বিস্তৃত।

আদৌ পুরাণের এতটা বিস্তৃতি ছিল না। আদি পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণ-সমন্বিত,—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্‌॥ [বিষ্ণু. ৬. ৮]

—সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (সৃষ্টির পর পুনঃ সৃষ্টি), বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ), মন্বন্তর (মনুর অধিকার কাল) এবং বংশানুচরিত (বংশোদ্ভূত বিখ্যাত চরিত্র)—পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ।

অনেকে এই লক্ষণকে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন, কারণ, পুরাণে এই পঞ্চ লক্ষণ বহির্ভূত আরও অনেক বিষয়ের, যথা, ভুবনবিস্তর, জ্যোতিষ, তীর্থমাহাত্ম্য, দেবলীলা, দেবপূজা-পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমধর্মাদির বর্ণনা থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, পঞ্চলক্ষণ উপপুরাণের, আসল পুরাণ দশলক্ষণযুক্ত [ব্র. বৈ. কৃষ্ণ. ১৩৩]। শ্রীমদ্ভাগবত মতেও পুরাণ এই দশলক্ষণাক্রান্ত[১] :—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ (ঈশ্বরানুগ্রহ), উতি (কর্মবাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ (প্রলয়), মুক্তি ও আশ্রয় (পরব্রহ্ম)। খুব সম্ভব আদি পুরাণ পঞ্চ লক্ষণযুক্তই ছিল এবং পঞ্চ

১। অত্র সর্গ বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ [ভাগ. ২. ১০]

লক্ষণের ভিতর সৃষ্টি ও বংশ বর্ণনা ছিল প্রধান। অথর্ববেদে পূর্ব পূর্বকল্পের সৃষ্টি-তত্ত্ববিদ্‌কেই 'পুরাণবিৎ' বলা হইয়াছে।[১] পুরাণ-প্রবক্তা সূতজাতির স্বধর্ম ছিল বংশপঞ্জী ধারণ ['বংশানাং ধারণং কার্যম্‌'—পদ্ম. সৃষ্টি. ১]। এই সৃষ্টি ও বংশ বর্ণনারই পরিপূরক প্রতিসৃষ্টি, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পুরাণের দশ লক্ষণও পঞ্চ লক্ষণের সম্প্রসারণ।

প্রথমতঃ 'সর্গ'। উহার অর্থ 'সৃষ্টি'। সাধারণভাবে পৌরাণিক সৃষ্টি নবধা : ১. মহৎসর্গ (পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণবৈষম্যে 'মহৎ'তত্ত্বের সৃষ্টি), ২. ভূতসর্গ (অহঙ্কারাদি পঞ্চতন্মাত্র ও তাহাদের বিকারে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি), ৩. ঐন্দ্রিয়িক সর্গ (দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং ঐন্দ্রিয়িক একাদশ দেবতা—চন্দ্র, দিক্‌, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতির সৃষ্টি), ৪. স্থাবর সর্গ (বৃক্ষগুল্ম-লতাদির সৃষ্টি), ৫. তির্যক সর্গ (জান্তব তির্যক প্রাণিবর্গের উৎপত্তি), ৬. ঊর্ধ্বস্রোতা সর্গ (দেবগণের সৃষ্টি, ইহাকে দেবসর্গও বলে), ৭. অর্বাকস্রোতা-সর্গ (মানব সৃষ্টি), ৮. অনুগ্রহ সর্গ (ভূতাদির সৃষ্টি), ও ৯. কৌমার সর্গ (ব্রহ্মার মানস প্রজা—নীললোহিত কুমার, নবব্রহ্মা—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও দক্ষ এবং মিথুনাদি সৃষ্টি)।

এই নববিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রথম তিনটি (মহৎ, ভূত ও ঐন্দ্রিয়িক) প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন বলিয়া 'প্রাকৃত সর্গ' নামে খ্যাত। ইহাই পুরাণের আদি সর্গ। ইহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎপত্তি। পরবর্তী ছয়টি সৃষ্টি ব্রহ্মাকৃত। উহাকে 'ব্রাহ্মী সৃষ্টি' বা 'ব্রাহ্মসর্গ'ও বলে। উহা বৈকৃত ও প্রাকৃত-বৈকৃত ভেদে দুই প্রকার : স্থাবর সর্গ হইতে অনুগ্রহ সর্গ পর্যন্ত পাঁচটি সৃষ্টি বৈকৃত, এবং নবম কৌমার সর্গ প্রাকৃত ও বৈকৃত অর্থাৎ উভয়াত্মক। পুরাণে ব্রহ্মাই স্রষ্টা বা প্রজাপতি। স্থাবর সৃষ্টিই প্রথম। এই সৃষ্টি যাবতীয় ব্রাহ্মসর্গের আদি বলিয়া ইহা 'মুখ্য সর্গ' নামে পরিচিত।

পুরাণমতে নিখিল সৃষ্টি নির্গুণ, নির্বিশেষ, সচ্চিদানন্দঘন বিভু পরমেশ্বরের লীলা। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নির্বিশেষ হইয়াও বিশিষ্ট, এক হইয়াও বহু। নির্গুণ ব্রহ্মের সমষ্টিভূত অব্যক্ত রূপ 'বিরাট'; ইনি সগুণ ব্রহ্মের প্রথম বিগ্রহ। বিরাটের রূপ অপ্রমেয় ও অচিন্তনীয়। তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ। তাঁহার অনন্ত শরীরে বিন্যস্ত চতুর্দশ ভুবন (ভূ-ভুব-স্ব-মহ-জন-তপ-সত্য এই সপ্তলোক এবং সপ্ততল অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল-পাতাল), ভুবনান্তর্গত সপ্তদ্বীপ (জম্বু-

১। যেত আসীদ্‌ ভূমিঃ পূর্বা যামদ্ধাতয় ইদ্‌ বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যাৎ নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ॥ [অ. ১১. ১০. ৭]

প্লক্ষ-শাল্মল-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর), দ্বীপান্তর্গত বর্ষ (যথা জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষ), সপ্তসাগর (দধি-সর্পি-ক্ষীর-ক্ষার-ইক্ষু-সুরা-শুদ্ধোদ), লোকান্তর্গত জ্যোতিশ্চক্র বা কালচক্র (গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি), স্বর্গ, নরক (রৌরব, মহারৌরব, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, কালসূত্র, অসিপত্র, অবীচি, কুম্ভীপাক প্রভৃতি একবিংশতি নরক), স্থাবর-জঙ্গমাদি সৃষ্টি, সুরাসুর নর, ধর্মাধর্ম, অখিল বেদ, নিখিল শাস্ত্র—এক কথায় ব্যক্তাব্যক্ত সমগ্র সৃষ্টি। তিনিই একদেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—স্রষ্টা, পালক, সংহর্তা। ['য এক ঈশো জগদ্ আত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি'—ভাগ. ১. ১০. ৩৪]। ইনি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন; তাহাতে প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতসর্গ প্রবর্তিত হয়। প্রাকৃত মহদাদি তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টিকার্যে অক্ষম। পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় উহারা পরস্পর সংহত ও সংযুক্ত হইয়া একটি হিরণ্ময় 'অণ্ড' সৃজন করে ['সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্'—ভাগ. ৩. ২০. ১৪]। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। ইহা বিভু পরমেশ্বরের দ্বিতীয় শরীর। ইহাও ত্রিলোক, দ্বীপ, বর্ষ, মেরু, পর্বত ও সাগর-সমন্বিত ['তস্মিন্নণ্ডে ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ'—লিঙ্গ. ১. ৩. ২৮]। সৃষ্টির সংহত রূপ ব্রহ্মাণ্ড—যেন বীজান্তর্গত বৃক্ষ। স্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রহ্মা রূপে অণ্ডে আবির্ভূত বলিয়া ব্রহ্মার এক নাম স্বয়ম্ভু। হিরণ্ময় অণ্ডে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহার অপর নাম হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মাই ব্যক্ত সৃষ্টির আদি পুরুষ, ইনি পরমেশ্বরের তৃতীয় শরীর। পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নির্গত হন। নির্গত হইবার সময় তিনি ব্রহ্মাণ্ডে লোকালোক সংস্থান করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপী অনন্ত সলিলে শয়ান থাকেন। অনন্ত সলিলে শয়ান বিভুকে বলা হয় 'নারায়ণ'।[১] এই অনন্ত পুরুষের নাভিস্থিত ভূপদ্ম-কর্ণিকায় সমাসীন বেদময় ব্রহ্মা বিরাটান্তর্গত অব্যক্ত সৃষ্টিকে ব্যক্ত রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার প্রত্যেকটি সৃষ্টি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে কৌমার সর্গান্তর্গত মিথুন সৃষ্টির গুরুত্ব সমধিক। প্রথমে তিনি মানসী প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রজাসৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি নিজ দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নিজেই মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষরূপ ধারণ করেন। পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু, স্ত্রীর নাম শতরূপা। এই দুই আদি মানব-মানবী হইতে বিশ্বজগতে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গে সন্ততি-সৃষ্টির প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

১। পরমেশ্বরের 'নারায়ণ' নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে একটি অতি প্রাচীন শ্লোক প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই উদ্ধৃত হইয়াছে: 'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥'—অপ্ বা জলের এক নাম 'নার'; 'নার' সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন; এই 'নার' পুরুষের অয়ন (অধিষ্ঠান স্থান) বলিয়া তাঁহার নাম 'নারায়ণ'।

পুরাণের দ্বিতীয় লক্ষণ 'প্রতিসর্গ'। সাধারণতঃ সৃষ্টির পর পুনঃ সৃষ্টিকেই 'প্রতিসর্গ' বলা হয়। সৃষ্টির পর প্রলয় সংঘটিত হয়, প্রলয়ের পর আবার নবসৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। 'প্রতিসর্গ' এই চিরন্তনী সৃষ্টি লীলার পুনরাবর্তন। বৎসরান্তে যেমন পূর্ব পূর্ব বৎসরের ঋতুচিহ্নগুলি ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই যুগান্তরে পূর্ব-পূর্ব যুগের সৃষ্টি ও ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে।[১] কল্পারম্ভে বেদগর্ভ ব্রহ্মাই তপস্যা বা অভিধ্যান দ্বারা নবসৃষ্টির পত্তন করিয়া থাকেন। ইহাই 'প্রতিসর্গ'।

শ্রীমদ্ভাগবতমতে প্রাকৃত সর্গই (মহৎ হইতে বিশেষান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি) সর্গ, আর যাবতীয় সৃষ্টি 'বিসর্গ' বা প্রতিসর্গ। এই মতে আদি ব্রাহ্মসর্গও অর্থাৎ স্থাবর, তির্যক, উর্ধ্বস্রোতা, অনুগ্রহ ও কৌমার সর্গও প্রতিসর্গের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন পুরাণমতে ব্রাহ্মী সৃষ্টির পরে মরীচ্যাদি ঋষি, দক্ষ ও মন্বাদি প্রজাপতি যে সকল নূতন সৃষ্টি প্রবর্তন করেন, তাহাই প্রতিসর্গ নামে খ্যাত।[২] এই মতে প্রাজাপত্য সৃষ্টিগুলিই প্রতিসর্গ।

প্রতিসর্গও বহু ব্যাপক। রুদ্র হইতে রুদ্রসর্গ, দক্ষ হইতে দক্ষসর্গ, মরীচি হইতে মারীচ (কশ্যপসর্গও ইহার অন্তর্গত), বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ। এই প্রতিসর্গ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি। শুধু তাই নয়, প্রতিসর্গই নব নব সৃষ্টি-সম্ভাবনার অঙ্কুর। বিভিন্ন যুগে বা কল্পে প্রতিসর্গ দ্বারা নূতনতর সৃষ্টি প্রবর্তিত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন হইয়াছে গরল ও অমৃত; বেণের রাজ্যকালে উৎপন্ন হইয়াছে 'নিষাদ' জাতি [ভাগ. ৪. ১৪]; পৃথুরাজার পৃথিবীদোহনে আবিষ্কৃত হইয়াছে নূতন ঔষধি—তিনি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে ধাতব পদার্থও আবিষ্কার করিয়াছেন, নতোন্নত বিষমা ভূমিকে সমতল করিয়াছেন এবং নিখিলবিশ্বে এক এক বিশিষ্ট জনকে এক এক বিষয়ের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন [মৎস্য. ৮]; অঙ্গিরার প্রতিসর্গে প্রবর্তিত হইয়াছে যন্ত্র-মন্ত্র ['মন্ত্র-যন্ত্রাদয়ো যে বৈ তে সর্বেঽঙ্গিরসঃ স্মৃতঃ'—কালিকা. ২৬]; নারদীয় প্রতিসর্গে সৃষ্ট হইয়াছে গান্ধর্ববিদ্যা, বিমান ও প্রশ্নোত্তর ['প্রশ্নোত্তরান্তবৈবাদ্যে নৃত্যগীতঞ্চ কৌতুকম্'—কালিকা. ২৬], আর ঋষি বিশ্বামিত্র সৃজন করিয়াছেন দক্ষিণ আকাশে নবতর নক্ষত্রমালা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল ['সৃজন্ দক্ষিণমার্গাস্থান্

১। যথর্তা বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ [পদ্ম. সৃষ্টি. ৩]

২। রুদ্রো বিরাড্ মনুর্দক্ষো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ।
যং যং সর্গং পৃথক চক্রু প্রতিসর্গশ্চ স স্মৃতঃ॥ [কালিকা. ২৬]

সপ্তর্ষিনপরান্ পুনঃ। নক্ষত্রমালামপরামসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ'—রামা. বাল. ৬০]। আদিসর্গে গ্রাম ছিল না, পুর ছিল না, দুর্গ ছিল না; পৃথু-কৃতসর্গে নূতন করিয়া গ্রাম, পুর, দুর্গ (বার্ক্ষদুর্গ, পার্বত্য দুর্গ ও ঔদক দুর্গ) নির্মাণের পদ্ধতি প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলিত হইয়াছে। প্রতিসর্গ নবসৃষ্টির প্রেরণাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনাগত পৌরুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

তৃতীয়তঃ 'বংশ'। 'বংশ' বলিতে বুঝায় ঋষি ও দেবসর্গজাত দেবগণের কুল। বংশ-বর্ণনা বস্তুতঃ কুলপঞ্জী। ইহাতে বিস্মৃতপ্রায় সুদূর অতীতের এবং অদূর অতীতের বংশ-সমূহের সন্তান-সন্ততিদের নাম ক্রমানুসারে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। এই ইতিহাসের বংশলতিকা কোথাও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, কোথাও কল্পনাদ্বারা গ্রথিত—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিকের।

বংশবর্ণনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে পড়ে অনাদি সৃষ্টিলগ্নের দেববংশ, ধর্ম ও অধর্মের বংশ এবং অতি পুরাতন ঋষিবংশ। দেব-বংশ অষ্টবিধ: ১ দেব ২ পিতৃ (পিতৃবংশ সাতটি: অগ্নিষ্বাত্তা, সৌম্যা, হবিষ্মন্ত, উষ্মপা, আজ্যপা, সুকালীন ও বর্হিষদ), ৩ অসুর, ৪ যক্ষ-রক্ষ, ৫ গন্ধর্ব-অপ্সরা, ৬ সিদ্ধ-চারণ-বিদ্যাধর ৭ ভূত প্রেত-পিশাচ এবং ৮ কিন্নর-কিম্পুরুষ। ধর্ম ও অধর্মের বংশও বহু বিস্তৃত। কমলযোনি ব্রহ্মার বক্ষ হইতে ধর্মের জন্ম। তাঁহার দশ পত্নী—কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি. শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি। এই সকল পত্নী হইতে ধর্মের বংশে সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ। অধর্ম ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হিংসা। এই বংশের মহাভয়ঙ্কর সন্ততি অনৃত, নির্ঋতি, ভয়, নরক, বেদনা ও মৃত্যু [মার্ক. ৫০]। সুপ্রাচীন ঋষি-বংশাবলীর মধ্যে দক্ষকন্যাদের বংশ বহুখ্যাত। দক্ষের পত্নী প্রসূতি (মতান্তরে বীরিণী বা অসিক্নী)। এই পত্নী হইতে দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে, সাতাইশটি চন্দ্রকে এবং নয়টি নয়জন ঋষিকে ও সতী নাম্নী কন্যাকে রুদ্রহস্তে সমর্পণ করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্র বহুবিস্তৃত। 'কশ্যপাৎ সকলং জগৎ'—কথাটি মিথ্যা নয়। কশ্যপ হইতে দেবমাতা অদিতিতে উৎপন্ন হয় দেববংশ, দিতি হইতে দৈত্যকুল। কাশ্যপ গোত্রেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সূর্য, ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতা—হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য—বৃত্রাদি দানব—নারদ-চিত্ররথাদি গন্ধর্ব—মিশ্রকেশী-তিলোত্তমা-রম্ভাদি অপ্সরা—বৈনতেয় গরুড—রাহু-কেতু ও সর্পকুল; বহু খ্যাত সূর্যবংশও কাশ্যপ গোত্র-সম্ভব। ভৃগু হইতে ভার্গব বংশ, অত্রি হইতে সোমবংশ, পুলস্ত্য হইতে যক্ষ-রক্ষবংশ, পুলহ

হইতে সিংহ-ব্যাঘ্র-ঋক্ষ বংশ, অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি-বংশ প্রবর্তিত হয়। এইগুলিই অতি প্রাচীন ঋষিবংশ। প্রাচীন বলিয়াই উহা কল্পনানুরঞ্জিত।

বংশ-বর্ণনার দ্বিতীয় স্তরে পড়ে মনুবংশ এবং অবরকালীন ঋষিবংশ। মনুদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈবস্বত মনুর বংশ বহু বিখ্যাত। বৈবস্বত মনুর আদি সূর্যবংশ, এই বংশেরই উত্তর বংশ রঘুবংশ।[১] অত্রি হইতে যে সোমবংশ প্রবর্তিত হয়, তাহা হইতে উত্তরকালে পৌরববংশ, যদুবংশ, ভারতবংশ এবং কুরুবংশ বিস্তারলাভ করে।[২] এতদ্ব্যতীত জনকবংশ, শিবিবংশ, কৌশিক বিশ্বামিত্রবংশ, বশিষ্ঠবংশ ও ভার্গববংশও বহু খ্যাত। বংশ বর্ণনার এই স্তরটি অর্ধ ঐতিহাসিক। বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস কল্পনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য লঘু হইয়া গিয়াছে, তথাপি এদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের তথ্য সংগ্রহে উহার উপযোগিতা কম নয়। আদি মনু হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জন্মেজয় পর্যন্ত রাজাবলীর আখ্যানবহুল ইতিহাস এই বর্ণনায় স্থানলাভ করিয়াছে। মনে হয়, পৌরাণিক যুগের পরিসমাপ্তি পরীক্ষিৎকে লইয়াই। [বিষ্ণু. ৪. ২০]

ইহার পর ভবিষ্যবংশ বর্ণনা। ইহাই ঐতিহাসিক স্তর। পুরাণে ইহার যোজনা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের, কারণ, এই বংশপঞ্জীতে উদয়ন, প্রসেনজিৎ ও প্রদ্যোতের নাম আছে; তাহা ছাড়া নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ, শাতকর্ণী (সাতবাহন) প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের বংশতালিকা বিবৃত হইয়াছে। V. A. Smith প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই তালিকাকে ভারত-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এদেশের প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস-নির্মাণে পুরাণের বংশ-বর্ণনার মূল্য অসাধারণ। খনির সোনা যেমন খাদ মিশানো থাকে, তেমনই পুরাণে ইতিহাসের সত্য কল্পনা-মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে

১। সূর্যবংশের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী,

বিষ্ণুনাভ্যজজো ব্রহ্মা মরীচিব্রহ্মণঃ সুতঃ।
মরীচেঃ কশ্যপস্তস্মাৎ সূর্যো বৈবস্বতো মনুঃ॥
ততস্তস্মাৎ তথেক্ষ্বাকুস্তস্য বংশে ককুৎস্থকঃ।
ককুৎস্থস্য রঘুস্তস্মাদজো দশরথস্ততঃ॥ [অগ্নি. ৫]

২। চন্দ্রবংশের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী,

বিষ্ণু নাভ্যজজো ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রোঽত্রিরত্রিতঃ।
সোমঃ সোমাদ্বুধ স্তস্মাদৈল আসীৎ পুরূরবাঃ॥
তস্মাদায়ুস্ততো রাজা নহুষোঽথযযাতিকঃ।
ততঃ পুরুস্তদ্বংশে ভরতোঽথ নৃপঃ কুরুঃ॥ [অগ্নি. ১৩]

প্রাচীন ভারতেতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, ভারতবাসীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই—এই বংশ-বর্ণনা তাঁহাদের মত পরিবর্তনে সহায়তা করিবে।

পুরাণের চতুর্থ লক্ষণ 'মন্বন্তর'। ইহার সাধারণ অর্থ, মনুর অধিকার কাল। এক মনু হইতে অন্য মনুর ভোগকালের অন্তর্বর্তী কালই মন্বন্তর: 'মনোরন্তরমবকাশে হবধিৰ্বা অস্মিন্নিতি মন্বন্তরম্' [শব্দকল্পদ্রুমধৃত লিঙ্গপুরাণোক্ত বচন]। মনুর সংখ্যা চতুর্দশ।[১] অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেদে মনুগণ তিন ভাগে বিভক্ত: স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ—এই ছয় মনুর কাল অতীত হইয়াছে; সপ্তম বৈবস্বত মনু, বর্তমানে তাঁহারই অধিকারকাল চলিতেছে; ভবিষ্যতে আরও সাতজন মনু আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের নাম—সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্মসাবর্ণ, রুদ্রসাবর্ণ, রৌচ্য ও ভৌত্য। অতীত-অনাগত ভেদে মনুর এই সংখ্যাগণনা বর্তমান বারাহ কল্পের। পূর্ব পূর্ব কল্পে এইরূপ চতুর্দশ মনু আরও অনেকবার আবির্ভূত হইয়াছেন। কোন মনুর কাল যখন প্রবর্তিত হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, সপ্তর্ষি ও মনুপুত্রগণ সহ মনু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মন্বন্তর অবসানে বিপর্যয় ঘটে, এক প্রকার প্রলয়ও সংঘটিত হয়, তখন মনুসহ দেবতা, সপ্তর্ষি ও মনুপুত্রগণ কালে লয় প্রাপ্ত হন।

মন্বন্তরকালের পরিমাণ গণনায় প্রাচীন ভারতবাসীর কাল-জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মিনিট-সেকেণ্ড দ্বারা আমরা কাল গণনা করিয়া থাকি, প্রাচীন ভারতে ছিল নিমেষ-পরার্দ্ধের গণনা। কোন একটি বস্তুর ভোগকালই কাল। এই কালের সূক্ষ্মতম বিভাগ 'নিমেষ': 'অক্ষিপক্ষ্ম পরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্তিতাঃ' —চোখের পাতার একটি মাত্র স্পন্দনকালই নিমেষ, উহাকে পলকও বলে। দুই নিমেষে এক 'ত্রুটি' (কোন পদার্থের দৃশ্যমান ক্ষুদ্রতম অংশ 'ত্রসরেণু' যে কালপরিমাণ ভোগ করে, তাহাই ত্রুটি—ভাগ ৩. ১১); তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ'; ছয়ক্ষণে এক 'দণ্ড'; দুই দণ্ডে এক 'মুহূর্ত' ('দ্বাদশক্ষণ পরিমিতঃ কালঃ'—মেদিনী) সাড়ে সাত

১। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্বং ততঃ স্বারোচিষো মতঃ।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ।
বৈবস্বতোঽয়ং যস্যৈতৎ বর্ততেঽন্তরম্॥..... [কূর্ম, পূর্ব, ৫০]
ভবিষ্যতি চ সাবর্ণো দক্ষসাবর্ণ এব চ;
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণো ধর্ম একাদশঃ স্মৃতঃ॥
দ্বাদশো রুদ্রসাবর্ণো রৌচ্য নামা ত্রয়োদশঃ।
ভৌত্য শ্চতুর্দশঃ প্রোক্তা ভবিষ্যা মনবঃ ক্রমাঃ। [কূর্ম, পূর্ব ৫২]

দণ্ডে এক প্রহর, অষ্ট প্রহরে এক 'অহোরাত্র'। পনের অহোরাত্রে এক 'পক্ষ'; দুই পক্ষে এক 'মাস'—মানুষের দুই পক্ষে যে মাস হয়, তাহাই পিতৃগণের এক দিন-রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিবস, শুক্লপক্ষ রাত্রি [কালিকা ২৪] মনুষ্যমানের ছয় মাসে এক 'অয়ন'; দুই অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) এক বৎসর। মানুষের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি—দক্ষিণায়ন দেবতার রাত্রি, উত্তরায়ণ দিন ['অয়নং দক্ষিণং রাত্রি দৈবানামুত্তরং দিনম্'—বিষ্ণু ১. ৩]। দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক চতুর্যুগ (চতুর্যুগ=সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি); এইরূপ এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক 'মন্বন্তর'; চতুর্দশ মন্বন্তরে এক 'কল্প'—ইহাই ব্রহ্মার একদিন [ব্রহ্মণো দিবসে বিপ্রা মনবশ্চ চতুর্দশঃ'—কূর্ম পূর্বঃ ৫]। কল্পান্তে প্রলয় সংঘটিত হয়, আসে ব্রাহ্মীনিশা—এই নিশাও এক কল্পকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ দুই কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ব্রাহ্মমানের তিনশত ষাট অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর; এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু—তাহাকে 'পর' বলে; এই পরের অর্ধেক 'পরার্দ্ধ'। পরার্দ্ধই কালের বিপুলতম পরিচিত বিভাগ।

কালেই সৃষ্টি, কালেই ধ্বংস। তাই কাল গণনায় 'প্রলয়'-এর প্রশ্ন আসে। প্রলয় চারি প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। প্রতিনিয়ত জগতে যে মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিত্য প্রলয়; ব্রহ্মদিবার অবসানে, অর্থাৎ কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় সংঘটিত হয়; এই প্রলয়ে সৃষ্টি একার্ণবে পরিণত হয়; দ্বিপরার্দ্ধের প্রাকৃত প্রতিসঞ্চর বা প্রাকৃত প্রলয় ঘটে, তখন সমগ্র সৃষ্টি প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়।[১] মহা প্রলয়ে মহা বিপর্যয়। তখন দ্বাদশ সূর্যের কিরণে ব্রহ্মাণ্ড উত্তপ্ত হয়, প্রচণ্ড অগ্নিদহনে সৃষ্টি দগ্ধ হইয়া যায়। এই সময় একসঙ্গে উনপঞ্চাশ মরুৎ প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। তারপর সংবর্তাখ্য মহামেঘ সকলের সঞ্চার হয়—কোন মেঘের বর্ণ দলিতাঞ্জন সন্নিভ, কোন মেঘ ধূম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। তাহারা পর্বতাকারে বা কুঞ্জরাকারে আবির্ভূত হইয়া ঘোর গর্জনে, প্রবল বর্ষণে সৃষ্টিকে একাকার করিয়া দেয়। তখন রাত্রি থাকে না, দিন থাকে না, আকাশ-পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার কিছুই থাকে না, থাকেন শুধু নিরাধার, নিরাকার, নিঃসত্ত্ব, বিশেষণবর্জিত, সচ্চিদানন্দঘন 'একং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমান্'।[২] 'অত্যন্তিক প্রলয়ে'—

১। তস্যান্তে সর্বসত্ত্বানাং স্বহেতৌ প্রকৃতৌ লয়ঃ।
তেনায়ং প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥ [কূর্ম পূর্ব ৫]

২। নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি—
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপ লভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥ [বিষ্ণু ১২; কালিকা ২৪]

জ্ঞানী ও যোগিগণ এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। প্রলয়ের এই অনন্ত শূন্য অবস্থাই পুনঃ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। পুরাণমতে যেখানে লয়, সেইখান হইতেই সৃষ্টি। প্রলয়ই সৃষ্টির হেতু [আত্যন্তিক প্রাকৃতিকশ্চ যোঽয়ং নৈমিত্তিকশ্চ প্রাগুসর্গ হেতুঃ—বায়ু ৩. ২৩] সৃষ্টি ও প্রলয় একই দেবতার দুই লীলা।

পুরাণের পঞ্চম লক্ষণ 'বংশানুচরিত'। বংশানুচরিত বলিতে বুঝায়, কোন বংশোদ্ভূত প্রবর অর্থাৎ কীর্তিমান দেব, ঋষি ও পৃথ্বীপালগণের চরিত ['দেবর্ষি পার্থিবানাঞ্চ চরিতম্—বিষ্ণু ১. ১]। সূর্যবংশের প্রখ্যাত পুরুষ ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ককুৎস্থ, রঘু। চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন পুরূরবা, নহুষ, যযাতি। স্বায়ম্ভুব মনুর কুলপাবন পুত্র ধ্রুব। দৈত্য ও দানবকুলেও কীর্তিমান সন্তানের অভাব হয় নাই। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, বলি, বিরোচন—দানবকুলের বৃত্র, পুরাণ প্রসিদ্ধ। এইরূপে দেব, ঋষি বা মন্বাদির বংশে দানে ধ্যানে তপস্যায় রাজ্যপালনে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, বংশানুচরিত তাঁহাদের কীর্তিগাথা। বংশানুচরিতের অর্থ আর একটু প্রসারিত করিলে অবতারাদি চরিত্রও এই পর্যায়ে পড়ে। ভাগবতোক্ত ঈশানুকথা বংশানুচরিতেরই সম্প্রসারণ। কারণ, পরশুরাম, বলরাম, রাম প্রভৃতি অবতার মর্ত্যের কোন বংশকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভূত। পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণও যদুকুলোদ্ভব।

বংশানুচরিতবর্ণনা পুরাণের একটি বৃহৎ অংশ। চরিত বর্ণনা দ্বারা পুরাণকার পুরাণের অন্যতম উদ্দেশ্য—'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ', 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' প্রভৃতি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। মনোজ্ঞ কাহিনীর মাধ্যমে ইহাতে সৎকর্ম, সদাচার ও নীতিধর্মের জয় উদ্ঘোষিত হইয়াছে। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে, আদর্শ গঠনে ও সৎকর্মানুষ্ঠানে পৌরাণিক চরিত্র অশেষ প্রেরণার উৎস।

এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত বিবিধ আখ্যান (স্বয়ংদৃষ্ট কথা), উপাখ্যান (শ্রুতার্থের কথন), গাথা (পিতৃ বা ঋষি কর্তৃক গীত প্রাচীন শ্লোক) ও কল্পশুদ্ধি (শ্রাদ্ধকল্প ও ব্রত-পূজাদির বিধান) যুক্ত করিয়া পুরাণকার ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।[১] ইহার ফলে পুরাণের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিপুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালক্রমে পুরাণবক্তা সূতগণও উহাতে বিবিধ কথা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্কলনকালে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের নানা বিষয়ও যুক্ত হইয়াছে। ফলে অধুনাপ্রচলিত পুরাণ হইয়াছে সার্বভৌমিক হিন্দুত্বের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ইহাতে না আছে, এমন বস্তু নাই। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম আচার-আচরণ, দর্শন, পূজাপদ্ধতি, নানা সংস্কার ও কুসংস্কার

১। আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥ [বিষ্ণু ৩. ৬]

সবই পুরাণের অন্তর্গত। পণ্ডিতপ্রবর Winternitz বলেন, 'They afford us a far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of god, its philosophy and superstition, its festivals and ceremonies and its ethics, than any other works. [A Hist. of Ind. Lit Vol I] উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

২. পুরাণের বিশিষ্টতা

পঞ্চ লক্ষণ দ্বারা পুরাণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথাও জানা যায়। জনসাধারণের মধ্যে বেদার্থ প্রচার করা পুরাণের অন্যতম লক্ষ্য। বেদের মর্মার্থ গূঢ় ও রহস্যময়। পুরাণ জনসাধারণের বেদ, তাই উহা বেদের সরলতর বিস্তৃত ভাষ্য। শুধু তাই নয়, পুরাণে লোক-সংস্কার ও বিশ্বাসকেও অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

(i) বেদাদি সাহিত্যেও লোক-সংস্কৃতির মিশ্রণ রহিয়াছে। লোক-সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিকতা থাকিলেও অযজ্ঞা, অব্রতা ব্রাত্যদের আচার-আচরণ, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি অদ্ভুত বিশ্বাস বেদে স্থানলাভ করিয়াছে। অথর্ববেদে ও ব্রাহ্মণে ব্রাত্যগণ সুউচ্চ দেব-মর্যাদার অধিকার পাইয়াছেন, কোথাও গ্রামদেবতা, কিংবা পাপদেবতা নির্ঋতি সম্মানলাভ করিয়াছেন। বেদ অপেক্ষা পুরাণে এই মিশ্রণ আরও স্পষ্ট ও বহুব্যাপক।

পুরাণে মূর্তি-কল্পনা, মূর্তির অধিষ্ঠানভূমিরূপে দেবস্থান (থান) বা তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা, দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য এবং দেবপূজার প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। বৈদিক যুগে যদিও বিগ্রহবৎ দেবকল্পনা ছিল, কিন্তু সত্যই দেবতার কোন বিগ্রহ ছিল না। পুরাণে দেবতা মাত্রই মূর্তিমান বিগ্রহ।[১] পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুর যে অখ্যাতি, তাহার প্রচার পুরাণ হইতেই। দেবতার প্রতিমা-প্রতীক প্রাগার্য যুগে

১। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, ভারতবাসী মূর্তি-কল্পনার জন্য গ্রীকদিগের নিকট ঋণী। ইহা সত্য নয়, কারণ, গ্রীক আগমনকালেও যে এদেশে হারকিউলিসের অনুরূপ (সম্ভবতঃ কৃষ্ণ) এবং ডায়োনিসাসের অনুরূপ (সম্ভবতঃ শিব) বিগ্রহ ছিল, মেগাস্থিনিসের Ta India বা ভারত-বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। দেবমূর্তির প্রচার এদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী মূর্তিগুলি তাহার সাক্ষ্য। মনে হয়, মূর্তিকল্পনা প্রাগার্য জাতি হইতেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। মহাভারতে দেখা যায়, নিষাদ-তনয় একলব্য গুরু দ্রোণের মৃন্ময় মূর্তি গড়িয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। [মহা, আদি. ১৩৪]।

প্রচলিত থাকিলেও উহার প্রতিষ্ঠা পুরাণে। এই দেবতার লীলা-কাহিনী, অধিষ্ঠান-ভূমিরূপে অসংখ্য তীর্থ ও দেব মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাও পুরাণে। দেবমূর্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়ায়, পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-স্নানীয়-পুষ্প-চন্দন-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য যোগে দেবতার বাহ্য পূজা এবং দেবতার সুদীর্ঘ স্তব-স্তুতির বাহুল্যও পুরাণের ব্যাপার। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, 'পূজা, ফুল' প্রভৃতি শব্দগুলি অন্-আর্যভাণ্ডারের শব্দ। পুরাণ-প্রবক্তা ব্যাসদেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, অরূপের রূপকল্পনা, সর্বব্যাপীকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা এবং অনির্বচনীয়কে স্তব-স্তুতিতে বচনীয় করিয়া তুলিবার প্রয়াস—তিনি নূতন করিয়া প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্যাসদেবের এই স্বীকৃতি পৌরাণিক প্রতিমাকল্পনায় স্তুতিরচনায় ও তীর্থ-কল্পনায় লৌকিক প্রভাবেরই সূচনা করে। পুরাণের দেববিগ্রহে, ভক্তির মাত্রাধিক্যে, বাহ্য পূজার আড়ম্বরে এবং তীর্থিক মনোভাবে নিঃসন্দেহে আর্যেতর সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

পুরাণের দেবতাও বৈদিক দেবতা হইতে ভিন্নতর। বেদের ইন্দ্র-অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বরুণ পুরাণের প্রধান দেবতা নন। পুরাণে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ['ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাণাং মাহাত্ম্যং'—মৎস্য ৪৪] ইঁহাদের সহিত আছেন শক্তিদেবতা দুর্গা বা কাত্যায়নী বা চণ্ডী। বেদে ব্রহ্মা নামের প্রতিষ্ঠা ঈষৎ পরবর্তী কালের। অবশ্য প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব, বেদে ও পুরাণে একই প্রকার। বেদের বিষ্ণু ও রুদ্র পৌরাণিক বিষ্ণু ও রুদ্র হইতে স্বতন্ত্র। বেদে বিষ্ণু সূর্যের প্রকার ভেদ, পুরাণে বিষ্ণু স্থিতির দেবতা। বেদের ত্রিপাদক্ষেপী বিষ্ণু পুরাণে ত্রিবিক্রম, তিনি বলির শাস্তা বামন অবতার। শুধু তাই নয়, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, প্রেমিক কমলাপতি ও ভক্তবৎসল ভগবান। দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণের সহিত তাঁহার অভিন্নতাও লক্ষণীয়। গোপকুলের সহিত বিষ্ণুর সম্পর্ক আবিষ্কার পুরাণেরই অভিনব কল্পনা—আর এই কল্পনার সহিত লোকজগতের সম্পর্ক অতি নিবিড। পুরাণের রুদ্র সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। বেদে রুদ্র ওষধিপতি, ভয়ঙ্কর দেবতা; শতরুদ্রিয় সূক্তে তিনি দস্যু-তস্করের পতি। বেদের রুদ্রাধ্যায়ের রুদ্র পুরাণে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, এখানে তিনি প্রধানতঃ ভূত-প্রেতাদির অধীশ্বর; উপরন্তু পৌরাণিক শিব নটরাজ প্রলয়ের অধিদেবতা, নগ্ন ভিখারী, উমাপতি ও আশুতোষ; সর্বাপেক্ষা বড় কথা পুরাণের রুদ্র মহাযোগী, তিনি যোগীশ্বর। বৈদিক সাহিত্যে দুর্গা ও উমাহৈমবতীর নাম আছে। কিন্তু সেখানে শক্তিদেবীর ভূমিকা প্রধান নয়। পুরাণে দুর্গা ও উমাহৈমবতী বিশিষ্ট শক্তি-মূর্তি; দুর্গা দনুজ-দলনী, মহিষমর্দিনী—উমা প্রেমিকা ও তপশ্চারিণী অপর্ণা—উভয়েই শিবশক্তি। পুরাণের শিব ও শক্তি অসুর-রাক্ষসের উপাস্য—ইহাও লৌকিক প্রভাবের

দিক হইতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাণের লীলাবাদে শক্তির স্বীকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতিকে পুরুষের স্ত্রীরূপে কল্পনা, যোগের অধিদেবতারূপে শিবের প্রতিষ্ঠা এবং শিবশক্তির মেলন ক্রিয়াই 'যোগ', দেবতার রূপ-চিন্তনই ধ্যান—এগুলির মধ্যেও লোক-সংস্কারের প্রভাব অল্প নয়।

(ii) সরলীকরণের চেষ্টা পুরাণের অপর বৈশিষ্ট্য। বেদ-দর্শন-তন্ত্রের পরবর্তী যুগটিই বিশেষভাবে পৌরাণিক যুগ। ইহা জনসাধারণের উপযোগী করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতে বেদের দুরূহতা, ক্রিয়াকর্মের জটিলতা, দর্শনের কঠিনতা ও তন্ত্রের রহস্যময়তা যথাসম্ভব পরিহার করা হইয়াছে। পুরাণ যেন বঙ্গের সমতল গাঙ্গেয় ভূমি, উহাতে বন্ধুরতা নাই, প্রস্তরময় ভূভাগের কাঠিন্য নাই, নীরসতা নাই। পুরাণের ধর্ম, কর্ম, দর্শন—সবই সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য। বেদের যাগ-যজ্ঞ ব্যয়বহুল। পুরাণে সোমযাগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'ন সর্বসাধ্যো যজ্ঞোঽয়ং বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ' [ব্র. বৈ. কৃষ্ণ. ৬০] রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও তথৈব চ। পুরাণে তাই ধর্মাচরণের সহজ ব্যবস্থা, ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞের পরিবর্তে স্বল্পব্যয়ের ব্রত-পার্বণের নির্দেশ—উমাব্রত, মাহেশ্বরী ব্রত, সাবিত্রীব্রত, বিভিন্ন তিথি ও বারব্রত। দর্শনের জটিলতাও পুরাণে সরলীকৃত। নির্গুণ নির্বিশেষ তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও উপাসনার ব্যাপারে পুরাণে সগুণ ব্রহ্মেরই প্রাধান্য।[১] নির্গুণ নিরাকারকে ধারণা করা কষ্টকর; পুরাণে তাই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিমা, বন্দনা, ধ্যান, স্তুতি, দেবতার প্রতি ভক্তি এবং পূজার্চনা দ্বারা দেবতার তুষ্টিবিধানের প্রয়াস। তন্ত্রসাধনাও পূজাবহুল। কিন্তু তন্ত্রের পূজা যন্ত্রাত্মক, মন্ত্রাত্মক ও যোগাত্মক বলিয়া জটিল—পৌরাণিক পূজাবিধি সরল ও জটিলতা-বর্জিত। এখানে পঞ্চোপচারেও দেবপূজার বিধান আছে। উপচার যদি না মিলে তাহাতেও ক্ষতি নাই—পুরাণমতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপচার।

পুরাণের ভাষাও সহজ সরল। লোকব্যবহারের উপযোগী সহজ সংস্কৃত ভাষাই পুরাণের বাহন। এই ভাষায় শব্দের দুরূহতা নাই, ব্যাকরণের কড়াকড়ি নাই। ইহা অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জিত। পুরাণের এই ভাষা ব্রাহ্মণের সরল ও অনাড়ম্বর গদ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের গদ্য যেন ব্রাহ্মণেরই গদ্য।

(iii) পুরাণের আর একটি বিশেষত্ব সমন্বয় প্রচেষ্টা। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় তো আছেই, উপরন্তু আছে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সমন্বয়, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের সন্ধি, বেদান্ত ও সাংখ্যের মিলন, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। বিগ্রহবৎ

১। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ [গীতা ১২. ৫]

দেবতার প্রতি একান্ত ভক্তি-বিশ্বাসই এই সমন্বয়বাদের মণিশৃঙ্খল। পুরাণমতে সর্বভূতে দেবতার অধিষ্ঠানবোধই জ্ঞান, সেই দেবতার প্রীত্যর্থে পূজা-অর্চনাই কর্ম, এবং দেবতার প্রতি ভক্তি ও প্রপত্তিই মুক্তিলাভের উপায়। দেবতাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একাশ্রয়। দেবলীলার প্রতি পুরাণের অগাধ বিশ্বাস। এই লীলাবাদে স্বর্গ ও মর্ত্য প্রেমভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, লীলার রহস্যময় স্বতঃপ্রকাশ শক্তিকে স্বীকার করায় বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও তন্ত্রের পরাশক্তির মধ্যেও একটি আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। সৃষ্টি-তত্ত্বেও সমীকরণের চেষ্টা প্রবল,—অব্যক্ত ও ব্যক্ত এখানে এক দেবতার দুই দিক; এই সৃষ্টি-প্রকরণে ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি ও বহু পুরুষ বাদ এবং বেদান্তের ব্রহ্মবাদের ঐকতান ধ্বনিত হইয়াছে।

(iv) কাহিনী-প্রাধান্য পুরাণের অপর বিশেষত্ব। পুরাণ কথা ও কাহিনীর মহাসমুদ্র। কি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায়, কি বংশকীর্তনে, কি তীর্থ-মাহাত্ম্য ঘোষণায়, ধর্মাধর্ম পবিজ্ঞানে, সদাচার কথনে, শ্রাদ্ধকল্প বর্ণনে, অফুরন্ত কাহিনীর সমাবেশ। দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্থন, মদনভস্ম, উমা-মেনকা সংবাদ, হর-পার্বতী বিবাহ, ত্রিপুরদহন, মহিষাসুর-মর্দন, শুম্ভনিশুম্ভ বধ, বৃত্রসংহার, ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, বলির দর্পচূর্ণ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংবাদ, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা কাহিনী, পুরুরবা-উর্বশীবৃত্তান্ত, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও বিবিধ দেবীলীলা—কাহিনীর যেন শেষ নাই। কথায় কথায় কাহিনী, কাহিনীর ভিতর আবার কাহিনী-সম্পুট।

এই কাহিনীই সরল পঞ্চলক্ষণ-সমন্বিত পুরাণকে বিপুল ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সংযোজনা ও কপোল-কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিয়াছে এই কাহিনী। লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব, কল্পনার অতিরঞ্জন ও বর্ণনার বাহুল্য,—এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহিনী-গুলিই কুসংস্কারের আকর। ইহা দ্বারা সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছে যে, রাহু বা কেতু সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে জন্যই গ্রহণ হয়, কূর্মপৃষ্ঠে ধরণী অবস্থিত থাকায় কূর্মের দেহ আস্ফালনে ভূমিকম্প হয়। কাহিনীগুলিই দৈব-নির্ভরতাকে দৃঢ় করিয়া পুরুষের পৌরুষকে দুর্বল করিয়াছে।

কিন্তু, এই কাহিনীর আবার অন্য দিকও আছে। কাহিনীগুলি জীবনের স্বাদে পূর্ণ। মানুষের কামের পরিণাম, আসুরী ভাবের শোচনীয় গতি, দৈবভাবের দয়া, ক্ষমা, দান ও ধর্মের মহিমা ও জীবের ভাবস্থির সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির কাহিনীগুলির আবেদন চিরকালীন। নীতিধর্মের জয়-ঘোষণায় পৌরাণিক কাহিনীর মূল্য অসাধারণ। কতকগুলি কাহিনী রূপকাশ্রিত। সাহিত্য-কৃতি হিসাবে ইহাদের মূল্য অপরিসীম। তত্ত্বের দুরূহ জটিলতা এই কাহিনীর মাধ্যমে সরল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

৩. পুরাণ পরিচয়

(i) পুরাণের সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ

পুরাণের সংখ্যা আঠার ['অষ্টাদশ পুরাণানি'] এবং উহাতে মোট চারি লক্ষ শ্লোক। পূর্বে পুরাণ একখানি ছিল, ব্যাসদেব তাহাকে আঠার খানি সংহিতায় বিভক্ত করেন। ক্রমানুসারে পুরাণগুলির নাম—(১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈষ্ণব, (৪) শৈব বা বায়বীয় (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আগ্নেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্ম বৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বারাহ, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কৌর্ম, (১৬) মাৎস্য, (১৭) গারুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।*

এই পুরাণগুলিকে কোথাও কোথাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। পুরাণমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রতীক। দেবতার গুণভেদে তাই পুরাণেরও প্রকার ভেদ। ভাগবত, নারদীয়, গারুড়, পাদ্ম, বারাহ ও বিষ্ণুপুরাণ সাত্ত্বিক; ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন পুরাণ রাজসিক এবং শিব লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য ও কূর্ম পুরাণ তামসিক।

কিন্তু, পুরাণগুলির এরূপ অবাস্তব ভেদকল্পনা অযৌক্তিক। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব গুণত্রয়ের বিশিষ্ট প্রতীক হইলেও পুরাণের এই ত্রিমূর্তি মূলতঃ এক। শুধু তাই নয়, সাত্ত্বিক পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য আছে (যেমন পাদ্ম-সৃষ্টি), রাজসিক পুরাণে বিষ্ণুর মহিমা ঘোষিত হইয়াছে (যেমন, ব্রহ্মবৈবর্ত ও বামন), আবার তামসিক পুরাণেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে (যেমন স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ড), আবার মার্কণ্ডেয় বামন ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে শক্তি-মাহাত্ম্য। কাজেই গুণ বা দেবতা ভেদে পুরাণের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সহিত লৌকিক সংস্কারের মিশ্রণে পুরাণগুলির উদ্ভব। মনে হয়, এই লৌকিক সংস্কারের প্রভাবের ক্রমাধিক্য বিচার করিয়াই পরবর্তীকালে পুরাণের এই অবান্তর ভেদ কল্পিত হইয়াছে।

* ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ বায়বীয়ং তথৈবচ
ভাগবতং নারদীয়ং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ কীর্ত্যতে।
আগ্নেয়ঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লিঙ্গকে।
বারাহঞ্চ তথা স্কান্দং বামনং কূর্ম্মসাংজ্ঞিকম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ং তদ্বদ্ ব্রহ্মাণ্ডাখ্য ইতি ত্রিবট। [নারদীয় পুরাণ]

(ii) অষ্টাদশ পুরাণের পরিচয়

ব্রহ্ম পুরাণ: পুরাণগুলির মধ্যে ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মপুরাণকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়। ইহা পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে দেবতা ও অসুর এবং সূর্য ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি বিবরণ আর উত্তর ভাগে আছে তীর্থাদির বর্ণনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বর্ণাশ্রমধর্মের কথা; শেষের দিকে সাংখ্য, যোগ ও জ্ঞানের আলোচনা। উত্তর ভাগের অন্যতম আখ্যান বিস্তৃত কৃষ্ণচরিত। তীর্থাদির বর্ণনায় উড়িষ্যার তীর্থ-মন্দিরাদির উল্লেখও দৃষ্ট হয়। এই অংশ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ।

পদ্ম পুরাণ: পাদ্ম বা পদ্মপুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত: সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। সৃষ্টিখণ্ডে পুলস্ত্য-ভীষ্ম সংবাদে পুষ্কর মাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞ, বিবিধ ব্রতকথা এবং শৈলজার জন্ম, বিবাহ, কার্তিকেয়ের জন্ম এবং তারকাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। ভূমিখণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—পিতৃ-মাতৃ-পূজা, বৃত্র-নহুষ-যযাতির উপাখ্যান এবং সতী আশোক-সুন্দরীর কাহিনী। স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, লোকসংস্থান ও তীর্থাদির বিবরণ; শেষাংশে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ব্রতাদির কথা। পাতালখণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী সহ পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডস্থ রামায়ণ-কাহিনী নানাদিক হইতে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। ইহাতে লব-কুশের সহিত রামসৈন্যের যুদ্ধের বিবরণ আছে। উত্তরখণ্ডে হর পার্বতী সংবাদে পর্বতের কাহিনী, সগররাজার উপাখ্যান এবং গয়া-গঙ্গা-প্রয়াগ-কাশীর মহিমা। উত্তরখণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ 'গীতা মাহাত্ম্য' ও 'ভাগবত মাহাত্ম্য'। উত্তরখণ্ড নানাদিক হইতে বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত। এই উত্তরখণ্ডের পরিশিষ্ট 'ক্রিয়াযোগ [illegible]'। ইহাও বৈষ্ণবগণের অতি আদরণীয়। ক্রিয়াযোগ-সারে বর্ণিত মাধব-চন্দ্রকলার উপাখ্যানের সহিত ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণু পুরাণ: এই পুরাণ বৈষ্ণবদের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার দুই ভাগ—প্রথম ভাগটিই মূল্যবান। ইহা পরাশর-মৈত্রেয় সংবাদে ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি পত্তন, কল্পান্তে পুনঃ সৃষ্টি এবং দেব ও ঋষি বংশের বর্ণনার সহিত আছে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশে আছে ভূমণ্ডল বর্ণনা, দ্বীপ ও বর্ষ সংস্থান এবং প্রিয়ব্রত ও জড় ভরতের উপাখ্যান। তৃতীয় অংশের আরম্ভ মন্বন্তর বর্ণনা লইয়া; তাহার পর বেদব্যাসের অবতার, বেদবিভাগ ও পুরাণ-সংহিতা প্রণয়নের ইতিহাস। এই অংশেই শ্রাদ্ধকল্প ও সদাচার কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আছে বেদবিরোধী দিগম্বর ও রক্তাম্বর সন্ন্যাসীদের নিন্দা:

এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা নহি এতানালপেদ্ বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্॥ [বিষ্ণু. ৩. ১৮]

—ইহারা পাষণ্ডী, পাপী; পণ্ডিত ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সম্ভাষণে সেই দিনের পুণ্য নাশ হয়।

অংশ বংশানুচরিত বর্ণনা। সূর্য ও সোমবংশ হইতে ভবিষ্য রাজবংশ—শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্রবংশের বিবরণ। ইহা গদ্যে রচিত[১]; মাঝে মাঝে অতি প্রাচীন গাথাজাতীয় শ্লোক। মনে হয়, গুপ্তযুগে যখন পুরাণগুলি পুনর্লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়েই এই ভবিষ্য অংশ যোজিত হইয়া থাকিবে। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত। ইহার রাস ও গোপীগীত অংশ অতি মধুর। ইহাতে রাধার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকায় গোপীদের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন—'সহ গোপীভির্নিশশ্চক্র রতিং প্রতি।' ষষ্ঠ অংশে কলি-জাত চরিত্র, চতুর্বিধ লয় ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত একটি প্রাচীন পুরাণ।

বায়ুপুরাণ: এই পুরাণ শিবপুরাণ নামেও খ্যাত। ইহা পূর্ব ও উত্তর—এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সৃষ্টিপ্রকরণ, বংশবর্ণন, মন্বন্তর কথন, পাশুপতযোগ, দানধর্ম, রাজধর্ম ও গয়াসুর বৃত্তান্ত; উত্তরভাগে প্রধানতঃ শঙ্কর-নর্মদা-কাহিনী। এই পুরাণটিকে প্রায় সকলেই সুপ্রাচীন বলিয়াছেন। ইহাও পঞ্চলক্ষণান্বিত। রুদ্রলোকে বাস ও রুদ্রত্ব লাভ করাই এই পুরাণের ফলশ্রুতি। ভারতবর্ষের প্রাচ্য জনপদগুলির বর্ণনায় এই পুরাণে প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বিদেহ, মগধ ও তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখিত হইয়াছে [বায়ু. ৬৩]।

ভাগবত পুরাণ: পুরাণগুলির ভিতর অন্যতম ভাগবত পুরাণ। শাক্তগণ মনে করেন, 'ভাগবত' বলিতে 'দেবী ভাগবত'কে বুঝায়। কিন্তু কি ভাষার দিক হইতে, কি বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেবীভাগবতে প্রাচীনতার লক্ষণ অল্প। উহাতে মঙ্গলচণ্ডী, মনসার পূজাবিধানও স্থান পাইয়াছে। ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় মহাশক্তির বিবিধ লীলা ও দেবীমাহাত্ম্য। ইহাতে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রের নবরাত্র বিধানে দেবীপূজার উল্লেখ আছে [তৃতীয় স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়]। দেবীভাগবত মতে দেবীই 'কারণং সর্বজন্তূনাম্', শুধু তাই নয়, 'তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো, ভবেৎ'। দেবীভাগবত বহুল পরিমাণে তন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত।

১। গদ্যাংশের নমুনা: মহানন্দিসুতঃ শূদ্রগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ ...তান্‌নন্দান্‌ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাংশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যে অভিষেক্ষ্যতি। ইত্যাদি।

ভাগবত বলিতে প্রচলিতার্থে বৈষ্ণব ভাগবতকেই বুঝায়। ইহা বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-গ্রন্থ এবং চৈতন্যদেব-প্রচারিত গৌড়ীয় প্রেম-ভক্তি ধর্মের আকর। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়। ইহা নিগম-নির্গলিত কল্পতরুর অমৃত। ইহা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত: প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের উপাখ্যান, দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরাণলক্ষণ ও সৃষ্টি-প্রকরণ, তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরচরিত ও ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃত্তান্ত, চতুর্থে সতী চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র ও প্রাচীনবর্হির আখ্যান—পঞ্চমে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত লোক-সংস্থান বর্ণনা, ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল-চরিত্র, দক্ষ সৃষ্টি ও বৃত্রাসুরের কাহিনী, সপ্তমে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম কথন, অষ্টমে গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, বলির বৈভব ও মৎস্যাবতার এবং নবমে সূর্য ও সোমবংশের বিবরণ। দশমস্কন্ধ ভাগবতের প্রধান অংশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার অংশ অতি মধুর। প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম ব্রজলীলার অন্যতম বিষয়; ভাগবতে রাধার নাম নাই, কিন্তু রাসলীলাকালে কৃষ্ণ যে একজন গোপীর আরাধনায় ['অনয়ারাধিতো'] প্রীত হইয়া অন্যান্য গোপীকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া বহঃস্থানে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ভাগ্যবতীকেই রাধা বলিয়া মনে করেন। ভাগবতের গোপীপ্রেম অনন্যসাধারণ। এই প্রেমই চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ। চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা এই নিঃস্বার্থ গোপী-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দশমস্কন্ধের রাসলীলার অংশে গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রেমের নিকট চিরঋণী কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
> স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জর গেহশৃঙ্খলাঃ
> সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ [ভাগ. ১০. ৩২. ২২]

—তোমরা গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, এ মিলন অনিন্দনীয়। দেবগণের পরমায়ু লাভ করিলেও আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিব না; তোমাদের সুশীলতা দ্বারা আমি অঋণী হইলাম।

ভাগবতের একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথায় পূর্ণ। ভগবদ্ভক্তিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। ভাগবতশ্রবণের ফলশ্রুতিও ভক্তি। অনেকে বৈয়াকরণ বোপদেবকে ভাগবতের রচনাকর বলিয়া মনে করেন। বোপদেব ভাগবত নয়, ভাগবতের অনুক্রমণী 'হরিলীলা'র রচনাকার।

নারদীয় পুরাণ: এই পুরাণখানিও বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক। ইহার পূর্ব ও উত্তর—এই

দুই ভাগ। পূর্বভাগ চারিপাদে বিভক্ত: প্রথমপাদে সৃষ্টি বর্ণনা, দ্বিতীয়ে মোক্ষোপায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বেদাঙ্গ কথন, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও পঞ্চোপাসনার বিবৃতি, তৃতীয়ে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে পুরাণলক্ষণ ও তিথিব্রতাদির বর্ণনা এবং চতুর্থে সনাতন কর্তৃক নারদের প্রতি পুরাণাখ্যান কথন। উত্তরভাগে প্রধানতঃ তীর্থবর্ণনা। তীর্থাদির মধ্যে বৈষ্ণব পীঠের বর্ণনাই মুখ্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ: এই পুরাণ ১৩৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বিভিন্ন অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রকথা, দত্তাত্রেয় কাহিনী, মদালসা-চরিত্র, সৃষ্টিপত্তন, দ্বীপ ও বর্ষ বর্ণনা, চতুর্দশ মনুর কাহিনী, অষ্টম মনু সূর্যসাবর্ণি মন্বন্তর প্রসঙ্গে 'চণ্ডী সপ্তশতী', রামায়ণ কথা, কৃষ্ণচরিত ও সাংখ্যযোগ বিবৃত হইয়াছে। আচার্য Winternitz এই পুরাণখানিকে, 'one of the oldest works of the whole Purana Literature' বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে ইহা খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত।

বস্তুতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ তো আছেই, উপরন্তু উহাতে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। রাণী মদালসার কাহিনী অলৌকিকত্ব মিশ্রিত হইলেও অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। স্বামীব মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করেন। মদালসা তাঁহার সন্তানদিগের নিকট 'তত্ত্বমসি' ঘুমপাড়ানি গান গাহিতেন। বিভিন্ন মনুব কাহিনীগুলিও বিচিত্র। এই পুরাণেব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায়: ইহাই প্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা দেবী সপ্তশতী। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই তেরটি অধ্যায়কে ষষ্ঠশতকের প্রক্ষিপ্তাংশ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুবাণে চণ্ডী সপ্তশতী প্রক্ষিপ্তও নয়, অবান্তরও নয়। এই পুবাণে মন্বন্তরবর্ণনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে মহামায়া চণ্ডীর আবির্ভাব প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণিত হইয়াছে। রাজা সুরথ এই মন্বন্তরে দেবীর আরাধনা করিয়া পরবর্তীকালে সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইয়াছিলেন। একদা রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য সংসারবিরক্ত হইয়া বনে আসেন। কিন্তু বনে আসিয়াও তাঁহারা সংসারের বন্ধনের কথা ভুলিতে পারিলেন না। কেন এই মায়া? কে এই মায়া? কি তাঁহার প্রকৃতি? মুনিবর মেধস্ এই সকল প্রশ্নের প্রসঙ্গে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনীয় বিষয়। ঋষি বলিলেন,

* নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ [শ্রীশ্রীচণ্ডী—১.১]

—সেই মহামায়া নিত্যা, প্রপঞ্চ জগৎ তাঁহারই প্রতিমা। তিনি নিত্যা হইলেও বহুপ্রকারে তাঁহার আবির্ভাব হয়—সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

'দেবীমাহাত্ম্য' দেবীলীলার এই বিচিত্র কাহিনী। সাতশত মন্ত্রে দেবীর

প্রথম চরিত্র (মধুকৈটভ বধ), মধ্যম চরিত্র (মহিষাসুর বধ) ও উত্তর চরিত্র (শুম্ভ-নিশুম্ভ বধবৃত্তান্তে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ বধের কাহিনী) বিবৃত। ইহার বর্ণনা কবিত্বময়, ভাষাও প্রাচীনতর। চণ্ডীতে লৌকিক ছন্দও ব্যবহার করা হয় নাই, গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ এই তিনটি বৈদিক ছন্দে যথাক্রমে চরিত্রত্রয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবীতত্ত্বের মূল রহিয়াছে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে [ঋ. ১০. ১২৫] এবং রাত্রিসূক্তে [ঋ. ১০. ১২৭]। চণ্ডীপাঠের পূর্বে এই সূক্ত পাঠ করিবার নিয়ম আছে। চণ্ডীসপ্তশতীর প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীসপ্তশতীর 'মৌর' বা 'কোলাবিধ্বংসী' শব্দগুলি অপ্রাচীন। কিন্তু, এই 'মৌর'—ঐতিহাসিক মৌর নয়, ইহারা দৈত্য 'মুর'-এর বংশধর। 'কোলাবিধ্বংসী'কেও জোর করিয়া যবনার্থে প্রয়োগ করা অসঙ্গত।

অগ্নিপুরাণঃ পুরাণ গুলির মধ্যে অগ্নিপুরাণের স্থান অষ্টম। ইহা ৩৮৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। Winternitz বলেন, 'The distinctive feature is this Purana is however, its encyclopaedic character'—উক্তিটি সর্বাংশে সত্য। বিষয়-বৈচিত্র্যে অগ্নিপুরাণ অনন্য। ইহাতে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-মহাভারত, সৃষ্টি প্রকরণ, দীক্ষাবিধান, অভিষেকপদ্ধতি, দেবালয় নির্মাণ, তীর্থ-মাহাত্ম্য, লোক-সংস্থান, জ্যোতিষশাস্ত্র, যুদ্ধপ্রণালী, অভিচারাদি ষট্‌কর্ম, ভেষজবিদ্যা, শ্রাদ্ধকল্প, তিথিব্রত, রাজধর্ম, শকুনিবিদ্যা, ধনুর্বেদ, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যবিচার, ব্যাকরণ, যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান—যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে কাহিনী অংশ অতি অল্প, ইহা বিধি-বিধানেরই বিস্তৃত বিবরণ। ইহা হিন্দুর অষ্টাদশবিদ্যা ও চৌষট্টি কলাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন। ৩৩৭—৩৪২ অধ্যায় ষট্‌ক কাব্যবিচারের দিক হইতে অতি মূল্যবান। অগ্নিপুরাণমতে মর্ত্যলোকে কবিত্ব দুর্লভ বস্তু ['কবিত্বং দুর্লভং তত্র'], কাব্য-সংসারে কবি স্বয়ং প্রজাপতি :

অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥ [অগ্নি. ৩৩৯. ১০]

ভবিষ্য পুরাণঃ এই পুরাণ পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের নাম ব্রাহ্ম পর্ব ঃ ইহাতে সূর্যাদির চরিত্র, সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ও কল্পবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব প্রধানতঃ ব্রহ্মা-মহিমা-বিষয়ক। দ্বিতীয় পর্বে ভোগ বিষয়ে শিবমাহাত্ম্য, তৃতীয়ে মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, চতুর্থে চতুর্বর্গবিষয়ে সূর্যমাহাত্ম্য এবং পঞ্চমে প্রতিসর্গ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণঃ এই পুরাণখানি লইয়া তুমুল তর্কের সুযোগ ঘটিয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান আকারের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে পুরাণগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'ইহার রচনা প্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্য-

দিগের রচনার মত' [কৃষ্ণচরিত-দশম পরিঃ]। কিন্তু, তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। অতএব এই পুরাণখানি যত অপ্রাচীনই হউক, উহা দশম শতকের পরবর্তী নহে।

বাংলার জনসাধারণের উপর এই পুরাণের প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের কতকগুলি লৌকিক দেবতা—মনসা, চণ্ডী—এই পুরাণে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'—এই শ্লোকটির আদর্শ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ; শুধু তাই নয়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যে রাধার কথা আছে, 'সেই রাধাই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ…এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সনাতন গোস্বামীকৃত 'ভাগবতামৃত' বা গোপালভট্ট রচিত 'হরিভক্তিবিলাস' ব্যতীত চৈতন্য চরিতামৃতাদির মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই পুরাণের উদ্ধৃতি নাই ; স্বীকৃতিও নাই। তাই ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয় থাকিয়াই যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত : ব্রাহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ও কৃষ্ণজন্ম খণ্ড। ব্রাহ্মখণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণ, নারদ-ব্রহ্মা বিবাদ, নারদের শিবলোকে গমন ও গান শিক্ষা—প্রকৃতি খণ্ডে নারদ-সার্বণি সংবাদে কৃষ্ণ হইতে প্রকৃতির অংশ ও কলাসকলের উৎপত্তি ও পূজার বর্ণনা—গণেশখণ্ডে গণেশের জন্ম, কার্তিকেয় জন্ম, কার্তবীর্য ও পরশুরামের বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকা-লীলার বর্ণনা। এই পুরাণমতে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম এবং রাধা তাঁহার স্বরূপ শক্তি,

> প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ।
> আবির্বভূব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ [ব্রাহ্ম ৫.২৭]

ইহাতে 'রাধা' নামের ব্যুৎপত্তিও দেওয়া হইয়াছে : রাসমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়াই তিনি কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম রাধা। ব্রহ্মবৈবর্তে শক্তি-বাদের প্রভাব গুরুতর।

লিঙ্গপুরাণ : ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে সৃষ্টি প্রকরণ, যোগাখ্যান, কল্পারম্ভ, লিঙ্গোদ্ভব ও লিঙ্গপূজা, ভুবনকোষ বর্ণনা, শিব মাহাত্ম্য, সূর্য ও চন্দ্রবংশের কাহিনী, বরাহ-নৃসিংহচরিত, দক্ষযজ্ঞ নাশ, কামদহন ও শিব-পার্বতীর বিবাহ। উত্তর ভাগেও শিব-মাহাত্ম্য। লিঙ্গপুরাণ শৈবধর্মের কথায় পূর্ণ, ইহাতে তান্ত্রিকতার প্রভাব বিদ্যমান।

বরাহ পুরাণ : ইহাও পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে গৌরীর উৎপত্তি, বিনায়কের কথা, নাগের কথা, অগস্ত্যগীতা, রুদ্রগীতা, ব্রত ও তীর্থকথা।

উত্তর ভাগে আছে পুলস্ত্য-কুরুরাজ সংবাদে তীর্থের মাহাত্ম্য, বিবিধ ধর্মাখ্যান ও পুরুষের পুণ্যকথা। ইহাতে শিবদুর্গার কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা কাহিনীটিও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ: পুরাণগুলির মধ্যে স্কন্দপুরাণ সুবৃহৎ। ইহাতে মোট ৮১,০০০ শ্লোক। নারদীয় পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৫০০০ এবং পদ্মপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০০। অন্যান্য পুরাণের শ্লোকসংখ্যা আরও কম। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৯০০০—পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আকার সর্বাপেক্ষা ছোট। স্কন্দপুরাণের বিখ্যাত সাতটি খণ্ড: মাহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণব খণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, অবন্তীখণ্ড, নাগরখণ্ড ও প্রভাস খণ্ড। মাহেশ্বর খণ্ড প্রধানতঃ শিব বিষয়ক, ইহাতে দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর উপাখ্যান, কার্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবখণ্ডে—উৎকলে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান, রথযাত্রা, গুণ্ডিচাআখ্যান—ভীষ্মপঞ্চক ব্রত, অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত ও তীর্থের কথা। বৈষ্ণবখণ্ড প্রধানতঃ বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক। ব্রহ্ম খণ্ডে—সেতুবন্ধ মাহাত্ম্য, রাক্ষসাখ্যান, ও রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। শেষাংশে দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর জন্ম ও তারকবধ কাহিনী। ব্রহ্মখণ্ডের একটি উত্তর ভাগ আছে, তাহাতে আছে শিবমাহাত্ম্য, ভীষ্মমাহাত্ম্য ও উমামাহেশ্বর ব্রত। ইহাতে যজুর্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের প্রশংসা আছে। কাশীখণ্ডে—সত্যলোকের প্রভাব, পতিব্রতা চরিত্র ও লোক সংস্থান বর্ণনান্তর, কাশীর বিবরণ। এই খণ্ডও শিবমহিমা বিষয়ক। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা মঙ্গলের কাশীপ্রতিষ্ঠার বিষয়—কাশীখণ্ড হইতেই সংগৃহীত। নাগরখণ্ডে লিঙ্গোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্র কথা, বৃত্রাসুর বধ, নাগরোৎপত্তি ও গঙ্গা, নর্মদা ও সরস্বতী নদীর বৃত্তান্ত। প্রভাসখণ্ডেও নানারূপ তীর্থের বর্ণনা ও বহুত প্রাচীন কথা আছে। স্কন্দপুরাণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামস পুরাণগুলির একটি সমন্বিত রূপ।

বামন পুরাণ: ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে হরললিত, কামদাহ, দেবাসুর যুদ্ধ, দেবীমাহাত্ম্য, বলির উপাখ্যান ও বিবিধ তীর্থানুকীর্তন। উত্তর ভাগের চারিটি সংহিতা—মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী ও গাণেশ্বরী। এই পুরাণে শিবশক্তির প্রাধান্য। Wilson সাহেব মনে করেন, ইহা মাত্র ৩।৪ শত বৎসরের গ্রন্থ।

কূর্মপুরাণ: কূর্ম পুরাণকেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অর্বাচীন বলিয়াছেন। কূর্ম পুরাণেরও চারিটি সংহিতা ছিল, তন্মধ্যে কেবল ব্রাহ্মীসংহিতাখানি পাওয়া গিয়াছে। এই সংহিতা পুরাণের পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত এবং পূর্ব ও উপরি এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ভাগের বর্ণনীয় বিষয়—সৃষ্টিপত্তন, দেববংশ ও ঋষিবংশ এবং ভুবনকোষ। উপরিভাগে আছে তীর্থমাহাত্ম্য ও শ্রাদ্ধকল্প। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে আছে দুইখানি

প্রসিদ্ধ গীতা—ঈশ্বরগীতা ও ব্যাসগীতা। কূর্মপুরাণকে বেদের মন্ত্রভাগ ও কর্মকাণ্ডের সারসমুচ্চয় বলা যাইতে পারে। ইহাতে হিন্দুর নিত্যকর্মপদ্ধতিও স্থানলাভ করিয়াছে।

মৎস্য পুরাণ: মৎস্য পুরাণের আরম্ভ মনু-মৎস্য সংবাদ লইয়া [১ম ও ২য় অধ্যায়]। মহাপ্রলয়ের প্রবল প্লাবনে অবতাররূপী মৎস্যের নির্দেশে মনু কি ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। মনুর নিকট মৎস্যপ্রোক্ত পুরাণই 'মৎস্যপুরাণ'। মনু-মৎস্য আখ্যান অনেকটা বাইবেলোক্ত Noah কাহিনীর অনুরূপ। ব্রাহ্মণেও মনু-মৎস্য কাহিনী রহিয়াছে। এই পুরাণে সৃষ্টি, মন্বন্তর, তীর্থকথা শ্রাদ্ধকল্প, বাস্তুবিদ্যা এবং প্রতিমা ও মণ্ডপ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্য রাজবংশের প্রসঙ্গে যে তালিকা আছে, V. A Smith তাহাকে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করেন।

গরুড় পুরাণ: ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই খণ্ডে সমাপ্ত। পূর্বখণ্ডে তার্ক্ষ্যকল্প কথা এবং উত্তরখণ্ডে প্রেতকল্প কথা। তার্ক্ষ্যকল্পে সূর্য, লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতার পূজা, অষ্টাঙ্গযোগ, জ্যোতিষ, শ্রাদ্ধ, গ্রহযজ্ঞ, ব্রতোক্তি, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ-শাস্ত্র বেদান্ত, সাংখ্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান কথিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে আছে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার বিবরণ; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে যমলোকমার্গ, প্রেতপীড়া, প্রেতত্বমোক্ষণ ও শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ: ইহা অষ্টাদশ পুরাণের শেষ পুরাণ। ইহা প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপোদ্ঘাতপাদ ও উপসংহারপাদ—এই চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে কৃত্যসমুদ্দেশ, নৈমিষাখ্যান, হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি ও লোককল্পন কথা—দ্বিতীয়ে কল্প-মন্বন্তরাখ্যান, মানসসৃষ্টি, রুদ্রোৎপত্তি ও ভুবনকোষ বর্ণন—তৃতীয়ে সপ্তর্ষির কাহিনী, মরুৎ-উৎপত্তি, বংশানুচরিত—রজি, যযাতি, কার্তবীর্য, ভার্গব ও কলিযুগের ভবিষ্য রাজন্যগণের বিবরণ এবং চতুর্থে বৈবস্বত মন্বন্তর, ভবিষ্যৎ মনুর কর্ম ও কল্প-প্রলয়।

৪. উপপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণের ন্যায় উপপুরাণও আঠারখানি। প্রাচীন পুরাণ গুলিতে উপপুরাণের নাম দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত, গরুড় ও কূর্মপুরাণে উপপুরাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। উপপুরাণের নাম এক এক স্থলে এক এক প্রকার। ব্রহ্মবৈবর্তমতে মহাভারত, রামায়ণ, পাঁচখানি পঞ্চরাত্র (সনৎকুমারীয়, বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল ও গৌতমীয়) এবং ব্রহ্ম, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম ও কুমার—এইগুলি উপপুরাণ। কিন্তু কূর্ম ও গরুড় পুরাণধৃত নামগুলিই সমধিক প্রচলিত; উহাদের সংখ্যা ও নাম এক প্রকার, যথা, (১) সনৎকুমার,

(২) নারসিংহ, (৩) কুমার, (৪) শিব, (৫) দুর্বাসা, (৬) নারদ, (৭) কাপিল, (৮) বামন, (৯) উশনা, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) বারুণ, (১২) কালিকা, (১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাম্ব, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ ও (১৮) ভৃগু।*

পুরাণগুলি 'অপৌরুষেয়'। ব্যাসদেব ইহার সঙ্কলয়িতা কিন্তু উপপুরাণগুলি রচনা। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়া বিভিন্ন ঋষি সংক্ষেপে উপপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন। কোন না কোন ঋষির নামে উপপুরাণের নাম, যদিচ শিব, ব্রহ্মাণ্ড ও কালিকাপুরাণ সেরূপ নহে। উপপুরাণগুলিও পুরাণের মত সর্বার্থ সাধক।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্ম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত লক্ষণ সমন্বিত পুরাণকে বলা হইয়াছে—'এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ'। বস্তুতঃ উপপুরাণেও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ আছে। কিন্তু, উপপুরাণের প্রধান লক্ষণ—পুরাণের দার্শনিক মত ও আচার-বিচারগুলির বিস্তৃত বর্ণনা। উপপুরাণ একদিকে দর্শন-শাস্ত্রের পদাঙ্কাক্রান্ত, অপরদিকে ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি; উহা বহুলাংশে তন্ত্রস্পৃষ্ট।

উপপুরাণগুলিকে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, সনৎকুমারীয়, গৌতমীয় ও কাপিল পঞ্চরাত্র নামে বিখ্যাত। বৈষ্ণবীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র মতে ভগবান বাসুদেবই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে শক্তিযুক্ত। প্রপঞ্চসৃষ্টি এই শক্তির বিক্রিয়া।

বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি ছাড়া উপপুরাণগুলির মধ্যে সৌরপুরাণ ও কালিকাপুরাণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌর পুরাণ ব্রহ্মপুরাণের খিল অংশ ['ইদং ব্রহ্মপুরাণস্য খিলং সৌরমনুত্তমম—সৌর, ৯.১৪]. কিন্তু সৌরপুরাণ বস্তুত একটি শৈব পুরাণ ['শিবকথাশ্রয়ম্']। ইহা ৬৯ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয়হাজার। ইহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে, লিঙ্গ মাহাত্ম্য, যোগের অষ্টবিধ সাধন, হরোৎপত্তি এবং হরপার্বতীর বিবিধ লীলা। ইহাতে শিবনিন্দকরূপে মধ্বাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়

* আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম।
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম॥
চতুর্থং শিবধর্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশ ভাষিতম্।
দুর্বাসসোক্ত মাশ্চর্যং নারদীয়মতঃ পরম্॥
কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরীতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চৈব কালিকাহ্বয়মেব চ॥
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্বার্থ সঞ্চয়ম্।
পরাশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাহ্বয়ম্॥ [কূর্ম.পূর্ব. ১.১৭-২০]

[৩৯ অঃ]। মধ্বাচার্য এখানে ঘোর নাস্তিকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। সৌর পুরাণ মতে শিব একটি যামলতত্ত্ব : শিব অর্থ শিব-শিবা, বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় শিব-শিবা অভিন্ন।

কালিকা পুরাণ শাক্ত-সিদ্ধান্ত সমন্বিত। ইহা কমঠাদি মুনি ও মার্কণ্ডেয় সংবাদে ৯০ অধ্যায়ে বিভক্ত। কালীর ক্রিয়াকলাপ কি, তাহাই এই পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে ব্রহ্ম-সৃষ্টি, সন্ধ্যা-কাম-রতির উৎপত্তি, মহাদেবকে মোহিত করিবার জন্য দক্ষকন্যা-রূপে মহামায়ার আবির্ভাব, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, সতীর দেহত্যাগ, সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি বর্ণনা, নরকাসুর বৃত্তান্ত, পার্বতীর জন্ম, মদনভস্ম, শিববিবাহ, কালীর গৌরীত্বলাভ ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি ও দেবীপূজাবিধান বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের অন্যতম বিবরণ বেতালভৈরবের উপাখ্যান, চন্দ্রশেখর কাহিনী ও কামাখ্যা তীর্থের বর্ণনা [৬২ অঃ]। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিকথা [৮২ অঃ] ইহার আর এক কাহিনী। এই পুরাণখানি কামরূপে প্রকাশিত ইহয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। ইহাতে কামরূপ, চন্দ্রশেখর, প্রাগ্-জ্যোতিষপুর এবং ত্রিপুরার মাহাত্ম্য প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ রহিয়াছে,

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥ [কালি, ৬০. ২৬]

কালিকা পুরাণ মতে কামরূপ শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং কালিকাদেবী পরমাত্মা স্বরূপিণী। তিনিই সৃষ্টির বীজ, স্থিতির কারণ এবং অন্তকারিণী শক্তি। তিনি মহামায়া, 'মহামায়েতি সা প্রোক্তা' —তিনিই জীবজগতকে আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন ['আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং করোতি যা'], তিনিই আবার মোক্ষের হেতুভূতা : 'একা দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসার-কারিণী' [কালি, ৬ অঃ]। বাংলা দেশে এই পুরাণখানির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ : উপপুরাণ গুলির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মূল্যও কম নয়। এই পুরাণের দুইটি প্রধান অংশ—অধ্যাত্ম্য রামায়ণ ও রাধা-হৃদয়। বাংলাদেশে অধ্যাত্ম্য রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। বাংলা রামায়ণের কাণ্ডবিভাগ, ভক্তিবাদ, রাম কর্তৃক দেবীপূজা প্রভৃতি ঘটনা অধ্যাত্ম্য রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। রাধা-হৃদয়ে স্বরূপ শক্তিরূপে রাধার তত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সহিত মিল লক্ষণীয়।

কল্কি পুরাণ : কেহ কেহ কল্কি পুরাণকেও উপপুরাণ মধ্যে গণনা করেন। কল্কি-পুরাণ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের রচনা। ইহাতে ভগবান বিষ্ণু কি প্রকারে কল্কিরূপে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক বিপ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কলির সহচর বৌদ্ধ, জৈন, ম্লেচ্ছ সহ দুর্ধর্ষ কলিকে বধ করিয়া সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করিবেন, উপাখ্যানছলে সেই কাহিনী

বিবৃত হইয়াছে। সিংহল রাজকন্যা পদ্মার সহিত কল্কির বিবাহ ঘটনাটি কৌতূহলোদ্দীপক—অনেকটা রূপকথাধর্মী। এই পুরাণে কলিযুগের লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ: এই পুরাণখানি পুরাণের অন্তর্ভুক্ত নয়, উপপুরাণের তালিকার মধ্যেও ইহাকে গণ্য করা হয় নাই। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে অবশ্য ইহাকে উপপুরাণ মধ্যে ধরা হইয়াছে [বৃহ. পূর্ব. ২৫]। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইহা অপ্রাচীন; মনে হয়, পুরাণখানি বাংলাদেশেই সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: পূর্বখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্বখণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংক্ষেপে রামায়ণ বিবৃত হইয়াছে [১৮-২২ অধ্যায়]। এই পুরাণমতে রামায়ণ ও মহাভারতের পার্থক্য এই যে, রামায়ণকথা শুধু নারায়ণময় ['একং নারায়ণময়ং কৃতং রামায়ণং'], কিন্তু মহাভারত নর-নারায়ণময় ['নর-নারায়ণময়ং তন্মহাভারতং বিদুঃ]; নর হইতেছেন অর্জুন, আর নারায়ণ বাসুদেব। রামায়ণই সনাতন কাব্যবীজ; মহাভারত বা অষ্টাদশ পুরাণ এই বীজের ক্রমানুসারে লিখিত। ব্যাসদেব বাল্মীকি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই মহাভারত রচনা করেন।

মধ্যখণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—সৃষ্টি প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, গৌরীবিবাহ এবং গঙ্গোৎপত্তি। সৃষ্টিপ্রকরণ একটু বিশিষ্ট: আদিতে কিছুই ছিল না, সৃষ্টি ছিল শূন্যরূপ ও তমোঘন ['চন্দ্রসূর্যাদিরহিতং শূন্যরূপং তমোময়ম্'], শুধু ছিলেন প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতিযোগে এক ব্রহ্ম ত্রিধা বিভক্ত হইলেন এবং প্রকৃতি-সম্ভব ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) হইতে পুরুষত্রয় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) উৎপন্ন হইলেন। প্রকৃতি জল সৃষ্টি করিয়া সেই পুরুষত্রয়কে তপস্যা করিতে বলিলেন। তপস্যা আরম্ভ হইল। দেবী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শবরূপ ধারণ করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন ['শবীভূতা জলে তত্র ভাসমানা ততস্ততঃ']। ব্রহ্মা সেই শব দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন, বিষ্ণুও নিমিলীত নেত্রে জলে শয়ান রহিলেন, কিন্তু শিব বিকৃতাকার সেই শবকে গ্রহণ করিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন। ইহার ফলে তামস পুরুষ হইলেন শিবাখ্য শিবময়।[১] দক্ষযজ্ঞে যাইবার জন্য সতীর মহাবিদ্যারূপধারণও মধ্যখণ্ডের আর একটি আখ্যান। সতী পিতার যজ্ঞে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব আপত্তি জানাইলেন। ক্রোধে সতী শ্যামামূর্তি ধারণ করিলেন। অতি ভীষণ সে মূর্তি—তৃতীয় নয়নে প্রজ্বলিত রোষাগ্নি, দেহ 'ধ্বান্তাঞ্জনচয়প্রভা', তিনি মুক্তকেশা ও বিবস্ত্রা। শিব ধৈর্যচ্যুত হইয়া পলায়নে তৎপর হইলেন—কিন্তু 'দশমূর্তির্বভৌ দেবী দশদিক্ষু শিবেক্ষিতা'। শিব

১। এই কাহিনীর প্রতিলিপি পাওয়া যায় বাংলা ধর্মপূজাপদ্ধতিতে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

বুঝিলেন, সর্বস্বরূপিণী এই মহাশক্তিকে নিষেধ করার শক্তি কাহারও নাই। কাজেই তিনি দেবীকে যথারুচি গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন [মধ্য. ৬.]।[১]

মধ্যখণ্ডের আর একটি ঘটনা গঙ্গোৎপত্তির বিবরণে শিবের গান। বৈকুণ্ঠ সভায় হরির নির্দেশে শিব গান্ধার রাগ আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে সাক্ষাৎ গান্ধার রাগের আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক দূতী আসিয়া বলিতে লাগিলেন :

কেশব কমলমুখী মুখকমলং
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽস্তি বিমলম্। ধ্রুব ॥

—হে কেশব, হে কমলনয়ন, কুঞ্জগৃহে বিজনে অবস্থিত কমলমুখীর বিমল মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

মহেশ্বরও গীতে ইহার অনুমোদন করিয়া পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিতে সভাস্থল মোহিত হইয়া গেল। দূতীও একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং হরিও সেই প্রিয়াকে দেখিতে লাগিলেন। তখন সেই প্রিয়া বলিতে লাগিলেন :

রসিকেশ কেশব হে ;
রস সরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসমিব হে। ধ্রু ॥ [মধ্য. ১৪]

—হে রসিকেশ! হে কেশব! রসসরোবরের রসের ন্যায় আমাকে যোজনা করুন।

প্রাচীন নাটগীতের আদর্শ কিরূপ ছিল, শিবের এই গান, তাহার স্মারক। এই গানে জয়দেবের সুর ও বাগ্‌ভঙ্গিও লক্ষণীয়।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুইটি কাহিনীরই উল্লেখ পাওয়া যায় বীজাকারে। উত্তরখণ্ডে বসুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু অসুরনাশিনী দেবীর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে,—

ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছল গোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বনিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥ [উত্তর. ১৬]

—আপনি ছলে গোধিকা মূর্তি ধারণ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা ; আপনি কমলেকামিনী রূপে করিসমূহ গ্রাস ও বমন করিয়া শ্রীশালবাহন নৃপতি হইতে সপুত্র বণিককে রক্ষা করিয়াছেন।

১। এই আখ্যানের প্রতিরূপ রহিয়াছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে

৫. পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য

অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ, বিবিধ আচার-বিচার, নিষেধ-নিয়মের তালিকায় ভরা পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য কি? সাহিত্য সৌন্দর্যের লীলাভূমি, রসের নির্ঝর। পুরাণে কি সৌন্দর্য আছে, রস আছে?

পুরাণকারগণ বলেন, 'অতিরুচিরং পুরাণম্'—পুরাণ অতি সুন্দর, পুরাণ 'রসমালয়ম্'—রসের আকর—ইহা 'কাব্যং নূতনং পদে পদে।' শুকমুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত কথা 'অমৃত দ্রবসংযুক্ত', ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ভারতী-কামধেনুর দুগ্ধবৎ। দেবীভাগবতের মুখবন্ধে আছে,

যথা জিহ্বেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ ষড়্‌রসৈঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়াহ্লাদো বচোভিঃ সুধিয়াংস্মৃতঃ॥

—ষড়্‌রস দ্বারা যেমন রসনার আহ্লাদ জন্মে, তেমনি পুরাণ-প্রবক্তা সুধীজনের বাক্যদ্বারা কর্ণেন্দ্রিয় আহ্লাদিত হয়।

পুরাণ কথা শ্রবণ করিতে করিতে সমুদয় রোম হর্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই পুরাণের প্রবক্তা সূতের নাম 'রোমহর্ষণ'। পুরাণ-কথা দ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ করিয়াছিলেন, 'লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যৎসুভাষিতৈঃ' [বায়ু. ১. ১৫]

বস্তুতঃ পুরাণ-বর্ণিত ক্রিয়া-কর্মের অংশগুলি বাদ দিলে পুরাণকে কাব্য বলিতে বাধা থাকে না। প্রথমতঃ পুরাণের কাহিনী-গত আকর্ষণ। পুরাণ ছোট গল্পের ভাণ্ডার, বৃহৎ উপন্যাসের বীজ। ইহাতে অসংখ্য কাহিনী, আখ্যায়িকা, নীতিকথা ও ব্রতকথা আছে—আছে অসংখ্যাত দেবচরিত, ঋষিচরিত, পৃথিপালচরিত, দৈত্য-দানব চরিত আর মানবচরিত। ব্রহ্মার সৃষ্টিকাহিনী, যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নরাদির জন্মকাহিনী, জীবের চিরন্তন বৃত্তিগুলির জন্মরহস্য অতীব বিস্ময়কর। তাহা ছাড়া, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হরপার্বতীর কাহিনী, মদনভস্ম, তারকাসুর নিধন, সমুদ্র মন্থন—ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, বলির উপাখ্যান—মন্বন্তরাধিপ বিভিন্ন মনুর বৃত্তান্ত—বিষ্ণু ও শিবশক্তির বিচিত্র লীলা সাহিত্যের চিরকালীন উপাদান।

পৌরাণিক এই কাহিনীগুলি কোথাও সহজ-সরল, বর্ণনার আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ,—কোথাও উহারা রূপকধর্মী। পুরাণে রূপকের অন্ত নাই; পুরাণের প্রতিমা রূপক, উহারা এক একটি অনির্বচনীয় ভাবের মূর্ত বিগ্রহ—পুরাণের অলৌকিক ঘটনাবলীও অধিকাংশ রূপকাশ্রিত। এই রূপকসৃষ্টির পশ্চাতে পুরাণকারের কবিমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যেমন সমুদ্রমন্থনকালে 'বারুণী'র এই বর্ণনা:

ব্যাক্ষিপ্তচেতসঃ সর্বে বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ।
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং তদা॥

বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা।
কৃতাবর্ত্তা ততস্তস্মাৎ প্রস্খলন্তী পদে পদে॥
একবস্ত্রা মুক্তকেশী রক্তান্তশুক্ললোচনা। [পদ্ম. সৃষ্টি.।৪]

—(সহসা) চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও নেত্র স্তিমিত হইল; ইহা কি—এই বলিয়া সিদ্ধগণ' যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সেই ক্ষীরাব্ধি হইতে মদাঘূর্ণিতলোচনা, পদে পদে স্খলিত-চরণা বারুণী আবির্ভূত হইলেন; তিনি একবস্ত্রা, মুক্তকেশী, রক্তান্তশুক্লনেত্র।

বারুণী মদ; এই বর্ণনার মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ত, ঘূর্ণিতলোচন, স্খলিতচরণ ব্যক্তির আকৃতি ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দেবী ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে মদোৎপত্তির বর্ণনাটিও তাৎপর্যমণ্ডিত। চ্যবন ঋষি অশ্বীদ্বয়কে সোমভাগী করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাহাতে বাধা সৃষ্টি করায় ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করিবার জন্য ঋষি যজ্ঞে একটি 'কৃত্যা' উৎপন্ন করিলেন; এই কৃত্যাই মহাভয়ঙ্কর দর্পিত মদ:

মদো নাম মহা ঘোরো ভয়দঃ প্রাণিনামিহ।
শরীরঃ পর্বতাকার স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ঙ্করঃ॥
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতংশত।
ইতরে তস্য দশনার্বভূবুর্দশ যোজনাঃ॥ [দেবীভা ৫. ৭]

—মদ মহা ঘোর, প্রাণিগণের ভয়প্রদ; পর্বতপ্রমাণ তাহার দেহ, দন্তগুলি অতি ভয়ঙ্কর। তাহাব চারিটি দশন শত শত যোজন পরিমিত, অপর দশনগুলি দশযোজন বিস্তৃত।

ইহা মদ-দর্পিত অভিমানীর বিভীষণ মূর্তি, যাহার লোভ দিগন্তবিস্তৃত। পুরাণের এইরূপ কল্পনাগুলি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট কবি-কৃতির নিদর্শন। এইরূপ আরও কতকগুলি তামসীবৃত্তির মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দোঃসহ-উৎপত্তি অধ্যায়ে [৫০-৫১]।

পুরাণ-ঋষির চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতাও অসাধাবণ। অসংখ্য কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণে যে চরিত্রগুলি চিত্রিত হইয়াছে, কালের কষ্টিপাথরে তাহারা উজ্জ্বল। এক একটি চরিত্র এক একটি চিরস্থির বৃত্তির প্রতীক। দেব চরিত্রাবলীতে—ব্রহ্মার অপক্ষপাত, শঙ্করের ঔদাসীন্য, বৃহস্পতির বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষ্মীর চপলতা পুরাণ-সিদ্ধ। অন্যান্য চরিত্রাবলীর ভিতর ধ্রুবের তপশ্চর্যা, প্রহ্লাদের হরিভক্তি, বলির অভিমানিতা বৃত্রের দম্ভ, হরিশ্চন্দ্রের দান, শিবির দয়া, যযাতির ভোগলালসা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়ীভূত। চরিত্র রেখাগুলি দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পাষাণ-রেখার মত অক্ষয়। ভক্তিতে, কর্মে ও জ্ঞানে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরাণের চরিত্রাবলী এই শিক্ষাই দেয়, জীব-জগতে ধর্ম ও অধর্মের, সত্য ও অসত্যের, অমৃত ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব

চিরন্তন; অধর্ম ও অসত্য জীবকে চিরকাল আকর্ষণ করে আসক্তির দিকে, ভোগের দিকে, লাভের দিকে ও লোভের দিকে—উহাই অশান্তি ও মৃত্যু। অমৃত ও অভয়ে প্রতিষ্ঠাই জীবের পরম লক্ষ্য—দয়া, শৌচ, ক্ষমা, সন্তোষ, বিবেক সেই পথে চালিত করে। জগতের কীর্তিমান পুরুষ—মনু, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, শিবি, এই আদর্শেরই প্রতীক। পুরাণে সুখ ও দুঃখের ভোগস্থানরূপে যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা করা হইয়াছে। সদাচার, সৎকর্ম, শীলতা জীবকে স্বর্গলোকের সন্ধান দেয়—আর দুষ্কর্ম, কাম-ক্রোধ জীবকে নরকে আকর্ষণ করে। পৌরাণিক চরিত্র-কল্পনায় নীতিবোধ একটি মুখ্য মানদণ্ড। এই মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পুরাণে দৈব-নির্ভরতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৌরুষ অধিকাংশ স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ধর্মের সুসূক্ষ্ম বিচারে সার্বভৌমিক মানবতাবোধকে বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। গ্রাম্য রমণীর কৃষ্ণ-কামনা এখানে শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে [দ্রষ্টব্য ভাগবত, বিষ্ণু], ধর্মতুলাধার সাধারণ মানুষ হইয়াও শ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন [দ্রষ্টব্য পদ্ম. সৃষ্টি ৫০], বারাঙ্গনার শীলাচার তাঁহাকে স্বর্গের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র-সৃষ্টিতে মানবধর্মের এই আবেদন তুচ্ছ নয়।

পুরাণের বর্ণনা অধিকাংশস্থলে বিবৃতিমাত্র। এইজন্য বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে নির্জীব ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু স্থলবিশেষে এই সকল বর্ণনাই এমন সুন্দর ও সমৃদ্ধ, এমন ভাবাবেগকম্পিত যে, তাহা চিরকালের জন্য মনের পটে রেখাপাত করে। যেমন ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় বা ভ্রমরগীতার অংশ। রাসবর্ণনায় দেখা যায়, শারদোৎফুল্ল রজনীতে চন্দ্র উদিত হইয়া, কুঙ্কুমরাগে দিগ্‌বিভাগের বদন রঞ্জিত করিয়া দিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন। বিশ্ববিমোহন সুরে গোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন। সুরম্য রাসমণ্ডলে রাসলীলা আরম্ভ হইল। মদনবিহ্বলা গোপীগণ। সহসা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। উন্মত্তের মত গোপীগণ কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন, চেতনে-অচেতনে ভেদ নাই। কখনও অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো, তোমরা কি নন্দ-নন্দনকে দেখিয়াছ? ওগো কুরুবক, অশোক, পুন্নাগ, চম্পক, তোমরা বল, হরি কি এই পথে গিয়াছেন?

চূত পিয়াল পনসাসন কোবিদার-
জম্বর্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্বনীপাঃ।
যে হন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ [ভাগ, ১০. ৩০. ৯]

—ওগো চূত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার—ওগো জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল

আম্র, কদম্ব, নীপ—ওগো যমুনা তীরের পরার্থভাবক বৃক্ষসকল! তোমরা বল, আমাদের হৃদয় শূন্য করিয়া কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন?

রাধার বর্ণনা ভাগবতে নাই। বিরহিনী রাধার অতি চমৎকার চিত্র পাওয়া যাইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। মথুরা হইতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনে। উদ্ধব বৃন্দাবনে আসিলেন, রাধার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, 'দদর্শ পুরতো রাধাং কুহ্বাং চন্দ্রকলোপমাম্'—কুহুরজনীতে নষ্টেন্দুকল চন্দ্রের ন্যায় রাধাকে দেখিলেন, দেখিলেন,

সপঙ্ক পদ্মপত্রে চ শয়ানাং শোকমূর্চ্ছিতাম্।
রুদতীং রক্তবদনাং ক্লিষ্টাঞ্চ ত্যক্তভূষণাম্॥
নিশ্চেষ্টাঞ্চ নিরাহারাং স্বর্ণবর্ণ কুন্তলাম্।
শুষ্কিতাধর কণ্ঠাঞ্চ কিঞ্চিন্নিশ্বাস সংযুতাম্॥ [ব্রহ্মবৈ. কৃষ্ণ. ৯২ অঃ]

—রক্তবদনা রাধা মলদিগ্ধ পদ্মপত্রে শয়ানা, শোক মূর্চ্ছিতা; তিনি ক্রন্দনরতা, ক্লিষ্টা, ভূষণহীনা; স্বর্ণ-কুন্তলার আজ চেষ্টা নাই, আহার নাই; শুষ্ক অধর, শুষ্ক কণ্ঠ—শ্বাস আছে, অতি সামান্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর উৎপত্তি-বর্ণনাটিও বিস্ময়কর। মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সূর্যাদি দেবতা ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন: দেবগণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ও শম্ভু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ভ্রূকুঞ্চনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল:

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চ দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসা কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥ [চণ্ডী. ম. চ. ২ অঃ]

—অনন্তর অতি কোপাবিষ্ট বিষ্ণুর, তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহাতেজ নির্গত হইল। শক্রাদি দেবগণের দেহ হইতেও ভীষণ তেজ নির্গত হইয়া মিলিত হইল। দেবগণ সেই তেজকে দিগন্ত ব্যাপী জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় দর্শন করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা পুরাণে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। কালিকা-পুরাণোক্ত 'মদনোৎপত্তি' বর্ণনাও আর একটি স্তম্ভিত বিস্ময়। ব্রহ্মা সৃষ্টিপত্তন করিতেছেন, সহসা তাঁহার মন হইতে উৎপন্ন হইলেন বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় নীলবর্ণা

এক বরবর্ণিনী, নাম তাঁহার 'সন্ধ্যা'। এই রূপবতী কি করিবেন,—ঋষি ও দেবসঙ্ঘ যখন এইরূপ ভাবিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মার মন হইতে বিনির্গত হইলেন এক পুরুষ :

কাঞ্চনী চূর্ণ পীতাভঃ পীনোরস্কঃ সুনাসিকঃ।
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘো নীলবেল্লিত কেশরঃ॥ [কালিকা. ১.]

—তাঁহার বর্ণ কাঞ্চনচূর্ণের ন্যায় পীত; পীবর বক্ষ, সু নাসা; ঊরু, কটি, জঙ্ঘ নিটোল,—কেশ নীলকুঞ্চিত।

ইনিই মন্মথনামা মনোভব মদন। পুরাণে এই মদন-ভস্মের বর্ণনা বহুবিখ্যাত।

পুরাণের ধ্যান ও স্তুতিগুলিও কবিত্বময়। ধ্যানের বিষয় দেবতার রূপবর্ণনা। তন্ত্রশাস্ত্রই এই ধ্যানের কল্পভাণ্ডার। পুরাণেও উহাদের সংখ্যা অল্প নয়। অতি প্রচলিত ধ্যানগুলির ভিতর গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি—এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গার ধ্যান উল্লেখযোগ্য। এই বর্ণনায় সুন্দর সুনির্বাচিত শব্দ ও অলঙ্কার-নৈপুণ্যেরও অসদ্ভাব নাই : যেমন লক্ষ্মী হইয়েছেন 'কান্ত্যা কনকসন্নিভা', সরস্বতী 'তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।'

পৌরাণিক স্তুতিগুলিও সুন্দর। স্তুতিতে দেবতার গুণবর্ণনার সহিত ভক্ত-হৃদয়ের প্রার্থনা ও আকুতি মিশ্রিত হইয়াছে। বেদেও দেবস্তুতি আছে। বৈদিক স্তোত্রে 'দেহি' 'ধেহি', 'পাত', 'অব' (রক্ষা কর) প্রভৃতি সুর অতি উচ্চ গ্রামে ধ্বনিত; পৌরাণিক স্তোত্রে সেস্থলে 'নমামি', 'প্রসীদ', 'নিবেদয়ামি'—এককথায় আত্মনিবেদনের সুরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক স্তুতিতে ভক্তি জ্ঞানসংযত, পুরাণে ভক্তি আবেগোচ্ছল। পৌরাণিক স্তুতিতে দেবনির্ভরতা ও পৌরুষের অভাবও পরিদৃষ্ট হয়। 'তৎ প্রসাদং প্রসন্নাত্মন্ প্রপন্নানাং কুরুষ নঃ' [বিষ্ণু পুরাণ], 'হৃষিকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোঽস্তুতে' [মৎস্য পুরাণ]—ইহাই বিশিষ্ট সুর। আবেগোল্লসিত হওয়ায় এই স্তুতি গীতি-কবিতার মত আস্বাদ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'নারায়ণী-স্তুতি'গুলি,

দেবি প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

—হে আশ্রিত দুঃখহারিণি, প্রসন্না হউন। হে অখিল জগজ্জননি, প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, প্রসন্না হইয়া বিশ্বকে পালন করুন। হে দেবি, আপনিই চরাচর জগতের ঈশ্বরী।

অধিকাংশক্ষেত্রেই পুরাণের স্তুতি নামাবলীর তালিক মাত্র : শতনাম, অষ্টোত্তর

শতনাম, সহস্রনামের তালিকা : যেমন, পদ্ম সৃষ্টিখণ্ডে সাবিত্রী-স্তবে সাবিত্রীর বিভিন্ন নামের এই তালিকা :

সাবিত্রী পুষ্করে নাম তীর্থানাং প্রবরে শুভে।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী ॥
প্রয়াগে ললিতাদেবী কামুকা গন্ধমাদনে।
মানসে কুমুদা নাম মন্দরে কামচারিণী ॥ ইত্যাদি [পদ্ম সৃষ্টি. ১৭]

এই ধরনের নামাবলী স্তুতি ও উহাদের সংখ্যাবাহুল্য রসবোধকে ক্ষুণ্ণ করে।

অলঙ্কারপ্রয়োগ সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। পুরাণ প্রধানতঃ বিবৃতি-প্রধান। ইহার কাজ লোককে জানানো। একাজে সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রশ্ন একান্তই গৌণ। পুরাণের যে অংশগুলি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রায় অলঙ্কারবর্জিত। দুই একটি অলঙ্কার যাহা আছে, তাহা উপমা। সর্গ ও প্রতিসর্গ, বংশ বা মন্বন্তর বর্ণনায় উপমা প্রয়োগের স্বল্পতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যে দুই একটি উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের শক্তি স্বল্প নয় : 'ভূমৌ ওষধয়ো যথা', 'অরণীব হুতাশস্য'. 'প্রাদুর্ভূতা তড়িদ্ যথা', 'নীল ইবাচলো মহান্' প্রভৃতি উপমা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ। প্রাচীন পুরাণে অলঙ্করণ অচেষ্টাপ্রসূত, সচেতনভাবে কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস পুরাণের প্রাচীন অংশগুলিতে নাই। কিন্তু অলঙ্কার-হীনতা রচনার দুর্বলতা নয়। রচনা রীতি সবল ও অনাড়ম্বর হইলেও বলিষ্ঠ—যেন আহিতলক্ষণ সাগ্নিক তাপস। উহা সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

কিন্তু কতকগুলি পুরাণে—পদ্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বামন পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অলঙ্কারনৈপুণ্য সচেতন শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বিশেষতঃ সুন্দর পুরুষ কিংবা সুন্দরী নারীর রূপবর্ণনায় যে নির্বাচিত রঙ ও রেখার বিন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির নিদর্শন। সে সকল স্থলে রমণীর বদন, নয়ন, ভ্রূযুগ, কেশকলাপ, গণ্ড, ওষ্ঠ, পীনোন্নত বক্ষ, ক্ষীণ কটি, নিবিড় নিতম্ব, বিশাল জঙ্ঘা, বাহু, কর ও চরণের বর্ণনায় ঔপম্য-বাচনের বাহুল্য লক্ষণীয়। রাজীববৎ বদন, ইন্দীবরসদৃশ নয়ন, মেঘের ন্যায় নীলকুন্তল, ধনুর ন্যায় বঙ্কিম ভ্রূযুগ, সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটি, বিম্বাধর, চরণকমল—যে-কোন চারুসর্বাঙ্গীর সাধারণ পৌরাণিক বর্ণনা। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে 'সায়ন্তনী সন্ধ্যা'র বর্ণনা, কিংবা পুরঞ্জনীর বর্ণনা : 'ক্বণচ্চরণাম্ভোজা' 'পলাশাক্ষি', 'স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেণ স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা' (স্নিগ্ধ অপাঙ্গ পুঙ্খ, প্রেমে ভ্রাম্যমান ভ্রূ-ধনু)।

গুণ বর্ণনাতেও পুরাণে কতকগুলি গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যে কোন

মহৎ চরিত্র—পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, অগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ, সিংহতুল্য পরাক্রান্ত, পবনের ন্যায় অপ্রতিহত গতি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে গুণোপমার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :

চন্দ্রতুল্য সুদৃশ্যশ্চ কন্দর্পসম সুন্দরঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিসম কাব্যে কবি সমস্তথা ॥
বাণীব সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ প্রতিভায়াং ভৃগোরিব।
কুবের তুল্যো ধনবান্ মহান্ দাতা মনোরিব ॥
দীপ্তিমান্ সূর্যতুল্যশ্চ গাম্ভীর্যে সাগরো যথা।
ঐশ্বর্যে শক্রতুল্যশ্চ সহিষ্ণুঃ পৃথিবীসমঃ। [ব্রঃ বৈ. ব্রহ্ম. ৩]

পুরাণের অলঙ্কার মোটামুটি বাঁধাধরা, প্রায়ই বৈচিত্র্যহীন। যে স্থলে বৈচিত্র্য, সে স্থলে পরবর্তীকালের আলঙ্কারিক রীতিসিদ্ধ শিল্পীর হস্তক্ষেপ আছে।

৬. পুরাণ ও বাংলা সাহিত্য

(i) প্রাচীন যুগ

পুরাণের কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। এদেশের কবিগণ পিতৃপিতামহের দায়াদরূপে পুরাণ-সম্পদের উত্তরাধিকারী। জন্মার্জিত সংস্কারের এই সূত্রে বাঙালীও পৌরাণিক সংস্কারের অধিকারী। সুপ্রাচীন কাল হইতেই যে এদেশে পুরাণের চর্চা প্রচলিত ছিল, গুপ্ত-পাল-সেন আমলের তাম্রশাসন, দানপত্র ও স্তম্ভলিপিতে পৌরাণিক উপমার প্রয়োগ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ মনে করেন, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সঙ্কলনে বাঙালীর হাত আছে। দেবীভাগবত, কালিকা ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বৃহৎ বঙ্গাঞ্চলেরই রচনা। দ্বাদশ শতকের পূর্বে এদেশে যে সংস্কৃত সাহিত্য রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতেও পুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মধ্যযুগেও বাংলাদেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ পুরাণ শ্রবণে আগ্রহশীল ছিলেন। লস্কর পরাগলখান 'পুরাণ পঠন্ত নিত্য হরষিত মতি' [পরাগলী মহাভারত]। চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে ভাগবত, বিষ্ণু, কূর্ম ও পদ্ম পুরাণাদি হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। ত্রিপুরা ও কোচবিহার রাজসভা ছিল পুরাণ-চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র। পুরাণ-কথকতা এদেশের লোকশিক্ষার অঙ্গ।

পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কার এদেশের মর্মমূলে প্রসারিত। জনসাধারণের জীবন পুরাণের রীতি-নীতি, আচার ও সংস্কার-কুসংস্কার দ্বারা শাসিত। বাংলার গ্রামে গ্রামে মন্দির ও পূজাস্থান, আনাচে কানাচে তীর্থস্থান, বৎসর ভরিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, নাগ পঞ্চমী

ষষ্ঠী, দুর্বাষ্টমী, তালনবমী প্রভৃতি বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান। এই ভৈষিক মনোভাব, এই মূর্তিপূজা, ব্রত ও ভক্তিতত্ত্ব এবং দেবলীলায় একান্ত বিশ্বাস পুরাণেরই দান। বাঙালীর সাহিত্যচর্চার মূলেও পুরাণ-প্রেরণা একটি বিশিষ্ট প্রেরণা।

প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ পুরাণের আক্ষরিক বা ভাবানুবাদ। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, মাধবাচার্য ও দুঃখী শ্যামাদাসের কৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতানুবাদের বিশিষ্ট নিদর্শন। এই অনুবাদের কেন্দ্রীয় প্রেরণা ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রচারে তাঁহার কীর্তি অবিস্মরণীয়। মালাধর বসুর কাব্যের মর্যাদা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।[১] রঘুপণ্ডিত বা ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রচনার প্রেরণাও চৈতন্য দেব।

শাক্ত অনুবাদ কাব্য গুলির ভিতর প্রধান মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী সপ্তশতী বা দেবী-মাহাত্ম্য। পিতাম্বর দাসের মার্কণ্ডেয় কথা, দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা বিজয়, অন্ধকবি ভবানী প্রসাদের দুর্গামঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেবীভাগবত ও কালিকা পুরাণ অবলম্বনেও দেবীমাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে। মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ, পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল, রামচন্দ্র মুখুটির দুর্গামঙ্গল বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই সকল অনুবাদ খাঁটি আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও মূল পুরাণের স্বাদ অলভ্য নয়। ত্রিপুরা ও কোচবিহারের রাজসভার আনুকূল্যে নারদীয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, শিব, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণের অনুবাদ করা হয়। এই সকল অনুবাদ বাঙালীর পুরাণ-প্রীতির বিশিষ্ট পরিচয়।

শুধু অনুবাদ নয়, সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে লৌকিক পুরাণ রচনার প্রয়াসও এ দেশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্য বাঙালীর জাতীয় পুরাণ। এই সকল কাব্যের দেবদেবী—মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী যদিও লৌকিক, তথাপি তাঁহারা পৌরাণিক পরমা শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। মঙ্গলকাব্য নানাদিক হইতে সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। মূল কাহিনীগুলি পৌরাণিক না হইলেও, পুরাণের মূল লক্ষ্যের পরিপোষক। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের সূচনায় যে দেবখণ্ড সংযোজিত, তাহা পুরাণেরই কাহিনী। উহাতে অতি সংক্ষেপে পৌরাণিক সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তরাদিও বর্ণিত হইয়াছে।

১। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ-নাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥ [চৈ. চ. মধ্য, ১৫]

বংশানুচরিতের বর্ণনাও মঙ্গলকাব্যে আছে, তাহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ সূর্য বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত পৃথ্বীপালগণের চরিত নয়, এই দেশেরই কোন লোকশ্রুত বংশের কীর্তিমান চরিত : লাউসেন সামন্ত প্রধান সেনবংশের কুলতিলক, চন্দ্রধর বৈশ্যবংশোদ্ভব, কালকেতু ব্যাধ-বংশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীর। সংস্কৃত পুরাণের অন্যতম লক্ষ্য কোন না কোন দেবতার মহিমা ও পূজাপদ্ধতির প্রচার। মঙ্গলকাব্যেরও সেই একই উদ্দেশ্য। পার্থক্য এই যে, পুরাণের দেবতা পূজা আদায়ের জন্য উদ্যোগী হন না, কিন্তু মঙ্গলদেবতা পূজা লোভী—উপরন্তু মঙ্গলদেবতার পূজা-বিধান লৌকিক ও পৌরাণিক পদ্ধতির মিশ্ররূপ। পুরাণের তৈর্থিক মনোভাব ও ভক্তিবাদ মঙ্গলকাব্যেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মঙ্গল কাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে বাংলার নিজস্ব পুরাণ-তীর্থের পরিচয় আছে, যেমন, দামুন্যার চক্রাদিত্য, বোড়-গ্রামের বলরাম, মুণ্ডঘোপের মঙ্গেশ্বরী, কাইতীর বাণেশ্বর, মৌলার রঙ্কিনী, তমলুকের বর্গভীমা, আমতার মেলাই, বেপুর বেপাই প্রভৃতি।[১] তাহা ছাড়া সংস্কৃত পুরাণে হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের সহিত শ্রাদ্ধকল্পের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা মঙ্গল কাব্যে পাই, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নারম্ভ ('ওদনপ্রাশন') এবং এ-দেশীয় বিবাহবিধির বিস্তৃত বিবরণ। লৌকিক আচার, বিশ্বাস ও ধর্মভাবের উপর পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাই মঙ্গলকাব্য বিকাশের গোড়ার কথা।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী-উৎস বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। এইসকল পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, কালীয়দমন, রাস ও মাথুর প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদ রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর আশ্রয়বিভাব রাধারাণী। এই রাধার উল্লেখ বিষ্ণু বা ভাগবত পুরাণে নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, 'সেই রাধাই নূতন বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র স্বরূপ।' এই উক্তির যাথার্থ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির যে প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার তত্ত্ব বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র, বিষ্ণুপুরাণাদিতেও আছে।[২] বিষ্ণুপুরাণে রাধার নাম নাই। পদ্মপুরাণে রাধাই বিষ্ণুর পরম বল্লভ—'সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা'। ঠিক এই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। সেখানে রাধিকা কৃষ্ণের প্রাণসমা ও আত্মাস্বরূপিনী—যথা 'ক্ষীরে চ ধাবল্যং দাহিকা চ হুতাশনে'। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রাধা ও কৃষ্ণ' এই তত্ত্বেরই প্রকাশ—'দুঁহু দোঁহা হোয়' (গোবিন্দ দাস)।

১. দ্রষ্টব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১ম ভাগ)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২. 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে' [বিষ্ণু. ১২. ৬৯]। বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুবক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীই সেই পরমা শক্তি।

বিষয়ে ও তত্ত্বে কি চৈতন্য পূর্বযুগে, কি চৈতন্যোত্তর যুগে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর মিল নিগূঢ়। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ কাব্যের কয়েকটি চিত্রের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত চিত্রাবলীর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দের সূচনায় যে 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্' শ্লোকটি আছে, তাহার প্রসঙ্গ রহিয়াছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। একদিন নন্দ বালক কৃষ্ণকে লইয়া ভাণ্ডীরবনে গোচারণার্থ গমন করেন। কৃষ্ণ-মায়ায় সহসা গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। নন্দ মেঘাবৃত গগন, শ্যামল কানন দেখিয়া ও বজ্র শব্দ শুনিয়া ভীত হন। গোবৎসগুলিকে ফেলিয়া কিরূপে তিনি বালককে লইয়া গৃহে যাইবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠেন। এমন সময় রাধা সেই পথে যাইতেছিলেন, তখন নন্দ তাঁহার কাছেই কৃষ্ণকে প্রদান করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন, 'গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্।'[১] ঠিক এই প্রসঙ্গেরই অনুরূপ বর্ণনা জয়দেবের :

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। [গীতগোঃ ১. ১]

—(নন্দ নির্দেশ দিলেন) হে রাধে, নভোমণ্ডল মেঘমেদুর, বনভূভাগ তমালদ্রুমে শ্যামান্ধকারময়, রাত্রিও সমাগত, তুমি এই ভীত কৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত রাধা প্রসঙ্গগুলিকে অর্বাচীন মনে করিয়া বলিয়াছেন, "জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিলেই বেশ বোঝা যায়, কবি রাধাকৃষ্ণ লীলার একটি বিশেষ উপাখ্যানকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপাখ্যানটির একটু বিস্তৃততর প্রাচীন রূপ পাইবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই উপাখ্যানটির যেরূপে বর্ণনা দেওয়া আছে, তাহা পাঠ করিলেই মনে হয়, পরবর্তী কালের কোনও লোক আমাদের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া অনেক খানি স্থূল ভাবেই যেন সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছেন"।[২] বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু মনে করিয়াছেন, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তকারের নিকট

১। মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্র শব্দঞ্চ দারুণম্॥
বৃষ্টিধারামতি স্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ॥......
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্...
দৃষ্ট্বা তাং নির্জনে নন্দো বিস্ময়ং পরমং যযৌ।...
উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।...
গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্। [ব্রহ্মবৈ. কৃষ্ণ. ১৫ অঃ]

২। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ [সপ্তম অধ্যায়]

ণী। বস্তুতঃ জয়দেবের বর্ণনা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধাতত্ত্ব পুরাণ হইতেই গৃহীত, না পুরাণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিবার বিষয়। রূপগোস্বামী বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃতে' এবং গোপালভট্টের 'হরিভক্তিবিলাসে' ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] তাহা হইলে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অর্বাচীনত্ব কোন্ দিক হইতে? আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানি সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত নয় বলিয়া এবং ইহা বহুল পরিমাণে শাক্ত তন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ইহা স্বীকৃতি লাভ করে নাই, যদিচ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ইহার অধমর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে যে শাক্ত সঙ্গীতগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহার কাহিনীমূল পুরাণ। বিশেষতঃ 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে যে গল্পাংশ রহিয়াছে,—বিভূতিভূষণ হরের সহিত রাজনন্দিনী পার্বতীর বিবাহ, কন্যা-বিরহে মেনকার হৃদয়বেদনা, পার্বতীর ঘর-কন্নার চিত্র, অসুরদলনী মহামায়ার বিবিধ লীলা—এগুলি পুরাণের। এই সকল কাহিনীতে বাংলাদেশের দুর্গোৎসব ও বাঙালী মাতৃহৃদয়ের বেদনার চিত্র প্রধান হইয়া উঠিলেও পুরাণের প্রভাব অল্প নয়। পুরাণে আছে

> ততো গতে ভগবতি নীললোহিতে
> সহোময়ারতিমনুভূত ভূধরঃ।
> সবান্ধবো ভবতি হি কস্য ন মনো
> বিশৃঙ্খলং জগতি হি কন্যকাপিতুঃ॥ [পদ্ম. সৃষ্টি. ৩৪]

—ভগবান নীললোহিত উমার সহিত প্রস্থান করিলে কন্যার প্রতি অনুরক্ত হিমরাজ সবান্ধব উন্মনা হইলেন; বিবাহান্তে কন্যার গৃহে কোন্ পিতার মন বিশৃঙ্খল না হয়?

এই বিরহার্তিই আগমনী-বিজয়ার গানে মেনকার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতে মহাদেবের সর্ব ঐশ্বর্যকে সর্বরিক্ততার প্রতীক মনে করিয়া যে সকল ব্যাজস্তুতি রহিয়াছে, তাহারও মূল পুরাণ। শিব নিজেই জটিল ব্রাহ্মণবেশে তপশ্চর্যারতা পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন:

> বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ।
> ব্যাঘ্রচর্মাং শুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃত্তিনা॥
> কপালধারী সর্পৌঘৈঃ সর্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ।

১। দ্রষ্টব্য হরিভক্তিবিলাস, ৩য়, ৪র্থ, ১১ শ. ১৪ শ. ১৫ শ বিলাস।

বিষদগ্ধ গলত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ ॥
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্য বিবর্জিতঃ।
শ্মশানবাসী সততং সংসঙ্গ পরিবর্জিতঃ ॥ [কালিকা. ৪৩ অঃ]

—মহাদেব বৃষবাহন, অঙ্গে নিরন্তর ভস্ম মাখে; সে জটাধর, ব্যাঘ্রচর্ম তাহার পরিধান, উত্তরীয় গজচর্ম; সে নরকপালধারী, সর্বগাত্র সর্পে বেষ্টিত; তাহার গলদেশ বিষদাহে দগ্ধ, তাহাতে একটি অক্ষমালা; সে বিরূপাক্ষ ও ভয়ঙ্কর। তাহার জন্মের স্থিরতা নাই, সে গৃহভোগ ত্যাগী, শ্মশানবাসী ও সংসঙ্গ বর্জিত।

এই ধরনের অসংখ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গকে যথাসম্ভব গৃহস্থালির অঙ্গীভূত করিয়াই শাক্ত কবিগণ অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া শাক্ত গীতাবলীতে যে স্তোত্রমূলক কবিতাগুলি আছে, তাহা পুরাণের স্তব-স্তুতির অনুরূপ। নামাবলী স্তোত্রগুলি পৌরাণিক শক্তি-নামাঙ্কিত স্তবেরই রূপান্তর।

(ii) আধুনিক যুগ

নব্য বাংলাসাহিত্যেও পুরাণ-প্রীতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। নব্য বাংলায় পুরাণের স্বীকৃতি নবলব্ধ পাশ্চাত্ত্য যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে। উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই পুরাণের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অতিলৌকিক কাহিনীগুলির প্রতি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল: পুরাণের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ পুরাণের নূতনতর ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া পৌরাণিক মত সমর্থন করিতেছিলেন। পুরাণকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিবার এই মনোভাবটি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফল। ইহার ফলে পুরাণ-প্রসঙ্গ লইয়া নূতন নূতন কাব্য-নাটক রচনার যে দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাতে পুরাণের নব রূপায়ণ লক্ষণীয়।

॥ যাত্রা ॥ পৌরাণিক চরিত্রে মানবীয় ভাবের আরোপ নব্যযুগের পুরাণ-পরিক্রমার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পুরাণপ্রসঙ্গকে মানবীয় ভাবে পরিবেশন করিবার মনোভাব মঙ্গলকাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। কবিওয়ালাদের গানেও এই মনোভাবের বিচিত্র স্ফূর্তি দেখা যায়; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ও কবিগানে পুরাণের অন্ধ সংস্কার ও অতিলৌকিক কাহিনী পরিত্যক্ত না হওয়ায় পুরাণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই পরিবেশিত হইয়াছে; এই ধারার আর এক প্রকাশ নব্য বাংলার যাত্রা ও যাত্রার ধরনে রচিত নাট-যাত্রা। মনোমোহন বসুর সতী নাটক, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র; হরিমোহন কর্মকারের শ্রীবৎসচিন্তা, পর্বতকুসুম (মদনভস্ম ও শিববিবাহ); ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাসমিলন,

ধ্রুবোপাখ্যান, ও বামনভিক্ষা; তিনকড়ি বিশ্বাসের দক্ষযজ্ঞ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ; ব্রজমোহন রায়ের কংসবধ; মতিলাল রায়ের গয়াসুর প্রভৃতি পালা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের কাহিনী লইয়া রচিত এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় গতানুগতিক প্রথায় পুরাণের অতিভক্তিবাদ, অন্ধ-সংস্কার ও অলৌকিকত্ব স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলার জনসাধারণের মুখ চাহিয়া এই যাত্রাগুলি রচিত। অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অলৌকিক দেবলীলার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা অতি সহজে দেবতা সম্পর্কে যে কোন সম্ভব-অসম্ভব ঘটনায় বিশ্বাসী। পুরাণের বিকৃতি বা নূতন ব্যাখ্যা তাহারা সহজে গ্রহণ করে না। তাই বাংলার লোক-সঙ্গীতে বা যাত্রায় প্রাচীন পুরাণের তেমন রূপান্তর সাধিত হয় নাই। লোকের বিশ্বাস ও মানসিক রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাত্রাকারগণও পৌরাণিক কাহিনীকে পৌরাণিক সংস্কার-বিশ্বাসের আধারেই পরিবেশন করিয়াছেন।

॥ **পৌরাণিক নাটক** ॥ শিক্ষিত সমাজে পুরাণকে নূতন আঙ্গিকে এবং নূতনভাবে যুগোপযোগী করিয়া প্রকাশ করার প্রবণতা জাগ্রত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে একমাত্র আঙ্গিকের দিক ব্যতীত এই নবভাব প্রায় অনুপস্থিত। কোন কোন নাট্যকার পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যুগ-ভাবনাকে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতিভক্তির উচ্ছ্বাস ও অলৌকিক দৈবশক্তি নাটকীয় বিকাশকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। মনোমোহন বসু বাংলা পৌরাণিক নাটককে যাত্রার সুরে বাঁধিয়া, ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রলেপ মাখাইয়া মঞ্চমুখী যাত্রাধর্মী নাটকের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের কোন বাংলা পৌরাণিক নাটক সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। মনোমোহন বসুর নাটকও ভক্তিরস প্রধান। তবে তাহার মধ্যে নবযুগোচিত দেশপ্রেমের স্পর্শ আছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকও ভক্তিরসপ্রধান এবং অতিনাটকীয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মসাধনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত; তাহার ফলে তাঁহার নাটকে ভাবতায় জীবন-সাধনার শ্রেষ্ঠ নীতি—দয়া, ক্ষমা, মানবতাবোধ, দানধর্ম ও মানব-প্রীতি প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিও ভক্তির অতিউচ্ছ্বাসে ও অলৌকিক পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রভাবে ভারাক্রান্ত। তবে তাঁহার নাটকে তৎকালীন হিন্দুধর্মের নবঅভ্যুত্থানের (Hindu revivalism) সুরটি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পৌরাণিক নাটকে যুগের জিজ্ঞাসা থাকিলেও যুগোপযোগী সমাধান নাই। বাংলার পৌরাণিক নাটক প্রাচীন পুরাণের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—

মাত্র, বলিষ্ঠতার সহিত পুরাণকে নবচেতনায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। বাংলা যাত্রা যে কাজ করিয়াছে গ্রামে, বাংলা নাটক সেই কাজটুকু করিয়াছে সহরে, নগরের নাটমঞ্চে। এই নাটকগুলি জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ভাবধারা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে এবং তৎকালে শিক্ষিত সমাজও যে নূতন করিয়া পৌরাণিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছিল, তাহারও প্রমাণ বহন করিতেছে।

॥ কাব্য ও কবিতা ॥ যুগচেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে উনবিংশ শতকের নূতন কাব্য ও কবিতাগুলিতে। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পুরাণের পথে বাঙালীর নব অভিযানের স্বাক্ষর। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা পুরাণের নবরূপায়ণ। ব্রজাঙ্গনার বিষয় বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় হইতে অভিন্ন হইলেও মূলতঃ পুরাণাশ্রিত। প্রাকৃতিক বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া বাংলার বৈষ্ণবপদে রাধা কোথাও নিজের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেন নাই। গোপী-হৃদয়ের বিরহবেদনা এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় এবং বিশেষভাবে 'ভ্রমরগীতা'য়। রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গোপীগণ যমুনাতীরস্থ তরুলতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রেমময় কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভ্রমর গীতায় কোন গোপী মধুকরকে দেখিয়া তাহাকেই কৃষ্ণের দূত মনে করিয়া অভিমান ছলে নিজের হৃদয়ার্তি প্রকাশ করিয়াছেন [ভাগবত, ১০. ৪৭. অঃ]। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধাও তদ্রূপ জলধর, ময়ূর, কুসুম, সারিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া হৃদয়ের বিরহ বেদনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজাঙ্গনার রাধা Mrs. Radha.—অনেকটা আধুনিকা প্রেমনায়িকার প্রতীক। 'মহাভাব শিরোমণি' রাধার ভাবতন্ময়তা তাঁহাতে নাই। ইয়ং-বেঙ্গলের প্রতিনিধি মাইকেলের কাছে পুরাণের চরিত্র কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, ব্রজাঙ্গনার রাধা তাহারই প্রকাশ। পুরাণী প্রতিমার এইরূপ আরও কতকগুলি রূপান্তরিত মূর্তি 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের তারা, উর্বশী ও রুক্মিণী। এগুলি চির পুরাতনী তির্যক নারী-প্রেমের বিশেষ যুগভাবিত চিন্তার প্রকাশ। কোথাও কুলবধূর ব্যাভিচারী প্রণয় (তারা), কোথাও বারাঙ্গনার প্রেমাসক্তি (উর্বশী), কোথাও কুমারীর প্রেম (রুক্মিণী)—সর্বত্রই প্রমুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। নারী-প্রকৃতির এই যুগোপযোগী বিচিত্র প্রকাশ দ্বারা মাইকেলের কাব্য পুরাণের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছেন।

উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় মদমত্ততার কবলে স্বাধীনতা হারাইয়া জাতির মনে যে 'জাতি বৈর' ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' তাহার আর এক রূপ। কাহিনী ভাগবতের, কিন্তু কল্পনা হেমচন্দ্রের। দৈত্য বৃত্রাসুর—ইউরোপীয় মদশক্তির প্রতীক, আর পরাজিত দেবগণ ধর্মভীরু দৈববল-নির্ভর ভারতবাসীর প্রতীক। এই কাব্যে দধীচির তনুত্যাগ—'দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে'—অতিশয় তাৎপর্য পূর্ণ।

দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন নিঃস্বার্থ আত্মদান—পুরাণ-কাহিনীর এ তাৎপর্য নবযুগের আবিষ্কার। হেমচন্দ্রের পুরাণ-অবগাহনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। পৌরাণিক বিশ্বাসকে যুক্তির আলোকে তিনি নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। 'ছায়াময়ী' কাব্যে কবি দান্তের আদর্শ যাহাই থাকুক, হিন্দু পুরাণের 'নরক কল্পনার' ছায়া অবশ্যই আছে। তবে হিন্দুপুরাণের মধ্যে পাপের ফল যে নরক ও নরক যন্ত্রণা, হেমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শোধনে বিশ্বাসী :

দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ। [ছায়াময়ী, ২য় পল্লব]

হেমচন্দ্রের আর এক পৌরাণিক কাব্য 'দশমহাবিদ্যা'। মানবসভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রতীক কালী-তারাদি মহাবিদ্যার রূপ—এই ব্যাখ্যা নবযুগের বিশ্লেষণী বুদ্ধির দৃষ্টান্ত। ভূমিকায় যদিও বলিয়াছেন, পুরাণাদির আখ্যান তিনি ঠিক ঠিক অনুসরণ করেন নাই, তথাপি কোন কোন স্থলে পুরাণ বর্ণনার সহিত গভীর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যেমন—সতীবিরহে শোকোন্মত্ত মহাদেব :

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্বার সুকুমার তনু তার
মমতার অভ্যাস যেমন॥
তখন নয়ন ঝরে পূর্ব কথা মনে সবে
সরে যথা নদী প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময় নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন॥ [দশমহাবিদ্যা]

এই বর্ণনা বামন পুরাণে সতীহারা মহাদেবের বর্ণনার অনুরূপ,

ক্ষণং গায়তি দেবর্ষে ক্ষণং রোদিতি শঙ্করঃ।
ক্ষণং ধ্যায়তি তন্বঙ্গীং দক্ষকন্যাং মনোরমাম্॥
ধ্যাত্বা ক্ষণং স্বপিতি চ ক্ষণং স্বপ্নায়তে হরঃ।
স্বপ্নে তথেদং গদতি দৃষ্ট্বা দক্ষস্য কন্যকাম্॥ [বামন, ষষ্ঠ অধ্যায়]

নবলব্ধ সমাজতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দার্শনিকতার ভিত্তিতে বাঙালী হিন্দুর অন্তরে যে নব মানবতাবোধ এবং হিন্দুত্বের যে বিশ্বকেন্দ্রিক রূপটি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ভিত্তিতে নবীনচন্দ্র সেন হিন্দু পুরাণকে নূতনভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া পরিণত বয়সে তিনখানি কাব্য প্রণয়ন করেন—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। এই ত্রয়ী কাব্যে ভাবগত একটি মিল

আছে, এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া উহাতে যথাক্রমে কৃষ্ণের আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলাকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। তাই একত্রে এই কাব্যত্রয়কে বলা হয়—'ত্রয়ীমহাকাব্য'। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে বলিয়াছেন 'The Mahabharata of the nineteenth century'—মহাভারত এই অর্থে, ইহাতে সমস্ত জাতিধর্মের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থানলাভ করিয়াছে, এবং সেই মহাভারতীয় আদর্শকে বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া তুলিবার একটি স্বপ্ন মূর্তিমন্ত হইয়াছে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রয়ী কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র, এবং তাঁহার ধর্মাদর্শ, বিশ্বমানবানুভূতি ও ঐক্যবোধ এই কাব্যের মূল বক্তব্য। কিন্তু মহাভারতীয় কৃষ্ণের শৌর্য, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা, তাঁহার নীতিকুশল রাষ্ট্রনেতার রূপ, জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে গঠিত কর্মযোগীর আদর্শ—এই কাব্যে যতটা না রূপায়িত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়াছে পুরাণের প্রেমভক্তির নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ। হরিবংশে, শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণে যে কৃষ্ণচরিত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে চৈতন্যদেবের ভক্তিরসোচ্ছলতায় তাহাকে পুটিত করিয়া কবি কৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকে বলা চলে, উনবিংশ শতকের নব পুরাণ। পৌরাণিক মনোভাবই প্রধান; সংস্কারকের মনোভাব লইয়া পুরাণের কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, বর্ণব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিভেদ, মূর্তিপূজা প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া কবি পুরাণকেই বিশুদ্ধতর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণের বহুদেবতার পরিবর্তে এক বিরাট পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একজাতি, একপ্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন এবং এই বিরাটের পূজার অর্ঘ্য যে মানবপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম—তাহাকেও পুরাণের আবেগানুবিদ্ধ রসোজ্জ্বল প্রেমভক্তির আদর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস সংস্কারমুক্ত মনের সৃষ্টি নবপুরাণ, তাহার মূলকথা:

> একজাতি মানব সকল;
> একবেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত, অসীম;
> একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়,
> একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম সাধন,
> যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ। [রৈবতক]

পুরাণের এই নবরূপায়ণ নবীনচন্দ্রে পরিপূর্ণতা লাভ না করিলেও, তখনকার শিক্ষিত মননশীল হিন্দু কিরূপে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কারমুক্ত মন ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণমুখী যুক্তি লইয়া হিন্দু পুরাণকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী পুরাণকে ভাল বাসিয়াছে—তাই পুরাণের ত্রুটি-বিমোচনে উদাসীন না থাকিয়া যুগের প্রয়োজনানুসারে তাহারা পুরাণের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা ॥

ঊনবিংশ শতকের প্রদীপ্ত প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাজাত স্বাধীন চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ। যুগটি ছিল সংশয় ও অবিশ্বাসের যুগ। একদল লোক অন্ধভাবে দেশীয় শাস্ত্র পুরাণের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিলেন, আর একদল পুরাণেতিহাসকে নস্যাৎ করিয়া বৈদিক জ্ঞানবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে-ছিলেন। ইহারই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় হিন্দুধর্মের সার্বিক রূপটি রহিয়াছে পুরাণের ভিতর। তিনি বলিলেন, পুরাণেতিহাসে আদর্শ চরিত্র আছে, 'পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত আছে' [ধর্মতত্ত্ব ১ম, ৮] এবং আরও বলিলেন, 'পুরাণেতিহাসেই বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেবশিষ্যদিগের মত এই যে পুরাণ-ইতিহাস কেবল মূর্খতা এবং উপধার্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ।' [ধর্মতত্ত্ব, ২য়, ৩]

এই উক্তিগুলির ভিতর পুরাণের প্রতি বঙ্কিচন্দ্রের শ্রদ্ধাদৃষ্টির পরিচয় সুপরিস্ফুট। কিন্তু পুরাণের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন নাই। এই সমর্থনের পরে একটা 'তবে' আছে, 'তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা'। কটাক্ষটি তীব্র এবং তখন-কার দিনে বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা নবজাগ্রত যুক্তি, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার সন্ধানী দীপ লইয়া। তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরাণের বহুলাংশ অনৈসর্গিক, অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ; পুরাণের প্রকৃত আদর্শ · সত্য বহু অবিশ্বাস্য ও মিথ্যার লক্ষণযুক্ত কাহিনী দ্বারা আবৃত; বহু দেবচরিত্র 'গুরুতল্পগামী', 'লোভী', 'স্বার্থপর', 'ইন্দ্রিয়পরবশ' ও 'মহাপাপিষ্ঠ'। এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম নয়। 'বাস্তবিক হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর গূঢ় তাৎপর্য আছে। তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর।' [ধর্মতত্ত্ব, ২য়, ৪]

এই সত্যটিকে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা। এই সত্যানুসন্ধিৎসার ফল—'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা'। এগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকৃত নব পুরাণ-ভাষ্য। এই ভাষ্যের মাধ্যমে তিনি পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব, অবতারবাদ, জীবতত্ত্ব জন্মান্তরবাদ, দেবোপাসনা ও মুক্তিতত্ত্বের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। আলোচনায় সর্বত্র পৌরাণিক বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন নাই, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য অবলম্বন করিয়াছেন; সাংখ্য-যোগের প্রভাবও গুরুতর।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব পরিস্ফুটনে বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্য-যোগ দর্শনের অনুপন্থী। পুরাণ যেমন

মনে করে, পরমতত্ত্ব লীলায় জগদ্রূপে পরিণত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা মনে করেন না। তাঁহার মতে, যেমন সাংখ্যযোগমতে, ঈশ্বরের সংজ্ঞাই স্বতন্ত্র। বৈদান্তিকের মত তিনি এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ নিত্য পদার্থকে স্বীকার করেন, কিন্তু পৌরাণিক মতে সেই পদার্থ যে স্রষ্টা ও সাকার—তাহা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। 'পরমতত্ত্বের 'আভা' প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য চলিতেছে।' [ধর্মতত্ত্ব, ২. ১৫]।

ঈশ্বর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে (যেমন সাংখ্য-যোগ মতে), 'সবগুণের সবাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ' [ধর্মতত্ত্ব ১. ৪] ; তিনি সবগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব ; তিনি সর্বভূতময়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; তিনি জগদ্গুরু, তাঁহার মূর্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার। অর্থাৎ ঈশ্বর চরম বিকাশের পরিপূর্ণ আদর্শ।

পুরাণমতে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। কিন্তু জীবদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে সংশয়বাদী। যে বিশ্বাসই থাকুক, কাগজে-কলমে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানবত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মতে, অবতার হইতেছেন সেই মানুষ, যিনি মানুষী শক্তির প্রকাশ করিয়া মানবতার আদর্শ স্থাপন করেন। ঈশ্বরাদর্শে গঠিত পূর্ণ মানুষই ঈশ্বর অথবা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তিই ঈশ্বরত্ব—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট অভিমত।

জীব, তাঁহার মতে পরমাত্মার মায়াবদ্ধ অংশ। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। কর্মফলে জীবের জন্মান্তরবাদ স্বীকৃতিতেও তিনি পৌরাণিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। জীবের উপাসনা ও মুক্তিতত্ত্বও পুরাণ-বিশ্বাসের যুগোপযোগী ভাষ্য। গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, 'কর্মানুসারে জীবাত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাঁহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় বা নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকে সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে' [শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা, ২, ১৩]। মুক্তি একটি স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য অবস্থা। অথবা বলা যায়, পরিপূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্বের বা ঈশ্বরত্বের অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'সম্পূর্ণ ধর্মাচরণদ্বারা ইহজীবনেই এই মুক্তি লাভ করা যায়।'

এই মুক্তির লক্ষ্যেই জীবের উপাসনা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপাসনাতত্ত্বেও পৌরাণিক মতের প্রতিধ্বনি আছে। তিনি পৌরাণিক ভক্তিবাদকেই উপাসনার মূল ভিত্তি বলিয়াছেন ; এমন কি প্রতিমাপূজাকেও তিনি গৌণ-ভক্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তথাপি এই উপাসনাতত্ত্ব পুরাণের পটভূমিতে এক নূতন তত্ত্ব। মানবতাবাদ বা মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্ফূরণ এই তত্ত্বের মূলকথা। ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলনতত্ত্ব'।

'মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ'—এই মানদণ্ডেই বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-অন্বীক্ষা ও পুরাণ-সমীক্ষা। এই মানদণ্ডেই ঈশ্বর, অবতার, কর্ম ও ভক্তিবাদ এবং জীবের পরম পুরুষার্থের বিচার।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, ঈশ্বরের 'আভা' যে মানুষে যত বিকশিত, তাঁহার উপাসনা ও মুক্তি তত প্রাগ্রসর। তিনি বলেন, 'তাঁহার (ঈশ্বরের) সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে।...অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে···তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব··ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব।' [ধর্মতত্ত্ব. ১. ৪.]। তিনি আরও বলেন, 'ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরের আরাধনা বটে, কিন্তু তোষামদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা' [শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা. ৩. ৯]। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'নিষ্কাম কর্ম'ই ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, উহাই ভক্তি ['যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি'—ধর্মতত্ত্ব. ১. ১১]। এই ভক্তিই প্রকৃত 'কৃষ্ণার্পণ'। বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার উপায় অনুশীলন দ্বারা বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান।

মোটের উপর মনুষ্যধর্ম পালন এবং সেই ধর্মপালন দ্বারা ঈশ্বরের আভায় উদ্ভাসিত হওয়াই মনুষ্যজীবনের চরম প্রাপ্তি। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচার দ্বারা পুরাণের এই মর্মসত্যের আবিষ্কার, বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমার শ্রেষ্ঠ ফল। এই ফলকে তিনি কেবল প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহার উপন্যাসাবলীর মধ্যেও প্রকাশ করিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণী অনুশীলিত মানবধর্মের এক প্রকাশ, আর এক প্রকাশ আনন্দমঠের 'সন্তান'। সৎকর্ম, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, প্রীতি-দয়াদির স্ফুরণে ইহারা ঈশ্বরের আভাময়। আর তাঁহাদের সমষ্টিভূত বিকাশের পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণচরিত্র।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও পুরাণ-প্রসঙ্গ ॥

বিপুলায়তন রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাণ-প্রসঙ্গ স্বল্প। যে ব্রাহ্মসমাজে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ পৌরাণিক বিশ্বাসের বিরোধী। পুরাণের কুসংস্কার, শুষ্ক আচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস-বশে নয়, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য যে উদার মানবধর্মে পুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সার্বভৌমিক মানবতার আদর্শ তাঁহাকে সকল হীনতা, দীনতা ও নীরস বন্ধনকে পরিহার করিতে

শিক্ষা দিয়াছিল। এইজন্ত প্রথম হইতেই যে পৌরাণিক অন্ধবিশ্বাস, বিচার-মূঢ়তা ও অন্ধ আচার ভারতীয় জীবনকে পঙ্গু ও প্রাণহীন করিয়া তুলিতেছিল, তাহাকে তিনি সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। মানসী কাব্যের 'দুরন্ত আশা', সোনার তরীর "হিং টিং ছট্', চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব' নৈবেদ্যের 'মুক্তি', 'অপ্রমত্ত', 'ত্রাণ' প্রভৃতি কবিতায় তিনি আচার-পরায়ণতা, অন্ধভক্তি ও কর্মবিমুখতাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। এমনকি, হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা পৌরাণিক বিশ্বাস সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহাদের অপচেষ্টাকেও তিনি শ্লেষবাণে বিদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন,

টিকিটি যে রাখা ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্‌নেটিজম্ শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তায় জেগে ওঠে শক্তি। [কল্পনা—উন্নতি লক্ষণ]

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'কালের যাত্রা' প্রভৃতি নাটকও কুসংস্কার ও প্রথা, পুঁথি ও পুরোহিত, শাস্ত্র, বলিদান ও মন্ত্র-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত মনের সুতীব্র প্রতিবাদ।

কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পুরাণকে বর্জন করেন নাই। মহর্ষি-ভবনে মাঝে মাঝে পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইত: 'এখানে পুরাণ পাঠও হইত। কোনদিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত' [জীবনস্মৃতি]। তাহা ছাড়া, ভারতবাসী জন্মার্জিত সংস্কারের বশে লোকমুখে নানা প্রসঙ্গ শুনিয়াই পুরাণের সহিত পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কবির কৈশোর-সৃষ্টি 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায় পুরাণের ত্রিমূর্তি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ক্রিয়া রূপায়িত হইয়াছে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। এই ব্যাপারে উপনিষৎ, বৌদ্ধ সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য এবং বাংলার মহাজনপদাবলী ছিল প্রেরণার মূল উৎস। ভারতীয় পুরাণকে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেন প্রধানতঃ কালিদাস ও বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যস্থতায়। মদনভস্ম ও হরপার্বতীর প্রেম এবং ব্রজকাহিনী বিচিত্রভাবে রবীন্দ্র-রচনায় রসসঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনায় এগুলির প্রভাব অসাধারণ। পুরাণের কমলা লক্ষ্মী রবীন্দ্রকাব্যের কল্যাণী নারী, পুরাণের বীণাপাণি সরস্বতী রবীন্দ্রকাব্যের মঞ্জুভাষিণী বাণী-শ্রী পুরাণের উর্বশী নির্বিশেষ সৌন্দর্যের (Abstract Beauty) প্রতীক; পৌরাণিক শিব বিচিত্ররূপে রবীন্দ্রকাব্যে রূপায়িত হইয়াছেন, কখনও তিনি নটরাজ, কখনও প্রেমিক—তাঁহারই নৃত্যে প্রলয় ঘনাইয়া আসে, তাঁহারই নৃত্যে সুন্দর হইয়া ফুটে সৃষ্টির শতদল: শিব ভীষণ সুন্দর,

আস্বাদ মধুর [উৎসর্গ : মরণ-মিলন]। এই চরিত্রগুলি নানাদিক হইতে—প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনায়, মৃত্যু ও অখণ্ড জীবনের ধারণায়, প্রেয়সী ও শ্রেয়সী নারীর বিশ্লেষণে—রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। অনন্তের লীলারসাস্বাদনে কবি বহুক্ষেত্রে ক্বষ্ণ ও রাধার প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকালকে বর কল্পনা করিয়া মৃত্যু-মাধুরী আস্বাদনের কল্পনাটিও অভিনব। এসকল স্থলে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের পৌরাণিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে নূতন চরিত্র-প্রতীক সৃষ্টি করিয়াছেন।

পুরাণের অন্ধসংস্কারগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই, বরং পুরাণে প্রচ্ছন্ন মহনীয় ভাবগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পুরাণে যে প্রতিমা, মন্দির ও তীর্থের কল্পনা আছে, তাহা শুধু সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য। গূঢ় ও অনির্দেশ্য ভাব সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়াই পুরাণে প্রতীকের অবতারণা। ব্যাসদেব নিজেই বলিয়াছেন, তিনি পুরাণ রচনা করিয়া অরূপকে ধ্যানকল্পিত প্রতিমার রূপ দিয়াছেন, স্তুতিদ্বারা অনির্বচনীয়ের অনির্বচনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, মন্দির ও তীর্থের কল্পনা করিয়া সর্বব্যাপকের ব্যাপকতা বিনষ্ট করিয়াছেন।[১] পুরাণে যে সত্য অপ্রাকৃত কল্পনা দ্বারা আচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, (১) জীবের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান, (২) ধরণীই শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও মন্দির, (৩) 'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা' [চৈতালি] এবং (৪) মহৎ কর্তব্য সাধন করাই মুক্তি-সাধনা। ব্যাসদেবের সংকেতিত অর্থই রবীন্দ্রকাব্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে অন্য কৌশলে।

রবীন্দ্রনাথে পুরাণের প্রভাব আরও গূঢ়সঞ্চারী। পুরাণের অন্যতম বিশিষ্টতা—১) জন্মান্তরবাদ, (২) লীলাবাদ, ও (৩) ভক্তিবাদ। রবীন্দ্রকাব্যে এগুলি বিচিত্র ভাব-রস সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী : অবিচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহের কল্পনায় পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদের (Evolution Theory) প্রভাব থাকিলেও, উহাতে হিন্দু পুরাণের প্রভাব অল্প নয়। পুরাণমতে একই চৈতন্যসত্তা কোন জন্মে অমোঘন জড় পদার্থ, কোন জন্মে পরিপূর্ণ চেতনধর্মী জীব। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সেই চৈতন্যেরই রূপান্তর। পুরাণের এই মত রূপায়িত হইয়াছে মনুসংহিতার 'তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতুনা' শ্লোকে। রবীন্দ্রনাথও মনে-প্রাণে ইহা বিশ্বাস করেন যে, জীব-চৈতন্য এইভাবে যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছে স্থাবর হইতে জঙ্গম সৃষ্টিতে। সমুদ্রকে

১। রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্।
স্তুত্যাঽনির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

দেখিয়া তাই তাঁহার সেই পূর্বজন্মের স্মরণ জাগে, যেন সমুদ্রের সহিত তাঁহার জন্মান্তরের সম্পর্ক ; বৃক্ষের পত্র-স্পন্দন দেখিয়া মনে হয়, ওই বৃক্ষের সহিত তাঁহার নাড়ীর যোগ এবং এ জন্মের প্রিয়তমাকে দেখিয়া মনে হয়, 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি আমি শতরূপে শতবার।'

শুধু জন্মান্তরবাদ নয়, লীলাবাদও পুরাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পুরাণের মতে 'The whole world-order is the play of the Supreme Spirit (Divine Lila)'[১] : । 'য এক ঈশা জগদ্‌আত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি' ভাগ. ১. ১০. ৩৪]। আনন্দঘন পরমসত্তা বিচিত্রভাবে বিশ্বে লীলা করিয়া চলিয়াছেন। স্বরূপতঃ তিনি 'অদ্বৈত'—কিন্তু লীলায় তিনি দুই বা দ্বৈত এবং বহু। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা ও ভগবান লীলাময়ী বা লীলাময়। অন্তরে তিনি এক, বাইরে 'বিচিত্ররূপিণী'—বহু। নিখিল জগতে তাঁহার আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য-লীলার অন্ত নাই। মানুষের সঙ্গে তাঁহার রসের যোগ। পুরাণের লীলাবাদই এই প্রকারে 'অবোধপূর্বভাবে' রবীন্দ্র কাব্যে লীলার অনন্ত মাধুরী বিস্তার করিয়াছে।

এই লীলাবাদের পরিপূরক ভক্তিবাদ। বিশ্বজগতে অনন্তের যে প্রেম ও সৌন্দর্য-লীলা বিলসিত, জীব প্রেমে ও ভক্তিতে সেই লীলারস আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়। জীব যে তাঁহারই অংশ। ভগবানের সহিত জীবের তাই প্রেম ও রসের সম্পর্ক। ভগবান প্রেমিক, জীব প্রেমিকা ; তিনি বঁধু, জীব বধূ। পুরাণের এই প্রেম-ভক্তিবাদ সহজনিশ্বাসের মত রবীন্দ্র-রচনায় রসসঞ্চার করিয়াছে। রাধারূপে বা উমারূপে কবি অনন্তের প্রেম আস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, আর বলিয়াছেন,

> আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
> আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান। [গীতাঞ্জলি—প্রতিস্মৃষ্টি]

ইহা যেন পৌরাণিক এই ভাগবতী লীলারই প্রতিধ্বনি,—

> শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরং পুমান্।
> আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ॥ [ভাগ. ২. ৪. ৭]

১। The Puranas—A. K. Banerjee ; Hist. of Phil. Eastern & Western. Vol I.

॥ রামায়ণ ॥

১. ইতিহাস বা মহাকাব্য

রামায়ণ বা মহাভারত ভারতবাসীর সর্বার্থ-সাধক। এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ধর্মাধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—এক কথায় রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনের সকল আদর্শ বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।' রামায়ণ-মহাভারত সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষের জনজীবনে ইহাদের প্রভাবও অপরিমেয়। বেদ এ-দেশের প্রধান গ্রন্থ, কিন্তু বেদজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ। পুরাণ এদেশের আর এক সম্পদ, কিন্তু পুরাণের প্রচারও সর্বব্যাপক নয়; রামায়ণ-মহাভারতই জনসাধারণের বেদ-পুরাণ। রামায়ণ 'বেদসম্মিত', মহাভারত 'পঞ্চম বেদ'। উভয় গ্রন্থই আবার পুরাণ সমূহের বিশ্বকোষ। তাই জন-জীবনে রামায়ণ মহাভারতেরই সমাদর। এ দেশের গৃহজীবনে পুত্রের আদর্শ রাম, ভ্রাতার আদর্শ ভরত ও লক্ষ্মণ, পত্নীর আদর্শ সীতা, আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনের আদর্শ রামরাজত্ব।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রামায়ণ-মহাভারতকে Epic বা মহাকাব্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এমন কি রামায়ণ-মহাভারতেও উহাদিগকে বলা হইয়াছে 'ইতিহাস' ['ইতিহাসং পুরাতনম্']। ইতিহাস বলিতে বুঝায় পূর্ব বৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথা। পুরাণও পূর্ব বৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথা। কিন্তু পুরাণ সুদূর অতীতের কথা, আর ইতিহাস অদূর অতীতের বিবৃতি; পুরাণ সুদূরের বলিয়া কল্পনা-প্রধান, আর ইতিহাস অদূরের বলিয়া উহার বাস্তবতার দাবী সমধিক। ইতিহাস লোকশ্রুত বংশের লোকশ্রুত ব্যক্তির কীর্তি-কাহিনী। সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এ দেশের দুই যুগপ্রাচীন বংশ। এই সূর্যবংশের ইতিহাস রামায়ণ। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র ইহার নায়ক। আর মহাভারত বিখ্যাত চন্দ্রবংশের ইতিহাস, কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষের বৃত্তান্ত। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দুই ঐতিহাসিক অনুবৃত্তি রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যও। বাল্মীকি আদি কবি, ব্যাসদেবও বিদ্বান কবি। সুপ্রাচীন কাল হইতেই এই দুইটি গ্রন্থ মহাকাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তবে পরবর্তীকালে অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে অর্থে ইহারা মহাকাব্য নয়। রামায়ণ-মহাভারত জাত মহাকাব্য। একটি সমগ্র দেশ বা জাতির সর্ব

তাহাতে উদ্‌ঘাটিত হয়। এরূপ মহাকাব্য অল্পই লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মহাকাব্য তো আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে চারিটি মাত্র আছে,—ইলিয়াড, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত।' রামেন্দ্রসুন্দরও বলেন, 'বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না'।

২। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের মতে একটি দেশের সুপ্রাচীন বীর গাথাই (Heroic Ballad) মহাকাব্যের মূল। এই বীরগাথাব সহিত সেই দেশের পুরাকাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান-যুক্ত হইয়া পরিশেষে জটাজুট সমাযুক্ত বৃহৎ কাব্যের আকার ধারণ করে। এইরূপ মহাকাব্য কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনাও নয়। অনেককালের অনেক রচনা ও কিংবদন্তী পরবর্তী কালের কোন শক্তিমান লেখকের লেখনীমুখে সংহত হইয়া বিশাল মহাকাব্যের কায়া লাভ করে।[১] অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যমতে জাত মহাকাব্যের লক্ষণ দুইটি—ইহার মূল Deeds of heroes এবং ইহার প্রকাশ Impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক।

রামায়ণ ও মহাভারতে এই দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান। রামায়ণ ও মহাভারত মূলতঃ বীরগাথা—রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে 'নানাচিত্রাঃকথাশ্চান্যাঃ' [রামায়ণ], এবং 'বিবিধাঃ কথাঃ' [মহাভারত]। রামায়ণ ও মহাভারত যথাক্রমে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের রচনা বলিয়া গণ্য হইলেও, উহারা যে এক ব্যক্তির রচনা নয় এবং কোন এক যুগের সৃষ্টিও নয়, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণে বলা হইয়াছে, বাল্মীকি প্রকাশিত রামচরিতকে পুনরায় ব্যক্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন—'ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ' [বাল. ৩.১]। মহাভারতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে,

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥ [আদি. ১. ২৬]

—এই ইতিহাস পূর্বে কোন কবি কীর্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি ইহা বর্ণনা করিতেছেন এবং পরেও কেহ কেহ বর্ণনা করিবেন।

বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল জাত মহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, (i) এপিক বর্ণনাত্মক, (ii) উহা আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি অখণ্ড কাহিনী এবং (iii) উহা বলিষ্ঠ গম্ভীর ছন্দে গ্রথিত। এই উক্তিতে মহাকাব্য

১। 'It is not in its entirety the work of a single author, but to some extent the result of a process of evolution and consolidation.—W. D. Hudson [An Intro. to the study of lit. Chap. III]

যে বিষয় ও বর্ণনা গুণে সমৃদ্ধ এবং উহাতে যে একটি রাজসিক গৌরব ও বিস্তৃতি থাকে, তাহা আভাষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অখণ্ডত্ব ও মহত্ত্ব। রামায়ণ-মহাভারত এদিক হইতেও মহাকাব্য। উহারা আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত অখণ্ড কাব্য তো বটেই, উপরন্তু উহাতে আছে বিপুল মহত্ত্ব ও গুরুত্ব। 'মহদ্ভুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্', আর 'মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে'। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতকে 'বৃহৎ বনস্পতি'র সহিত তুলিত করিয়াছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, 'মহাভারতকে ভারতের হিমাচলের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।' শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতকে বলেন, 'Olympian', আর রামায়ণকে বলেন, 'Oceanic poetry' [Vyasa and Valmiki—Sri Aurobindo]—রামায়ণ 'সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যম্', আর মহাভারত 'যথামেরুর্মহাগিরিঃ'। এই বিশালত্বই ইহাদের মহাকাব্যত্ব।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মহাকাব্যের মূলে যে বীরগাথা থাকে, তাহা ধর্ম ও অলৌকিক বিশ্বাসবিরহিত নিছক মানব-কাহিনী। কালক্রমে ধর্ম ও নীতিকথায় মণ্ডিত হইয়া উহা Religious in character হইয়া উঠে। হোমারের ইলিয়াড-অডেসিতে তাহাই হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারতও ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, 'নরচন্দ্রমা' রাম এবং 'নরবপু যাঁহার স্বরূপ' এমন কৃষ্ণ আদৌ ছিলেন বীরপুরুষ মাত্র। ক্রমে তাঁহারা বিষ্ণুর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, রামায়ণে ও মহাভারতে যে-যে অংশে রামচন্দ্রে ও কৃষ্ণে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত।[1] রামায়ণ-মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ অবশ্যই আছে। কিন্তু সে প্রক্ষেপবিচারের পথ ইহাই কিনা, বিচার্য। উপরন্তু রামায়ণ-

---

১। It is true in the Epic poems Rama and Krishna appear as an incarnation of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men, acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority......It is impossible to read either of these two poems with attention without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes and of the unskilful manner in which these passages are often introduced, and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unneceessary they are for its progress'—Indian Antiquities. Vol I. Lassen [Quoted from Muir's O. S. T]

মহাভারতে ধর্মভাব আরোপিত—ভারতবর্ষের ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে এ মত অশ্রদ্ধেয়। রামায়ণ 'কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্' [বাল ৩. ৮] আর মহাভারত,

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসনামিতবুদ্ধিনা॥ [আদি ৫৭. ২৩]

এই ধর্মভাব পরবর্তীকালের যোজনাও নয়। ভারতবর্ষের জীবন কোনকালেই ধর্মবিরহিত নয়। ধর্ম ও নীতি বিরহিত জীবনের বিরুদ্ধেই এদেশের সংগ্রাম। কামাচর অধর্মাচারী দশাননের উপর ধর্মবীর রামচন্দ্রের জয় এবং মত্সরময় দুর্যোধনের উপর সত্যধর্মবাদী যুধিষ্ঠিরের জয়—এই সত্যেরই পরিপোষক। উপরন্তু রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতারত্ব বহুপূর্ব হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

২ রামায়ণ-প্রসঙ্গ : কাব্যোৎপত্তির কাহিনী

রামায়ণ 'আদি কাব্য', বাল্মীকি 'আদি কবি'। বৈদিক ঋষিগণও কবি, কিন্তু আদি কবিখ্যাতি রামায়ণকার বাল্মীকির। কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিবৃন্দ বাল্মীকিকেই আদ্য কবি বলিয়া স্বীকৃতি জানাইয়াছেন[১] বাল্মীকির কবিত্বলাভের বিবরণটিও মনোজ্ঞ। কবি হৃদয়ে সৃষ্টি-প্রেরণা কিরূপ গভীর, এই বিবরণ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। রামায়ণের সূচনা এই কাহিনী লইয়া :

বাল্মীকি নারদমুনিকে প্রশ্ন করিলেন, 'কোন্বস্মিন সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।' নারদ উত্তর করিলেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামোনাম জনৈঃ শ্রুতঃ।' নারদ রামচন্দ্রের গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া সূত্রাকারে যৌবরাজ্যে অভিষেক হইতে রামচন্দ্রের রাবণ বধান্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কহিলেন, রামরাজ্যে লোক নিরাময়, নীরোগ, আনন্দিত ও দুর্ভিক্ষভয়বর্জিত হইবে। বাল্মীকি রাম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে স্নানার্থ তমসা নদীর তীরে আসিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় বনশোভা, বনে বিহারে প্রমত্ত এক ক্রৌঞ্চমিথুন। সহসা এক নিষ্ঠুর ব্যাধ কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বাণবিদ্ধ করিল। ভূতলে পতিত রক্তাপ্লুত ক্রৌঞ্চ, আর তাহাকে ঘিরিয়া ক্রৌঞ্চীর করুণ রোদন। মহর্ষির অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। উদ্বেলিত শোকভরে তিনি অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ [বাল. ২. ১৫]

১। অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায়
[উত্তররামচরিত. ২য় অঙ্ক।]—ভবভূতি

—রে নিষাদ! যেহেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করিলি, সেই নিমিত্ত অনন্তকাল তুই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবি না।

বলিয়াই তিনি ভাবিলেন, এ আমি কি বলিলাম, 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, শোকের আবেগে এই যে পাদবদ্ধ, সমাক্ষরবিশিষ্ট, লয়সমন্বিত বাক্য উচ্চারিত হইল, ইহা 'শ্লোক' নামে খ্যাত হউক ['শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা']। শিষ্যও মুনির বাক্য অনুমোদন করিলেন। বাল্মীকির মনে বিতর্ক চলিতেই লাগিল। আশ্রমে ফিরিয়াও তিনি উন্মনা রহিলেন। এমন সময়ে আশ্রমে আসিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা। বাল্মীকি তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দিলেন, কিন্তু তখনও তিনি শোকার্ত হইয়া তন্ময়চিত্তে পূর্ব শ্লোকের কথাই ভাবিতেছিলেন। অন্তর্যামী ব্রহ্মা সব বুঝিলেন, সহাস্যে তিনি বলিলেন, 'শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা'—সংশয় করিও না, তোমার এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই বিখ্যাত হইবে। ব্রহ্মা তাঁহাকে নারদবর্ণিত রামের সমগ্র চরিত রচনা করিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন :

> যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
> ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥
> যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
> তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচারিষ্যতি ॥ [বাল. ২. ৩৫-৩৬]

> —যাহা অবিদিত, তাহাও তোমার বিদিত হইবে ; তুমি যাহা এই কাব্যে বর্ণনা করিবে, তাহার একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না। যতদিন মহীতলে গিরি ও সরিৎ থাকিবে, ততদিন রামায়ণকথা এই লোকে প্রচারিত থাকিবে।

ব্রহ্মার বাক্যে বাল্মীকি ধ্যানযোগে করতলস্থ আমলকবৎ ['পাণাবামলকং যথা'] রামের সমগ্র ইতিহাস দেখিতে পাইলেন এবং রামায়ণকথা রচনা করিয়া 'কুশীলব' দ্বারা সেই শ্রুতিমধুর, শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য রৌদ্র-বীরাদি রসসমন্বিত কাব্য গান করাইলেন। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞবাটে কুশীলবই সর্বপ্রথম এই রামায়ণ গান করিয়াছিলেন।

৩. বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী সার

বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড—এই ছয়কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড সহ মোট সাতকাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে পাঁচশত সর্গ ও ২৪০০০ শ্লোক আছে।[১]

১। চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥ [রামা, বাল, ৪।২]

রামায়ণের বালকাণ্ডের সূচনায় প্রথম ৪ সর্গে বাল্মীকির কবিত্বলাভের বর্ণনা; পঞ্চম সর্গ হইতে অযোধ্যা নগরীর ও রাজা দশরথের বিবরণ লইয়া মূল কাহিনীর আরম্ভ। এই কাণ্ডে আছে প্রধানতঃ ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান, রামাদির জন্ম, তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের কাহিনী, অহল্যা-মোচন, হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বিবাহ ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত বৃত্তান্ত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্ত্রী-পুরুষে ভেদরহিত বারাঙ্গনাদ্বারা প্রতারিত তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত একটি ছোটগল্প। এই কাণ্ডের অপর উল্লেখযোগ্য কাহিনী বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ। বিশ্বামিত্র কুশিকগোত্রীয় ক্ষত্রিয়, তপোবলে তিনি হইলেন ব্রহ্মর্ষি। এ এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। তেমনি বিস্ময়কর হরধনুভঙ্গ বৃত্তান্ত। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনু গ্রহণ করিলেন, অবলীলাক্রমে শর যোজনা করিয়া মহানিস্বনে ধনুভঙ্গ করিলেন ['বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ']। বীর্যশুল্কে সীতালাভ এই হরধনুভঙ্গের ফলশ্রুতি; ইহারই অপর পরিণাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

অযোধ্যাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা—রামাভিষেকের আয়োজন, মন্থরার মন্ত্রণা, রামের নির্বাসন, 'নিষদাধিপসংবাদ', দশরথের মৃত্যু, রাম-ভরত মিলন, জাবালির নাস্তিকতা, নন্দিগ্রামে রামচন্দ্রের পাদুকাভিষেক ও রামের চিত্রকূট ত্যাগ। অভিষেকের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে রাম-নির্বাসন এক মর্মান্তিক কাহিনী। এ কাহিনী অশ্রু-বিধৌত। গুহ-মিলন আর এক মনোরম বৃত্তান্ত। রামচন্দ্র বর্ণক্ষত্রিয়, গুহ নিষাদ; ব্যাধ হইয়াও গুহ রামের মিত্র ['রামস্যাত্মসমঃ সখা']। গুহ বলিয়াছিলেন, 'নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন' —পৃথিবীতে রামের মত প্রিয়তম আর কেহ নাই। অন্ত্যজের এ সখ্য অতুলনীয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। এই কাণ্ডের আর এক আকর্ষণ ভরত-মিলন। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা। রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া জটাচীরধারী ভরত রামের পাদতলে পতিত হইলেন, আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, 'তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি'। কিন্তু পিতৃসত্যে অটল রাম। অনন্যোপায় ভরত রাম-প্রদত্ত পাদুকা শিরে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া, অগ্রজের পাদুকাকে অভিষিক্ত করিয়া বল্কলজটাধারী মুনির বেশে প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। 'জাবালি-সংবাদ' আর একটি ঘটনা। রামচন্দ্রের প্রতি জাবালির উপদেশ নাস্তিক চার্বাকের প্রতিধ্বনি: 'রাম, মনে রাখিও, পরলোক নাই। যাহা প্রত্যক্ষ তাহার জন্য উদ্‌যোগী হও, যাহা পরোক্ষ তাহা পরিত্যাগ কর' ['প্রত্যক্ষং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু'—অযো. ১১৭. ১৭]। নাস্তিক্যবাদ যে কত প্রাচীন, জাবালির উক্তি তাহার প্রমাণ।

অরণ্যকাণ্ডের ঘটনাসমূহ যেমন ভয়াবহ, তেমনি করুণ। এই কাণ্ডের প্রধান বর্ণনীয়

বিষয়,—শূর্পনখা সংবাদ, মায়ামৃগ কথা, সীতাহরণ, জটায়ু বধ, রামবিলাপ ও শবরীর স্বর্গারোহণ। এখানে রামচরিত্রে দুই বৈপরীত্যের সমাবেশ: একদিকে তাঁহার বীর ধনুষ্পাণি মূর্তি, অন্যদিকে 'শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্ উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে'। দুঃখময় বনবাস-জীবনে প্রাকৃতিক শোভার লীলাস্থলী পঞ্চবটীতে ['বনরামণ্যকং যত্র জলরামণ্যকং তথা'] পর্ণশালায় সুখের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সুখের নীড়ে দুর্বিপাক সৃষ্টি করিল কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পনখা। মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়া ছলনা করিতে আসিল:-অপূর্ব মৃগ 'মণিপ্রবর শৃঙ্গাগ্রঃ...রক্তপদ্মোৎপলমুখঃ'। রামচন্দ্র তাহাকে ধরিতে ছুটিলেন। মৃত্যুকালে মারীচ অবিকল রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া 'কোথায় সীতা', 'কোথায় লক্ষ্মণ' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সীতা মায়ামারীচের ছলনা বুঝিতে পারিলেন না, লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে গমন কবিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'সুদুষ্টস্বং'—তুমি দুষ্টমতি, আমার প্রতি তোমার অভিলাষ, রামের বিপদই তোমার কাম্য—'অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।' সীতার বাক্যে লক্ষ্মণের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনিও কঠোর ভাষায় কহিলেন, 'উত্তরং নোৎসাহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম'—আপনি আমার নিকট দেবীতুল্য, আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না; বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন, 'গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে।' কিন্তু স্বস্তি আসিল না, আসিল পরিব্রাজকের বেশধারী দুষ্ট দশগ্রীব। মুহূর্তে ছদ্মবেশ অপসারিত হইল, প্রকাশিত হইল নীলমেঘের ন্যায় ভীষণ বক্তাম্বরধর রাবণমূর্তি। সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া মায়াময় রথে স্থাপন পূর্বক সে ঊর্ধ্বাকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, পঞ্চবটির নদী-বনানী-গিরিকন্দরের উদ্দেশ্য করিয়া আর্তস্বরে বলিলেন, 'ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।' কিন্তু নিষ্ফল ক্রন্দন। সীতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া জটায়ু ক্ষীণায়ু হইলেন। সীতা অপহৃতা হইলেন। এ অবস্থায় রামের বিলাপ অতি করুণ। চেতনে-অচেতনে পার্থক্য নাই। কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার, মৃগ, ব্যাঘ্র, হস্তী—যাহা দেখিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, 'যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্'—যদি জান, বল, সুমুখী সীতা কোথায়? এই সময়ে শ্রমণী শবরী তাঁহার বহুদিনের অভীষ্ট রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া ধন্য হন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্যতম ঘটনা,—রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী, বালীবধ, তারাবিলাপ ও সীতা অন্বেষণে হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের উদ্যোগ। বসন্ত সমাগমে পুষ্পাঢ্য পম্পার বর্ণনা লইয়া এই কাণ্ডের আরম্ভ। বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ। সমীরণে সঞ্চালিত কুসুমশাখা, চতুর্দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি, মধুগন্ধী রম্যবনে ষট্‌পদের অনুকূজন। তাহার মধ্যে রামচন্দ্রের সকরুণ বিলাপ:-

অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্।
স্মারয়তি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্॥ [কিষ্কি. ১. ৮৮]

—হায়রে কামের বাম স্বভাব। যে চলিয়া গিয়াছে, যে দুর্লভ, সেই কল্যাণী কল্যাণবাদিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইহার পর বালীবধের কাহিনী। অন্তরালে থাকিয়া রামচন্দ্রের পক্ষে বালীকে বধ করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, বিতর্কের বিষয়। বন্ধুত্বের অনুরোধে এই জুগুপ্সিত কার্য করিয়া রামচন্দ্রকে কলঙ্কভাজন হইতে হইয়াছে। বালী বলিয়াছেন, 'জানে পাপ সমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্'। —বুঝিলাম, তুমি পাপাচারী, তৃণাচ্ছন্ন কূপ।

রামচন্দ্র মনুবাক্য উদ্ধার করিয়া নিজ দোষ স্খালন করিতে চেষ্টা করিলেও, কলঙ্ক অপনীত হয় নাই। এই কাণ্ডের তারাবিলাপও মর্মভেদী। আশ্রিত লতা যেমন মহাসমুদ্রকে বেষ্টন করে, তেমনি মৃতস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তারা বিলাপ করিয়াছেন। কাণ্ডশেষে মহর্ষি অনন্ত সাগরের সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়াছেন। আকাশের ন্যায় দুষ্পার সাগর, কোথাও স্থির, কোথাও ক্রীড়াচঞ্চল, কোথাও পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ:

প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীডন্তমিব চান্যতঃ।
ক্বচিৎ পর্বত মাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্॥ [কিষ্কি ৬৪. ৬]

মহাবীর, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, অঞ্জনানন্দন হনুমান—ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মত যাঁহার বিক্রম—এই মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

হনুমানের সাগর লঙ্ঘন বৃত্তান্ত দ্বারা সুন্দরকাণ্ডের সূচনা। এই কাণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—রাবণ-ভবন লঙ্কার বর্ণনা, অশোক বনে শোকার্তা সীতার চিত্র, সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কাদাহ ও সীতার অভিজ্ঞানসহ হনুমানের প্রত্যাবর্তন। অপূর্ব শোভার সার পরিখা ও প্রাকারবেষ্টিত বিশ্বকর্মানির্মিত লঙ্কা: রাবণ-ভবন 'কাঞ্চন চারুরূপম্', 'মহীতলে স্বর্গমিব'। ভোগের উপকরণে শোভিত ভোগবতী—কোথাও বিলাসবতী সহস্র অঙ্গনা, কোথাও নৃত্য-গীত, পানভোজনের সমারোহ। এই সমারোহের পাশে অশোকবনে সীতার মূর্তি, 'শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্'। কণকবর্ণাঙ্গী আজ অশ্রুমুখী। রাত্রিশেষে যখন ব্রহ্মরাক্ষসগণের বেদধ্বনিতে পূর্ণ লঙ্কা, তখন অশোকবনে আসিল কামমত্ত, মদদর্পিত রাবণ। অশোকবনের এই দৃশ্য অবিস্মরণীয়। একদিকে কামোন্মত্ত পরদারলোভীর গর্জন, অপরদিকে সাধ্বী সীতার তিরস্কার। ক্রোধান্ধ রাবণ প্রস্থান করিলে একজটা, হরিজটা, বিকটা রাক্ষসীর দল সীতাকে ঘিরিয়া ধরিল। ক্রুদ্ধ শূর্পনখা বলিল,

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোক বিনাশিনী ॥
মানুষং মাংসমাসাদ্য নৃত্যামোহথ নিকুম্ভিলাম্ ॥ [সুন্দর. [illegible]]

—সর্বশোকবিনাশিনী সুরা আন। আজ মানুষের মাংস ভক্ষণ করিয়া নিকুম্ভিলার সম্মুখে নৃত্য করিব।

এই বিষাদঘন পরিবেশে সীতাকে রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া হনুমান বিষে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। হনুমানের আর এক কীর্তি, লঙ্কাদাহ। এই মহাবীর বীরবিক্রমে লঙ্কাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রামচন্দ্রকে সীতার বার্তা নিবেদন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ড যুদ্ধকাণ্ড। ইহা যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি ভয়ঙ্কর। একদিকে কপিসেনার কিলকিলা ও জয়ধ্বনি, অপর দিকে রক্ষোবংশের হুঙ্কার ও আর্তনাদ। রামসেনার সমুদ্র-দর্শন, রামের সহিত বিভীষণের মৈত্রী, নলের সেতুবন্ধন, 'কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্', এবং 'রাবণস্য বিনাশঞ্চ'—এই কাণ্ডের প্রধান ঘটনা। ৪র্থ সর্গে আবার সমুদ্রের বর্ণনা: চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সমুদ্র, ফেনাগুলি যেন মুখের হাসি, তরঙ্গভঙ্গ যেন উচ্ছল নৃত্য, উর্মিমালার সংঘর্ষ যেন সিন্ধুরাজের ভেরীনিনাদ। এই মহাসাগরের একমাত্র উপমা অনন্ত অম্বর, যেমন অম্বরের একমাত্র উপমা সাগর:—

সাগরং চাম্বর প্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরং চাম্বরং চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ [যুদ্ধ. ৪. ১২০]

এই সাগরে সেতুবন্ধন কপিবর নলের অদ্ভুত কীর্তি, সেকালের উৎকৃষ্ট শিল্পকৃতির নিদর্শন। এই সেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মিত, সূত্র ও মানদণ্ডে পরিমিত। ইহার নির্মাণে যন্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে ['পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ'—যুদ্ধ, ২২. ৫৬]। কপিসেনার মধ্যে ভেষজবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন সুষেণ। ইন্দ্রজিৎ যতবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রায় ততবারই রাম লক্ষ্মণ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। এই বিপদে ভেষজ আহরণের মন্ত্রণা দিয়াছেন সুষেণ। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর মদোদ্ধত ক্রুদ্ধ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণের উপর ময়দানব নির্মিত অষ্ট ঘণ্টাযুক্ত শক্তিশেল নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ শেলাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রামচন্দ্র আহত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন,

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ [যুদ্ধ ১১৬. ১৪]

—দেশে দেশে স্ত্রী মিলে, বান্ধবও মিলে; কিন্তু এমন দেশ নাই যেখানে সহোদর ভ্রাতা মিলিতে পারে।

তখনও এই সঙ্কটে সান্ত্বনা দিলেন সুষেণ। তিনি মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, লক্ষ্মণ

প্রাণ হারান নাই। তাঁহারই নির্দেশে হনুমান ওষধি পর্বত হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্য করণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী ওষধি আনিয়া লক্ষ্মণকে বিশল্য ও নীরোগ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকাণ্ড যুদ্ধ সমারোহে পূর্ণ। যুদ্ধের বর্ণনাগুলি বৈচিত্র্যহীন হইলেও, তাহাদের আকর্ষণ কম নয়। অতি ভীষণ কুম্ভকর্ণের প্রতাপ, বজ্রের মত তাহার গর্জন। মায়াধর ইন্দ্রজিতের যুদ্ধও নিপুণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর রাম-রাবণের যুদ্ধ। আত্মীয়স্বজন আত্মজের মৃত্যুতে শোকোন্মত্ত অতি ভীষণ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। সমুদ্র ধূমে পরিণত হইল, উত্তাল তরঙ্গ গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। রাম ইন্দ্র-প্রদত্ত মাতলি-চালিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু অবধ্য রাবণ। দেবগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্য রাম রাবণের যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে সর্বশত্রুবিনাশন আদিত্য-হৃদয় স্তব শিখাইয়া তিনবার তাহা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র আচমন করিয়া শুচিশুদ্ধ চিত্তে সেই স্তোত্র জপ করিলেন। তারপর আবার ভীষণ যুদ্ধ সুরু হইল। কিন্তু রাম যতবার রাবণের মস্তক ছেদন করেন, ততবার নূতন মস্তক উদ্গত হয়। অবশেষে মাতলির নির্দেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বসুন্ধরা সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হইল। বেদবিধি অনুসারে তিনি সেই অমোঘ বাণ সন্ধান করিলেন। রাবণ নিহত হইল, যেন বেলাভূমিতে মহাসাগর ভগ্ন হইয়া গেল। দেবগণ স্তুতি উচ্চারণ করিলেন, চতুর্দিকে সাধু সাধু রব উঠিল। কিন্তু ভ্রাতৃ-বিরহে বিভীষণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, মন্দোদরী প্রমুখ রাবণমহিষীদের বিলাপে রণস্থল শোকস্থলে পরিণত হইল। রাম বলিলেন, 'মরণান্তানি বৈরাণি'—মৃত্যুতে শত্রুতার শেষ: তিনি রাবণের দেহ-সংকারের নির্দেশ দিলেন। রাক্ষসব্রাহ্মণগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মন্ত্রের সহিত চন্দন কাষ্ঠের চিতায় রাবণের দেহ ভস্মীভূত হইল। যুদ্ধ-কাণ্ডের আর একটি ঘটনা সীতার অগ্নিপরীক্ষা। মহর্ষি এখানে রামচন্দ্রের মুখে অতি রূঢ় উক্তি যোজনা করিয়াছেন: যাহার চরিত্রে আমি সন্দেহ করি, সেই তুমি নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করিতেছ। 'নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি'—তোমার প্রতি আমার আসক্তি নাই; যেখানে খুসি সেইখানে তুমি যাও। সীতার প্রত্যুত্তর সতীজনোচিত ও তেজোদৃপ্ত।

পতির নির্দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি অগ্নি প্রবেশ করিলেন। অগ্নি অম্লান মাল্য-ভূষিতা সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন। রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্পকবিমানে অন্যান্য সুহৃৎসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামচন্দ্র রাজা হইলেন। রাম-রাজত্বের প্রশস্তি ও রামায়ণ-শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়া যুদ্ধকাণ্ডের পরিসমাপ্তি।

উত্তরকাণ্ড রামচন্দ্রের উত্তর জীবনের কাহিনী। ইহাতে মূল কাহিনী অংশে আছে,

সীতার বনবাস, কুশ ও লবের জন্ম, শত্রুঘ্নের লবণ বধ, রাম কর্তৃক শম্বুকের শিরশ্ছেদ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, যজ্ঞবাটে লবকুশের রামায়ণ গান (রামের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত), সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জন এবং রামের মহাপ্রস্থান। প্রসঙ্গতঃ এই কাণ্ডে বিবিধ পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে : তন্মধ্যে প্রধান রক্ষোবংশের ইতিহাস, রাবণের দিগ্বিজয়, বেদবতী ও রম্ভার উপাখ্যান, বানর বংশের পূর্ববৃত্তান্ত, দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস। উত্তরকাণ্ড অনেকটা পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনার দিক হইতে বালকাণ্ড অর্থাৎ প্রথমকাণ্ডের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। উত্তরকাণ্ড অশ্রুর অনন্ত নির্ঝর। সীতার নির্বাসন হইতে রামচন্দ্রের মহানির্বাণ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ অতি করুণ। ক্রৌঞ্চ মিথুনের বেদনায় মহাকবি বাল্মীকির হৃদয়ে যে শোকের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছিল, উত্তরকাণ্ডে তাহা সহস্র ধারায় পরিণত হইয়াছে। সুখের দিন আসিতে না আসিতেই সীতার বনবাস। যে সীতাকে রামচন্দ্র অগ্নিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকাপবাদ শ্রবণে প্রজারঞ্জনানুরোধে সেই সীতাকে তিনি বিসর্জন দিলেন। ব্যক্তিগত প্রেম তাঁহার জীবনের বড় কথা নয়, বংশমর্যাদাই জীবনসর্বস্ব। তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী, সর্বাপেক্ষা রিক্ত, তাঁহার ত্যাগ অতুলনীয়। সীতা চরিত্রও অতি উজ্জ্বল। পরিত্যক্ত হইয়াও সীতা প্রতিবাদ করেন নাই, স্বামীরই মঙ্গল কামনা করিয়া বলিয়াছেন, "যত্ত্ব পৌরজনে রাজন্ ধর্মেন সমবাপ্স্যসি' [উত্তর ৫২. ১৫]—পৌরজনের ধর্মরক্ষা করিয়া আপনি কীর্তিলাভ করুন।

এই কাণ্ডের আর এক ঘটনা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষার জন্য স্বর্ণসীতার পরিকল্পনা—"কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষার্হাং যজ্ঞকর্মণি [উঃ ৯১. ২৫]। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, মূল রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। মূলে আছে, বাল্মীকিই শিষ্যসহ রামচন্দ্রের যজ্ঞবাটে আসিয়াছিলেন এবং কুশ লবকে রামায়ণের অংশবিশেষ গান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কুশ ও লবের মুখে মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র জানিতে পারেন লব কুশ সীতার পুত্র। তিনি মহর্ষিকে বার্তা প্রেরণ করেন, সীতা যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে তিনি যেন সভামধ্যে নিজ বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। এইখানেই সীতার পাতাল প্রবেশের সূচনা। পরদিন বাল্মীকি সীতাসহ সভায় উপস্থিত হইলেন। সভায় তখন ত্রিলোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সকলেই ঔৎসুক্যবশে পাষাণ মূর্তির ন্যায় স্থির। মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে অপাপবিদ্ধ ও শুদ্ধচারিণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন, যদিও মহর্ষি প্রাচেতসের নির্মলবাক্যে সীতার বিশুদ্ধি বিষয়ে আমার সন্দেহের অবকাশ নাই, তথাপি ত্রিলোকবাসী যখন সীতার শপথ শুনিতে আসিয়াছেন, তখন সীতা বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা

হইয়া আমার প্রীতিপাত্রী হউন। কাষায়-বসনা সীতা দৃষ্টি অবনত করিলেন, তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ [উত্তর ৯৭. ১৪-১৬]'

—যদি আমি রাঘব ব্যতীত অন্য কাহাকে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে ধরণীদেবী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন। যদি মনে, কর্মে, বাক্যে রামকেই ভজনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন। রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না,—আমার এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেবী বসুমতী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন

ত্রিসত্য উচ্চারিত হইতে না হইতে ভূতল হইতে নাগবাহিত, রত্নবিভূষিত এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। ধরণীদেবী দুই বাহু দ্বারা মৈথিলীকে বেষ্টন করিয়া স্বাগত সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইলেন। রত্নসিংহাসন রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রামায়ণে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা আছে, তন্মধ্যে সীতার পাতালপ্রবেশ অন্যতম। সীতার জন্ম ও তিরোভাব—দুইই বিস্ময়কর : ভূতল হইতে তিনি উত্থিতা ['ভূতলাদুত্থিতা সা'], আবার ভূতলেই প্রবিষ্টা। সীতার অন্তর্দ্ধানে রামচন্দ্র ক্রোধে শোকে আকুল হইলেন। এই সময়ই ব্রহ্মার নির্দেশে সভায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ড গীত হইয়াছিল : ইহার পূর্বে রামচন্দ্রের পূর্বচরিত গীত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ ও রামায়ণের ফলশ্রুতি বর্ণনান্তে উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তি।

৪. রামায়ণের প্রক্ষিপ্তাংশ ও কাল-বিচার

'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'। কিন্তু রামায়ণের এই কাণ্ড সংখ্যা লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। কেহ বলেন, রামায়ণ ষষ্ঠ কাণ্ড, সপ্তম কাণ্ড অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, উহা পরবর্তীকালের যোজনা; প্রথম কাণ্ডও মূলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডের প্রথম চারি সর্গ সম্পর্কে আপত্তি এই যে, ইহা যদি স্বয়ং

বাল্মীকির রচনা হইবে, তবে কবি স্বীয় কবিত্বলাভের ইতিহাসটি উত্তম পুরুষে (1st person) বর্ণনা না করিয়া, প্রথম পুরুষের উক্তিতে (3rd person) বর্ণনা করিলেন কেন? সর্বাপেক্ষা বেশি সংশয় উত্তরকাণ্ড লইয়া। (উত্তর কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি অন্যান্য কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি হইতে স্বতন্ত্র। অযোধ্যা হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনার যে গতি, উত্তরকাণ্ডে তাহা অতি মন্থর: মূলকাহিনী অপেক্ষা পুরাকাহিনীর বাহুল্য ইহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে) দ্বিতীয়তঃ বালকাণ্ডে রামায়ণ কাহিনীর দুইটি আনুক্রমণিকা আছে—একটি নারদ-বর্ণিত, অপরটী বাল্মীকির নিজের। দুইটি অনুক্রমণিকায় কিছু কিছু অমিল রহিয়াছে। নারদবর্ণিত আনুক্রমণিকায় 'রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরাপ্তবান্' বলিয়া রামরাজ্যের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে: ইহাতে উত্তরকাণ্ডের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় অনুক্রমণিকায় 'স্বরাষ্ট্ররঞ্জনশ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্'—রামের প্রজানুরঞ্জন ও সীতা নির্বাসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু উত্তরকাণ্ডোক্ত অন্যান্য ঘটনার উল্লেখ নাই; সীতার পাতালপ্রবেশ উত্তরকাণ্ডের বিশিষ্ট ঘটনা: উহার উল্লেখ কোন অনুক্রমণিকাতেই নাই। তাই অনেকেরই ধারণা উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়। রাজশেখর বসু বলেন, 'তাঁর (বাল্মীকির) মূলকাব্য মিলনান্ত, অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রামসীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল, এমন কথা বাল্মীকি লেখেননি'।[১]) পণ্ডিতগণ আরও বলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে 'নরচন্দ্রমা' রামে দেবত্ব, সে সকল অংশও প্রক্ষিপ্ত।)

এই পদ্ধতিতে ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষেপ বিচার করা সঙ্গত কিনা, বিবেচ্য। ভারতবর্ষ বহুকাল যাবত সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছে। মূল রামায়ণ মিলনান্ত, এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই। নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনও রামায়ণকে করুণরসাত্মক কাব্য বলিয়াছেন [ধ্বন্যালোক ৪র্থ উদ্যোত], চতুর্থ শতকের কবি কালিদাসও রামায়ণের বিয়োগান্ত পরিণতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। রামচন্দ্রের দেবত্বও বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালিদাস তাঁহাকে 'বিভক্তাত্মা বিভুঃ' [রঘু ১০. ৬৫] বলিয়াছেন। ভবভূতি বলেন, রামায়ণকথা 'মঙ্গল্যা চ মনোহরা।' তাহা ছাড়া ভগবান যখন নরাকারে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি দেবত্ব নয়, মানবত্বকেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহার দ্বারা 'নরচন্দ্রমার' দেবত্ব বাধিত হয় না, বরং দেবতার মাধুর্যই আভাসিত হয় এবং সেই গুণেই ধর্মসাহিত্য কাব্য হইয়া উঠে। কাজেই রামায়ণের যে যে অংশে রামচন্দ্রের দেবত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, এ বিচার অসমীচীন। উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, এমতও অগ্রাহ্য। উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেদ্য

১। বাল্মীকি-রামায়ণ (সারানুবাদ)—ভূমিকা

অংশ। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রক্ষোবংশের আদি ইতিহাস ও কপিবংশের পূর্ব বৃত্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত; উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণকে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত মহাকাব্য বলা চলিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমগ্র রামায়ণের উপোদ্‌ঘাত; ইহা না থাকিলে অনেক জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। রাবণ এত দুর্ধর্ষ কেন, তাহার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবরণ দ্বারাই রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড রচনাই বাল্মীকির প্রধান কৃতিত্ব। রাম রাজা হইলে তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।[১] উত্তর কাণ্ডের কবিত্বও তুচ্ছ নয়। রাজশেখর বসু মহাশয় উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা স্বীকার করিয়াও বলেন, 'বাল্মীকির রচনার কাল যাই হক, একথা নিশ্চিত যে মূলগ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাসন জুড়ে দিয়েছেন, তিনি অতি প্রাচীন ও তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়'।

অবশ্য রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, উহা এক যুগের রচনাও নয়। বর্তমানে যে আকারে উহা পাওয়া যাইতেছে আচার্য Winternitz তাহাকে Probably in the period 400—200 B. C. বলিয়া মনে করেন।

৫. রামায়ণের সমাজ ও চরিত্র

রামায়ণে যে সমাজের বর্ণনা আছে, তাহাকে অনেকেই কৃষিসভ্যতার প্রতীক মনে করিয়াছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষি সভ্যতার যুগ। তখন পর্যন্তও মানুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন করে নাই,—বনের সহিত জনপদের মিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন ও আরণ্য জীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এই মিলন ও মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে।' [ত্রয়ী]

রামায়ণে মিশ্রণের চিহ্ন আছে। এখানে তিনটি পরিবার, তথা তিনটি বৃহৎ সমাজের কথা পাওয়া যায়: (১) অযোধ্যার রঘুবংশ, (২) কিষ্কিন্ধ্যার কপিবংশ, এবং (৩) লঙ্কার রক্ষোবংশ। প্রথমটির নায়ক-নায়িকা 'নর', দ্বিতীয়টির 'বানর', (ব + নর—নরের বিকল্প) এবং তৃতীয়টির রাক্ষস-রাক্ষসী। মনুষ্য সমাজ আর্যধর্মাবলম্বী, রাক্ষস সমাজ অনার্য গোষ্ঠী এবং কপি সমাজ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও যৌথ পারিবারিক সংগঠন, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সর্বত্রই প্রায় এক প্রকার। প্রত্যেকটি সমাজে মনুপ্রবর্তিত শাস্ত্র ও

১। প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকি ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ [বাল্ম ৪. ১]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ প্রভাব বিস্তৃত। যে রাবণ রক্ষোবংশের প্রধান নায়ক, তিনি আহিতাগ্নি, বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্যে ব্রতী [যুদ্ধ. ১১১]। লঙ্কায় ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ ব্রহ্মরাক্ষস ছিলেন, নিশাশেষে তাঁহাদের বেদধ্বনিতে পুরী পবিত্র হইত [সুন্দর ১৮]; রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে পিতৃমেধ, অগ্নিসংকার ও তর্পণাদি করা হইয়াছিল—তাহাও ব্রাহ্মণ্য বিধানের অনুরূপ। কপিবংশে বালী ছিলেন পরম নীতিজ্ঞ, চতুঃসমুদ্রে তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন [উত্তর. ৩৪], হনুমান সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপ-শব্দিতম্' [কিষ্কি. ৩]—ইনি নিশ্চয় বহুবার ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছেন, একটিও অপশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। মনে হয়, রামায়ণের যুগে আর্যেতর সমাজ বহুল পরিমাণে আর্যীকৃত হইয়াছিল, অথবা বলা যাইতে পারে যে, 'পুরাণ ব্রহ্মবিদ্' প্রাচেতস্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কপি ও রাক্ষস সমাজের উপর স্বীয় ধর্মবিশ্বাস আরোপ করিয়াছেন। আরোপ যাহাই হউক, রামায়ণের কপি বা রক্ষোবংশ যে সুউচ্চ মানব ধর্মের অধিকারী, তাহার অবিরল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

॥ **নরসমাজ** ॥ নরসমাজে রামচন্দ্র পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, আশ্রিত-পালক, প্রজানুরঞ্জক। রামচন্দ্রের 'প্রাণ ইবাপরঃ' লক্ষ্মণ পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ দেবর; 'ভরত ভ্রাতৃভক্তির পরাণ', ত্যাগের একাদর্শ; আর সীতা পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার পবিত্রতা অগ্নিশুদ্ধ।

॥ **কপিবংশ** ॥ রামায়ণের বানরসমাজ মানুষের মতই গোষ্ঠীবদ্ধ। মানুষের মতই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও অনুভূতি। এই সমাজেই আছেন নলের মত শিল্পী, সুষেণের মত ভিষগ্বর। এই সমাজের নেতা ছিলেন বীরবিক্রম বালী। তাঁহার বিক্রমে রাবণ তটস্থ, রাক্ষস দুন্দুভী পরাভূত। বালীর স্ত্রী সুষেণ-দুহিতা তারা, তাঁহার পুত্র ধীমান অঙ্গদ, তাঁহার স্নেহের সহোদর সুগ্রীব। এই সুগ্রীবের সহিত তাঁহার বিরোধ। বিরোধের কারণ রাজ্য ও স্ত্রীঘটিত ব্যাপার। বালীর অনুপস্থিতিতে বালীকে মৃত মনে করিয়া সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন এবং অগ্রজ বধূকে রাণীরূপে গ্রহণ করেন। বৎসরান্তে রাজ্যে ফিরিয়া বালী এই কার্যের নিন্দা করেন, সুগ্রীবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নির্বাসিত করেন এবং সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে গ্রহণ করেন। নির্বাসিত সুগ্রীব স্ত্রীহরণকারী বালীকে নিহত করিবার জন্যই রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে বালীর উপদেশাবলী সুগভীর নীতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বালী পুত্রবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, পুত্রের নাম করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 'পার্বত্য প্রদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শ

অত্যন্ত সমুন্নত ছিল না' [রামায়ণী কথা] উক্তিটি হয়তো সত্য। তাহার দৃষ্টান্ত বালী-পত্নী তারা। তারা অতি বুদ্ধিমতী ও নয়-পারদর্শিনী। সঙ্কটকালে তিনি বালীকে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, তেমনি সুগ্রীবেরও উপকার করিয়াছেন। রামকে সাহায্য করিতে বিলম্ব করিলে লক্ষ্মণ যখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুগ্রীবের অন্তঃপুরে আসিলেন, তখন লক্ষ্মণকে মধুর নীতিবাক্যে ভুলাইলেন তারা। কিন্তু তারার চরিত্র দুর্বোধ্য। যে তারা বালীর মৃত্যুতে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছেন, তিনিই আবার সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ভুলিতে পারেন নাই অঙ্গদ। মাতার প্রতি তিনি দোষারোপ করেন নাই, কিন্তু সুগ্রীবের জুগুপ্সিত কর্ম সম্পর্কে অতি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন [কিষ্কি. ৫৫. ৩]।

কপিসমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দাস্য ও প্রভুভক্তির একাদর্শ বায়ুপুত্র, অঞ্জনানন্দন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান। তিনিই রাম-সুগ্রীবের মৈত্রীবন্ধনের সেতু। রামলক্ষ্মণের সহিত তিনি ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষায় কথা কহিয়াছেন, কামমোহিত সুগ্রীবকে রামের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। দুর্লঙ্ঘ্য সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই সাগর লঙ্ঘন করিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছেন হনুমান। অশোকবনে শোকাকুলা সীতাকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সীতাকে রামের অভিজ্ঞান দিয়াছেন, আবার সীতার দিব্য চূড়ামণি লইয়া রামের মৃতকল্প জীবনে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। ওষধিপর্বত হইতে ওষধি আহরণ হনুমানের আর এক কীর্তি। হনুমানের প্রত্যেকটি কর্ম শাস্ত্রানুমোদিত ও নীতিসঙ্গত। রাক্ষসদের প্রতি সাম-দান-ভেদনীতি প্রয়োগ নিষ্ফল বুঝিয়াই তিনি রাক্ষসসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হনুমানের সে মূর্তি, সে আস্ফোট বিস্ময়কর। তিনি ঘোষণা করিলেন :

> দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
>
> হনুমাঞ্ শত্রু সৈন্যানাং নিহন্তা মরুতাত্মজঃ॥ [সুন্দর. ৪২. ৩৩]

—আমি কোশলপতি অক্লিষ্টকর্মা রামের দাস : আমি মরুতাত্মজ হনুমান, শত্রু সৈন্যের নিহন্তা।

হনুমানের দাস্য ও সেবা রামায়ণে অমর হইয়া আছে।

॥ রক্ষোবংশ ॥ রামায়ণের অন্যতম পক্ষ রক্ষোবংশ। রাক্ষস 'নরখাদক' বলিয়া বর্ণিত হইলেও রাবণ-পরিবার ঠিক এই শ্রেণীর রাক্ষস নহে। আদি রক্ষোবংশ ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি। প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার নিমিত্ত তিনি একদল প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ক্ষুধার কামনায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন, রক্ষা কর। তাহারা বলিয়াছিল 'রক্ষামঃ', তাই তাহারা রাক্ষস [উত্তর, ৪]

বংশের সন্তান মাল্যবান, মালী ও সুমালী। ইহারা বিষ্ণু কর্তৃক পরাজিত ।। পাতাল আশ্রয় করিয়াছিল। সুমালীর কন্যা কৈকসী পুলস্ত্যপুত্র মুনি বিশ্রবাকে ।ত্বে বরণ করেন। বিশ্রবা-কৈকসী হইতে রাবণের জন্ম। রাবণ বৈশ্রবণ রাক্ষস। বংশে অনার্যরক্তে আর্যরক্তের মিশ্রণ। ইহাদের যে সমাজ, তাহা বর্বর সমাজ । রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মন্দোদরী, সরমা—সকলেই অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি। াদের মধ্যে কেহ ধার্মিক, কেহ বা অধার্মিক—কেহ সংযত, শাস্ত্রপরায়ণ, আবার কেহ বা মদোদ্ধত, পরশ্রীকাতর ও পরদারলোভী। কিন্তু পিতৃত্বে কিংবা পুত্রত্বে, পত্নীত্বে কিংবা মাতৃত্বে সকলেই সংবেদনশীল। মানুষ হইতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, রাক্ষস মায়াধর, নিকৃতিনিপুণ ও কামাবচর। মায়া করিয়া তাঁহারা যে-কোন বেশ ধারণ করিতে পারেন, যে-কোন কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারেন, ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে পারেন। মারীচ মায়ামৃগের বেশে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়াছিলেন, রাবণ যতি ছদ্মবেশে সীতা হরণ করিয়াছিলেন [অরণ্যকাণ্ড]। রামের মায়ামুণ্ড ও মায়া সীতার মূর্তি নির্মাণও রাক্ষসের নিকৃতি-নিপুণতার পরিচয়। ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে গরুড় বলিয়াছিলেন, রাক্ষসেরা কূটযোদ্ধা—মানুষের বল সরলতা—['প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ। শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্'—যুদ্ধ ৫০. ৫৩]। মানুষে ও রাক্ষসে প্রধান পার্থক্য এইখানে। নচেৎ রামায়ণের রাক্ষস অদ্ভুত কিছু নয়। রামায়ণের রাক্ষসসমাজের কথা চিন্তা করিলে চিরকালের লোভপ্রমত্ত প্রতিস্পর্ধী মানুষের কথা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় ই. : আভাস দিয়েছিলেন: 'ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারায় কাজ আদায় করত।' এ ধরনের মানুষ বর্তমান কালেও দুর্লভ নয়। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদী, ঐশ্বর্যমত্ত জাতির প্রতীকরূপে এইজন্যই রাবণকে চিত্রিত করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

রাক্ষস সমাজে আর্য ও প্রাগার্য জাতির মিশ্রণ সুস্পষ্ট। আর্যপূর্ব জাতির কতিপয় বিশ্বাস—দুর্নিমিত্ত দর্শনে ভয়, শৈব ও শাক্ত মতে বিশ্বাস, আথর্বন্ মন্ত্রে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি এই সমাজে প্রচলিত। 'নিকুম্ভিলা যজ্ঞ কি, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন: কেহ বলেন, নিকুম্ভিলা শক্তিমূর্তি—এখানে নরবলি দেওয়া হইত, মদ্য পান করিয়া ইহার সম্মুখে নৃত্য করা হইত। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ সজীব ছাগ উৎসর্গ করিয়া হোম করিতেন—ইহা নিকুম্ভিলা যজ্ঞের একটি ক্রিয়া [রাম, যুদ্ধ ৭৩]। এইরূপ আরও কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম আর্য-সংস্কার বহির্ভূত। আর্যসংস্কারের প্রভাবই তো আছে।

এই সমাজের প্রধান প্রতিনিধি দশগ্রীব রাবণ। রাবণের আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁহার অতুল বিভবের অনুরূপ। রক্তাম্বর পরিহিত, সর্বাভরণ ভূষিত, নীলমেঘের মত সেই বিশাল বপু, যে-কোন লোকের বিস্ময়। হনুমান প্রথম দর্শনেই 'অপাসর্পৎ সুভীতবৎ'—ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। রাজসভাতেও এই রাবণকে তিনি দেখিয়াছিলেন: মুক্তাজালমণ্ডিত মুকুট, মহার্ঘমণিসমন্বিত রত্নাভরণ, রক্তচন্দনেচর্চিতদেহ, নীলাঞ্জননিভ বর্ণ, পরিধানে মহার্ঘ ক্ষৌমবসন, বক্ষে চন্দ্রদ্যুতি রত্নহার। হনুমান সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন:

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥ [সুন্দর. ৪৯. ১৭]

—অহো, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি গুণ, কি দ্যুতি! অহো, রাক্ষসরাজে সর্বলক্ষণের কি সমন্বয়!

এই রাবণের প্রধান ত্রুটি—বলদর্প, জিগীষা ও কামোন্মত্ততা। দশগ্রীবের বলদর্প যে কত প্রচণ্ড, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বাহুবলে কৈলাস পর্বত উৎক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে। কৈলাস উৎক্ষিপ্ত হয় নাই, কম্পিত হইয়াছে। শিবের সামান্য পদচাপে দশানন ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন: এই ভীষণ রবের জন্য তাঁহার নাম 'রাবণ'। অপরিমেয় তাঁহার জিগীষা। কুবের-যম-দেব বিজয়ী রাবণ, রাবণ ত্রিলোকজয়ী। অমেয় জয়েচ্ছার মতই তাঁহার কামভোগেচ্ছা: তাহার কামাগ্নির আহুতি বেদবতী, রম্ভা, অসংখ্য দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্বকন্যা। সহস্র নারীর অভিশাপে অভিশপ্ত রাবণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে নির্যাতিতা নারীর উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালা। এই জ্বালাকে বাক্যারণিতে মন্থন করিয়াছিল শূর্পনখা—সীতা পূর্ণ চন্দ্রাননা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা,

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে॥ [অরণ্য ৩৪. ১৭]

ইহার ফল সীতাহরণ। যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের অহমিকা ও অবিমৃষ্যকারিতা চরমে উঠিয়াছে। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মাতামহ মাল্যবানের ধর্মোপদেশকে তিনি তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মৃত্যুর আঘাতে তাঁহার শোক দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার আরক্ত চক্ষু হইতে তপ্ত তৈলের ন্যায় অশ্রু নির্গত হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে তিনি প্রথমে মূর্ছিত হইয়াছেন, সংজ্ঞালাভ করিয়া 'হা বৎস, হা বীরশ্রেষ্ঠ' বলিয়া হাহাকার করিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধ গ্রীষ্মমার্তণ্ডের ন্যায় প্রখর হইয়াছে। এই ক্রোধকে উদ্দীপিত করিয়াছে পতিহীনা, পুত্রহীনা রাক্ষসীদের

বিলাপ। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ কালাগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর। কিন্তু অপ্রতিহত বিধির বিধান, অতিদর্পের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই রামের ব্রহ্মাস্ত্রে মহাবল রাবণ নিহত হইলেন, যেন বজ্রাহত বৃত্রাসুর রথ হইতে পতিত হইলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকবিহ্বল বিভীষণের বিলাপে রাবণ-চরিত্রের দোষ ও গুণ—দুইই উদ্ঘাটিত হইয়াছে, 'হায়, ধৈর্য যাহার পত্র, হঠকারিতা যাহার পুষ্প, তপস্যা যাহার বল এবং শৌর্য যাহার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অদ্য রণমধ্যে রামরূপ বায়ুবেগে উন্মূলিত হইল। হায়, তেজ যাহার দন্ত, আভিজাত্য যাহার মেরুদণ্ড, কোপ যাহার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যাহার হস্ত, সেই রাবণরূপ গন্ধহস্তী অদ্য রামরূপ সিংহ দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন'।[১] [যুদ্ধ. ১১১ সর্গ]

এই রাবণের পুত্র মেঘনাদ। মেঘনাদ ময়দানবকন্যা মন্দোদরীর পুত্র। জন্মকালে ইনি মেঘের মত সুমহান্ 'নাদ' করিয়াছিলেন, এইজন্য নাম মেঘনাদ। মায়া প্রভাবে ইনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাভূত করিয়া 'ইন্দ্রজিৎ' নামে বিখ্যাত হন [উত্তর ১২. ৩৪]। মেঘনাদ নিকৃতি-নিপুণ, তামসী বিদ্যায় সিদ্ধ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পাবককে সন্তুষ্ট করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে, কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মেঘের আড়ালে থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া ইনি যুদ্ধ করিতে পারিতেন। রাম-লক্ষ্মণকে ইনিই নাগপাশে বদ্ধ করেন। অতি বলশালী মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ দেশকালজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তিনি পিতৃভক্ত : পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন, যুদ্ধ হইতে ফিরিয়াও পিতাকে প্রণাম করেন। যজ্ঞকালে মেঘনাদ তাপসসদৃশ—কৃষ্ণাজিন পরিহিত, দণ্ডকমণ্ডলুধারী। যুদ্ধকালে ইনি অতি ভয়ঙ্কর। শত্রুসৈন্য কর্তৃক লঙ্কা আক্রান্ত হইলে, জাতি-শত্রু নিধন কর্তব্য মনে করিয়াই তিনি পিতৃপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বিভীষণের প্রতি তাঁহার ক্রোধের কারণ, পিতৃব্য বিভীষণ স্বজন-দ্রোহী ও শত্রুর ভৃত্য : 'ক চ স্বজন-সংবাসঃ ক চ নীচ-পরাশ্রয়ঃ' তাই তাঁহার সুতীব্র অভিযোগ :—

> ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্যং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
> প্রমাণং ন চ সৌন্দর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥ [যুদ্ধ. ৮৭. ১২]

—হে দুর্মতে, ধর্মদূষণ, তোমার জ্ঞাতিত্ব নাই, সৌহার্দ নাই, ধর্মও নাই, জাতি-প্রেম নাই ; তোমার শাস্ত্রপ্রমাণ নাই, সৌন্দর্যবোধ নাই, ধর্মও নাই।

মেঘনাদ জানেন, স্বজন যদি নির্গুণও হয়, আর শত্রু যদি গুণবানও হয় তবু স্বজনের আশ্রয়ে থাকাই শ্রেয়, কারণ, পর চিরকাল পর .

> গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
> নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ [যুদ্ধ ৮৭. ১৫]

১। অনুবাদ—রামায়ণ (বসুমতী-সংস্করণ)

এই ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বীর বিক্রম অসাধারণ। বিভীষণ তাঁহাকে দুর্বিনীত ও গর্বিত বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তথাপি বলিয়াছিলেন 'হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি'। কবি বাল্মীকি স্বল্পাক্ষরে নিহত ইন্দ্রজিতের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 'শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ'—যেন হৃততেজ আদিত্য, যেন নির্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নি।

রাক্ষস বংশে বিভীষণ একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। ইনি কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিভীষণ ধর্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান। তিনি ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিপৎকালেও যেন ধর্মে মতি থাকে। ধর্মমতি বিভীষণ ব্রহ্মার বরে অমর। রাক্ষসকুলে বিভীষণ যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। লুণ্ঠিতা নারীকুলের প্রতি রাবণের অসদভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তিনিই ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, পরদারাভিমর্ষণ ও পাপকার্যের ফল অশুভ [উত্তর, ৩০ সর্গ]। রাবণ যখনই কোন পাপকার্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বিভীষণ প্রতিবাদী হইয়াছেন। সীতাহরণের প্রতিবাদ অতি তীব্র। বিভীষণ ধর্মসঙ্গত বাক্যে রাবণের বিবেককে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, তাহার ফল অপমান। শেষ পর্যন্ত তিনি রাম-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। বিভীষণের এই স্বজন ত্যাগ ও শত্রুপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পর্কেই বিতর্ক। ইহারই জন্য তিনি 'ঘরভাঙা বিভীষণ' নামে পরিচিত। রাবণ তাঁহাকে জ্ঞাতিশত্রু, ভীরু, ভ্রাতৃস্নেহবর্জিত অনার্য বলিয়াছেন [যুদ্ধ, ১৬], ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ধর্মদূষণ' [যুদ্ধ, ৮৭]। কিন্তু, তিনিও যে জ্ঞাতিবৎসল, তাহার প্রমাণ আছে। ইন্দ্রজিতকে তিনি নিজে বধ করিতে পারেন নাই,—বলিয়াছেন, 'অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম' [যুদ্ধ ৮৯]; রাবণের মৃত্যুতে তিনি একান্ত শোকবিহ্বল হইয়া বলিয়াছেন, 'গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মস্য বিগ্রহঃ'।

মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা, রাবণের অগ্রমহিষী ও ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র মেঘনাদের জননী। তিনি স্বর্ণবর্ণা। অসাধারণ তাঁহার পতিপ্রাণতা। মহর্ষি কখনও কখনও বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার শোকাহত মূর্তি দেখানো হয় নাই, কিন্তু রাবণের মৃত্যুর পর তিনি বলিয়াছেন, 'যখন কুমার ইন্দ্রজিৎ রণমধ্যে লক্ষ্মণহস্তে নিহত হইয়াছিল, তখন আমি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছি।' মন্দোদরীর নীরবতাই তাঁহার গভীর পুত্রশোকের প্রমাণ। রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী-বিলাপ বর্ণনায় করুণহৃদয় বাল্মীকি কিঞ্চিৎ কৃপণতা করিয়াছেন। পতির অভাবে মন্দোদরী কামভোগে বঞ্চিত হইলেন, এই সুরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মদনভস্মের পর কালিদাসের রতি-বিলাপও অনেকটা এই পর্যায়ের। হয়তো ইহা দ্বারা মহর্ষি রাক্ষসরাজ-

মহিষীর কামাসক্তিকেই উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর শোককরুণ মুহূর্তে এ ধরনের বিলাপ অশোভন—অনেকটা ব্যঙ্গোক্তির অনুরূপ। এই বিলাপে একদিকে রাবণ-চরিত্রের কামপরায়ণতা ও ঔদ্ধত্য বর্ণিত হইয়াছে, অপরদিকে রাম-সীতার গুণগান করা হইয়াছে। পতিনিন্দা ও যাহাদের জন্য লঙ্কার সর্বনাশ, তাঁহাদের প্রশংসা—মৃত্যু-বিলাপে অসময়োচিত। তথাপি সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে মন্দোদরীর পিতৃগর্ব, পতিপ্রাণতা ও সন্তান বাৎসল্যও প্রকাশিত। মন্দোদরী বলিয়াছেন, 'দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্তা এবং সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র'—আমি এই বলিয়া গর্বিতা ছিলাম ;

পিতা দানবরাজো মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ।
পুত্রো মে শক্রনির্জেতা ইত্যেবং গর্বিতা ভৃশম্॥ [যুদ্ধ. ১১৩. ৪০]

রক্ষোবংশে আর একটি নারীচিত্র সরমা। ইনি গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা। সরমা যখন মানস সরোবরতীরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বর্ষা হেতু সরোবরের জল বর্দ্ধিত হওয়ায় জননী বলিয়াছিলেন, 'সরো মা বর্ধত'—সরোবর আর বর্দ্ধিত হইও না', তাই তাঁহার নাম হয় 'সরমা'। বিভীষণ ইহাকে ভার্যারূপে লাভ করেন [উত্তর, ১২ সর্গ]। সরমা ধর্মজ্ঞান সম্পন্না। ইনি রাবণকর্তৃক অশোকবনে সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দয়া ও পরোপকারব্রত শীলতা গুণে তিনি সীতার সখী হইয়াছিলেন। রাবণ রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়া সীতাকে বিহ্বল করিলে সরমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। সরমার মতে, রাবণ ক্রূরকর্ম, সর্বভূতবিরোধী ও ভীষণ। তিনি জানেন, রাবণ বিনষ্ট হইবে, অচিন্ত্য পরাক্রম রাম জয়ী হইবে। শোকার্ত সীতার প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী অতি সুন্দর, যেন দাবদগ্ধ ধরণীতে সুশীতল জলধারা।

৬. বাল্মীকির কবিত্ব

সকলেই বাল্মীকিকে আদি কবি বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হইয়াছে, আদি কাব্যবীজ বাল্মীকির অধিকারে ছিল। বাল্মীকি হইতেই ব্যাসদেব সেই বীজ অবগত হইয়া মহাভারত ও পুরাণ রচনা করেন ; বাল্মীকি হইতেই নিখিল কাব্যের বিস্তার [বৃহদ্ধর্ম. পূর. ২৬]। বৈদিক ঋষি কবি, বৈদিক সূক্তাবলীও অপূর্ব কবিত্ব-পূর্ণ। তথাপি আদি কবির খ্যাতি বাল্মীকির।

ইহার কারণ, লৌকিক কাব্য রচনার সূত্রপাত বাল্মীকি হইতেই। বাল্মীকির পূর্বে অখণ্ড কোন কাব্য রচিত হয় নাই। সুপ্রচলিত অনুষ্টপ ছন্দকে লৌকিক কাব্যে প্রথম

প্রয়োগ করেন বাল্মীকি। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে কাব্য রচনায় যে রীতি, বাচনভঙ্গি ও রসসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও সূচনা প্রাচেতস্ বাল্মীকিতে।

বাল্মীকি শুধু আদ্য কবি নন, এদেশের লোক-মানসে কবি-সংজ্ঞা সম্পর্কে যে একটি সনাতন দৃঢ়মূল ধারণা আছে, তাহার মূর্তিমান বিগ্রহ। এদেশে কবি তিনি, যিনি 'ক্রান্তদর্শী'। কবি লোকচরিত্রজ্ঞ, কবি ত্রিকালবৃত্তিজ্ঞ, কবি ধর্মবক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী. 'সর্বরসৈকবিৎ' (সর্বরসাভিজ্ঞ)। কবি কাব্য-সংসারে প্রজাপতি। এই অর্থেই বাল্মীকি কবি, চির কবির আদি প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির কাব্যকে বলিয়াছেন, 'Oceanic poetry'; রামায়ণে সাগর-পারের এক কাহিনী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—সেদিক হইতে নয়, রামায়ণে পাই মহা-সাগরের বিশালতা, মহাসাগরের বৈচিত্র্য। এই বিশালতা বাল্মীকি-প্রতিভার মর্মকেন্দ্রে। রামায়ণ বিশাল। তাহাতে কু-ও আছে, সু-ও আছে—আছে সমগ্রতা।

কিন্তু এই সমগ্রতাই কাব্যের সর্বস্ব নয়। কবিপ্রতিভার মূল সংবেদনশীল মনন, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন 'বেদনা'। এই বেদনার ফলেই শোক শ্লোক হইয়া উঠে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে এইভাবেই বাল্মীকির কণ্ঠে 'মা নিষাদ' শ্লোক-নির্গত হইয়াছে। সমগ্র রামায়ণ কাব্য সেই বেদনা বা সংবেদনশীল মনের প্রকাশ।

এই ধরনের মননের প্রত্যক্ষ পরিচয় বাল্মীকি-অঙ্কিত চরিত্রগুলি। কালের বুকে এই চরিত্র যেন পাষাণরেখ। রামায়ণের আর এক গৌরব, ইহার বর্ণনা। বর্ণনাগুলিও মননের স্বাক্ষর। রামায়ণে দুইটি নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়, অযোধ্যা ও লঙ্কা। দুইটি নগরীই সর্বরত্ন সমাকীর্ণ, সর্ব ঐশ্বর্যভূষিত ও শিল্পশোভার সার। কিন্তু প্রকৃতিতে এই দুই নগরী স্বতন্ত্র। দ্বাদশ যোজনায়ত মহাপুরী অযোধ্যা 'নরোত্তম-সমাবৃত'—সেখানে কামী নাই, কদর্য ব্যক্তি নাই,

> কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।…
>
> সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ। [বাল. ৬. ৮, ৯]

অযোধ্যার সমৃদ্ধি সাত্ত্বিক সমৃদ্ধি। আর লঙ্কা? তাহাও সর্বরত্নসমাকীর্ণ ও ঐশ্বর্যপ্রধান 'হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্যময়তোরণা' [অরণ্য ৪৮. ১১]। কিন্তু সেখানে আছে 'মদ-সমৃদ্ধা নারী', 'মনঃকান্তা বরস্ত্রী'—তাহাতে রাজসিক ঐশ্বর্য আর তামসিক বিলাস। কবি সুকৌশলে নিশাকালের ভোগপুরী লঙ্কার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পাঠককে লইয়া গিয়াছেন রাবণভবনে রাবণের অন্তঃপুরে। ভোগভূমি ও পানভূমির দৃশ্য দেখাইয়া লঙ্কার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মহাকবির পাণ্ডিত্য নয়, এই দুই পুরী বর্ণনায় প্রকাশিত হইয়াছে বাল্মীকির সংকল্প।

বাল্মীকি অবশ্য নগরের কবি নন। অরণ্যের তাপস সমগ্র কাব্যে আরণ্যশ্রী সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কবি নগরকেও দেখিয়াছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, প্রকৃতি-পালিত সন্তানের দৃষ্টিতে। তাই তাঁহার অযোধ্যা—'উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্' [বাল. ৫. ১২], আর ভোগবতী লঙ্কা অশোকবনিকাশোভিতা—'ফুল্ল পদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপকূজিতাঃ।' [সুন্দর. ১৪. ২৪]

বাল্মীকি প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। সমগ্র রামায়ণ কাব্যখানিই প্রকৃতি-শ্রীবিভূষিত। বন-পাহাড়-সাগরের বর্ণনাগুলি পড়িতে পড়িতে মন অন্য এক রাজ্যে চলিয়া যায়, যেখানে প্রকৃতি মাতা তাঁহার অকৃপণ দাক্ষিণ্য লইয়া উদার মূর্তিতে দণ্ডায়মান, যেখানে চিত্রকূট হইতে লঙ্কা পর্যন্ত বনপথের বিচিত্র শোভা। লতাগুল্মশোভিত বন, পুষ্পসুশোভিত বৃক্ষ, পদ্মোৎপলভূষিত সরোবর, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, হংস-নিনাদিত বাপী—তাহারই ভিতর তপস্বীর সিদ্ধাশ্রম। বন-বর্ণনার অন্ত নাই, শুনিতে শুনিতে শ্রুতিরও যেন ক্লান্তি নাই। বর্ণনার উপকরণ প্রায় সর্বত্রই এক, তথাপি প্রতিটি বর্ণনায় যেন নূতন বিস্ময়। এক এক ঋতুর পটভূমিকায় একই বনভূমির নব নব মূর্তি : যেমন, হেমন্তের এই পঞ্চবটী,—

> বাষ্পাচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
> শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥
> খর্জুর পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
> শোভন্তে কিঞ্চিদানম্রাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥ [অরণ্য. ১৬.১৬,১৭]

—অরণ্য বাষ্পাচ্ছন্ন। তাহাতে যব ও গোধূমের শোভা। সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চসারসের কলরব। কনকবর্ণ শালিধানের খর্জুর-পুষ্পাকৃতি পক্বশীর্ষ আনত।

আবার বসন্তের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ পম্পার এই বর্ণনা,—

> পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বর্ণানাং পুষ্পশালিনাম্।
> সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥ .....
> বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ
> মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে॥ [কিষ্কি. ১. ১১. ১৪]

—লক্ষ্মণ, দেখ পুষ্পিত বনরাজির রূপ। মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। কুসুমিত বৃক্ষের শাখা সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত মরুৎ, আর তাহার পশ্চাতে গীতমুখর ভ্রমর পুঞ্জ।

এমনই বর্ষা ও শরতের পটভূমিকায় অসংখ্য প্রকৃতিচিত্র—বর্ষার মাল্যবান, শরতের কিষ্কিন্ধ্যা। বর্ণনাগুলি বস্তুনিষ্ঠ। অরণ্যের স্নিগ্ধ নীলিমা, গিরিদরীর অঙ্কুরস্ত রঙ্

কবির নয়নে মায়াঞ্জন পরাইয়া দিয়াছে। তাই শুধু প্রকৃতিবর্ণনায় নয়, নর-নারীর রূপ বর্ণনাতেও আসিয়া ভিড় করিয়াছে প্রকৃতি জগতের উপমান। বাল্মীকির উপমা নিসর্গ-উপমানে পূর্ণ। তাঁহার সাগরের উপমান অম্বর, অম্বরের উপমান সাগর; বৃক্ষের পুষ্পবর্ষণের উপমান মেঘের জলবর্ষণ। বাল্মীকির রাম রাজীবলোচন, 'ভূতলাদুত্থিতা' সীতা প্রকৃতিরই দুহিতা। সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্র যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সীতা প্রকৃতিময়ী। সীতা 'কদম্বপ্রিয়া', 'জাম্বুনদপ্রভা', 'মৃগশাবাক্ষী', 'চন্দ্রনিভাননা', 'কামলেক্ষণা', 'চম্পকবর্ণাভা' [অরণ্য ৬০]—সর্বোপরি 'প্রিয়কাননসঞ্চারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী' [অরণ্য ৬১. ১৫]। নারীর রূপই হউক, নরের রূপই হউক—রূপ-গুণ, শৌর্য-বীর্য, কঠোরতা বা কোমলতা বর্ণনায় বাল্মীকি চির বনচারী। বিক্রম বর্ণনায় শার্দূল, সিংহ, মত্তহস্তী প্রভৃতি উপমান; দশরথ রাজশার্দূল, বিশ্বামিত্র মুনিশার্দূল; রাবণের মৃত্যুতে যে উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে ['ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী'—যুদ্ধ. ১১২. ১১] তাহাতে রাম ও রাবণ যথাক্রমে উপমিত হইয়াছেন সিংহ ও গন্ধহস্তীর সহিত।

বাল্মীকির কবিত্ব কালের কষ্টিপাথরে বিচারিত হইয়া গিয়াছে। এই কবিত্বের আদি নির্ঝরের পুণ্যধারা গ্রহণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় সাহিত্যের পরবর্তী লৌকিক কাব্য। বাল্মীকি তাই 'কবিগুরু'।

৭. রামায়ণের রূপান্তর

কালক্রমে রাম-রাবণের যুদ্ধ এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা লইয়া অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও বাল্মীকির নামে বা অন্য নামে ভিন্নতর রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৌদ্ধগণ রাম-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সিংহলে ও যবদ্বীপেও রামায়ণ রচিত হইয়াছে। জৈনদের বিখ্যাত রামায়ণ 'পউম চরিঅ'। সংস্কৃতেও কতকগুলি স্বতন্ত্র রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। পদ্ম, স্কন্দ ও ভাগবত পুরাণে ও শ্রীমহাভাগবতেও রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের কাহিনী মূল রামায়ণের অনুগত হইলেও পার্থক্য কম নয়। রামায়ণ কাহিনীকে পরিবর্ধিত করিয়া, পরিমার্জিত করিয়া, রূপান্তরিত করিয়া কোথাও বা উহার চারিপাশে অত্যুজ্জ্বল অলৌকিক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া নবতর রামায়ণ সৃষ্টি করা হইয়াছে। মনে হয়, মূল রামকাহিনীর সহিত এদেশের বিচিত্র ধর্মীয় আকৃতি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংযুক্ত হওয়ার ফলেই রামায়ণের এই ধরনের রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে।

॥ অধ্যাত্ম রামায়ণ ॥

এই রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত। ইহা বাল্মীকি-প্রণীত নহে। বাল্মীকি যে রামায়ণ প্রণয়ন করেন, তাহারও উল্লেখ ইহাতে নাই। উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে, মুনি বাল্মীকি কুশ-লবকে যে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর-বর্ণিত রামায়ণ ['শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্বত্যৈ পুরহারিণা'—উত্তর.৬]

অধ্যাত্ম রামায়ণের কর্তা পুরাণকার মহর্ষি বেদব্যাস। এই রামায়ণের আরম্ভও পুরাণের ঢংয়ে। গ্রন্থারম্ভে একটি অনুক্রমণিকাধ্যায়—তাহাতে নারদ লোকমঙ্গল কামনায় ব্রহ্মার নিকট ভবিষ্য কলিযুগের সদ্‌গতির উপায় জানিতে চাহিলে, ব্রহ্মা হরপার্বতীর কথোপকথন ছলে অধ্যাত্ম রামায়ণ বিবৃত করেন। ইহা আগম জাতীয় পুরাণ।

মূল কাহিনীর দিক হইতে বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কতকগুলি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য আছে। রামায়ণে আদিকাণ্ডের নাম বালকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ডের নাম যুদ্ধকাণ্ড; অধ্যাত্ম রামায়ণে সপ্তকাণ্ডের নাম আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর।[১]

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান স্বাতন্ত্র্য আগাগোড়া বিষ্ণুর অবতারত্ব ঘোষণায়। বাল্মীকি রামায়ণে মাত্র কয়েকটি স্থলে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং সেই সকল অংশ বাল্মীকির নিজস্ব, না প্রক্ষিপ্ত, তাহাও বিতর্কের বিষয়। অন্যান্য স্থলে রামচন্দ্র নরচন্দ্রমা; মানুষের মতই রামের বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি। মায়ামৃগের ছলনায় তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন, সীতাবিরহে প্রাকৃতজনের ন্যায় বিলাপ করিয়াছেন, মায়াসীতা দর্শনে বিহ্বল হইয়াছেন, শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিয়াছেন এবং সীতাকে অপাপবিদ্ধ জানিয়াও রাবণবধের পর তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানান্ধ সাধারণ মানুষের মত আচরণ করিয়াছেন। রাম যদি পরম ব্রহ্ম, তবে কেন এই মায়া-মোহ? অধ্যাত্ম রামায়ণ এই সংশয়ের উত্তর। বিষ্ণুস্বরূপ রামের মানুষোচিত এই সকল লীলার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতিপাদ্য। এইজন্য এখানে রামের মাহাত্ম্য খ্যাপন উদ্দেশ্যে স্থানে-অস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে মায়াবিরহিত, নির্গুণ নির্লেপ ব্রহ্মস্বরূপ রামের স্তব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা রামায়ণ-রহস্যের ভাষ্য, গুহ্যাতিগুহ্য রামলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ মতে সাক্ষী রামে কোন বিমোহ নাই। মায়া মানুষরূপে রামচন্দ্র যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানবশেই করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি

১ বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাণ্ডবিভাগ ও নাম সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত। অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের অন্যান্য বিষয়েও মিল আছে।

-কার্য, এমনকি মোহ-ভ্রান্তি পর্যন্ত জ্ঞানকৃত। ইহাতে রামচন্দ্র অবতাররূপে কীর্তিত হওয়ায় রাম-ভক্তিই যে মুক্তি' কারণ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রে হ্খিলতত্ত্ব সারে
ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা। [আদি. ১০. ১৫]

—অখিল লোকসার শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়া ভক্তিই ভবসাগর তরণের প্রসিদ্ধ তরণী।

এই রামায়ণে অনেকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে,

১. ॥ **বাল্মীকির পূর্ব বৃত্তান্ত** ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বৃত্তান্ত নাই, কিন্তু কিরূপে চোর দ্বিজাধম ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত আছে। পুরাকালে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও কিরাত মধ্যে বাস করিতেন। শূদ্রাগর্ভে তাহার অনেকগুলি পুত্র হয়। পরিবার পালনে অসমর্থ হইয়া তিনি চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেন। একদিন তিনি সপ্তর্ষির পশ্চাতে ধাবমান হন। ঋষিগণ বলেন, তোমার পাপের ভাগী কে—গৃহে গিয়া শুনিয়া আইস। পরিবারের সকলেই কহিল, সকল পাপ তাহার। তখন তিনি করুণ হৃদয় ঋষিগণের নিকট ফিরিয়া এই পাপ হইতে রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ দেখিলেন, 'রাম নাম' জপ করাই মোক্ষের উপায়, কিন্তু এই নরাধমের সে সামর্থ্যও নাই, তাই তাঁহারা বলিলেন, 'একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা'—একাগ্রমনে রামনামের অক্ষর-বিপর্যয় 'ম-রা' শব্দ সর্বক্ষণ জপ কর। ঋষিদের নির্দেশে তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন : ক্রমে তাঁহার নিশ্চল দেহের উপর বল্মীকস্তূপ হইল। বহুযুগ অন্তে ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ক্রান্ত হইতে বলিলেন ; বাল্মীক হইতে পুনর্জন্ম হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল বাল্মীকি :

মামপ্যাহু র্মুনিগণা বাল্মীকিস্ত্বং মুনিশ্বরঃ।
বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তে অভবৎ ॥ [অধ্যাত্ম, অযোধ্যা. ৬]

২. ॥ **প্রতিবিম্বরূপিণী সীতার কল্পনা** ॥ রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত সীতা নন, সীতার ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপিণী সীতা। মারীচ মায়ামৃগরূপে ছলনা করিতে এবং রাবণ ভিক্ষুবেশে সীতাকে হরণ করিতে আসিতেছেন—সর্বজ্ঞ রাম ইহা জানিতে পারিয়া সীতাকে কহিলেন :

—রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তোমার ছায়া [ছায়াং ত্বদাকারাং] কুটিরে রাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞায় একবৎসর অদৃশ্যভাবে থাক। হে শুভে, রাবণ বধের পর আবার তুমি আমাকে পূর্ববৎ লাভ করিবে। [অরণ্য. ৭]

এই ছায়াসীতাকেই রাবণ হরণ করিয়াছিলেন। রামের হস্তে নিহত হইয়া পরমপদ

প্রাপ্তির আশায় আনিয়া শুনিয়া রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া অশোকবনে রক্ষা করিয়াছিলেন [লঙ্কা, ১০]। রামচন্দ্র রাবণ বধান্তে এই ছায়াসীতার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলেন। ছায়া সীতাই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অগ্নি হইতে যে সীতাকে রাম গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত জানকী। এই সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া অগ্নি বলিয়াছিলেন, 'তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা। [লঙ্কা' ১৩]

৩. ॥ রাবণের অভিচারহোম ॥ লঙ্কানগরীর সমূহ বিপদ দেখিয়া রামের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রাবণ শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিলেন। শুক্রাচার্য তাঁহাকে হোম করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে বলিলেন। যদি হোমবিঘ্ন না ঘটে, তবে রাবণ অজেয় হইবে। রাবণ হোমদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নির্জন গুহায় মৌনাবলম্বন পূর্বক হোম আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ ধূম দেখিয়া ভীত হইয়া রামকে শীঘ্র যজ্ঞবিঘ্ন করিতে নির্দেশ দিলেন। দশ কোটি বানর অগ্রসর হইল। বিভীষণ-ভার্যা সরমা গুহাদ্বার দেখাইয়া দিলেন; বানরগণ গুহায় প্রবেশ করিয়া হোমদ্রব্য বিক্ষিপ্ত করিল, রাবণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু মৌন রাবণ ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না। তখন অঙ্গদ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিলেন। বিস্রস্তবসনা মন্দোদরী করুণস্বরে রোদন করিতে থাকিলে রাবণ, 'উত্তস্থৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ব্রুবন্'—দেবীকে ত্যাগ কর বলিয়া খড়্গ ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। ইহাতে রাবণের যজ্ঞবিঘ্ন ঘটিল এবং তিনি ঈপ্সিত সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইলেন [লঙ্কা, ১০]

৪. ॥ রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃতের কল্পনা ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে রামের 'আদিত্য হৃদয় স্তব' পাঠ করার কথা নাই। কিন্তু আর একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্র যতবার রাবণের মুণ্ড ছেদন করেন, ততবার তাহা উদ্ভূত হয়। বিভীষণ তখন বলিলেন, রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃত আছে—'নাভিদেশে অমৃতং তস্য কুণ্ডলাকার সংস্থিতম্'—আগ্নেয়াস্ত্রে তাহা শোষণ না করিলে মৃত্যু হইবে না। তখন রাম আগ্নেয়াস্ত্রে রাবণের নাভিস্থিত অমৃত শোষণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহাকে নিহত করেন। [লঙ্কা, ১১শ অধ্যায়]

৫. ॥ ইন্দ্রজিৎবধের কাহিনী ॥ বাল্মীকি-রামায়ণে, বীর লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিয়াছিলেন—এই বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে লক্ষ্মণ দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার আশ্চর্য পূর্বানুবৃত্তি আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নহে; কিন্তু,

যস্তু দ্বাদশ বর্ষাণি নিদ্রাহার বিবর্জিতঃ
তেনৈব মৃত্যুনির্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ॥ [লঙ্কা, ৮]

—ব্রহ্মা স্থির করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ আহার-নিদ্রা বর্জিত, তাঁহার হস্তে এই দুরাত্মার মৃত্যু হইবে।

অযোধ্যা হইতে নির্গত হইবার পর পাছে রামচন্দ্রের সেবার ত্রুটি হয়, এই ভয়ে লক্ষ্মণ আহার-নিদ্রা বর্জন করিয়াছিলেন। তাই তিনি অজেয় ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬. ॥ রাম গীতা ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণের একটি উপাদেয় সংযোজন 'রামগীতা'। সীতা-নির্বাসনের পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট পরমতত্ত্ব জানিতে চাহিলে, রামচন্দ্র স্বয়ং এই গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধনমার্গের যাবতীয় স্তর বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম হইতেও যে জ্ঞানের সাধনা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানের অববোধ—ইহাই রামগীতার প্রতিপাদ্য। এই গীতার মতে জ্ঞানই বিদ্যা, 'বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতিভণ্যতে'।

বাল্মীকি-রামায়ণ কাব্য। উহার শ্লোকে শ্লোকে আদি কবির হৃদয়রসনির্ঝর প্রবাহিত। অধ্যাত্ম রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত এবং তত্ত্বভারাক্রান্ত। বর্ণনা নীরস বিবৃতিমাত্র, রামস্তুতিগুলিও কবিত্ব-বর্জিত। শ্রীরামের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকায় কাব্যরস তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছেই, উপরন্তু কাহিনীর আকর্ষণও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মানুষ হিসাবে যে কার্যগুলি ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও হৃদয়গ্রাহী, রামের দেবত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত হওয়ায় সেই রহস্যময় আকর্ষণটুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রামলীলার দুর্জ্ঞেয় রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পুরাণকার লীলার মাধুর্যও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ॥

যোগবাশিষ্ঠ নামে মাত্র রামায়ণ, বস্তুতঃ ইহা অধ্যাত্ম জগতের সামগ্রী। অধ্যাত্ম রামায়ণেও রামতত্ত্ব ও রামলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাতে মোটামুটি মূল রামায়ণ-কাহিনীর স্বাদ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যোগবাশিষ্ঠে কাহিনীকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে তত্ত্ব। হিন্দুজীবনের লক্ষ্য—জীবন্মুক্তি ও মোক্ষই ইহার মূল প্রতিপাদ্য। ইহাও বাল্মীকি-প্রণীত। ব্রহ্মার নির্দেশে শিষ্য ভরদ্বাজকে তিনি এই রামায়ণ উপদেশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও বশিষ্ঠের কথোপকথন ছলে সমগ্র তত্ত্বকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, এইজন্য ইহা যোগবাশিষ্ঠ নামে খ্যাত। ইহাকে মহারামায়ণও বলা হয়।

কথারম্ভে ইহা সুতীক্ষ্ণ-অগস্ত্য সংবাদ, অগ্নিবেশ্য-কারুণ্য সংবাদ, সুরুচি অপ্সরা ও দেবদূত সংবাদ—এইরূপ কয়েকটি অবান্তর কাহিনী দ্বারা সম্পুটিত। মূল কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে রামচন্দ্রের অকাল বৈরাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া। রামচন্দ্র বিদ্যাগৃহ হইতে ফিরিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু তীর্থ হইতে ফিরিয়াই তাঁহার মনে অদ্ভুত ভাবান্তর

উপস্থিত হইল। তিনি শারদাগমে শুষ্ক সরোবরের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। এমন সময় আসিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। যজ্ঞে রক্ষো-বিঘ্ন অপসারণের জন্য তিনি দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ ইতস্ততঃ করিলে কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে ঋষিশাপের ভয় দেখাইলেন। রামচন্দ্রকে সভায় আনয়ন করা হইল। অমিত তেজা রাম আজ মলিন ও কৃশ—তিনি ভোগে বীতস্পৃহ, কর্মে প্রেরণাহীন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার বৈরাগ্যের কারণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন: জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা দেহ ও জীবন—অতি অমঙ্গলকরী তৃষ্ণা, অতি ভয়ঙ্কর যৌবন মত্ততা—কালের পরাক্রম অপ্রতিহত; দুঃখময় এই সংসারে বাঁচিয়া কি লাভ?

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥ [যোগবাঃ, বৈরাগ্য, ১৪]

—তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু তিনিই প্রকৃত জীবিত, যিনি মননের দ্বারা জীবিত থাকেন।

অতএব রামচন্দ্রের প্রশ্ন, হে মুনি, সাধুগণ যে উপায়ে দুঃখমুক্ত হইয়াছেন, সেই নিবৃত্তির উপায় যদি কিছু জানা থাকে, তাহাই উপদেশ করুন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে ঋষিবর বশিষ্ঠ তখন রামচন্দ্রকে তত্ত্ব ও সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাই যোগবাশিষ্ঠ। ইহা পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ—এই দুই ভাগে ও ছয় প্রকরণে বিভক্ত: প্রকরণগুলির নাম—বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশান্তি ও নির্বাণ।

'যোগবাশিষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্বেরই কথা। কিন্তু এই তত্ত্ব জগৎ-পলাতকা, কর্মত্যাগী, নিশ্চেষ্ট ধর্মতত্ত্ব নয়। কি প্রকারে অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীব জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম দ্বারা জীবন্মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, এই রামায়ণে . কুযুক্তার্থ বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগযুক্ত হইয়া ভোগ, জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্মসাধনই যোগবাশিষ্ঠের সারোপদেশ। 'জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্'—ইহাই ইহার মর্মকথা। ইহা বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের, জ্ঞান ও কর্মের যুক্তবেণী।

অনেকেই মনে করেন, যোগবাশিষ্ঠ শুষ্ক জ্ঞান ও দুরূহ সাধনের কথা। অবশ্য ইহা তত্ত্বামোদীর যতটা আদরণীয়, কাব্যামোদীর ততটা আদরণীয় নয়। তথাপি ইহা যে একান্তই কাব্যশোভাবর্জিত, তাহা নয়। প্রায় প্রত্যেকটি [illegible] মনোজ্ঞ উপমাগর্ভ বাচনে বিন্যস্ত। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ধ্বনির ঝঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়: 'অন্তর্দীপশিখেব কজ্জলম্', 'মতিঃ কলুষতামেতি প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী', 'নৃত্যতি আনন্দরহিতং তৃষ্ণা জীর্ণেব নর্তকী', 'ললনা বিপুলালানে মনোমত্ত মতঙ্গজঃ' প্রভৃতি উপমা অতি সুন্দর, অথবা জরার আবির্ভাবে দেহের এই বর্ণনা,

অরসা বক্রতামেতি গুল্মাবয়বপল্লবা।
তাং তন্বীতরুণীনাং লতাপুষ্পানতা যথা॥ [বৈরাগ্য. ২২]

অলঙ্কার-সৌন্দর্য তো আছেই, যোগবাশিষ্ঠের উপাখ্যানগুলিও অতি হৃদয়গ্রাহী। আকাশজ বিপ্রের উপাখ্যান, পদ্মনরপতি ও মহিষী লীলার কাহিনী, সূচী রাক্ষসীর কথা (এই রাক্ষসীই ভয়ঙ্কর ব্যাধি 'বিসূচিকা') প্রভৃতি উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর। সর্বাপেক্ষা সুন্দর নির্বাণপ্রকরণের 'চূড়ালা' উপাখ্যান। চূড়ালা ছিলেন নৃপতি শিখিধ্বজের মহিষী। অজ্ঞানতাবশতঃ নৃপতি শিখিধ্বজ পতিত হইয়া বনবাসী হইলে এই চূড়ালা দেবপুত্র কুম্ভের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানদান করেন এবং কর্মে উৎসাহিত করেন। চূড়ালা ভারতীয় মহীয়সী নারীকুলের অন্যতমা।

॥ অদ্ভুত রামায়ণ ॥

যোগবাশিষ্ঠ যেমন তত্ত্বপ্রধান, তেমনি অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী-প্রধান অদ্ভুত রামায়ণ। অতিলৌকিক কাহিনীর বিচিত্রতার জন্যই ইহার নাম অদ্ভুত রামায়ণ। ইহাকে 'অদ্ভুতোত্তর রামায়ণ' বলা হয়। ইহারও প্রণেতা বাল্মীকি। মূল রামায়ণ রচিত হইবার পরে (উত্তর) এই রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছিল। সূচনায় দেখা যায়, শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকির নিকট প্রস্তাব করিতেছেন, ত্রিলোকে শতকোটি রামায়ণ প্রচারিত আছে, মর্ত্যলোকেও আপনি শ্লোকে রামায়ণ প্রচার করিয়াছেন, উহাতে যাহা নাই, এমন অদ্ভুত আশ্চর্য রামকথা বর্ণনা করুন। বাল্মীকি বলিলেন,

নৃণাং হি তাদৃশং রামচরিতং বর্ণিতং ময়া।
সীতামাহাত্ম্যসারং যদ্বিশেষাদত্র নোক্তবান্॥
শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ কাকুৎস্থচরিতং মহৎ।
সীতায়া মূলভূতায়াঃ প্রকৃতেশ্চরিতঞ্চ যৎ॥ [অদ্ভুত, ১ম. সর্গ]

মূল প্রকৃতি সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্যই অদ্ভুত রামায়ণ। ইহা সপ্ত বিংশতি সর্গে বিভক্ত। মূল রামায়ণের কাহিনী ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই রামায়ণে শক্তিবাদের প্রভাব অতি স্পষ্ট এবং সীতা যে মূল প্রকৃতিরই অংশ তাহা প্রতিপাদনের জন্য ইহাতে অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সীতার উৎপত্তিকাহিনী ও সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ।

॥ সীতার উৎপত্তি-কাহিনী॥ দণ্ডকারণ্যে গৃৎসমদ নামে এক মহাতপা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এক শত পুত্র ছিল, কন্যা ছিল না। লক্ষ্মীকে কন্যারূপে লাভের

নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ একটি কলসে প্রত্যহ একটু করিয়া মন্ত্রপূত দুগ্ধ রক্ষা করিতেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণের রক্ত দ্বারা সেই কলস পূর্ণ করিয়া উহা লঙ্কায় লইয়া আসেন এবং মন্দোদরীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া উহা সাবধানে রক্ষা করিতে বলেন এবং ইহাও বলেন, কলসে উগ্র বিষতুল্য তেজস্কর ব্রহ্মরক্ত আছে। রাবণ পুনরায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে মন্দোদরী পতিবিরহে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া বিষবোধে কলসের সেই রক্ত পান করেন। ইহার ফলে মন্দোদরী গর্ভবতী হন এবং লজ্জায় ভয়ে সেই গর্ভ কুরুক্ষেত্র তীর্থে মোচন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিছুকাল পরে রাজর্ষি জনক কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিতে আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিবার কালে লাঙ্গলের সীতায় এই কন্যাকে লাভ করেন। ইনিই সীতা [অদ্ভুত, ৮]।

॥ **সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ** ॥ রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া রাজা হন। একদিন সীতার সহিত তিনি সভায় সমাসীন ছিলেন। রাবণকে বধ করার নিমিত্ত ঋষি অগস্ত্য যখন রামের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন সর্বসমক্ষে সীতা হাস্য করেন। সীতার হাস্যহেতু অবগত হইবার জন্য প্রশ্ন করা হইলে সীতা সহস্রস্কন্ধ রাবণের কাহিনী বিবৃত করেন। বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাক্ষসী নিকষার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে,—একজন দশানন, আর একজন সহস্রবদন। জন্মকালে তাহাদের রবে ত্রিলোক ধ্বনিত হওয়ায় উভয়েরই নাম হয় রাবণ। কনিষ্ঠ দশানন লঙ্কায় বাস করিতেন, কিন্তু সহস্রবদন রাবণ বাস করিতেন পুষ্করদ্বীপে। লঙ্কার রাবণ সহস্রস্কন্ধ রাবণ হইতে হীনবল। রামচন্দ্র অনুজ রাবণকে নিহত করায় মুনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, এইজন্য সীতার হাস্য। সীতার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করিবার জন্য পুষ্করে যাত্রা করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্রবদনের ভীষণ শরাঘাতে রামচন্দ্র মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সীতা ভীমা মহাকালীর মূর্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণা হইলেন: তাঁহার উদর ক্ষীণ, চক্ষু কোটরগত, দীর্ঘ জঙ্ঘা, কণ্ঠে মুণ্ডমালা—তিনি চতুর্ভুজা, দীর্ঘতুণ্ডা, লোলজিহ্বা, জটাজুট মণ্ডিতা; খড়্গ ও খর্পর লইয়া তিনি মহাহবে মত্ত হইলেন: একে একে সহস্র বদনের কুম্ভাণ্ডক, কালভক্ষক, শুণ্ডগ্রীবাদি পুত্র নিহত হইল এবং মহাকালীরূপিণী সীতা ছিন্ন মস্তক লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় জানকীর রোমকূপ হইতে বিকটাকার সহস্র মাতৃকাগণের আবির্ভাব হইল—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, সহুলা, জটোজ্জ্বলা, পলুরন্তী, এড়ী, ভেড়ী পূতনা, কোটরা, দহদহা, লম্বাক্ষী, শিশুমারী, কন্যকা প্রভৃতি। রণস্থল যেন মহাভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি; জনকনন্দিনী এই প্রেতভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যে কম্পিত পৃথিবী, ভূধর, সাগর। তখন স্বয়ং শঙ্কর শবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত

হইলে দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও রাম মূর্চ্ছিত। ব্রহ্মা হস্তস্পর্শে রামকে সঞ্জীবিত করিলেন। রাম উত্থিত হইয়া সম্মুখে সেই মহাকালী মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীমা এবার ভীমরূপ সংহরণ করিয়া শান্ত হইলেন এবং রামকে বর প্রদান করিয়া পুনর্বার সীতারূপে পুষ্পক রথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সীতা-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল এবং সীতাই যে পরমাশক্তি, তাহা প্রমাণিত হইল [অদ্ভুত, ১৭-২৬]।

রামকাহিনী অদ্ভুত ও আশ্চর্য উপাখ্যানে মণ্ডিত হইয়া আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে যে কি বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল, 'অভোত্তর রামায়ণ' তাহার দৃষ্টান্ত।

৮. বাংলা দেশে রচিত রামায়ণ

ভারতবর্ষের সর্বত্রই রামায়ণের সুসমাদর। এমন অঞ্চল নাই, যেখানে রামায়ণের প্রচার নাই, বা আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয় নাই। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এদেশে 'রামায়ত' সম্প্রদায় না থাকিলেও এখানে রামায়ণের প্রভাব গূঢ় সঞ্চারী। রামনাম তারক ব্রহ্ম নাম। এই নাম উচ্চারণ করিয়া এদেশের লোক শয্যাত্যাগ করে[১], গৃহজীবনে প্রবাদে-প্রবচনে রামায়ণের দৃষ্টান্ত দেয়, মৃত্যুকালে কর্ণে রামনাম শুনায়। এদেশের বিশ্বাস রামনামের নামাভাসও মুক্তিদায়ক।[২] সীতার মত পত্নী, ভরত-লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা, রামের মত সন্তান কাহার না কাম্য? প্রাচীনকালে রাজার প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের কথা উঠিত: ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে আছে, ধর্মপাল সত্যরক্ষায় রামতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার অনুজ বাক্‌পাল ছিলেন, 'সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য মহিমা বাক্‌পাল নামানুজঃ'।

বাংলাসাহিত্যও নানাদিক হইতে রামায়ণের প্রভাবপুষ্ট। প্রাচীন বাংলার 'শ্রীরাম পাঁচালি'র সংখ্যাবাহুল্য, ঊনবিংশ শতকের কীর্তিস্তম্ভ মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', বাংলা নাটক ও যাত্রায় রামায়ণ কাহিনীর বিস্তার এদেশের সাহিত্যে রামায়ণের সুস্পষ্ট প্রভাব সূচনা করে। প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ রামায়ণ। কিন্তু বাংলা রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি বাল্মীকি-রামায়ণের হুবহু অনুবাদ বা অনুকরণ নয়।

১। রাম রাম সোঙরণে পোহাল্য রজনী।
শয্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি॥ [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]

২। মহাপ্রভু হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, গো-ব্রাহ্মণ-হিংসাকারী যবনের অপার দুঃখ, তাহাদের নিস্তার নাই। হরিদাস উত্তর দিয়াছিলেন, প্রভু, চিন্তার কারণ নাই, যবনও মুক্তিলাভ করিবে, কারণ 'হারাম হারাম' বলিয়া তাহারাও অজ্ঞাতসারে রামনাম উচ্চারণ করে: 'যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে। হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥' [চৈঃ চরিতামৃত, অন্ত্য, ৩য় পরিঃ]

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যেসকল রামায়ণকথা প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে একধরনের রাম-কাহিনী প্রচলিত ছিল—লোকের মুখে, কথকের কথকতায় ও মহিলামহলে। তাহাদের মূল লোকশ্রুতি ও বিবিধ পুরাণ; তাহাতে আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত রামায়ণ-কাহিনী এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে প্রচলিত রামায়ণের প্রভাব ছিল। আর এক ধরনের রামায়ণ বাংলায় প্রচলিত হইয়াছে—আদ্য কবি বাল্মীকির অনুসরণে। লিখিত আকারে বাংলায় যে রামায়ণ পাওয়া যায়, তাহাতে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব থাকিলেও উহা লোকশ্রুতি ও পুরাণাশ্রিত অলৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাস দ্বারা পল্লবিত। বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুসৃতি প্রাচীন বাংলা রামায়ণে নাই।

বাংলাদেশে পূর্বপর যে-সকল রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি প্রধান বিশিষ্টতা লক্ষণীয়: (১) রামচন্দ্রের দেবত্ব, (২) ভক্তি-ভাবের আতিশয্য, (৩) শক্তি-ভাবনার প্রাধান্য এবং (৪) লোকশ্রুতির অনুসৃতি। বাংলাদেশ ভক্তিবাদের দেশ, এদেশের নদ-নদীতে গঙ্গাভক্তির প্লাবন, এদেশের মাটিতে গঙ্গা-মৃত্তিকার তিলক, এদেশের হৃদয়ে ভক্তির অফুরন্ত নির্ঝর। তাই বাঙালীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্র 'নরচন্দ্রমা' মাত্র নহেন, তিনি 'বিষ্ণুর অবতার; বাঙালীর নামাবলীতে ও কীর্তনের গানে মুদ্রিত 'হরেরাম' নাম। শক্তি-ভাবনাও এদেশের অন্যতম বিশিষ্টতা। বাঙালী মা-পাগল জাতি; তাই এদেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে মাতৃভাবাসক্তির প্রকাশ। বাংলা রামায়ণও মাতৃভাবে বিলসিত। লোকশ্রুত হইতে সমাহৃত নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর সংযোজনাও বাংলা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য।

ক. সংস্কৃত রামায়ণ

বাংলাদেশে সংস্কৃতেও রামায়ণ রচিত হইয়াছে। পাল আমলে লিখিত দুইখানি রামচরিতের সন্ধান পাওয়া যায়—অভিনন্দের রামচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত।

অভিনন্দের 'রামচরিত' অসম্পূর্ণ। ইহার ছত্রিশটি সর্গ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার কাহিনী প্রচলিত রামকাহিনীর অনুরূপ। প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রামায়ণে হনুমানের মুখে একটি দেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক স্তব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: ইহার সহিত আছে 'কবিপ্রশস্তি:'। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি আর্যাছন্দে দ্ব্যর্থক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এক অর্থে কাব্যের বিষয় রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং দশরথ-নন্দন রাম কর্তৃক রাবণবধ ও সীতার উদ্ধার; অপর অর্থে কৈবর্তরাজ দিব্য কর্তৃক বরেন্দ্রী গ্রহণ,

রামপাল কর্তৃক ভীমরূপী রাবণবধ এবং 'জনকভুবা' রূপিণী জন্মভূমির উদ্ধার। ইহা প্রকারান্তরে একটি ঐতিহাসিক কাব্য। পাল আমলে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত-রাজের বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক সেই বিদ্রোহ দমন এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। তবে কাহিনীর কাঠামো রামায়ণ-ভূমক। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয়ে এই গ্রন্থকে 'কলিযুগ রামায়ণ' এবং নিজেকে 'কলিকাল বাল্মীকি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ['কলিযুগ বামায়ণমিহ কবিবপি কলিকালবাল্মীকিঃ'— বামচবিত, কবি প্রশস্তি]। ইহাতেও বাঙালীব মাতৃভাবাসক্তির পবিচয় বহিয়াছে। ভীমরূপী রাবণ ভবানী-মহেশ্বরের উপাসক :

স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গম বিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজবাজ কেতুরাসীমুক্তা পুণ্যাস্য যস্যান্তঃ॥ [বামচঃ, ২. ২৬]

—ভীম সকলপ্রকার অধর্ম হইতে মুক্ত ছিলেন, ভুজঙ্গম-বিভূষিত চন্দ্রকলা-লাঞ্ছিত দেব মহাদেব ভবানীসহ তাঁহাব অন্তবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

খ. বাংলা রামায়ণ

॥ **কৃত্তিবাস** ॥ ভাষায় রচিত 'শ্রীবাম পাঁচালী'ব আদি কবি পণ্ডিত কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতক)। শুধু আদি কবি নহেন, বাংলা বামায়ণেব জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসী বামায়ণেব মূল রূপ কি ছিল, তাহা জানা অসম্ভব; যে রূপে এই বামায়ণ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাতে নিঃসন্দেহে পববর্তীকালেব বহু কবির হাত পড়িয়াছে। কথক ও গায়েনের মুখে মুখেও অনেক কাহিনী যোজিত হইয়াছে। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই রামায়ণকে বলিয়াছেন, 'Composite Text': উক্তিটি মিথ্যা নয়। বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপের কূটতর্ক ছাড়িয়া দিলে, অন্য বৈশিষ্ট্য-গুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তারিত বা সংক্ষেপিত—কোনদিক হইতেই আক্ষবিক অনুবাদ নয়। কৃত্তিবাস যদিও একাধিকবার বলিয়াছেন, 'বাল্মীকি প্রসাদে বচে রামায়ণ গান' কিংবা 'কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকিমুনি বরে'—কিন্তু কৃত্তিবাসেব সপ্তকাণ্ড বামায়ণে আদি কবিব এই প্রসাদের ভাগ অতি অল্প। বাল্মীকির বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডেব নাম কৃত্তিবাসে হইয়াছে আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড। চরিত্রসৃষ্টিতেও কৃত্তিবাস স্বতন্ত্র: বাল্মীকির আদর্শ 'নরচন্দ্রমা' বীযবান্ বাম, কৃত্তিবাসেব আদর্শ কোমলতাব আধার ভগবান রাম; বাল্মীকি ধিক্কৃতা অনুতপ্তা কৈকেয়ীব মনোভাব বিশ্লেষণ করেন নাই,—রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে কৃত্তিবাস অনুতপ্তা কৈকেয়ীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে

সতিনীর বিষ-নিশ্বাস নাই, আছে জননীর অশ্রু-উচ্ছ্বাস, 'যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে। ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে।' বাল্মীকির রাবণ মনে-প্রাণে রামের শত্রু, কৃত্তিবাসের রাবণ প্রকারান্তরে রামভক্ত, মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে রামস্তুতি 'অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন। দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥' কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু ঘটনা আর্ষরামায়ণ বহির্ভূত: রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, গঙ্গাস্পর্শে সৌদাস রাজার মুক্তি, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয় ও দানকীর্তি, অজ-বিলাপ, হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডার লঙ্কাত্যাগ, তরণীসেন কাহিনী, অহিরাবণ ও মহীরাবণ বৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, রাবণের চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধকরণ, মৃত্যুকালে রাবণের রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান, রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করিবার কল্পনা, লবকুশের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ববন্ধন ও যুদ্ধ প্রভৃতি। এই সকল ঘটনা কৃত্তিবাস নানা উৎস হইতে আহরণ করিয়াছেন। বাংলার লোকশ্রুতি, অধ্যাত্মরামায়ণ ও পদ্মপুরাণ বা কালিকাপুরাণের কাহিনী এবং কালিদাসের রঘুবংশের প্রভাব কৃত্তিবাসে গুরুতর। সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাঙালীর মানস-প্রবণতা ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদের প্রভাব। ভক্তিবাদের দেশে কৃত্তিবাস রাম-ভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন: কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম-বৈরী রাবণ, তরণী-সেন, বীরবাহু সকলেই রামভক্ত। তরণীসেন রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছেন, তাহার রথে ও ধ্বজপতাকায় লেখা 'লক্ষ লক্ষ রাম নাম গঙ্গামৃত্তিকাতে', তিনি বলিতেছেন, 'রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা', রামের হস্তে নিহত হইয়াও 'তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে'। ভক্তিবাদের যেমন এই একদিক, তেমনই মাতৃভাবাসক্তির আর একদিক। রাবণের পুত্র মহীরাবণ কালিকাভক্ত: 'কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান'—এই মহীরাবণ মায়াবলে রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া পাতালে কালিকার নিকট বলি দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। রাবণ নিজেও ছিলেন শক্তির বরপুত্র; যুদ্ধকালে দেবীর স্তুতি করায় দেবী তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন: 'অসিত-বরণা কালী কোলে দশানন।' এই রাবণবধের জন্যই রামচন্দ্রের অকালে দেবীর বোধন: 'তন্ত্রমন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ'—শুধু তাই নয়, ১০৮টি নীলপদ্মের একটি অপহৃত হওয়ায় 'নীলকমলাক্ষ' রাম 'ফুল্ল নীলোৎপল' সদৃশ নয়ন উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে দেবী তাঁহাকে রাবণবধের বর প্রদান করেন। ভক্তি ও শক্তির এই অপার মহিমা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

॥ অন্যান্য রামায়ণকার ॥ বাংলা রামায়ণে অধ্যাত্ম রামায়ণ বা লোকশ্রুতিতে প্রচলিত রামায়ণের প্রভাবই বলবান্। কৃত্তিবাসের পরে অনেকে রামায়ণের কোন

বিশেষ অংশ বা পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনা করিয়াছেন; সেগুলিতেও বাল্মীকির অনুসৃতি নামে মাত্র। এই অংশগুলির মধ্যে লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, অঙ্গদরায়বার, শিবরামের যুদ্ধ তরণীসেন বধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পালাগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণেও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর (১৭০২) অঙ্গদরায়বার ও তরণীসেন বধ—যাহা 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে পারিচিত, তাহার অধিকাংশই কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়। দ্বিজ ভবানীনাথের শ্রীরাম পাঁচালী অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। দ্বিজ লক্ষ্মণও অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে রামায়ণ রচনা করেন, তাঁহার আদিকাণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

✓ ॥ **অদ্ভুত আচার্য** ॥[১] ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য, মাতার নাম মেনকা। স্বর্গত মনীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, ইনি ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। রামচন্দ্রের নির্দেশ লাভ করিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হয় 'অদ্ভুত আচার্য': 'প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত নাম হইল সেই সে কারণ' ॥ [আদ্যকাণ্ড]। 'পুরাণেতে শুনি রাম বিক্রমের সীমা'—ইনি বহু পুরাণ ঘাটিয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাঙালীর আগ্রহ পল্লবিত অলৌকিক কাহিনীর প্রতি, আর এই সকল অতিলৌকিক কাহিনীর ভাণ্ডার পুরাণ। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ নানাদিক হইতে পুরাণ-কাহিনীর মত পল্লবিত। কবিত্ব নিতান্তই অল্প, বর্ণনা বিবৃতি-প্রধান। ইহার কাণ্ডগুলির নাম আদ্য, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা। সুযোগ পাইলেই কবি পুরাণোক্ত নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন: আদ্যকাণ্ডে বিষ্ণুর রামরূপে বাল্মীকিকে দর্শন প্রদান, কদ্রু-বিনতার কাহিনী, শিব-পার্বতীর বিবাহ, বলির বৃত্তান্ত, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের উপাখ্যান প্রভৃতি পৌরাণিক অনুবৃত্তি রামায়ণে নব সংযোজন। ইহাতে রাবণ-কুম্ভকর্ণাদির জন্ম বৃত্তান্ত আদ্যকাণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে; দশরথের কাহিনী সুরু হইয়াছে উনত্রিংশ অধ্যায় হইতে। এইদিক হইতে জৈন রামায়ণের ঘটনা-বিন্যাসের সহিত ইহার মিল লক্ষিত হয়। আর একটি নূতন অদ্ভুত ঘটনা মাধব পাটনীর নৌকায় রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রের নদী পার হওয়ার বৃত্তান্ত [আদ্য, ৬৪ অধ্যায়]: রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাটনীর কাঠের নৌকা সোনায় পরিণত হইল দেখিয়া মাধব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল,

> আজি মোর হাতে তোর কভু নিস্তার নাই।
> রাজা নাও করি বেটা যাবা কোন ঠাঁই ॥

১। দ্রষ্টব্য অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ—রঙ্গপুর পরিষদ্ গ্রন্থাবলী।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গিল মাধবের স্ত্রীর কথায়। সে বুঝিল, রামচন্দ্রই অখিল ভুবন পতি।[১]

অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে এইরূপ—অনেক অদ্ভুত কথা আছে। ইহা হইতে জানা যায়, পূর্বজন্মের দশরথ—'পূর্বে দধীচি পরে দশরথ রাজন্'; এই রামায়ণ মতে কুব্জার নাম নন্দনা।

॥ চন্দ্রাবতী ॥ লোকশ্রুত কাহিনীসুবলিত আর একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর। চন্দ্রাবতী প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলকার দ্বিজবংশীদাসের বিদুষী কন্যা। ইনি ষোড়শ শতকের কবি। ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলাদের মুখে মুখে এখনও চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অংশবিশেষ গীত হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, যবদ্বীপের রামায়ণ-কাহিনীর সহিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সাদৃশ্য আছে। ইহার সীতার জন্ম-কাহিনী অদ্ভুতোত্তর রামায়ণের অনুরূপ। রাবণ মর্ত্য ও পাতাল জয় করিয়া মুনিদের রক্তে পূর্ণ একটি কটরা মন্দোদরীকে প্রদান করেন এবং বলেন, উহাতে উগ্র বিষ আছে। রাবণ অশোকবনে অপহৃতা দেবকন্যাদের সহ প্রমোদ করিতেছেন সংবাদ পাইয়া মন্দোদরী বিষ মনে করিয়া সেই রক্ত পান করেন, তাহার ফলেই একটি ডিম্ব প্রসূত হয়। গণকেরা বলেন, 'এই ডিম্বে কন্যা এক গো লভিবে জনম। তা হইতে রাক্ষস বংশ গো হইবে নিধন'। রাবণ এই সংবাদ পাইয়া 'সোনার কটরার মধ্যে গো রূপার খিল দিয়া' সেই ডিম্ব সাগরে ভাসাইয়া দেন। মিথিলার মাধব জালিয়া সেই কটরা পাইয়া ঘরে আনে এবং সাধ্বী পত্নী 'সতা'র হস্তে অর্পণ করে। একদিন একটি আশ্চর্য রূপসী কন্যা আবির্ভূত হইয়া কটরাটিকে জনকরাজার ঘরে পাঠাইয়া দিতে বলে। মাধবপত্নী কৌটাটি জনকরাজার রাণীর নিকট লইয়া যায় এবং তাহার বিনিময়ে বহু ধনরত্ন লাভ করে। এইখানেই কটরার ডিম্ব হইতে সীতার উৎপত্তি হয়। জালিয়ার পত্নী সতার নাম অনুসারে কন্যার নাম রাখা হয় সীতা ['সতার নামেতে গো কন্যার নাম রাখে সীতা']। রামের জন্ম-কাহিনীও স্বতন্ত্র: আটকুড়া দশরথ রাজা একজন মুনির নিকট হইতে একটি ফল লাভ করেন, সেই ফল ভক্ষণ করায় তিন রাণী হইতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রামের হরধনু ভঙ্গ হইতে রাবণবধ পর্যন্ত কাহিনী সীতার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সীতা-নির্বাসনের কারণটি অভিনব: কেকয়ীর একটি কন্যা ছিল—নাম কুকুয়া। সে-ই নির্বন্ধ করিয়া রাবণ কেমন, জানিতে চাহিলে সীতা মাটিতে রাবণের

১। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরীপাটনীর সহিত মাধবপাটনীর সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ উভয়েই কোন সাধারণ লোকশ্রুতি হইতে বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিয়াছেন।

২। দ্রষ্টব্য চন্দ্রাবতীর রামায়ণ—পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখান এবং ভ্রান্তিবশতঃ সেই চিত্রের পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। কুকুয়া রামচন্দ্রকে ডাকিয়া বলে,

> শুন শুন দাদা ওগো কহি যে তোমারে।
> বলিতে পাপের কথা গো বাক্য নাহি সরে॥
> বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া।
> তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া॥

ইহাই সীতার বনবাসের কারণ। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ অসম্পূর্ণ। কুকুয়ার কাহিনীর পর আর কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে বাংলা রামায়ণের বিশিষ্টতা সহজেই ধরা পড়ে। বাংলা দেশের রামায়ণ বাংলাদেশেরই বিচিত্র সংস্কার ও বিশ্বাসের রূপায়ণ। কাহিনীর কাঠামো আর্ষ রামায়ণের হইলেও ইহার বেশির ভাগ চরিত্র ও ঘটনা লোকশ্রুতি হইতে সমাহৃত।

॥ **বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ** ॥[১] এদেশে জনপ্রিয় রামকাহিনী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর হস্তে যে কিরূপ রূপান্তর লাভ করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের 'নূতন রামায়ণ'। রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন: 'আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার'। মহাকালীর ইচ্ছায় তিনি বুদ্ধের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং রামায়ণ রচনা করিয়াছেন হনুমানের অনুজ্ঞায়, 'রামানন্দ লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায়া।' কবিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ পাওয়া যায় নাই, লঙ্কাকাণ্ডের শেষাংশে পুঁথি খণ্ডিত। কিন্তু ইহার মধ্যে মহাযান শক্তিবাদী বৌদ্ধ প্রভাব অতি স্পষ্ট; তাঁহার মতে, দারুব্রহ্ম (পুরীর জগন্নাথ) এবং রামচন্দ্রও বুদ্ধ: 'রামচন্দ্রের চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি সর্বত্রই বৌদ্ধভাব বা নির্বাণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।' রামানন্দের রামায়ণে কাহিনীর কাঠামো প্রচলিত রামায়ণের মত হইলেও ইহা যোগ-যাগ-সাধনের কথায় পূর্ণ: ইহাতে বৌদ্ধ তন্ত্রাচার ও যোগাচারের প্রভাব লক্ষণীয়।

॥ **জগৎরাম ও রামপ্রসাদ** ॥ 'অদ্ভুতাশ্চর্য রামায়ণ' বা 'অদ্ভুত রামায়ণের অনুকরণে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন জগৎরাম রায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ। এই রামায়ণে আটটি কাণ্ড আছে—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্করকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। পুষ্করকাণ্ডের শেষাংশ রামরাস। জগৎরাম প্রথমে সমগ্র কাব্যটি রচনা করেন, পরে লঙ্কা ও উত্তর-কাণ্ড পুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক বিস্তৃত করিয়া লেখা হয়। পুঁথিখানি সমাপ্ত হয় ১৭১৮

১। দ্রষ্টব্য বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু (হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড)

খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা অদ্ভুত রামায়ণ প্রধানতঃ সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনেই রচিত। ইহাতে ভরদ্বাজ-বাল্মীকি-সংবাদে বিশেষভাবে সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। পুষ্কর কাণ্ডটিই বিশেষত্ব মণ্ডিত। এই কাণ্ডেই সীতার হাস্যতত্ত্ব, পুষ্করাধিপ সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত, সহস্রস্কন্ধ রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের পরাজয়, সীতার মহাকালীরূপ ধারণ, সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ ও রামকর্তৃক প্রকৃতিরূপা সীতার স্তব বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর 'রামরাস'। রামরাস সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা এবং উহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। জগৎরামের রামায়ণে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ বহির্ভূত অনেক অতিরিক্ত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের একটি অধ্যায়ে রামপ্রসাদ এই রামায়ণের বিশিষ্টতা সম্পর্কে বলিয়াছেন,

সীতারাম লীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম ॥

অদ্ভুত রামায়ণে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব গুরুতর। উপরন্তু আছে সহজিয়া বৈষ্ণবমত ও শক্তিবাদের প্রভাব। বাংলা রামায়ণ বাঙালীর বিচিত্র মানস-প্রবণতার প্রতীক।

গ. নব্য বাংলায় রামায়ণের নব রূপান্তর

বাংলা রামায়ণ যে পুরাপুরি বাল্মীকি রামায়ণের অনুসৃতি নয়, উহাতে যে অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ বা অন্যান্য পুরাণবর্ণিত রামায়ণ এবং দেশপ্রচলিত নানাপ্রকার সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব বর্তমান, তাহা আলোচিত হইয়াছে। বাংলা রামায়ণে বাঙালীর নিজস্ব মানস-প্রবণতার ছাপ অতি স্পষ্ট। অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ, ভক্তি-বাদ ও শক্তিবাদের দেশে—দেশজ এই বিশিষ্টতাই সংস্কৃত রামায়ণের পঞ্জরে নব প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছে। পুরাকাহিনী এইভাবে যুগে যুগেই নূতন আকার প্রাপ্ত হয়: কোথাও বিকৃত হয়, কোথাও সংস্কৃত হয়, কোথাও আবার যুগপ্রয়োজনের বাহন হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদ্বোধিত বাঙালীর জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যেদিন নবপ্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন স্পষ্টতঃ দুইটি নূতন ধারায় পুরাতত্ত্বকে গ্রহণ-করিবার চেষ্টা দেখা গেল: (১) পুরাতনকে স্ব-স্বরূপে প্রকাশ করিবার আগ্রহ এবং (২) পুরাতনের আস্বাদকে নূতন যুগের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করার

প্রয়াস। অবশ্য অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে পুরাতনের গতানুগতিক অনুকরণ, পৌরাণিক অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিকতার মোহ কোনদিনই পরিবর্তিত হয় নাই: তাহার ফলে কথকতায় বা কবিগানে, যাত্রায় বা যাত্রানাট্যে সেই অলৌকিকতা, সেই চমকপ্রদ ভক্তি-বিশ্বাসের অদ্ভুত কাহিনীরই প্রাধান্য থাকিয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতকের বাংলা রামায়ণ সম্পর্কেও এই তিনটি ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই শতাব্দীতে অখণ্ড রামায়ণ বড় বেশি রচিত হয় নাই। কেবল একখানি অখণ্ড রামায়ণ পাওয়া যাইতেছে—রাজকৃষ্ণ রায় অনূদিত রামায়ণ; ইহা মূল বাল্মীকি-রামায়ণের পদ্যানুবাদ। অনুবাদে কবি নানা-প্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন—কোথাও পয়ার, কোথাও ত্রিপদী, কোথাও অমিত্রাক্ষর, কোথাও বা সংস্কৃত ছন্দ। ছন্দের বৈচিত্র্যের জন্য নয়, বাল্মীকি-রামায়ণের যথাযথ মূলানুবাদের জন্যই ইহা অমূল্য। প্রাচীন কোন বাংলা রামায়ণ এ-স্বাদ দিতে পারে নাই। প্রাচীন কবিদের রামায়ণ বাল্মীকির ছায়া মাত্র, কায়া নয়—রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ মূলের কায়া, মূলের একটি অবিকল প্রতিমূর্তি। কোন কোন স্থলে অনুবাদ দুর্বল হইলেও, কবি মূলকে কোথাও বিকৃত করেন নাই। রাজকৃষ্ণ রায়ের এই রামায়ণ ছাড়া এযুগের রামায়ণমূলক সকল রচনাই রামায়ণের অংশ মাত্র। যাত্রা-নাটকের পালায় কিংবা কাব্য-কবিতায় রামায়ণের কোন-না-কোন খণ্ডিত অংশই অবলম্বিত হইয়াছে।

॥ যাত্রা ও নাটক ॥ প্রাচীন যাত্রার গান, ভক্তি-বিশ্বাস ও অতিলৌকিকতাকে উপজীব্য করিয়া মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটক রচনার যে দ্বার খুলিয়া দিয়া-ছিলেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রামায়ণ-কাহিনীও নাট্যযাত্রার পালায় স্থান লাভ করিয়াছিল। মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'জানকী-নাটক', হরিমোহন কর্মকারের 'ইন্দুমতী', ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মৈথিলীমিলন' ও 'সীতার বনবাস', কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সীতার বনবাস', 'রামবনবাস', 'রামাভিষেক', ও 'লক্ষ্মণ-বর্জন'—তিনকড়ি বিশ্বাসের 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'সীতার পাতাল প্রবেশ'—ব্রজমোহন রায়ের 'রামাভিষেক' ও 'শতস্কন্ধ রাবণবধ' এবং মতিলাল রায়ের 'সীতাহরণ', 'রামরাজা' ও 'রাবণবধ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল যাত্রানাট্যে রামের দেবত্ব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস বাংলা রামায়ণের বিশেষত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। যাত্রার সহজ চমক সৃষ্টিতে অদ্ভুত অলৌকিক বিশ্বাসকে প্রয়োগ করিয়া ইহা প্রাচীন বন্ধনীর চারিপাশেই ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রও এই বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', লক্ষ্মণবর্জন', 'সীতাহরণ' প্রভৃতি নাটক প্রাচীন ভক্তি-

বিশ্বাসেরই একটু রকমফের। নবং রামায়ণ-কাহিনীর একটি নূতনতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নব্যযুগের চিন্তার আলোকে 'পাষাণী' নাটকের ইন্দ্র ও অহল্যা চরিত্রকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে গিয়া পৌরাণিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পুরাণকে নূতন দৃষ্টিতে বিচার করিবার স্বাধীনতা লেখকের থাকিলেও, আদর্শচরিত্রকে আদর্শভ্রষ্টরূপে চিত্রিত করিবার স্বাধীনতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়: তাহাতে পুরাণের নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরাণের রসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটে এবং চিরাগত বিশ্বাস আহত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ইন্দ্র ও অহল্যা চরিত্র এই দোষে দুষ্ট। রামায়ণে অহল্যা 'বিশুদ্ধাঙ্গী', 'মহাভাগা', 'দ্যোতিত-প্রভা', 'যশস্বিনী'—তিনি ইন্দ্রমায়ায় ভ্রষ্টা,—আর ইন্দ্র দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত 'দুর্মতিবশা', কিন্তু পশ্চাতে 'অনুতপ্ত'; রামায়ণে ইন্দ্র-অহল্যার সঙ্গম যেন একটা দৈব-নিষ্পত্তি [বাল, ৪৮-৪৯ সর্গ]। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ইন্দ্র লম্পট ও কামুক, অহল্যা স্বেচ্ছায় ছিচারিণী। 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার ভূমিকা সম্ভোগ-লালস-তাড়িতা সামান্যা নারীর ন্যায়: স্বামীর প্রতি তাহার অভিযোগ:

> বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
> কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
> নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে?

তিনি ইন্দ্রকে বলেন, 'সত্য ভালবাস?' প্রেমিককে লইয়া প্রেমিকার স্বর্গ-রচনার কল্পনাটিও আধুনিক: অবৈধ রতি সম্ভোগের জন্য স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিতেও অহল্যার বিবেকে বাধে নাই। পুরাণ লইয়া এ ধরনের নবসৃষ্টি মৌলিকতা-সম্পন্ন হইলেও নিন্দনীয়। কিন্তু 'পাষাণী' নাটকের ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত দ্বিজেন্দ্রলাল করিয়াছেন 'সীতা' নাটকে এখানে তিনি রামায়ণ-কাহিনীকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যেভাবে চরিত্র-গুলির নবতর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে যেমন একদিকে আছে নবযুগের স্বীকৃতি, তেমনি অপরদিকে আছে নৈপুণ্যের পরিচয়। রামায়ণে রাম সীতাকে অগ্নিশুদ্ধা ও অপাপবিদ্ধা জানিয়াও কেবল বংশমর্যাদা ও কীর্তিরক্ষার জন্য বিসর্জন দিয়াছিলেন: তাঁহার নিকট প্রেম হইতেও বড় ছিল কীর্তি ও মহৎ বংশগৌরব—কিন্তু 'সীতা' নাটকে রাম একরূপ নিরুপায় হইয়া, কুলগুরু বশিষ্ঠের প্ররোচনাবশে শাস্ত্রের মুখ চাহিয়া সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন: রাম এখানে বশিষ্ঠের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র, কিন্তু প্রেমিক। বশিষ্ঠ হৃদয়হীন শাস্ত্র-বিধির পোষ্টা: তাঁহার নিকট শাস্ত্রের বিধানের কাছে ব্যক্তিগত স্নেহ, প্রেম, কোমলতা নিতান্ত মূল্যহীন। এই নাটকে বাল্মীকি এক অভিনব চরিত্র—তিনি হৃদয়বান্; সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্তা নারীর অভিযোগ তাঁহার কণ্ঠে অগ্নিবীণা-

রবে বাজিয়া উঠিয়াছে। রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটনা অলৌকিক, সীতানাটকে এই ঘটনা যুক্তিসিদ্ধ: ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ায় সীতা পাতালে প্রোথিত হন। এইভাবে সীতানাটকে মূল রামায়ণের স্বাদও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অপরদিকে নবযুগের চিন্তাধারাও আহত হয় নাই।

কাব্য-কবিতায় রামায়ণ-প্রসঙ্গ॥ নব ধ্যান-ধারণার যুগে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে স্ব-স্ব প্রবণতা অনুসারে পুরাণ কাহিনী গ্রহণ করার যে প্রয়াস জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মধুসূদন ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি। তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ইউরোপীয় সাহিত্যের আস্বাদজনিত নবতর রসানুভূতির প্রকাশ। শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক পাশ্চাত্ত্য জাতি তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গলের চেতনায় যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, মেঘনাদ-বধ কাব্য সেই যুগ-চেতনার সার্থক রূপায়ণ। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর যুগভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধকাব্য একখানি নব রামায়ণ। এই কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদ অমেয় ঐশ্বর্য, অপরিমিত মদশক্তি ও বলিষ্ঠ মানবের প্রতীক। এই ঐশ্বর্য, এই শক্তি প্রাচীন ভারতের রাক্ষসী শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হইলেও ইহাতে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রতিসরণ অতিশয় স্পষ্ট। রাম-লক্ষ্মণকে মধুসূদন যোগ্য মর্যাদা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিজয়ীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাঁহারা পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি দৈবাহত রাবণ ও মেঘনাদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারেন নাই। রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে দুর্বলতা ও পরাজিত মানুষসুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে। মধুসূদনাঙ্কিত দেবদেবীর চরিত্রেও পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাবচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছে। মহাদেব, পার্বতী, ইন্দ্র, শচী, বারুণী লক্ষ্মী প্রভৃতি—ভারতীয় দেবদেবীর পাশ্চাত্ত্য সংস্করণ। কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও বাল্মীকি-প্রতিভাকে অমান্য করেন নাই; ভাবশিষ্যের মত তিনি যেমন বলিয়াছেন, 'নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি', তেমনি কাব্যেও সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি স্থানে স্থানে মূল রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদের শক্তিমত্তা ও সমৃদ্ধি মূল রামায়ণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়; রাজসভায় 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ' রাবণের মূর্তি মূল রামায়ণের অশেষ রূপ, ধৈর্য, সত্ত্ব ও দ্যুতির আধার রাবণের স্মারক। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের শ্লেষোক্তিও রামায়ণের প্রতিধ্বনি। তাহা ছাড়া, পঞ্চবটীবনের বর্ণনায়, পঞ্চবটীবনে রামসীতার দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে, অশোকবনে সরমাচিত্র রূপায়ণে এবং রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনায় মধুসূদন বাল্মীকিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অনুকৃতির এই নিষ্ঠা প্রাচীন

বাংলা রামায়ণে দুর্লভ: মূলের প্রতি এ নিষ্ঠা উনবিংশ শতকের ঐতিহ্য-অবগাহনের একটি বিশিষ্ট রূপ।

মেঘনাদবধ কাব্য ছাড়াও মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যের দুইটি পত্রিকা 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' এবং 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'—রামায়ণের ঘটনা লইয়া রচনা করিয়াছেন। এই পত্রদ্বয়ে কেকয়ী ও শূর্পণখা রামায়ণের পুরাণ-ভূমিতে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। কেকয়ীর অভিযোগ নব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত, শূর্পণখার প্রেমাসক্তি ভোগসুখবঞ্চিতা কাম-লোলুপা বিধবার প্রেমাভীপ্সার দর্পণ।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও রামায়ণ ॥ রবীন্দ্রনাথেও রামায়ণের প্রভাব কম নয়। যদিও সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে রামায়ণ-প্রসঙ্গ খুবই অল্প, তথাপি রামায়ণের প্রতি তাঁহার যে কি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রবন্ধে ও কবিতায়। প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রামায়ণকে তিনি বহুকোটি নরনারীর অনন্ত শান্তি ও শক্তির প্রেরণা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের চিরকালের আশা-কামনার প্রতীক, ভারতীয় মহৎ আদর্শের প্রতিনিধি, ভারতবাসীর গৃহ-জীবনের কাব্য। 'পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে' [প্রাচীন সাহিত্য]

'পুরস্কার' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, সেই কোন্ যুগে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আজিও সেই সুর 'মধুর-করুণ তানে' হৃদয়কে বিধুর করিয়া তুলিতেছে:

> সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
> যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
> আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
> বাজে মানবের কানে [সোনার তরী—পুরস্কার]

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রচিত্তে রামায়ণের প্রভাব নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তাহার প্রথম স্বাক্ষর। অবশ্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রেরণা মূল রামায়ণ নয়, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'—তথাপি বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি কবিচিত্তে যে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালের অপর কয়েকটি প্রবন্ধে ও কবিতায়। কাহিনীর অন্তর্গত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যাইতেছে। এখানে একদিকে আরোপিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্য ও মানবপ্রীতি, অপরদিকে রূপায়িত হইয়াছে কবি-

জীবন ও কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট ধারণা। মানুষের ভাষার দৈন্য সম্পর্কে বাল্মীকির মনোভাব কবির নিজেরই মনোভাব :

মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে। [কাহিনী—ভাষা ও ছন্দ]

সহসা আবির্ভূত দৈবীছন্দে বাল্মীকি দেবতার বন্দনা গান করিতে চাহেন নাই, চাহিয়াছেন আদর্শ মানুষের বন্দনা করিতে—ইহাও মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মূল রামায়ণকে একেবারে বিকৃত করেন নাই, মোটামুটি ঘটনাটিকে অবিকৃত রাখিয়া কাব্যসত্য সম্পর্কে নিজস্ব মত পরিবেশন করিয়াছেন। মূল রামায়ণে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন,

যচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ [বাল, ২.৩৫]

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় নারদ বাল্মীকিকে কহিয়াছেন—

'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি আরও বিচিত্র ভাবে কবি-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই ঘটনার মধ্যে কবির কাব্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল সত্যটি নিহিত আছে, এবং ইহার মধ্যে রামায়ণের অন্তরাত্মার সমগ্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে,

কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল? করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রু-নির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণ কথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে।...ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক [সাহিত্য—কবিজীবনী]

রত্নাকর দস্যুর ঋষিত্ব লাভের কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণে নাই, আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাস হইতে এই কাহিনীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এ কাহিনীও রবীন্দ্র-মানসকে আলোড়িত করিয়াছে। তাঁহার মতে এই ঘটনা, ভারতবাসীর চক্ষে রামচরিত্র যে কত বড়, কি গভীর ভক্তি ও প্রেরণার উৎস, তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়াছে :

আর একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্য-প্রকৃতির আর-এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প

রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রাম-সীতার বিচ্ছেদ দুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে, রামের এমন চরিত্র, ভক্তির এমন প্রবলতা। রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কত বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যেন তাহাই মাপিয়া দিতেছে [সাহিত্য—কবিজীবনী]

রবীন্দ্রচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে আর একটি কাহিনী—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান। ঋষ্যশৃঙ্গ নারী-পুরুষে ভেদ জানিতেন না। তিনি বারাঙ্গনাদের দেখিয়া তাঁহাদিগকে উত্তম ঋষিজ্ঞানে অভ্যর্থনা করিয়া পূজা করেন। ঋষিপুত্রের এই পূজায় একজন বারাঙ্গনা কিভাবে কলুষ জীবনে প্রেম-জ্যোতির স্পর্শলাভ করিয়া সহসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা' কবিতায় সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বারাঙ্গনার হৃদয়-জাগরণের কথা মূল রামায়ণে নাই, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিজস্ব ভাব আরোপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মানসীকাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতা। রামায়ণের ঘটনামাত্র অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবধাত্রী জননীর অন্তরের অপরিসীম স্নেহ-ব্যাকুলতার তথ্য অহল্যার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। অহল্যার নিকট কবির এ জিজ্ঞাসা নূতন, অহল্যা যেন এক নবতর সৃষ্টি—স্মৃতি-বিস্মৃতির রহস্যময় ভাবাবেশে যিনি ভূমিগর্ভ হইতে স্নেহকোলাহল মুখর ধরণীর বুকে জাগিয়া উঠিয়াছেন, 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র।' ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, 'বাল্মীকির সীতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই অহল্যার সোদরত্ব অতি স্পষ্ট।' [ত্রয়ী]

এইভাবে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের রসচেতনাকে আন্দোলিত করিয়াছে। এ কথা ঠিক যে, 'রক্তকরবী' নাটক রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রামায়ণকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, রামায়ণের রাবণ চির-কালের 'বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী দেবদ্রোহী' লুব্ধ সংগ্রহ-প্রয়াসের ভয়াল মূর্তি: রামায়ণে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণ-জীবী দুই জাতীয় সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষ মূর্তিমন্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, যক্ষপুরীর নিষ্প্রাণ সম্পদের মধ্যে নারীশক্তি নন্দিনীর আবির্ভাব—লঙ্কার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মধ্যে মানব কন্যা সীতার আবির্ভাবের অনুরূপ। এস্থলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া রামায়ণে মর্মার্থ আবিষ্কার করিয়া পুরাতত্ত্বের ভিত্তিতে নব-উপলব্ধ মানস-সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ মহাভারত ॥

১. ভূমিকা

মহাভারত সুবিশাল গ্রন্থ। ইহা সমুদ্রের মতই বিশাল, বিস্তৃত, গভীর ও গম্ভীর সমুদ্রের মতই রত্নাঢ্য। সাগর-লহরী গণনা করা দুঃসাধ্য, মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। বিপুল মহত্ত্ব ও ভারত্বের জন্যই এই গ্রন্থের নাম মহাভারত।

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি। রামায়ণের কাহিনী সরল: উহার সপ্তকাণ্ডে মূল কাহিনী ব্যতীত মাত্র একশত উপাখ্যান আছে। মহাভারতের পর্বসংখ্যা আঠার; মূল কাহিনীর অতিরিক্ত ইহাতে অসংখ্য কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এমনও হইয়াছে যে, অনেকস্থলে মূল কাহিনী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে,— 'অত্রাপ্যুদাহরণমন্তীতিহাসং পুরাতনম্' বলিয়া মহাভারতকার কথার পর কথা যোজনা করিয়া কাহিনীকে শাখায়-প্রশাখায় জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

রামায়ণেও বৃহত্তর সমাজের চিত্র আছে, বৃহত্তর সমাজের সংঘাত প্রদর্শিত হইয়াছে: তথাপি রামায়ণ মুখ্যতঃ পারিবারিক কাহিনী। মহাভারতের সমাজ বিস্তৃততর, সংঘাত আরও প্রচণ্ড। মহাভারতের গৃহযুদ্ধে সমগ্র ভারত যুক্ত, সমগ্র ভারত আন্দোলিত। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জীবনের সকল নীতি—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, গৃহধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম—ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র সবই মহাভারতের বিপুল অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে। ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির বিষয় ইহাতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা কুত্রাপি নাই:

> ধর্মে চার্থে কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
> যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥ [আদি. ৫৭. ২৪]

মহাভারত সম্পর্কে এ উক্তির সত্যতা অবিসংবাদিত।

২. মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় ও পর্ব বিভাগ

মহাভারত মূলতঃ কুরু-পাণ্ডবের বিরোধের ইতিহাস। কুরুকুলে দুর্যোধন ছিলেন একটা মন্যুময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল এবং অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। আর পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মময়

মহাদ্রুম; তাহার স্কন্ধ অর্জুন, শাখা ভীমসেন, মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেব পুষ্পফল এবং কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণবর্গ তাহার মূল।[১] মহাভারত এই মন্যুময় মহাবৃক্ষ ও ধর্মময় মহাদ্রুমের সংঘর্ষে মন্যুময় মহাবৃক্ষের পতন ও ধর্মময় মহাদ্রুমের বিজয় ও উত্থানের কাহিনী। এই মূলকাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে আরও অনেক কথা ও কাহিনী। বহু নদ-নদী দ্বারা যেমন মহাসমুদ্র বর্ধিত ও স্ফীত হয়, তেমনি 'বিবিধাঃ কথাঃ' দ্বারা বিচিত্রার্থ মহাভারত স্ফীত ও বর্ধিত হইয়াছে। এই প্রবর্ধিত ভারতকথা অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেছে,—দম্ভ, দর্প, অভিমানিতার শোচনীয় পরিণাম দেখ, পরিণাম দেখ ধর্মের—মনে রাখিও, 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।'

প্রচলিত মহাভারতে মোট পর্বসংখ্যা আঠার। আঠারটি পর্বের নাম,—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক (ঐষীক), স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব। তন্মধ্যে **আদিপর্বে** আছে জন্মেজয়ের সর্পসত্র প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কাহিনী, আস্তীকোপাখ্যান, ভারতবংশের পুরাবৃত্ত, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী, যযাতি উপাখ্যান, পরাশর-মৎস্যগন্ধা সংবাদ, ভীষ্মকাহিনী, অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা বৃত্তান্ত, ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম, দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্ম, পাণ্ডুর প্রব্রজ্যা, বনে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরাদির হস্তীনাপুরে আগমন, কুরু-পাণ্ডবের বাল্য-ক্রীড়া ও অস্ত্রশিক্ষা, পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনের দ্বেষ, বারণাবত-প্রয়াণ, জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পঞ্চপতিবরণ, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভ, অর্জুনের বনবাস ও খাণ্ডবদাহ বৃত্তান্ত। **সভাপর্বে** ময়দানব কর্তৃক সভা-নির্মাণ, জরাসন্ধ বধ, পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, শিশুপাল বধ, ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দর্শনে দুর্যোধনের পরিতাপ ও শকুনির পরামর্শে অক্ষক্রীড়ার উদ্যোগ, অক্ষক্রীড়া, যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্রৌপদীর পণ, দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন ও বস্ত্রহরণ, ভীমের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর বরলাভ, পুনরায় দ্যূতক্রীড়া ও দ্যূতপণে পরাজিত যুধিষ্ঠিরের দ্বাদশ বৎসরের জন্য সামান্য বনবাস ও এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়া পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীসহ বনগমন। **বনপর্বে** কির্মীর বধ, দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের

১। দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ [আদি. ১. ৭১-৭২]

প্রভৃতি দ্রৌপদীর অনুযোগ, অস্ত্রলাভের নিমিত্ত অর্জুনের বনগমন, কীরাতার্জুন সংবাদ, অর্জুনের স্বর্গগমন ও উর্বশী-প্রত্যাখ্যান, অতিকরুণ নলোপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা, সোমক-ঋত্বিক সংবাদ, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, নিবাতকবচ বধ, মার্কণ্ডেয়-পাণ্ডব সম্মেলন, দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান, সাবিত্রী উপাখ্যান, রামায়ণ কথা, শিবি-উপাখ্যান, ধর্মব্যাধপ্রকরণ ও বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ। মহাভারতের বনপর্ব ভারতীয় কথা-সাহিত্যের মহামূল্য ভাণ্ডার। **বিরাটপর্বে** পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস। ইহাতে আছে ছদ্মবেশে পাণ্ডবগণের বিরাটনগরে প্রবেশ, কীচকবধ, গোগ্রহ ও উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ। **উদ্‌যোগপর্ব** কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব। ইহার বিষয়, পাণ্ডবগণের সন্ধির প্রচেষ্টা, কৃষ্ণের দৌত্য, বিদুরের উপদেশ, কৃষ্ণের কুরুসভায় প্রবেশ, কুন্তী কর্তৃক বিদুলা উপাখ্যান বর্ণনা, কর্ণকুন্তী সংবাদ, যুদ্ধের উদ্যোগ, কৌরব পক্ষে ভীষ্মকে সৈনাপত্যে বরণ ও অম্বাশিখণ্ডী-কাহিনী। **ভীষ্মপর্বে** সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ, উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশ, যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব, শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, যুদ্ধারম্ভ, ভীষ্মের পরাজয় ও শরশয্যা। **দ্রোণপর্বের** প্রধান বর্ণনীয় বিষয় চক্রব্যূহে পরিবেষ্টিত সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যুবধ, অর্জুনের জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ বধ, ঘটোৎকচবধ ও রোমাঞ্চকর দ্রোণবধ বৃত্তান্ত। **কর্ণপর্বে** কর্ণ ও শল্য সংবাদ, ত্রিপুরাসুর বধ বৃত্তান্ত, কর্ণের প্রতি শল্যের তীব্র ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও কৃষ্ণার বেণীসংহার এবং দ্বৈরথসমরে মেদিনীগ্রস্ত রথে অর্জুন কর্তৃক হততেজ কর্ণ বধ। **শল্যপর্বে** শল্য ও শকুনি বধ, দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থান, ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ। **সৌপ্তিক পর্বে** অশ্বত্থামার সৈনাপত্য গ্রহণ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বধ, অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও দুর্যোধনের মৃত্যু। ঐষীক পর্ব সৌপ্তিক পর্বেরই একটি উপপর্ব। **স্ত্রী পর্বে** ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীমচূর্ণ ও বিলাপ, গান্ধারীর বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রতি অভিশাপ, কৌরব ও পাণ্ডবস্ত্রীগণের করুণ শোক, যুদ্ধমৃতদিগের তর্পণ, কুন্তী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণের পরিচয় প্রদান। এই পর্বটি অতি করুণ। ইহাতে সজ্জনের মনও অধীর হয় ও নয়নে অশ্রু আনয়ন করে—'সজ্জনমনোবৈক্লব্যাশ্রু প্রবর্তক'। তাহার পর বহু বিখ্যাত **শান্তিপর্ব**। ইহাতে শরশয্যাগত ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজধর্ম, দেশ-কালোচিত আপদ্ধর্ম ও অতি বিস্তৃত মোক্ষধর্মের বর্ণনা। **অনুশাসন** পর্বও 'ধর্মার্থীয়ঃ পরিকল্পিতঃ'—ইহাতে ধর্মের আচার, অর্থের ব্যবহার, দানের পাত্র ও সত্যের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাও বহুবিধা কথার ভাণ্ডার। এই পর্বের শেষাংশে ভীষ্মের স্বর্গারোহণ। ভীষ্ম শেষ পর্যন্ত এই সত্যোক্তি করিয়া গিয়াছেন, 'যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' **অশ্বমেধপর্বে**

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, মরুত্ত উপাখ্যান, অনুগীতা কথন, অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ, অর্জুনের ত্রিগর্ত-প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-মণিপুর-মগধাদি বিজয়, অদ্ভুত নকুল কাহিনী, যজ্ঞসমাপ্তি ও কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা। **আশ্রমবাসিক পর্বে** ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর বানপ্রস্থ অবলম্বন ও দাবানলদগ্ধ হইয়া মৃত্যু। অতি ভয়ঙ্কর **মৌসল পর্বে** যদু-বংশ ধ্বংস কীর্তন। **মহাপ্রস্থানিক পর্বে** নির্বেদ প্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান ও একে একে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমের পতন, যুধিষ্ঠির-কুকুর সংবাদ ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলোকে যাত্রা এবং সর্বশেষ **স্বর্গারোহণ পর্বে** যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত সহ মহাভারত পাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনা দ্বারা অষ্টাদশ পর্ব যুক্ত মহাভারতের পরিসমাপ্তি।

৩. মহাভারতের কাহিনী-সম্পদ

মহাভারত কথাসাহিত্যের বিশাল রত্নকোষ। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাভারতের বিপুল রত্নকোষে যুগ-যুগান্তরে বহু সৌত উপাখ্যান (Bard Poetry), ব্রাহ্মণ্য উপাখ্যান (Brahmanical myths) এবং নীতিমূলক শ্রামণ্য রচনা (Ascetic Poetry) স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মতে সৌত উপাখ্যানগুলিই মহাভারতের আদি স্তর; ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ কাহিনীগুলি পরবর্তীকালের যোজনা। ঠিক এইভাবে মহাভারতের কাহিনী বিভাগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ প্রায় প্রত্যেক কাহিনীতেই এই তিন প্রকার রচনার মিশ্রণ আছে। তবে কোন কোন কাহিনীতে প্রেম ও বীরত্বের প্রাধান্য, কোনটিতে ক্রিয়াকর্মের প্রাধান্য, কোনটিতে বা নীতিকথার প্রাধান্য। এইদিক হইতে কাহিনীগুলিকে (i) প্রেম ও বীর্যের উপাখ্যান, (ii) ধর্মমূলক উপাখ্যান ও (iii) নীতিমূলক উপাখ্যান—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

॥ প্রেম ও বীর্যের কাহিনী ॥

প্রাচীনকালে প্রেম ও বীর্যের মূল্য ছিল অপরিসীম। এগুলি মানুষের ভাবস্থির বৃত্তিগুলির অন্যতম, আদিমতমও বটে। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রেম ও বীর্যের আধারেই রচিত। মহাভারতের রুরু ও প্রমদ্বরার কথা, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান, কচ ও দেবযানীর কাহিনী, যযাতি-শর্মিষ্ঠা সংবাদ, তপতী-সংবরণ কথা, নলোপাখ্যান, রামোপাখ্যান ও বিদুলার কথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

রুরু ছিলেন প্রথিতযশা প্রমতির পুত্র। বিশ্বাবসু-মেনকার কন্যা সুন্দরী প্রমদ্বরাকে দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং পিতার অনুমতি লইয়া প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন।

কিন্তু প্রমদ্বরা অচিরেই সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রুরু তখন প্রায় উন্মাদ, প্রিয়াবিরহে হতচেতন। নিজ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ দানে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রমদ্বরাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। রুরুর এ প্রেম তুলনা রহিত [আদি, ৮-৯]।

আর একটি প্রেমের কাহিনী দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী। বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরী মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয় এবং তিনি আশৈশব কণ্বমুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হন। একদিন রাজা দুষ্মন্ত বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া প্রকৃতির লীলাভূমি কণ্বাশ্রমে উপনীত হন। কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে শকুন্তলাই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজার প্রশ্নের উত্তরে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। রূপমুগ্ধ দুষ্মন্ত গান্ধর্বমতে বিবাহের প্রস্তাব করিলে শকুন্তলা এই বলিয়া বিবাহে সম্মত হন যে, তাহার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দান করিতে হইবে। রাজা প্রতিশ্রুতি দান করিয়া শকুন্তলার সহিত মিলিত হন এবং শকুন্তলাকে শীঘ্রই রাজধানীতে লইয়া যাইবেন বলিয়া রাজ্যে ফিরিয়া যান। কণ্বমুনি আশ্রমে ফিরিয়া দিব্যচক্ষুদ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এ বিবাহ অনুমোদন করেন। তিন বৎসর পরে শকুন্তলার 'সর্বদমন' নামে এক পুত্র হয়। পুত্র বড় হইলে কণ্বমুনি সপুত্র শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করেন। শকুন্তলা স্বামীসকাশে উপনীত হইয়া নিজ পরিচয় দিয়া সর্বদমনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রার্থনা জানান। রাজা সব জানিয়াও শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন :

সোঽথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্ট তাপসি॥ [আদি. ৮৮. ১৯]

শকুন্তলা লজ্জায় মরিয়া গেলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়ন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল, রাজাকে কটাক্ষে দগ্ধ করিয়া তিনি বক্রদৃষ্টিতে রাজার পানে তাকাইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, —হে মহারাজ, জানিয়াও আপনি কেন নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাকৃত জনের ন্যায় 'আমি জানি না'—এই মিথ্যা বলিতেছেন। ব্যর্থ হইল শকুন্তলার অভিযোগ, ব্যর্থ হইল হিতোপদেশ ও অনুনয়—রাজা তাচ্ছিল্যভরে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

সহসা সর্বসমক্ষে দৈববাণী হইল, হে রাজন্ এ পুত্র তোমারই, ইহাকে গ্রহণ কর :- "ভস্মাভরস্ব দুষ্মন্ত পুত্রং শাকুন্তলাং নৃপ।' আকাশবাণী দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় রাজা দুষ্মন্ত 'হৃষ্টঃ প্রমুদিতশ্চাপি প্রতিজগ্রাহ তং সুতম্' এবং 'তাঞ্চৈব ভার্যাং দুষ্মন্তঃ পূজয়ামাস ধর্মতঃ।' মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানে দুর্বাসার শাপের কথা নাই। রাজার চরিত্রও তেমন মহত্ত্বের দাবি করিতে পারে না, কারণ, রাজা জানিয়া শুনিয়াও শকুন্তলাকে অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানটিও সুন্দর প্রেমের কাহিনী : ইহা মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যানের অন্তর্গত। বৃহস্পতিপুত্র কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য শুক্রাচার্যের নিকট আসেন। বিদ্যালাভের জন্য তিনি গুরু শুক্র ও গুরুকন্যা দেবযানীকে পরিচর্যা করিতে থাকেন। দেবযানীও গীত-নৃত্যাদি দ্বারা কচের পরিচর্যা করিতেন। এই চর্যা প্রেমে পরিণত হয়। কচ অনেকবার দানবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন, প্রতিবারই দেবযানীর নির্বন্ধাতিশয্যে শুক্রাচার্য তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কচের প্রতি দেবযানীর এই প্রেম ছিল গোপন। একবার অসুরেরা কচকে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মচূর্ণ সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্যকে পান করিতে দেয়। শুক্রাচার্য তাহা পান করেন। এদিকে কচকে না দেখিয়া দেবযানী আকুল ভাবে রোদন করিতে থাকেন। পিতাকে বলেন, 'প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ।' শুক্রাচার্য তখন কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করেন। কচ গুরুর উদর ভেদ করিয়া নির্গত হন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে গুরুকে সঞ্জীবিত করেন; কচ অভীষ্ট লাভ করিয়া স্বর্গগমনে উদ্যত হইলে দেবযানী কচের নিকট আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেন এবং বলেন, 'গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্': 'সৌহার্দে চানুরাগেচ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাম্।'

কিন্তু কচ দেবযানীকে বিবাহ করিতে পারেন না। দেবযানী গুরুকন্যা, 'গুরোর্গুরুতরা' কচের ভগিনীস্থানীয়া। তাই কচ বলিলেন, 'ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে'; 'আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমাশংস মে পথি'—তুমি আমার ভগিনী, এরূপ কথা বলিও না; অনুমতি দাও, গমন করি; আশীর্বাদ কর, যেন আমার পথ শিবময় হয়। দেবযানী তখন অভিশাপ দিলেন :

যদি মাং ধর্মকামার্থে প্রত্যাখ্যাস্যসি যাচিতঃ।
ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিমেষা গমিষ্যতি ॥ [আদি, ৭৫. ১৬]

—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, হে কচ, তোমার বিদ্যা সফল হইবে না।

কচও প্রত্যভিশাপ দিলেন, তুমি কামের বশবর্তী হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছ, আমিও বলিতেছি, কোন ঋষি-পুত্র তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন না।

যযাতি-শর্মিষ্ঠার কাহিনীও মনোজ্ঞ। শর্মিষ্ঠা ছিলেন দানব বৃষপর্বার দুহিতা। তিনি দুষ্কর্ম বশতঃ দেবযানীর দাসী হন। দেবযানীর সহিত রাজা যযাতির বিবাহ হইলে শর্মিষ্ঠাও পরিচারিকারূপে যযাতিভবনে গমন করেন। শুক্রাচার্য যযাতিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, বৃষপর্বদুহিতা শর্মিষ্ঠাকে পূজনীয়ার মত পালন করিও, উহাকে শয্যায় আহ্বান করিও না। কিন্তু কার্যতঃ নিয়মভঙ্গ হইল। শর্মিষ্ঠার প্রেমে মোহিত হইয়া যযাতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই নিয়মভঙ্গের ফল শুক্রাচার্যের অভিশাপ

ও যযাতির জরা। পুত্রের যৌবনের সহিত যযাতির জরাবিনিময়ের কাহিনীও আশ্চর্য। পিতার নির্দেশে পুত্র পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করেন। যযাতি পুত্রের যৌবন লইয়া পুনরায় ভোগে আসক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিতে পারিলেন,

ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥' [আদি ৭৫]

—অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান করিলে, অগ্নি যেমন শান্ত না হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তেমনি কাম-সম্ভোগ দ্বারা কাম নিবৃত্ত না হইয়া উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তপতী-সংবরণ কাহিনীও একটি অপূর্ব প্রেমের কাহিনী। কুরুবংশের বিখ্যাত বলবান ও রূপবান রাজা ছিলেন সংবরণ। যথাবিধানে প্রত্যহ তিনি উদয়-সূর্যের উপাসনা করিতেন। একদিন মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে সহসা হিরণ্যদ্যুতি এক কন্যা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়। অপরূপ রূপ, যেন সূর্যমণ্ডলভ্রষ্টা আদিত্যজ্যোতি। রাজা সংবরণ মদনবাণে পীড়িত হইলেন, মুগ্ধের মত তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে, কাহার কন্যা? রাজার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে সেই আয়তেক্ষণা মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিতা হইলেন: 'সৌদামিনীব চাভ্রেষু তত্রৈবান্তরধীয়ত।' উন্মত্ত রাজা সংবরণ তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় কন্যাটি আবার আসিলেন, মধুর বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। রূপোন্মত্ত রাজা কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ন হ্যহং ত্বদৃতে ভীরু শক্ষ্যামি খলু জীবিতুম্।' কন্যা বলিলেন, হে রাজন্ আমি পিতৃমতী কন্যা, আমার নিজের আত্মদানে স্বাতন্ত্র্য নাই। আমিও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি, আপনি পিতার নিকট যাচ্ঞা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন:

অহং হি তপতী নাম সাবিত্র্যবরজা সুতা।
অস্য লোক প্রদীপস্য সবিতুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ॥ [আদি. ১৬৫.২৫]

—হে ক্ষত্রিয়বর, আমার নাম তপতী, আমি লোকপ্রদীপ সবিতার দুহিতা, সাবিত্রীর অনুজা ভগিনী।

তপতী অন্তর্হিতা হইলেন। সংবরণ সুস্থ হইয়া উর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন। বশিষ্ঠদেব সংবরণের হইয়া সূর্যের নিকট তপতীকে প্রার্থনা করিলেন। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংবরণ, নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা তপতী—আর প্রার্থনা করিতেছেন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ। সূর্যদেব সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিরহ-মিলনের অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান নল-দময়ন্তী কাহিনী। ভাগ্যবঞ্চিত যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া

একদিন বৃহদশ্বকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমার ন্যায় এমন দুর্ভাগ্য জগতে কাহারও আছে কি? বৃহদশ্ব তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'ত্বত্তো দুঃখিততরো রাজাসীৎ পৃথিবীপতে'

—হে রাজন্, আপনাব অপেক্ষা দুঃখিততর এক রাজা ছিলেন,—তিনি নিষধ দেশের বীবসেন রাজার পুত্র ধর্মজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ পুণ্যশ্লোক নল। নলের মত সৌভাগ্য কার? তিনি রূপবান্, গুণবান্—দেবেন্দ্রের মত তাঁহার সার্বভৌমত্ব, সূর্যেব মত তেজ। বিদর্ভদেশের রাজা ভীমের কন্যা দময়ন্তীও ছিলেন অনুরূপ সম্পন্না :

দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুষা শ্রিয়া।

সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা ॥ [বন. ৪৫. ১০]

হংস-দৌত্যে নল এই দময়ন্তীব প্রেম লাভ কবেন। স্বয়ম্বর সভা আহূত হইলে নল নিষধ দেশে যাইতেছিলেন, সহসা পথে ইন্দ্রাদি দিকপালগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদেব একজনকে ববরূপে ববণ কবিবার জন্য নলকেই দূতরূপে দময়ন্তী সকাশে প্রেবণ করেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। প্রেমিক প্রেমিকাব নিকট যাইতেছেন অন্যের প্রেমেব দৌত্য লইয়া। পরিচয় পাইয়া দময়ন্তী বলিলেন,

দেবেভ্যো'হং নমস্কৃত্য সর্বেভ্যঃ পৃথিবীপতে।

বৃণে ত্বামেব ভর্তারং সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ বন. ৪৬. ৭০]

—হে পৃথিবীপতি, দেবতাদিগকে নমস্কার কবিয়া এই সত্য করিতেছি, আমি আপনাকেই পতিরূপে ববণ করিব।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর অপব দৃশ্য। দেবতাগণ নলেব সদৃশ মূর্তি ধাবণ কবিয়া সভায় বসিয়াছেন। বিদর্ভ-নন্দিনী সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তুল্যাকৃতি পঞ্চ পুরুষ সভা আলো কবিয়া বহিয়াছেন। কে নল, নির্ণয় কবা দুসাধ্য। দময়ন্তী বুঝিলেন, এ দৈবী মায়া। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,

বচসা মনসা চৈব যথা নাভিচরাম্যহম্।

তেন সত্যেন বিবুধাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥ [বন. ১৮]

—বাক্যে ও মনে যদি আমি ব্যভিচারী না হইয়া থাকি, তবে সেই সত্যে দেবগণ আমায় নলকে বিদিত করিয়া দিউন।

দময়ন্তী-উপাখ্যানেব প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি চিত্র বোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক; কাব্যসৌন্দর্যও অনুপম। নল ভ্রাতা পুষ্করের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় একে একে সর্বস্ব-হারা হইয়া মনস্বিনী দময়ন্তী সহ এক বস্ত্রে বনচারী হইলেন। দুঃখেব উপর দুঃখ বাড়িতে লাগিল, স্বর্ণপক্ষী ধরিতে গিয়া নল বস্ত্রখানিও হারাইলেন। শেষে মতিচ্ছন্ন হইয়া বিজনবনে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিলেন। মহাভয়াল অরণ্যে দময়ন্তীর সে

অসহায় অবস্থা ও আকুল ক্রন্দন অতি মর্মস্পর্শী। দময়ন্তী কোনপ্রকারে চেদিরাজ সুবাহুর অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইলেন। নলও বনমধ্যে নাগদংশনে বিরূপ হইয়া ঋতুপর্ণ রাজার সারথি হইলেন। অবশেষে দুঃখের দিন শেষ হইল। দীর্ঘ বিরহান্তে, নল ও দময়ন্তী মিলিত হইলেন। মিলনের সে দৃশ্য করুণ-মধুর।

উদ্যোগপর্বের অন্তর্গত বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদটি একটি বিশুদ্ধ উৎসাহোদ্দীপক কাহিনী। সন্তানের বৈক্লব্য দেখিলে ভারতের বীরাঙ্গনা নারী কি অসীম তেজোগর্ভ বাক্যে তাহাকে কর্মে প্রেরণা দিতেন, বিদুলা-উপাখ্যান তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। বিদুলা ছিলেন ক্ষত্রধর্ম-নিরতা বীরাঙ্গনা। তাঁহার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্তৃক বিনির্জিত হইয়া উদ্যমশূন্য অবস্থায় শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিদুলা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অগ্নিগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করিলেন

> অনন্দন ময়া জাত দ্বিষতাং হর্ষবর্দ্ধন।
> ন ময়া ত্বং ন পিতা চ জাতঃ কাভ্যাগতোঽসি॥ [উদ্যোগ ১২৭.৫]

—রে আমার অনন্দন, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধন, তুমি আমার সন্তান নও, তোমার পিতাও তোমাকে জন্ম দেন নাই। তুমি কোথা হইতে জন্মিয়াছ ?

বিদুলার বাক্য কর্কশ, কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ইহা জ্বালা সৃষ্টি করে, মর্মে কঠিন আঘাত হানে, বজ্রের মত গর্জন করিয়া উঠে,

> মা ধূমায় জ্বলাত্যন্তমাক্রম্য জহি শাত্রবান্।
> জ্বল মূর্দ্ধণ্যমিত্রাণাং মুহূর্তমপি বা ক্ষণম্॥ [উদ্যোগ. ১২৪. ৩১]

—ধূমিত হইয়া থাকিও না, জ্বলিয়া উঠ, শত্রুকে হনন কর—ক্ষণকালের জন্যও শত্রুর মস্তকে প্রজ্বলিত হও।

বিদুলার এই বাক্যে হতোদ্যম সঞ্জয় কশা-তাড়িত অশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া শত্রুকে নির্জিত করিয়াছিলেন।

॥ ধর্মমূলক উপাখ্যান ॥

ধর্মমূলক কাহিনীগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। এগুলি যাগযজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠান, দানধ্যান, তীর্থমহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রশংসায় মুখর। অধিকাংশই পুরাণের অলৌকিক কাহিনী। জন্মেজয়ের সর্পসত্র, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন, যযাতিপতন, অগস্ত্যাখ্যান, পরশুরামের কাহিনী, মান্ধাতৃ কথা, অষ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান, ভীম-হনুমান সংবাদ, আজগর প্রকরণ, মনু-মৎস্য সংবাদ, পতিব্রতোপাখ্যান, ধর্মব্যাধ সংবাদ, সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী, বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মরুত্ত কাহিনী, অনুগীতা প্রভৃতি এই

শ্রেণীর রচনা। মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব নানাদিক হইতে এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা করে। ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ক বহু আলোচনা এগুলিতে স্থানলাভ করিয়াছে। তীর্থ-মহিমা বিষয়ক সকল রচনাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কাহিনীগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী 'বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ' [বন. ২৮৬—২৮৮]। বন মধ্যে পাণ্ডবগণ অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, এমন সময় এক মৃগ এক ব্রাহ্মণের অরণি হরণ করিয়া বনমধ্যে আত্মগোপন করিল। ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের শরণার্থী হইলেন। মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত পাণ্ডব। সহসা সম্মুখে এক জলাশয় দেখা গেল। একে একে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম জল আহরণে গেলেন কিন্তু ফিরিয়া আসিলেন না: তখন যুধিষ্ঠির চলিলেন জলের উদ্দেশ্যে। গিয়া দেখিলেন, চারি ভ্রাতা মৃত—সম্মুখে এক বিশালদেহ বকরূপী যক্ষ: যক্ষ বলিলেন, জলাশয়ের জল তাঁহারই অধিকারে, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যে জল পান করিতে অগ্রসর হইবে—সে-ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। নকুলাদি চারি ভ্রাতা এই ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। যুধিষ্ঠির তখন প্রশ্ন করিলেন, কি আপনার প্রশ্ন। যক্ষের প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন চারিটি:

> কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে
>
> মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥ [বন ২৮৭. ৮১]

বার্তা কি! আশ্চর্য কি? পথ কি? সুখী কে? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া জল পান কর।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন:

> অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
>
> সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
>
> মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন
>
> ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥ [বন ২৮৭. ৮২]

—সূর্যরূপ অগ্নি, দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধন দ্বারা মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়া জীবগণকে মহামোহরূপ কটাহে কাল পাক করিতেছে—ইহাই বার্তা।

> অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
>
> শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥ [বন. ২৮৭. ৮৩]

—জীবগণ প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে: তাহা দেখিয়াও অবশিষ্ট লোক মনে করিতেছে তাহারা অমর—ইহা হইতে আর আশ্চর্য কি?

> বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
>
> নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ [বন, ২৮৭, ৮৪]

—বেদ ভিন্ন, স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন; মুনিদের মতেরও মিল দেখা যায় না। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত (দুর্বোধ্য) : সুতরাং মহাজন-নির্দিষ্ট পথই পথ।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥ [বন. ২৮৭. ৮৫]

—হে জলচর বক, যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া স্বীয় গৃহে দিনশেষে শাকান্নও ভোজন করেন, তিনিই সুখী।

যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর কতকগুলি অতি কঠিন প্রশ্নের সমাধান। হিন্দু প্রৌঢ়োক্তিতে এই উত্তরগুলি চিরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মবিষয়ক রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ ভীষ্মপর্বোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কৃষ্ণার্জুন সংবাদে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা এই মহামূল্য উপদেশ গীত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম গীতা। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সূত সঞ্জয় এই অংশ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আঠারটি অধ্যায়ের সমষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইহার অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ দ্বাদশ অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। কেহ কেহ সমগ্র গীতাকেই মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে গীতা তেমন প্রাচীনও নয়। কূট প্রশ্নকে কূট মীমাংসা দ্বারা নিরসন করার চেষ্টা অপেক্ষা বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। গীতা উপনিষৎ; উপনিষদের ভাব ও ভাষার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে; অতএব গীতার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়িত : ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। ভারতীয় জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, ভীষণ মহাসমরের তূর্যনিনাদ মধ্যেই গীতার অমৃতবর্ষী গীতধ্বনি একান্ত সুসঙ্গত : ঝটিকাসঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে গীতা অবিকম্পিত সন্ধানী দীপ। গীতার পরিবেশটিও সুপরিকল্পিত। গীতার অধ্যায়-সংখ্যা অষ্টাদশ, ইহাও গভীর তাৎপর্য-বোধক। ইহা অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের সার। সুতরাং গীতার অধ্যায়-সংখ্যাও যাহা আছে, তাহা হইতে কম নয়।

কুরুক্ষেত্রের প্রত্যাসন্ন মহাসমরের পটভূমিকায় দুই দলের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী [কৌরব-পক্ষে একাদশ ও পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত] মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। সৈন্যদল যুযুৎসু। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, পাণ্ডবগণের পাঞ্চজন্য-দেবদত্তাদি শঙ্খের নির্ঘোষে কৌরব হৃদয় সচকিত। সহসা অর্জুনের বৈক্লব্য উপস্থিত হইল। দুই দলের

মধ্যে রথে অবস্থান করিয়া তিনি নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের এই ভয়ঙ্কর যুযুৎসু মূর্তি দর্শন করিলেন, কুলক্ষয়ের ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া শিহরিত হইলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল, দেহ কাঁপিতে লাগিল, গাণ্ডীব যেন হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। নিতান্ত উৎসাহহীন হইয়া তিনি সারথি কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ, হায় আমরা কি মহাপাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি, রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয়-স্বজন বিনাশে প্রস্তুত হইয়াছি—আমার পক্ষে জীবনধারণ কবা অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর কল্যাণকর। এই বলিয়া অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথের উপর বসিয়া রহিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনেব এই বৈক্লব্য দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন :

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ [গীতা. ২. ৩]

–হে অর্জুন, ক্লীবতা প্রাপ্ত হইত না, এ কাপুরুষতা তোমার উপযুক্ত নয় ; হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

তাহার পব একে একে আবন্ত হইল সাংখ্যযোগ [২য় অধ্যায়], কর্মযোগ [৩য় অধ্যায়], জ্ঞানযোগ [৪র্থ অধ্যায়] কথন। এ জগতে আত্মা অবিনশ্বর, কে কাহাকে মাবে, কে মৃত হয়? জীর্ণবসন ত্যাগ কবিয়া মানুষ যেমন নববস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি দেহী জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ গ্রহণ কবে মাত্র :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নবোহপরাণি।
তথা শবীবাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ [গীতা. ২. ২২]

এইরূপে কৃষ্ণ সাংখ্যের সাব ব্যাখ্যা কবিলেন, কর্মেব প্রশংসা কবিলেন, জ্ঞানালোকে অজ্ঞান বিনষ্ট করিতে বলিলেন। দশম অধ্যায়ে আসিয়া কহিলেন বিভূতিযোগের কথা : ভগবানই সব, অনন্ত বিশ্বে ভগবানের অনন্ত বিভূতি। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ এই অংশ। অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন : অর্জুন দেখিলেন—

অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ [গীতা. ১১ ১০-১২]

—তাঁহার অনেক বক্ত্র, অনেক নয়ন, অনেক অদ্ভুত আকৃতি—অনেক তাঁহার দিব্য আভরণ, অনেক দিব্য আয়ুধ। তিনি দিব্য মাল্যে ও অম্বরে ভূষিত, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। অতি আশ্চর্য এই অনন্ত বিশ্বতোমুখ রূপ। যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের আভা উদিত হয়, তবে সেই দীপ্তির তুল্য হইতে পারে।

গীতা হিন্দুর জীবনবেদ, কর্মের প্রেরণা, ধর্মের মূল, অধ্যাত্ম চিন্তার সার। হিন্দু-জীবনে জ্ঞানে, কর্মেও ভক্তিতে যে আপাত বিরোধ আছে, গীতা তাহার সার্থক সমন্বয়। গীতামতে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' ইহাই জ্ঞানের চরম, 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—ইহাই কর্মের শেষ কথা, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন' —ইহাই ভক্তির সার উপদেশ। গীতার শ্লোকগুলি মধুর অমৃতবর্ষী।

॥ নীতিমূলক কাহিনী ॥

মহাভারতে প্রচুর নীতিকথা—ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ও কামনীতি বিষয়ক কাহিন বিবৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের প্রভাবে ভারতীকথায় এগুলির সংযোজন ঘটিয়াছে পরবর্তীকালে, এগুলি শ্রামণ্য রচনা (Ascetic poetry); কিন্তু ভারতীয় জীবনে 'নীতি' বৌদ্ধদের দান—এ মত গ্রহণীয় নয়। আবহমান কাল হইতে ভারতীয় জীবন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ-প্রবচনের মত এগুলি সাধারণের সম্পত্তি, কোন শ্রেণীবিশেষের নয়; বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, জৈন বা হিন্দু—সকলেই এক সাধারণ ভাণ্ডারের অধমর্ণ।

নীতিকথাগুলির মধ্যে কতকগুলি কথা জীবজন্তু বা জড় প্রকৃতি বিষয়ক—এগুলি রূপক জাতীয় রচনা; আবার কতকগুলি কথা পুরাণাশ্রয়ী বা মানবজীবনাশ্রয়ী। গল্পগুলি অতি প্রাচীন। যে-কোন বক্তা সুযোগ পাইলেই এই সকল যুগ-প্রাচীন কথার দৃষ্টান্ত দিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিতেন। কথাগুলি নীরস বক্তব্যকে সরস করিয়া তুলিত ও বক্তব্যে একটা বিশেষ গুরুত্ব সঞ্চার করিত।

প্রাণীমূলক কাহিনীগুলির ভিতর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কৃণিক-বর্ণিত শৃগাল-ব্যাঘ্র-মূষিক-বৃক-নকুল-কথা [আদি, ১৪১] শিশুপাল-কথিত বৃদ্ধহংস ও ভূলিঙ্গ নাম্নী পক্ষিনীর কথা [সভা. ৪১ ও ৪৪], শান্তি পর্বের দীর্ঘসূত্রী শকুল মৎস্যের উপাখ্যান, লোমশ নামক চতুর বিড়ালের কাহিনী ও গৃধ্র-শৃগাল সংবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত। রাজধর্ম বা আপদ্ধর্ম কথন প্রসঙ্গে এই সকল নীতিকথার অবতারণা করা হইয়াছে। বিচিত্রা

কথার ভাণ্ডার মহাভারতের বনপর্বে, শান্তিপর্বে ও অনুশাসন পর্বে এইরূপ অসংখ্য নীতিকথার প্রসঙ্গ আছে। পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীগুলির মধ্যে বিদুর-বর্ণিত বিরোচন-সুধন্বা সংবাদ [উদ্যোগ. ৩৫] একটি বিখ্যাত কাহিনী। স্বর্ণ ভূমি প্রভৃতির লোভে বা পুত্রের স্বার্থেও মিথ্যাচারণ করা অনুচিত, এই প্রসঙ্গে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কাহিনী বর্ণনা করেন। কেশিনী নাম্নী এক কন্যার স্বয়ম্বর উপলক্ষ্যে দৈত্য বিরোচন ও ব্রাহ্মণ সুধন্বার মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইল—দৈব বড়, না ব্রাহ্মণ বড়। মীমাংসার জন্য উভয়ে বিরোচন-পিতা প্রহ্লাদের কাছে গেলে প্রহ্লাদ নিরপেক্ষভাবে পুত্রের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া সত্য কথা বলিলেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কুন্তী-কথিত বিদুলা উপাখ্যানও [উদ্যোগ. ১২৪] এই পর্য্যায়ের। স্বকর্মদোষে মানুষ ফল ভোগ করিয়া থাকে—এই প্রসঙ্গে শান্তিপর্বে একটি আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। গৌতমী ব্রাহ্মণীর অন্ধের যষ্টির ন্যায় এক পুত্র ছিল। সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। অর্জুনক নামে এক ব্যাধ ঐ সর্পকে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসে। তখন বালকের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী—ইহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, বালকই তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী। শান্তিপর্বে মৃত্যু দেবীর কাহিনীও সুন্দর: ব্রহ্মার নির্দেশে মৃত্যুদেবী জীবের প্রাণহরণের নিষ্ঠুর কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন: জীবের দুঃখে এই মৃত্যুদেবীর অশ্রুই ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। এই কাহিনীতে মৃত্যুদেবীর করুণাঘন রূপটি বড় সুন্দর। স্ত্রীপর্বোক্ত অরণ্য-পথিকের কাহিনীও অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। কণ্টকময় অরণ্যে এক শ্রান্ত পথিক চলিয়াছে আশ্রয়ের আশায়। এমন সময় এক হস্তী ও এক রাক্ষসী তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। পথিক প্রাণভয়ে ছুটিতে গিয়া লতাজালে বদ্ধ হইয়া এক কূপমধ্যে পড়িয়া গেল: লতাজালে পা বদ্ধ হওয়ায় সে হেঁটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিল। কূপের নীচে ছিল এক মহাভয়ঙ্কর সর্প, সে ফণা তুলিয়া পথিককে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এদিকে একদল মৌমাছি পথিককে দংশনে অস্থির করিয়া তুলিল, একটি মূষিক আসিয়া লতাবন্ধন ছিন্ন করিতে লাগিল। মহাভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত পথিক, চতুর্দিকে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু সেই অবস্থাতেও উপরের মধুচক্র হইতে পতিত ফোঁটা ফোঁটা মধুর আস্বাদে সে ভুলিয়া রহিল। ইহা সংসারকূপে নিপতিত মানুষের একটি রূপক।

বিখ্যাত শ্যেন-কপোত ও শিবি রাজার কাহিনীও নীতিকথার অন্তর্ভুক্ত। ইহা শরণাগতরক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহা ছাড়া কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়না, জ্ঞানধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও গৃহধর্ম কথন প্রসঙ্গে বহু নীতিকথা বিবৃত হইয়াছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, মানব-প্রকৃতির গূঢ়ার্থ নির্ণয়ে, রহস্যের ছোঁয়ায়,

জীবনের স্পর্শে ও রূপকাবরণের মহিমায় অনেকগুলি কথা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে শান্তিপর্বোক্ত সরিৎ-সাগর সংবাদটি উল্লেখযোগ্য [শান্তি ১১০]। একদিন সরিৎপতি সাগর নদীকে প্রশ্ন করিলেন, তোমরা স্রোতে বৃক্ষগুলিকে উৎপাটন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাও, কিন্তু বেতলতার কোন ক্ষতি কর না কেন? গঙ্গানদ উত্তর করিলেন। বৃক্ষগুলি পরকে আশ্রয় করে না, নত হয় না বলিয়াই নদী কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু বেতস জলের বেগ আসিতে দেখিয়াই নত হয়; বেগের কাল বুঝে ও আত্মরক্ষার উপায় জানে—এই জন্যই সে বিনষ্ট হয় না। ভীষ্ম এই দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন।

এবমেব যদা বিদ্বান্মন্যতে হতিবলং রিপুম্।
সংশ্রয়েদ্বৈতসীং বৃত্তিমেতৎ প্রজ্ঞান লক্ষণম্॥ [শান্তি. ১১০. ১৪]

—বুদ্ধিমান মানুষ যখন শত্রুকে নিজের অপেক্ষা অধিক বলশালী মনে করিবেন, তখন এইরূপ বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ।

ভারতীয় এই সকল নীতিকথা যে কতকাল ধরিয়া মানুষের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলা দুষ্কর এই কথাগুলিরই সঙ্কলন দেখা যায় পরবর্তী কথাসাহিত্যে—জাতকে, পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে।

॥ মহাভারতীয় চরিত্র ॥

মহাভারত মহৎ চরিত্রের মহাসমুদ্র। সমুদ্রের যেমন সংখ্যাহীন ঊর্মি, কোনটি উন্নত, কোনটি অবনত, কোনটি ফেনোচ্ছ্বাসিত—তেমনি দম্ভ, দর্প, অভিমানিতা ও অতিচারী শক্তির ফেনোচ্ছ্বাসে এখানে কাহারও প্রমত্ত হুঙ্কার; মানবতা, ক্ষমা, দয়া, সত্যের অপার মহিমায় কাহারও সুগম্ভীর সমুন্নতি।

সকল চরিত্রের পুরোভাগে আছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ। তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ মানব। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অর্ঘদানের প্রশ্ন উঠিলে ভীষ্ম অমন্যত তদা কৃষ্ণমর্হনীয়তমং ভুবি'—ভূমণ্ডলে কৃষ্ণকেই পূজ্যতম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন [সভা ৩.]। বস্তুতঃ জ্যোতিষ্কমণ্ডলে যেমন সূর্য ভূমণ্ডলে তেমনি কৃষ্ণ। পুরাণের কৃষ্ণ, মহাভারতে তিনি সর্বনীতিকুশল কর্মী কৃষ্ণ। অবশ্য মহাভারতেও তাঁহার ভগবত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই পরম পুরুষ—'আদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ'—বিশ্বের যত বিভূতি, তাঁহারই অংশ—তিনিই বিশ্বরূপ। তথাপি মহাভারতে কৃষ্ণের ভূমিকা প্রধানতঃ ধার্মিক নীতি কুশলী মানবের ভূমিকা। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনিই অগ্রণী,

ধর্মযুদ্ধে তিনিই প্রধান সহায়। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ ধর্মযুদ্ধের আহ্বান, কৃষ্ণের উপদেশ বিপদে বল, অবসাদে প্রেরণা।

মহাভারতের আর একটি গৌরবময় চরিত্র 'ভীষ্ম'। ভীষ্ম শাপভ্রষ্ট দ্যু নামক বসু; শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন; তাই তাঁহার নাম দেবব্রত ও গাঙ্গেয়। পিতার জন্য তিনি কঠিন সত্য করিয়াছিলেন, বিমাতা সত্যবতীর যে সন্তান হইবে, সেই হইবে আমাদের রাজা ['যোঽস্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি'—আদি ৯৪.৮৭]; দাসরাজের নিকট আরও ভীষণতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'অদ্য প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি'—আজ হইতে ব্রহ্মচর্য আমার অবলম্বনীয় হইবে। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আকাশ হইতে অপ্সরা, দেবতা ও পিতৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইঁহার নাম হইল ভীষ্ম। শান্তনু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন 'স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে' [আদি ৯৪]। সার্থক ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, দার পরিগ্রহ করেন নাই। ভ্রাতাদের জন্য তিনি কাশীরাজদুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বীর্যশুল্কে হরণ করিয়া আনিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের এই কার্যে অম্বার নারীত্ব আহত হইয়াছিল; ইহার পরিণাম শিখণ্ডীরূপে অম্বার জন্ম। এই শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের কারণ। ভীষ্মের কয়েকটি কর্ম অত্যন্ত দুর্বোধ্য—১. কৌরবসভায় দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার সময় ভীষ্মের নিষ্ক্রিয়তা এবং ২. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার কৌরব পক্ষে অংশ গ্রহণ। রাজসভায় দ্রৌপদীর অতি কাতর প্রার্থনার উত্তরে ভীষ্ম শুধু বলিয়াছেন, 'ন শক্নোমি বিবেক্তুমেতৎ'—আমি যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না; দ্রৌপদী যখন বলিলেন, কৌরবগণ আপনারা বলুন, আমি জিতা না অজিতা? ভীষ্ম তখনও বলিতেছেন:

> উক্তবানস্মি কল্যাণি ধর্মস্য পরমা গতিঃ।
> লোকে ন শক্যতে জ্ঞাতুমপি বিজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ॥ [সভা. ৬৬. ১১]

—হে কল্যাণি, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, জগতে ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বিজ্ঞ লোকেরাও বুঝিতে পারেন না।

ভীষ্মের পতন ভাগ্যের পরিহাস। শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুন তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতেও দৈববাণী হইল, হে মহাধনুর্ধর যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করিলেন। অর্জুনের বিষমবাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তিনি রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহে অসংখ্য শর বিদ্ধ হইয়াছিল,

এইজন্য রথ হইতে পতিত হইলেও তাঁহার দেহ ভূতল স্পর্শ করিল না। তিনি শরশয্যায় শায়িত হইলেন এবং উত্তরায়ণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইচ্ছামৃত্যু বর বলে জীবিত রহিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শান্তিপর্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে ধর্মকথা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও প্রত্যেক হিন্দুর শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে শক্তি, জীবনে মহতী প্রেরণা। মহাভারতের কথায় বলা যায়,—ভারতগণ-পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীষ্ম ছিলেন,—

বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা ক্ষময়া পৃথিবীসমম্।
সমুদ্রমিব গাম্ভীর্যে হিমবন্তমিবস্থিরম্॥
প্রজাপতিমিবৌদার্যে তেজসা ভাস্করোপমম্।
মহেন্দ্রমিব শত্রূণাং ধ্বংসনং শরবৃষ্টিভিঃ॥ [উদ্যোগ. ১৪৬. ২-৩]

'ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী'—মন্যুময় দুর্যোধন-মহাবৃক্ষের মূল। মাতার দোষে ও ঋষির শাপে তিনি জন্মান্ধ, কিন্তু 'দীর্ঘবাহুর্মহাতেজাঃ'—দেহে দশহাজার হস্তীর বল ['নাগাযুত-সমপ্রাণঃ']। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ হইয়াও অন্ধতাবশতঃ তিনি রাজ্যলাভ করেন নাই। গান্ধাররাজনন্দিনী গান্ধারী তাঁহার পত্নী। এই গান্ধারী হইতে তাঁহার শত পুত্র লাভ হয়—তন্মধ্যে প্রধান দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহান্ধ ['পুত্রস্নেহসমন্বিত'] ধৃতরাষ্ট্রের যত দুষ্কর্ম পুত্রস্নেহ বশে। পাণ্ডুপুত্রগণকে তেজস্বী ও উন্নত হইতে দেখিয়া তিনি অসূয়াপরবশ হইয়াছিলেন। এই সময় মন্ত্রী কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে যে কূটনীতি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের জীবন-নীতি [আদি. ১৩৫]; সমগ্রজীবনে ধৃতরাষ্ট্র এই নীতি দ্বারা চালিত হইয়াছেন। কণিক বলিয়াছিলেন,

১. শপথেনাপ্যরিং হন্যাদর্থদানেন বা পুনঃ।
বিষেণ মায়য়া বাপি নোপেক্ষেত কথঞ্চন॥ [আদি. ১৩৫. ৫৩]

—শপথ, ধনদান, বিষ বা মায়া প্রয়োগে শত্রুকে বিনষ্ট করিবে, কখনও উপেক্ষা করিবে না।

২. প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ॥ [আদি. ১৩৫. ৫৬]

—যাহাকে প্রহার করিতে হইবে, বা যাহাকে প্রহার করা হইতেছে, তাহাকে প্রিয় কথা বলিবে; প্রহার করিয়া শোক প্রকাশ করিবে, দয়া দেখাইবে এবং কাঁদিবে।

৩. সুপুষ্পিতঃ স্যাদফলঃ ফলবান্ স্যাদ্দুরারুহঃ।
আম স্যাৎ পক্কসঙ্কাশো ন চ জীর্য্যেত কর্হিচিৎ ॥ [আদি. ১৩৫. ৬৮]
—'ফুল দেখাইবে, কিন্তু ফল দিবে না; ফল দিলেও দুরারোহ করিবে, এবং অপক্ক হইয়া পক্কের মত থাকিবে; কখনও জীর্ণ হইবে না।' [অনু- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ]।

ধৃতরাষ্ট্রের জীবনে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতিটি কাজে তিনি 'দ্বিধাচিত্তঃ'। তাঁহার অন্তরে অসূয়া, বাইরে ধর্মভাব। ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের সহিত তিনি পরামর্শ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। মুখে ধর্মকথা, কার্যতঃ পাণ্ডবের অনিষ্ট-চিন্তা। তিনি গান্ধারীকেও ছলনা করিয়াছেন। গান্ধারীর আবেদনের ফল দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়া। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের বহির্বিম্ব দুর্যোধন। তাই পুত্রের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ। স্নেহবশতঃ দুর্যোধনের সমস্ত কর্মকে তিনি সমর্থন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র একদিকে ধারযুক্ত অসির ন্যায় কেবল আপন বুদ্ধি দ্বারাই কার্য করিতেন, প্রায়ই অসৎ লোকের পরামর্শ লইতেন। তিনি শুধু জন্মান্ধ ছিলেন না, জ্ঞানান্ধ ছিলেন। পরিণাম জানিয়াও যে দুষ্কার্যে তাঁহার সমর্থন ছিল, তাহার প্রমাণ 'যদাশ্রৌষং...তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়' উক্তিগুলি [আদি. ১]। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ অতি করুণ: শতপুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি 'বাতাহত ইব দ্রুম' ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন [স্ত্রীপর্ব. ১]। অগ্নিদাহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে প্রথম তিন পাণ্ডব তিন রসের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। যুধিষ্ঠির শান্ত রসের, ভীম রৌদ্ররসের এবং অর্জুন বীররসের। বিপুল ধর্মদ্রুমের তাঁহারা এক একটি অঙ্গ। মহাভারতের অতি ভয়ঙ্কর আবর্তে যুধিষ্ঠির চিরস্থির ও শান্ত। সার্থক তাঁহার ধর্মরাজ নাম। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম ও গহীন—এই সূক্ষ্ম গহীন ধর্মপথের পথিক যুধিষ্ঠির। তাই তিনি সশরীরে স্বর্গ গমনের একাধিকারী।

ভীমের রৌদ্র মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। অগ্রজকে তিনি অমান্য করেন নাই, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন। কৃষ্ণার অপমানে সভাপর্বে ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ বিস্ফুরিত হইল, করে কর নিষ্পেষণ করিয়া মহাস্বনে তিনি বলিতে লাগিলেন:

অস্য পাপস্য দুর্বুদ্ধের্ভারতাপসদস্য চ
ন পিবেয়ং বলাদ্বক্ষো ভিত্ত্বা চেদ্রুধিরং যুধি।
যদ্যেতদেবমুক্ত্বাহং নকুর্য্যাং পৃথিবীশ্বরাঃ
পিতামহানাং সর্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুয়াম্ ॥

—ভারত কুলের এই পাপের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যদি রণক্ষেত্রে ইহার রক্ত পান না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যেন পিতৃ পিতামহের গতি লাভ না করি।

দুঃশাসনের বক্ষোরক্তে দ্রৌপদীর বেণী-সংহার ভীমের মহাভয়ঙ্কর রৌদ্রকর্ম।

তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন কৃষ্ণের সখা। অর্জুন ও কৃষ্ণ,—নর ও নারায়ণ —এই দু'য়ে মিলিয়া পূর্ণ শক্তি। সঞ্জয় বলিয়াছিলেন :

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ [গীতা. ১৮. ৭৮]

—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ বর্তমান, সেইখানেই রাজ্যশ্রী, অভ্যুদয়, বিজয় ও ধ্রুবা নীতি বিরাজমান,—ইহাই আমার অভিমত।

উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্জুনের দেহবল ও মনোবল বিশ্ববিশ্রুত। তিনি বীর, প্রেমিক, জিতকাম, যোগ ও ভোগের একাদর্শ। কীরাতবেশী মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তিনিই পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, স্বর্গপরী উর্বশীর প্রলোভন হেলায় জয় করিয়াছেন এবং মৎস্যভেদ করিয়া যাজ্ঞসেনীকে তিনিই পাণ্ডবদের জন্য জয় করিয়াছেন। অর্জুনের প্রেমিক মূর্তিটিও স্মরণযোগ্য। তিনি দ্রৌপদীপ্রিয়; আবার সুভদ্রা, উলুপী ও চিত্রাঙ্গদারও ধ্যেয়। কুরুক্ষেত্রের মহাহবে ভগবানের গীতা তাঁহার উদ্দেশ্যেই গীত হইয়াছিল। মহাভারতীয় জীবনগুলির মধ্যে অর্জুনের জীবনই সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল —কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান জয়গৌরব তাঁহারই। মহাপ্রস্থানিক পর্বে এই অর্জুনের পতন অতি করুণ। দয়ায়, ধর্মে, শরণাগতরক্ষণে ও বিক্রমে তাঁহার সমান কে? তথাপি তাঁহার পতন হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'অবমেনে ধনুর্গ্রাহানেষ সর্বাংশ্চ ফাল্গুনঃ' [মহাপ্র. ২]—ফাল্গুনী অন্যান্য ধানুকীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। বীরত্বের এই অহঙ্কারই অর্জুনের পতনের কারণ। ধর্ম সামান্য স্খলনকেও ক্ষমা করে না,—অর্জুনের মধ্য দিয়া ইহাই মহাভারতের শিক্ষা।

অন্যান্য পুরুষচরিত্রের মধ্যে দুর্যোধন ও কর্ণ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দুর্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ :

অল্পবুদ্ধিরহঙ্কারী নিত্যং যুদ্ধমিতি ব্রুবন্।
ক্রূরো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ বীর্যবান্॥ [স্ত্রী ১. ২৮]

—তিনি অল্পবুদ্ধি, অভিমানী, ক্রূর, অসহিষ্ণু, নিত্য অতৃপ্ত ও বলবান্; সর্বদা বলিতেন, যুদ্ধ চাই।

দুর্যোধনের অতিস্পর্দ্ধী, অসহিষ্ণু মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাণ্ডবদের

প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ। ছলে, বলে, কৌশলে পাণ্ডবদিগকে অপমানিত ও নির্জিত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। কর্ণের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি দেখিয়া অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তিনি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করেন। দুর্যোধনের প্রায় সকল কর্মই দুষ্কর্ম। জতুগৃহদাহ, রাজসভায় কৃষ্ণার অপমান, মানী ব্যক্তির প্রতি দুঃসহ স্পর্ধিত দুর্বাক্য দুর্যোধনের অপকর্মের পরিচয়। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়—রাজা দুর্যোধন একক। তাঁহার রাজনীতি দ্বিতীয় রহিত। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলিয়াছিলেন :

অহং হি পাণ্ডবান্ হত্বা প্রশাস্তা পৃথিবীমিমাম্।
মাং বা হত্বা পাণ্ডুপুত্রাঃ ভোক্তারঃ পৃথিবীমিমাম্॥ [উদ্যোগ ৫৭]

—হয় আমি পাণ্ডবদের হত্যা করিয়া পৃথিবী শাসন করিব, নয় পাণ্ডুপুত্রগণ আমাকে নিহত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে।

দুর্যোধনের দম্ভ রাজসিক, পরশ্রীকাতরতাও রাজসিক। উদ্যোগপর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, এমন কি কৃষ্ণ পর্যন্ত পাণ্ডবদের রাজ্য দান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্যোধনের এক উক্তি, 'সমর্থাঃ স্ম পরান্ জেতুং বলিনঃ সমরে বিভো'। কৃষ্ণকে তিনি বলিয়াছেন :

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমে র্নঃ পাণ্ডবান্প্রতি॥ [উদ্যোগ, ১২৮]

—সূক্ষ্ম সূচির অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি ধরে, তাহাও পাণ্ডবদের দিব না।

এই দুর্যোধনের পরিণাম অতি ভয়াবহ। দ্বৈপায়ন হ্রদে স্তম্ভিত জলে দুর্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ মদশক্তির স্তম্ভিত পরিণাম। ভগ্ন উরু, রক্তাক্ত দুর্যোধনের চিত্র আরও শোচনীয়। হ্রদতীরে সন্ধ্যার আবির্ভাব অতিদর্পের অবসানসূচক। এই মহাপতন-কালেও দুর্যোধনের গর্বোক্তি :

উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্ট্যা যুযুৎসতা।
দিষ্ট্যা চাস্মি হতো যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ॥ [সৌপ্তিক, ২]

—আমার ভাগ্য আমি নিত্য উৎসাহ লইয়াই যুদ্ধ করিয়াছি; আমার ভাগ্য জ্ঞাতিবান্ধব নিহত হইলে আমি নিহত হইয়াছি।

মহাভারতে দীপ্ত পুরুষকারের প্রতিমূর্তি কর্ণ। আদিপর্বের অস্ত্ররঙ্গশালায় এই মূর্তির আবির্ভাব অতীব বিস্ময়কর। অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন প্রায় শেষ হইয়াছে, বাদ্যধ্বনি মন্দীভূত, সহসা বজ্রাঘাত শব্দের ন্যায় গুরু বাহ্বাস্ফোট শ্রুত হইল, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, পরপুরঞ্জয় কর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতেছেন :

সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলোদ্যোতিতাননঃ।
সধনুর্বদ্ধ নিস্ত্রিংশঃ পাদচারীব পর্বতঃ॥ [আদি. ১৩১]

—তিনি সহজ কবচধারী, কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত আনন : ধনু ও তরবারিসহ তিনি যেন এক সচল পাদচারী পর্বত।

কিন্তু সৌরদীপ্ত এই পুরুষ দৈব দ্বারা অভিতপ্ত। কুন্তীপুত্র হইয়াও তিনি সূতপুত্র নামে পরিচিত, আজন্ম মাতৃপরিত্যক্ত ও মাতৃস্নেহবঞ্চিত। রঙ্গস্থলে সকলে যখন তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন, তখন কর্ণের মুখ লজ্জায় আরক্ত 'বভৌবর্ষাম্বু বিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা'। সূতপুত্র জানিয়া ভীম ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া'—ওহে, তুমি শীঘ্র তোমার কুলের যা কাজ তাই কর, কশা হাতে নাও। আর এক চিত্র দ্রুপদসভায় লক্ষ্যভেদের দৃশ্য। ভারতের গণ্যমান্য রাজন্য-বর্গের সম্মুখে কর্ণ লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় দ্রৌপদী বলিয়া উঠিলেন, 'নাহং বরয়ামি সূতম্'। এ লজ্জা কর্ণ হাসি দ্বারা ঢাকিতে চাহিয়াছেন, সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কম্পিত করে ধনু ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ এই কর্ণ ছিলেন দাতা ও রথিশ্রেষ্ঠ। পূর্বে কর্ণের নাম ছিল বসুষেণ। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি কর্ণ ছেদ করিয়া সহজ কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম হয় কর্ণ বা বৈকর্তন। জীবনে তিনি 'দিব' এই কথাই বলিয়াছেন, প্রার্থীকে কখনও 'নাই' বলেন নাই —'দদানীত্যেব যোঽবোচন্ন নাস্তীত্যর্থিতোঽর্থিভিঃ'। বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন,

বৃষো মহেন্দ্রো দেবেষু বৃষঃ কর্ণো নরেষ্বপি।
তৃতীয়মন্যং লোকেষু বৃষং নৈবানুশুশ্রুম॥ [কর্ণ. ৬]

—দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ; অপর কোন শ্রেষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির নাম শুনি নাই।

বস্তুতঃ কর্ণ ছিলেন 'সিংহখেলগতি ধীমান্ ঘৃণী দাতা যতব্রতঃ' [শান্তি. ১]—সিংহের মত সখেলগতি, ধীমান, দয়ালু, দাতা ও যতাত্মা। কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধন সংসর্গে তিনিও দুর্মতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নানারূপ অধর্ম কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে কর্ণ ধর্মের দোহাই দিলে কৃষ্ণ যুক্তি-যুক্তভাবে এই পাপ কর্মগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, দুর্যোধন তোমারই পরামর্শে বিষ প্রয়োগে ভীমকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, দ্যূতসভায় তুমিই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নির্দেশ দিয়াছিলে, সপ্তরথী মিলিত হইয়া বালক অভিমন্যুকে নিহত করিয়াছিলে, হে রাধেয়, 'ক্ব তে ধর্মস্তদা গতঃ'—সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল? কর্ণ এ অভিযোগের উত্তর দিতে

পারেন নাই, 'লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্' [কর্ণ. ৬৬]। কর্ণ দুষ্কর্মে রত হইলেও সত্যনিষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোদ্যোগ পর্বে কুন্তী যেদিন মাতৃস্নেহ ও কর্তৃত্বের প্রলোভন লইয়া কর্ণের নিকট আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, সেদিনও সত্যপরায়ণ কর্ণ অবিচলিত চিত্তে এই কথাই বলিয়াছিলেন,

সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্।

অহং বৈ ধার্তরাষ্ট্রাণাং কুর্যাং তদফলং কথম্॥ [উদ্যোগ. ১৩৬]

—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার সুখের জন্য আমাকে অভীষ্ট বস্তু দিয়াছেন, আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, আমি কি তাঁহাদের এই পূজা নিষ্ফল করিতে পারি? কৃষ্ণকে তিনি বলিয়াছিলেন,

মৎস্নেহাচ্চৈব রাধায়াঃ সদ্যঃ ক্ষীরমবাস্রবৎ।...

তস্যাঃ পিণ্ডব্যপনয়ং কুর্যাদস্মদ্বিধঃ কথম্॥ [উদ্যোগ. ১৩২]

—আমার প্রতি স্নেহবশতঃ রাধার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছিল...আমার মত লোক কি করিয়া সেই রাধার পিণ্ডলোপ করিতে পারে?

কর্ণের সমগ্র জীবনই দৈবাভিভপ্ত। মৃত্যুকালের দৃশ্য অতি করুণ। পরশুরামের অভিশাপে তিনি ব্রহ্ম অস্ত্রের সন্ধানমন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন। মেদিনী রথচক্র গ্রাস করিয়াছে, তিনি প্রাণপণে রথচক্র উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নিষেধ ও অনুনয় সত্ত্বেও অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্রোধে তাঁহার নয়নে অশ্রুপাত হইতেছে। এই অবস্থায় অর্জুনের মহাবাণে কর্ণের মস্তক ছিন্ন হইল :

তদুদ্যদাদিত্য সমান বর্চ্চসং

শরন্নভোমধ্যগ ভাস্করোপমম্।

বরাঙ্গমুর্ব্যামপতচ্চমূপতে-

র্দিবাকরো হস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ॥ [কর্ণ ৬৬]

—রক্ত মণ্ডল সূর্য যেমন অস্ত পর্বত হইতে পতিত হয়, উদয়-সূর্যের মত তেজস্বী, শরৎ মধ্যাহ্নের ভাস্করের মত প্রচণ্ড সেনাপতি কর্ণের মস্তকও তেমনি ভূতলে পতিত হইল।

কর্ণের খণ্ডিত দেহ হইতে একটি তেজ নির্গত হইয়া সূর্যমণ্ডলে মিলাইয়া গেল। যেন মর্ত্যের আদিত্য-তেজ স্বর্গীয় আদিত্যে বিলীন হইল।

মহাভারতের স্ত্রী চরিত্রগুলিও অপূর্ব। প্রথমেই মনে পড়ে দেবী গান্ধারীর কথা।

পতিব্রতা মহাভাগা সমান ব্রতচারিণী।

উগ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী॥ [স্ত্রী. ১৬]

ইনি গান্ধাররাজ সুবল-নন্দিনী। অন্ধ রাজার সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া পতিব্রত-পরায়ণা গান্ধারী পট্টবস্ত্র দ্বারা নিজচক্ষু আবৃত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী গান্ধারী শতপুত্রের জননী; কিন্তু জীবনে তিনি অসুখী। গান্ধারী ধর্ম-দর্শিনী। অথচ যে পক্ষের তিনি মহিষী ও মাতা, সে পক্ষ অধর্মাচারী। স্বামী পুত্র, ভ্রাতা—সকলেই অধর্মের পোষক। যেদিন রাজসভায় পুত্রেরা রজঃস্বলা দ্রৌপদীর প্রতি জঘন্য অত্যাচার করিল, সেদিন এই 'মহাপ্রাজ্ঞা' ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইলেন, হে রাজন্, মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণকে প্রশ্রয় দিবেন না, 'মা বালানামশিষ্টানামভ্যুপমংস্থা মতিং প্রভো'; আপনি বংশনাশের কারণ হইবেন না, 'মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি'; আমি বলিতেছি, এই কুলপাংসন পুত্রকে ত্যাগ করুন, 'তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ' [সভা. ৭২] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসন্ন সঙ্কটে তিনি যেমন একদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুযোগ করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে উৎপথগামী পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

> ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্মার্থৌ কুতঃ সুখম্।
> ন চাপি বিজয়ং নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ॥ [উদ্যোগ. ১২০]

> —হে পুত্র, যুদ্ধে কল্যাণ নাই, ধর্ম নাই, অর্থলাভের প্রত্যাশা নাই; সুখও নাই; ইহাতে জয়েরও স্থিরতা নাই। সুতরাং যুদ্ধে মন দিও না।

কিন্তু মনস্বিনী মাতার কথায় পুত্র কর্ণপাত করে নাই। প্রতিদিন যুদ্ধে যাইবার পূর্বে মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া দুর্যোধন বলিত, 'অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্ব ব্রবীতু মে'। গান্ধারী শুধু বলিতেন, 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ'। তিনি এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণাম জানিতেন। স্ত্রীপর্বে শোকাকুলা গান্ধারীর মূর্তি অতি করুণ। তাঁহার শত পুত্র নিহত, নয়নে অশ্রু-উচ্ছ্বাস। কৃষ্ণকে তিনি অভিসম্পাত করিয়াছেন। তথাপি ইহারই ভিতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আধার গান্ধারী অভিতপ্তা কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, 'অবশ্যম্ভাবী সম্প্রাপ্তঃ'—যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, 'মন্যে লোকবিনাশোঽয়ং কালপর্যায় চোদিতঃ'। এই ধর্মদৃষ্টিই গান্ধারীর শোকে সান্ত্বনা।

পৃথা কুন্তীর চরিত্রও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। পাণ্ডুমাতা হইয়াও তিনি জীবনে দুঃখী। পুত্রদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার তেজস্বিতাও অসাধারণ। যুদ্ধপ্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ পরিবেশন করিয়া তিনি পুত্রকে তিন্দুককাষ্ঠের মত জ্বলিয়া উঠিতে বলিয়াছেন,

> যুধ্যস্ব রাজধর্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।
> মা গমঃ ক্ষীণপুণ্যস্ত্বং সানুজঃ পাপিকাং গতিম্॥ [উদ্যোগ. ১২৩]

—রাজধর্মানুসারে যুদ্ধ কর, পিতৃপিতামহের নাম ডুবাইও না, ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত পাপগতি প্রাপ্ত হইও না।

কুন্তী-চরিত্রের একটি রহস্যময় অধ্যায় কর্ণের জন্ম। কর্ণ কুন্তীর কুমারী-জীবনের কলঙ্ক, প্রথম মাতৃত্বের সুধাস্পর্শ। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে এই পুত্রকে জন্মমাত্র মঞ্জুষায় ভরিয়া তিনি জলে বিসর্জন দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের প্রাক্কালে তিনি এই গোপন তথ্য কর্ণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন,

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।
নাসি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ তদ্বিদ্ধি মে বচঃ॥ [উদ্যোগ. ১৩৫]

—তুমি রাধেয় নও, অধিরথও তোমার পিতা নন। হে কর্ণ, আমার কথা শুন, তুমি সূতকুলে জাত নও, তুমি কুন্তীপুত্র।

কুন্তী প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন। তিনি কর্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'অনাময়ং স্বস্তি চেতি।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে মহাকবি কর্ণের জন্য কুন্তীর শোকের কোন চিত্র উদ্ঘাটন করেন নাই। স্ত্রীপর্বে কুন্তী যে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, তাহাও যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণের দীর্ঘ অদর্শনের জন্য। কর্ণের জন্য নয়। কি দুঃসহ শোক তাঁহার হৃদয়ে ছিল, বুঝা যায় তখন, যখন মৃতের তর্পণ করিবার জন্য পাণ্ডুপুত্রগণ গঙ্গায় অবতরণ করিয়াছেন। কুন্তী সহসা শোকে আকুল হইয়া বাষ্প গদগদকণ্ঠে পুত্রগণকে বলিলেন,

কর্ণস্য সত্যসন্ধস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ॥ [স্ত্রী. ১]

কর্ণের জন্মকথা গোপন করিবার জন্য যুধিষ্ঠির মাতাকে তীব্র অনুযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মর্মাহতা কুন্তী তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

মহাভারতের আর একটি বিস্ময়কর স্ত্রীচরিত্র যজ্ঞ-সমুত্থিতা, কৃষ্ণকুটিলকুন্তলা দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী। সমগ্র মহাভারতীয় জীবন তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিতপ্ত। দ্রৌপদী শ্যামা স্ত্রী। অপূর্ব সুন্দরী। 'নৈব হ্রস্বা ন মহতী নাতি কৃষ্ণা ন রোহিণী'; তাঁহার রূপ চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, সূর্যের মত দীপ্ত—ক্রোশব্যাপী তাঁহার অঙ্গগন্ধ ['যস্যা রূপং সোমসূর্যপ্রকাশং গন্ধশ্চাস্যাঃ ক্রোশমাত্রাৎ প্রবাতি'—আদি ১৯০]। যজ্ঞবেদী হইতে উত্থিতা বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'যাজ্ঞসেনী'। দ্রৌপদীই ভারত-সমরের অরণি। রাজকন্যা ও রাজবধূ হইয়াও তিনি ভৃশদুঃখিতা। বিবাহলগ্ন হইতেই এই দুঃখ। স্বয়ম্বর সভায় এক বীরের কণ্ঠে তিনি বরমাল্য অর্পণ করিলেন, কিন্তু ভাগ্যের লিখনে তিনি হইলেন পঞ্চস্বামীর পত্নী। রাজসূয় যজ্ঞের আনন্দ-

মহোৎসব শেষ হইতে না হইতে তিনি দ্যূতপণে পণ্যা হইলেন, রজঃস্বলা অবস্থায় অগণিত রাজন্যবর্গের সম্মুখে লাঞ্ছিতা হইলেন, তারপর একবস্ত্রা মুক্তকেশী দ্রৌপদী স্বামীদের সঙ্গে বনবাস বরণ করিলেন। সামান্য বনবাস অন্তে অজ্ঞাতবাসের দুঃখনিশি সমাগত হইল, রাজরাজেশ্বরী হইলেন বিরাট-গৃহের সৈরিন্ধ্রী। দ্রৌপদীর দুঃখের শেষ কোথায়? জীবনভর দ্রৌপদী মর্মে যে বহ্নিজ্বালা বহন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের শোণিত-তর্পণে তাহার শেষ পূর্ণাহুতি।

দ্রৌপদী অপূর্ব তেজস্বিনী ও নয়কুশলা। কৌরব দ্যূতসভায় দ্যূতে তিনি জিতা না অজিতা—এ নীতির প্রশ্নে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও ধর্মবিদ্‌গণের কণ্ঠ নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছিল। তখনকার তেজোদৃপ্ত মূর্তিটিও অবিস্মরণীয়। পঞ্চপতি পণে বদ্ধ, দ্রৌপদী অসহায়া। সেই অবস্থায় দুঃশাসনের প্রতি তাঁহার ক্রুদ্ধ গর্জন, 'নৃশংসকর্মন্ ত্বমনার্যবৃত্ত', রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে তাঁহার ধিক্কার, 'ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্মস্তথা', 'ক নু ধর্মো মহীক্ষিতাম্'—তেজস্বিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা' দ্রৌপদীর আর এক মূর্তি দ্বৈতবনে। যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ও অমন্যু দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, স্বামীকে অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দুঃখার্হং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যু র্নবর্ধতে', 'ধ্যায়ন্তমর্জুনং দৃষ্টা কস্মাদ্ রাজন্ ন কুপ্যসি', 'মাং বৈ বনগতাং দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব। সুতীব্র শ্লেষে তিনি কহিলেন,

> ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্।
> তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ॥ [বন. ২৪]

—লোকে বলে ক্ষত্রিয় ক্রোধশূন্য হয় না, হে মহারাজ, আজ আপনাতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।

এই তেজস্বিনী মনস্বিনী মহিলার আর এক ক্ষুভিত চিত্র দেখা যায় উপপ্লব্য নগরে। যুদ্ধের উদ্যোগ প্রায় সমাপ্ত। এমন সময় যুদ্ধবিরতির দৌত্য লইয়া কৃষ্ণ যাইতেছেন হস্তীনাপুরে। সহদেব ও সাত্যকি ব্যতীত অপর সকলেই শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী। এই সময়ে আসিলেন দ্রৌপদী 'অসিতা আয়তমূর্দ্ধজা', 'অশ্রু পূর্ণেক্ষণা'। প্রথমে তিনি বলিলেন, হে কৃষ্ণ, সাম-দান দ্বারা যে শত্রু বশীভূত হয় না, জীবিতার্থীর উচিত তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা। ক্রমে কণ্ঠ উচ্চতর হইল। নিজ গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়া তিনি বলিলেন, হে কেশব, আমার মত ভাগ্যবতী কে ['কা তু সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব!']; আমি দ্রুপদ রাজার নন্দিনী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, আপনার 'প্রিয় সখী' আর ইন্দ্রতুল্য পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। সেই আমি কেশাকৃষ্টা হইয়াছি, 'দাসীভূতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা'। মুহূর্তে গর্ব যেন গর্জন করিয়া উঠিল,

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্ বলম্।
যত্র দুর্যোধন কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি ॥ [উদ্যোগ. ৭৬]

তারপর সেই কৃষ্ণা কৃষ্ণকুটিল, অসংবৃত, মহাসর্পের ন্যায় কান্তিযুক্ত কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া অশ্রুকণ্ঠে কৃষ্ণকে বলিলেন,

অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুশাসনকরোদ্ধৃত।
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা॥ [উদ্যোগ. ৭৬]

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, সন্ধি করিবার সময় দুঃশাসনকরধৃত এই কেশের কথা মনে রাখিবেন। বলিতে বলিতে কৃষ্ণার নয়নে অত্যুষ্ণ ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

দ্রৌপদীর এই অশ্রুসিক্তা ক্ষুভিতা মূর্তিই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অরণি।

মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র পাষাণরেখার মত স্পষ্ট ও জীবন্ত। মুখ্য চরিত্রগুলির তো কথাই নাই, শকুনি, বিকর্ণ, অভিমন্যু, উত্তর ও উত্তরা, সুদেষ্ণা, সুভদ্রা, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, বভ্রুবাহন প্রভৃতি গৌণ চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল। চরিত্র-চিত্রনে ব্যাসদেব অদ্বিতীয়।

৫. মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য

মহাভারত ইতিহাস। মহাভারতেও মহাভারতকে ইতিহাসই বলা হইয়াছে: 'ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ' [আদি, ১. ৫৪], 'জয়োনামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা' [আদি, ৫৭. ২০]। কিন্তু এই ইতিহাস লোকপালগণের কর্মের ইতিহাস মাত্র নয়, মর্মের ইতিহাস। এইখানেই মহাভারতের কাব্যত্ব। উপরন্তু এই ইতিহাস, 'অলঙ্কৃতং শুভৈঃ শব্দৈঃ'—সুন্দর শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত, 'ছন্দোবৃত্তৈশ্চ বিবিধৈরন্বিতম্'—নানাবিধ ছন্দে অন্বিত [আদি, ১. ২৮] এবং ইহার বিষয় ও উপাখ্যান অতি আশ্চর্য—'বিচিত্রার্থপদাখ্যানম্' [আদি, ২. ৩৫]। নিপুণ কবি ব্যাসদেবের 'মনঃসাগর সম্ভূত' এই যে মহৎ আখ্যান, ইহার রসসিদ্ধিও সন্দেহাতীত। আচার্য আনন্দবর্ধন এবং লোচনকার অভিনব গুপ্ত উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন, মহাভারত অপূর্ব শান্তরসাত্মক কাব্য।[১] বিপুলা শান্তিই মহাভারতের রসধ্বনি। 'বিপুল মহাভারত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পর্বের পর পর্ব পড়িয়া চলিয়াছি, কত রাজা, কত ঋষি, কত মানব, কত মহামানব, কত তুচ্ছ বা বৃহৎ ঘটনা, কত ব্যক্তি, কত জাতি, কত জীবন, কত যুদ্ধ, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব,

১। মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসান বৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তোরসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষা বিষয়ত্বেন সূচিতঃ—ধ্বন্যালোক. ৪. ৫

মহাপ্রস্থান পর্ব—সহস্র ঘটনার অজস্র ঝংকার উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলই মনের তলায় পড়িয়া যাইতে লাগিল; জগৎ ও জীবন কিছু মনে রহিল না। ধ্বনি উঠিতে লাগিল শান্তি শান্তি—বিপুল বৈরাগ্য, কঠিন কর্তব্য, দুঃখ, শোক, দম্ভ, দ্বন্দ্ব, বঞ্চনা, সংঘর্ষ, উল্লাস ও অবসাদ, মৃত্যু ও শুদ্ধতা, সব অতিক্রম করিয়া স্থিতি ও গতি। শান্তি, শান্তি! ইহাই মহাভারতের ধ্বনি'।[১] রবীন্দ্রনাথও মহাভারতের কাব্যত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, মহাভারত 'একটি বিরাট গানে' এক ভীষণা শান্তির ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে:

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ
সকল আশার বিষাদ মহান্
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির-মানবের প্রাণে। [সোনার তরী, পুরস্কার]

মহাভারত সত্যই অপূর্ব কাব্য। যে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শোক, ঘৃণা, হাস্য ও উৎসাহ উদ্দীপিত হয়, যাহা পাঠ করিতে কারতে মুহূর্তে হর্ষ, দুঃখ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, নির্বেদ উপস্থিত হয়—তাহা শুধু কাব্য নয়, মহৎ কাব্য। রামায়ণ যেমন মহাকাব্য, মহাভারতও তেমনি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের গৌরব ইহার কাহিনী, (ii) ইহার চরিত্র এবং (iii) ইহার বর্ণনা।

মহাভারতের কবিত্ব বিচার করিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, **'Vyasa is the most masculine of writers'**[২] ; মহাভারতের কাহিনী চরিত্র ও বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকেনা। ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় ব্যাসদেব অনন্য। ব্যাস-প্রণীত কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনায় এই সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

কাহিনী ও চরিত্রগুলির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভারতীকথা কথা-সাহিত্যের মূল্যবান ভাণ্ডার। কাহিনীগুলি নানারসের নির্ঝর। শৃঙ্গার, বীর, করুণ হাস্য, ভয়ানক—সকল রসেই এগুলি সরস। স্ত্রীপর্ব যেমন করুণ রসের আধার, তেমনই মৌসলপর্ব ভয়ানক রসের। নলোপাখ্যানটি 'ধর্মিষ্ঠং করুণোদয়ম্'। প্রত্যেকটি কাহিনী আবার সুগভীর পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়বহ। রসালাপে, ইষ্টগোষ্ঠী-কথনে, সন্ধিস্থাপনে, বিগ্রহসংঘটনে, সমস্যার সমাধানে ও শোকের সান্ত্বনায় কাহিনীগুলির আবেদন সুদূরপ্রসারী। জাতকে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে এই কাহিনী-গুলিই সঙ্কলিত হইয়াছে। মহাভারতের চরিত্রগুলিও বিশিষ্ট ও স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল।

১। কাব্যালোক (ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি)—ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।

২। **Vyasa and Valmiki—Sri Aurobindo.**

এই সৃষ্টির গৌরব স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তারই গৌরব। পুরাণেও অসংখ্য চরিত্র আছে। তাহাও ব্যাসদেবের সঙ্কলন। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রে ও মহাভারতীয় চরিত্রে প্রভেদ আছে। মহাভারতের চরিত্র প্রখর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ও জীবন্ত। তাহার কারণ, মহাভারতের চরিত্রগুলি ঋষির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। ভারতযুদ্ধের প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রাদির স্বর্গারোহণের পর মহাভারত রচনা করেন।[১] পুরাণের ভিত্তি স্মৃতি ও শ্রুতি, উহা অনেকটা কল্পনার সৃষ্টি। এইজন্য পৌরাণিক চরিত্র অপেক্ষা মহাভারতীয় চরিত্রের স্বাদ ভিন্নতর। মহাভারতীয় চরিত্রে আছে জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শ। ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতা ও কুটিলতা, দুর্যোধনের দম্ভ, কর্ণের পুরুষকার, শকুনির শাঠ্য, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, যুধিষ্ঠিরের ধর্মধীরতা, অর্জুনের বীরত্ব, কুন্তীর ধৈর্য এবং সর্বোপরি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত। গৌণ চরিত্রগুলিও শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতির পরিচয়।

॥ মহাভারতের বর্ণনা ॥

মহাভারতের বর্ণনাও আশ্চর্য সংযম-শাসিত ও পৌরুষব্যঞ্জক। এই কাব্যে মহাকাব্যের উপযোগী অসংখ্য বর্ণনা আছে: রূপবর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা ও যুদ্ধবর্ণনা। বর্ণনায় যে গতানুগতিকতা নাই, তাহা নয়—কিন্তু বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। যেমন, যজ্ঞ-সমুত্থিতা পাঞ্চালী দ্রৌপদীর এই বর্ণনাটি,—

> কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
> সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা ॥
> শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজা।
> তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূশ্চারু পীনপয়োধরা ॥
> মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।
> নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রধাবতি ॥ [আদি ১৬০]

—কুমারী পাঞ্চালী বেদিমধ্য হইতে সমুত্থিতা; তিনি সুভগা, দর্শনীয়া, শ্যামা আয়তলোচনা; তাঁহার কেশকলাপ নীল ও কুটিল, নখ তাম্রবর্ণ ও সুউচ্চ, স্তনযুগল উন্নত। যেন সাক্ষাৎ দেববালা মানুষীরূপে অবতীর্ণা। তাঁহার অঙ্গে ক্রোশব্যাপ্ত নীলপদ্মের গন্ধ।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বাল্মীকির বর্ণনা হইতে এ বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য আছে।

১। তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্।
অব্রবীদ্ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহাঋষিঃ ॥ [আদি ১.৫৭]

বাল্মীকিতে আছে আবেগ, ব্যাসদেবে সংযম—বাল্মীকিতে হৃদয়বত্তা, ব্যাসদেবে বুদ্ধিমত্তা, বাল্মীকিতে কোমলতা, ব্যাসদেবে পৌরুষ।

মহাভারতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে। মহাভারতের যুগে নাগরিক সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে, রামায়ণের আরণ্য শ্রীকে বহুল পরিমাণে গ্রাস করিয়াছে মহাপুরীর সভ্যতা। তথাপি এ যুগেও নগর অরণ্য পর্বত হইতে বেশিদূরে সরিয়া যায় নাই। রামায়ণের প্রকৃতিবর্ণনার স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতা মহাভারতে নাই। মহাভারতে প্রকৃতিবর্ণনায় প্রাকৃতিক বস্তুর ভার। বর্ণনাগুলি প্রায়ই নানাজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও বন-বিহঙ্গের নাম-তালিকায় ভারাক্রান্ত। কোন কোনস্থলে তালিকা এত দীর্ঘ যে, তালিকার তলে সৌন্দর্য ডুবিয়া যায়, থাকে শুধু তথ্যের ভার। যেমন, গন্ধমাদন পর্বতের এই বর্ণনা,—

> 'বৃক্ষসকল সর্বঋতুর ফলভরে আঢ্য, সর্বঋতুর কুসুমে সমুজ্জ্বল ও ফলভরে অবনত হইয়াছে। আম্র, আম্রতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, জীব, দাড়িম, বীজপুর, পনস, কদলী, খর্জুর, বিল্ব, অম্বুবেতস, চম্পক, কদম্ব, কপিত্থ, জম্বু, গম্ভারী, বদরী, প্লক্ষ, উডুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরিতকী, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ, মহাফল ও কেন্দুক এতদ্ভিন্ন অমৃতকল্প সুস্বাদু ফলসমাচিত বিবিধ বৃক্ষসকল গন্ধমাদন সানুতে শোভিত হইয়াছে।... চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারিত, জীব-জীবক, প্রিয়ক, চাতক ও অন্যান্য বিবিধ বিহঙ্গরাজি ওই সকল বৃক্ষ অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রোত্ররম্য সুমধুর কূজন করিতেছে; পুণ্ডরীক, কোকনদোৎপল, কহ্লার-কমলে ইতস্ততঃ সমাচিত সরোবর সকল চতুর্দিকে জলচর পক্ষিগণ দ্বারা মনোহর হইয়াছে; ঐ সকল সরোবর কলহংস, চক্রবাক, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, বক ও মদগু এইসকল পক্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে।' কালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাকাব্যের যুগের প্রকৃতিবর্ণনা প্রায়শঃ বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু এই ধরনের বর্ণনায় বস্তু-দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও রসদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বর্ণনায় এই বস্তুর ভার থাকিলেও বনপ্রবেশের আনন্দ ও তৃপ্তি ক্ষুণ্ণ হয়না। বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কুটজ কুসুমের গন্ধে, বনবিহগের কূজনে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব পরিবেশে সহজেই হৃদয় মুগ্ধ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, রূপবর্ণনায় ও প্রকৃতিবর্ণনায় কিংবা অন্য যে কোন বর্ণনায় পুরাণ হইতে মহাভারত স্বতন্ত্র নয়। পুরাণকর্তাও ব্যাসদেব, মহাভারতের প্রণেতাও ব্যাসদেব। কবি যেখানে এক, বর্ণনাও সেখানে একরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি মহাভারতের বর্ণনায় পুরাণ অপেক্ষা অধিক সংযম; এখানে রঙের

রেখা ও তুলির টান উভয়ই নিপুণতর। পুরাণের বর্ণনা বিবৃতিমাত্র,—তাহাতে কবিকর্মের প্রয়াস কচিৎ পরিস্ফুট; মহাভারতের বর্ণনা উক্তি-বৈচিত্র্যে পূর্ণ—রীতি বহুল পরিমাণে আলঙ্কারিক। দ্রোণপর্বে কবি যুদ্ধশ্রান্ত রণক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের একটি বর্ণনা করিতেছেন: 'নিদ্রার আকর্ষণে সৈন্যগণ নীরব, এখন তাহারা নিদ্রামগ্ন ও নিশ্চল, যেন পটে আঁকা কোন চিত্রকরের চিত্র ['কুশলৈঃ শিল্পিভির্ন্যস্তং পটে চিত্রমিবাদ্ভুতম্'], এমন সময় চন্দ্রোদয় হইল:

তত: কুমুদনাথেন কামিনীগণ্ডপাণ্ডুনা।
নেত্রানন্দেন চন্দ্রেন মাহেন্দ্রী দিগলঙ্কৃতা॥ [দ্রোণ ১৫৮. ৪৫]

—তখন কুমুদবান্ধব কামিনীগণের গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ নয়নানন্দ কিরণ দ্বারা পূর্বদিক্ অলঙ্কৃত করিলেন।

ক্রমে 'পদ্মলবর্ণ উদয়-পর্বতের সিংহস্বরূপ চন্দ্র গুহা হইতে নির্গত হইলেন:

হরবৃষোত্তম গাত্র সমদ্যুতিঃ স্মরশরাসনপূর্ণসমপ্রভঃ।
নববধূস্মিত চারু মনোহরঃ প্রবিসৃতঃ কুমুদাকরবান্ধবঃ॥ [দ্রোণ ১৫৮. ৪৭]

—হরবৃষের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কামদেবের পুষ্প-পুঙ্খের ন্যায় শ্বেতকান্তি, নববধূর হাস্যের ন্যায় চারু মনোহর চন্দ্র ক্রমে আরও একটু উপরে উঠিলেন।

ততো মুহূর্তাদ্ভুবনং জ্যোতির্ভূতমিবাভবৎ।
অপ্রখ্যমপ্রকাশঞ্চ জগামাশু তমস্তথা॥ [দ্রোণ ১৫৮. ৫১]

—মুহূর্তমধ্যে জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল; রহস্যঘন অজ্ঞেয় অন্ধকার দ্রুত দূরে গমন করিল।

সহসা চন্দ্রের বিভায় জগৎ দিনের ন্যায় আলোকিত হইল। প্রভাতে যেমন পদ্মবন জাগিয়া উঠে, তেমনই প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া সুপ্ত সৈন্যগণ জাগিয়া উঠিল।

যথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ ক্ষুভিতো সাগরো ভবেৎ।
তথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ স বভূব বলার্ণবঃ॥ [দ্রোণ ১৫৮. ৫৪]

—চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন উদ্বেলিত ও ক্ষুব্ধ হয়, সেই সৈন্য-সমুদ্রও তেমনই উদ্বেলিত ও ক্ষুব্ধ হইল।

এ বর্ণনা অত্যুৎকৃষ্ট কবিকর্মের স্বাক্ষর।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনাগুলিও উল্লেখযোগ্য। পুরাণেও যুদ্ধবর্ণনা আছে। মহাভারত তো যুদ্ধেরই কাব্য—কিন্তু বর্ণনায় পার্থক্য অতি স্পষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, 'বিশেষত ইহার (মহাভারতের) যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-পাথর ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎস রস প্রধান শক্তি-আস্ফালনের

ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহনির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কূটষড়যন্ত্র ও মানবীয় ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্য'।[১] পুরাণ ও মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গেও এই উক্তি প্রযোজ্য। পুরাণের যুদ্ধ অনেকটা দৈবাস্ত্রের যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ মানবীয় বুদ্ধির, মানবীয় শক্তি ও কৌশলের। দৈবাস্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও মহাভারতোক্ত নালিক, বৃহন্নালিক প্রভৃতি অস্ত্র আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাভারতের যুগে ভারতের ধনুর্বেদ বিদ্যা নানাদিক হইতে সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া মহাভারতে আছে বিবিধ ব্যূহনির্মাণের কৌশল। অভিমন্যুবধের জন্য দ্রোণ কর্তৃক রচিত চক্রব্যূহ মহাভারতের একটি নিন্দনীয় স্মরণীয় কীর্তি: কিন্তু উহা যুদ্ধসজ্জার ও সৈন্য সমাবেশে বুদ্ধিমত্তার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

চক্রব্যূহো মহারাজ আচার্যেণাভিকল্পিতঃ।
তত্র শক্রোপমা সর্বে রাজানো বিনিবেশিতা॥ [দ্রোণ. ৩১]

—হে মহারাজ, চক্রব্যূহ আচার্য দ্রোণ কর্তৃক অভিকল্পিত; তাহাতে ইন্দ্রভূষণ সকল রাজা সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন।

এই ব্যূহের মধ্যস্থলে ছিলেন রাজা দুর্যোধন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন মহারথ কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপ। ব্যূহের প্রবেশপথে ছিলেন স্বয়ং দ্রোণ এবং সুমেরু পর্বতের মত অচল সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। জয়দ্রথের একপার্শ্বে অশ্বত্থামা ও ও ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিশজন পুত্র; অপর পার্শ্বে ধূর্ত শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা। দ্রোণাচার্য-পরিকল্পিত এই ব্যূহবিন্যাস নিঃসন্দেহে আশ্চর্য যুদ্ধকৌশলের পরিচয়। জয়দ্রথকে অর্জুনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণকর্তৃক চক্র-শকট ব্যূহ নির্মাণ কৌশলের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

॥ ব্যাসকূট ও প্রহেলিকা ।

মহাভারতের বর্ণনায় কবিত্ব তো আছেই, একভাবে ইহার শ্লোকগুলির কাব্য-মূল্যও যথেষ্ট। ভারতকথার প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোক হীরকের মত উজ্জ্বল ও নিহিতার্থ-বোধক। উহাতে আশ্চর্য মনস্বিতা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্বাক্ষর বিদ্যমান। মহাভারতে সূক্তি ও সুভাষিতাবলীর সংখ্যা অসংখ্যেয়: হিতোপদেশ ও নীতি উপদেশের অন্ত নাই। শুক্রনীতি ও বার্হস্পত্য নীতির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ইহাতে শ্লোক-পরিবেশন করা হইয়াছে।

১. বাংলাসাহিত্যের বিকাশের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল চাণক্যশ্লোক, নীতিশতক বা বৈরাগ্য শতক রচিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতীয় শ্লোকগুলিরই প্রকারভেদ মাত্র; কোথাও বা হুবহু প্রতিধ্বনি।

মহাভারতে এই শ্লোক ব্যতীত আছে কতকগুলি 'ব্যাসকূট' ও প্রহেলিকা। এই শ্লোকগুলি পরবর্তীকালের ধাঁধাঁ, তর্জা ও প্রহেলিকার উৎস। অবশ্য প্রহেলিকার কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়াছে বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্বেদের 'হংসবতী ঋক' এবং বিশেষতঃ ঋষি দীর্ঘতমাদৃষ্ট সূক্ত [ঋ, ১. ১৬৪] রহস্যময় ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এই রচনাধারার সুচিন্তিত প্রকাশ মহাভারতের 'ব্যাসকূট'। কিংবদন্তী এই যে, ব্যাসদেব গণেশকে মহাভারত লিখিয়া দিবার অনুরোধ করিলে, গণেশ একটি সর্তে রাজি হন যে শ্লোকগুলি বলিবার সময় ব্যাসদেব থামিতে পারিবেন না, তাঁহাকে অনর্গল বলিয়া যাইতে হইবে। ব্যাসদেব তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া আর এক সর্ত করেন যে, লিখিবার সময় গণেশকে অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। ব্যাসদেব কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াই এক একটি কূট শ্লোক বলিতেন, অর্থ বুঝিয়া তাহা লিখিতে গণেশের একটু বিলম্ব হইত। সেই অবসরে ব্যাসদেব আবার চিন্তা করিয়া পরের শ্লোকগুলি বলিয়া যাইতেন। ইহাই 'ব্যাসকূট'-উৎপত্তির জনশ্রুতি। জনশ্রুতি যাহাই হউক 'ব্যাসকূট' আশ্চর্য প্রহেলিকা—ব্যাসকূটের ভাষা দুর্বোধ্য না হইলেও অর্থ অতি রহস্যময়। বাচ্য অর্থ ইহার প্রকৃত অর্থ নয়, নিহিতার্থ উদ্ঘাটন করাও দুঃসাধ্য। যেমন,

১. যুধিষ্ঠির বারণাবতে যাইবার সময় প্রাজ্ঞ বিদুর প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে দুর্বোধ্য ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন: এই বৃত্তান্তটি একটি হেঁয়ালীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে:

প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞমিদংবচঃ।
প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞং প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোঽব্রবীৎ॥ আদি, ১৩৯.২০]

ইহার বাচ্যার্থ—প্রাজ্ঞ ও প্রাজ্ঞকথায় অভিজ্ঞ বিদুর প্রাজ্ঞ কথায় অভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন, প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞকে, প্রলাপজ্ঞ প্রলাপজ্ঞকে এই কথা বলিলেন।[১]

২. আর একটি ব্যাসকূট বিরাট পর্বের। বিরাটরাজপুত্র উত্তর কুরুসৈন্য দর্শনে

১। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অদ্বৈত মহাপ্রভু-প্রেরিত তর্জাটিও ঠিক এইরূপ:
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলের কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥ [চৈঃ চ. অন্ত্য ঃ১৯ পরিঃ]

ভীত হইয়া পলায়নে উদ্যত, ক্লীববেশী অর্জুন তাহাকে ফিরাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তখন দ্রোণ বলিয়াছিলেন :

নদীজ লঙ্কেশ বনারিকেতুর্নগাহ্বয়ো নাম নগারিসূনুঃ।

এষোঽঙ্গনাবেষধরঃ কিরীটী জিত্বা বয়ং নেষ্যতি চাদ্য গাবঃ॥ [বিরাট. ৩৬]

ইহার বাচ্যার্থ : হে ভীষ্ম (নদীজ) এই ক্লীববেশধরই কপিধ্বজ (লঙ্কেশ-বনারিকেতু) ইন্দ্রপুত্র (নগারিসূনু) অর্জুন (নগাহ্বয়ো নাম) কিরীটী আপনাদিগকে জয় করিয়া আজ গাভীগুলি লইয়া যাইবে।

ব্যাসকূট ছাড়া প্রহেলিকা জাতীয় শ্লোকের সংখ্যাও মহাভারতে প্রচুর। প্রহেলিকার বহিরঙ্গ ব্যাসকূটের মত, কিন্তু ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। প্রহেলিকার গূঢ়ার্থ বুদ্ধিগম্য। সাঙ্কেতিক শব্দগুলির অর্থ জানা থাকিলে প্রহেলিকার অর্থ নির্ণয়ে কষ্ট হয় না। শব্দকল্পদ্রুম মতে প্রহেলিকা 'কূটার্থ ভাষিতা কথা'—উহার স্বরূপার্থ প্রচ্ছন্ন :[১]

১. মহাভারতের বনপর্বে অষ্টাবক্র উপাখ্যানে অষ্টাবক্রের প্রতি জনকের প্রশ্নগুলি প্রহেলিকাজাতীয়। জনক প্রশ্ন করিলেন :

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্যেনপাতে দিবৌকসম্।

কস্তয়োর্গর্ভমাধত্তে গর্ভং সুষুবতুশ্চ কম্॥ [বন. ১০৯. ২৬.]

—দুইটি ঘোটকীর ন্যায় যাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং দুইটি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় যাহাদের পতন হয়, কোন্ দেবতা তাহাদের উৎপাদক? তাহারাই বা কাহার উৎপাদক।

২. উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এই উক্তিটিও একটি প্রহেলিকা,

একয়া দ্বে বিনিশ্চিত্য ত্রীংশ্চতুর্ভির্বশে কুরু।

পঞ্চ জিত্বা ষড় বিদিত্বা সপ্ত হিত্বা সুখী ভব॥ [উদ্যোগ. ৩৩. ৫০]

—এক দ্বারা দুইকে জানিয়া, তিনকে চার দ্বারা বশ কর; পাঁচকে জয় করিয়া, ছয়কে জানিয়া, সাতকে ত্যাগ করিয়া সুখী হও।

এইরূপ বহু প্রহেলিকা মহাভারতে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। ব্যাসকূটই হউক বা প্রহেলিকাই হউক, উক্তিগুলি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত। তবে বুদ্ধির পরীক্ষা ইহাদের অন্যতম লক্ষ্য হইলেও রসসৃষ্টির লক্ষ্যটিও উপেক্ষণীয় নয়। প্রহেলিকায় যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাতে কৌতুকহাস্যের স্পর্শও বর্তমান।

১। ব্যক্তীকৃত্য কমপি অর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ।
যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যেতে সা প্রহেলিকা॥

৭. মহাভারতের খিল অংশ (হরিবংশ)

'হরিবংশ' মহাভারতের পরিশিষ্ট। ইহাও ব্যাসদেবের রচনা। মহাভারত কীর্তন করা হইলে জন্মেজয় বিস্তৃতভাবে বৃষ্ণি-অন্ধকবংশের কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, 'কথয়স্ব কুলং তেষাং বিস্তরেণ তপোধন'। এই জিজ্ঞাসার উত্তর 'হরিবংশ'। ইহাতে বিশেষতঃ ভগবান বিষ্ণুর লীলা কীর্তিত হইয়াছে।

হরিবংশের মোট তিনটি পর্ব : হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। হরিবংশ পর্ব পুরাণ-লক্ষণসহ বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণের ভূমিকা; বিষ্ণুপর্ব কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার বর্ণনা; ভবিষ্যপর্বও অনেকাংশে কৃষ্ণের দ্বারাবতী লীলার অন্তর্ভুক্ত।

হরিবংশ নানাদিক হইতে পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ বিষ্ণুপর্ব। ইহাই কৃষ্ণের জীবন-লীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত এই অংশের সাদৃশ্য আছে। ভাগবতে রাধার নাম নাই, হরিবংশেও রাধার নাম নাই; এখানে গোপী-ক্রীড়ার নাম 'হল্লীস' এবং ইহার বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। শারদী সুন্দর নিশায় চন্দ্রভাসিত বন দেখিয়া কৃষ্ণ 'মনশ্চক্রে রতিং প্রতি'। গোপীগণ 'বার্যমাণাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা'—কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে বনে আসিলেন, তাঁহারা 'আমোদরপরায়ণা' তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণচরিত গান [গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং]। কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত মনোরথানুরূপ ক্রীড়া করিলেন :

> এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
> শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥ [হরি. বিষ্ণু. ২০]

—ইহাই হরিবংশের গোপী ক্রীড়া বা হল্লীস।

হরিবংশে দুইটি 'আর্যা স্তব' বিন্যস্ত হইয়াছে। এই স্তবে শক্তিদেবীকে 'কোটবী' (নগ্না), 'বারুণীং মদিরাবাসাং' এবং 'কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য ইনিই যে আবার 'অচিন্ত্যা হ্যপ্রমেয়া' তাহাও বলা হইয়াছে [হরি. বিষ্ণু. ১২০]। উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীতে এই দেবীই উষাকে বর দিয়াছিলেন, 'উষে ত্বং শীঘ্রমপেব্যং ভর্ত্রা সহ রমিষ্যসি'। উষা ও অনিরুদ্ধের গোপন মিলন অনেকটা ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের বিহারের অনুরূপ। দেবীর বরেই অনিরুদ্ধের মনোবাসনা সিদ্ধ হইয়াছিল। Winternitz মনে করেন, হরিবংশের আর্যা স্তব প্রক্ষিপ্ত।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের দুইটি দুর্গাস্তবের কথা মনে পড়ে; একটি বিরাটপর্বে

যুধিষ্ঠির-কৃত দুর্গাস্তব আর একটি ভীষ্মপর্বের অর্জুন-কৃত 'দুর্গাস্তব। বিরাটপর্বের স্তবটি অনেকেই প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। অর্জুনের দুর্গাস্তবের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত নারায়ণী-স্তুতির প্রতিধ্বনি আছে। মহাভারতে দুর্গাদেবীর 'সিদ্ধসেনা', 'কালী, 'কপালী' 'করালী' নামগুলি পাওয়া যায়। এই নামগুলিও উল্লেখযোগ্য :

ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি॥ [ভীষ্ম. ২৩. ৫]

মহাভারতের দেবীরূপ আর্যীকৃত; হরিবংশে প্রাগার্য রূপটি পরিস্ফুট :

পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবী বনেষূপবনেষু চ।
শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনি লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥ [হরি. বিষ্ণু. ৩]

'হরিবংশ' হইতে তৎকালীন অভিনয়কলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। যদু-সৈন্যগণ নটবেশে বজ্রপুরে প্রবেশ করিয়া রামায়ণ অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন,

নান্দিং চ বাদয়ামাস প্রদ্যুম্নো গদ এব চ।
সাম্বশ্চ বীর্যসম্পন্নঃ কার্যার্থং নটতাং গতঃ॥
নান্দ্যন্তে চ তদা শ্লোকং গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্।
বৌস্মিণেয়স্তদোবাচ সম্যক্ স্ববিনয়ান্বিতম্॥ [হরি. বিষ্ণু. ৭৪]

অভিনয়কলার এই পদ্ধতিই দেখা যায় পরবর্তী সংস্কৃত নাটকে। অধমর্ণ কে? হরিবংশ, না সংস্কৃত নাটক? পণ্ডিতপ্রবর Wilson-এর মতে হরিবংশ দশম শতাব্দীরও পরের। মনে হয়, হরিবংশ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক বা তাহারও পূর্ববর্তী।

মহাভারতের খিলঅংশ (পরিশিষ্ট) হইলেও, মহাভারতের কবিত্ব হরিবংশে নাই। হরিবংশের প্রকৃতি পুরাণের অনুরূপ। বর্ণনা বিবৃতি-প্রধান ও অনেকটা নিরাভরণ।

॥ জৈমিনী মহাভারত ॥

মহাভারত প্রসঙ্গে মহাভারতের আর একটি সংস্করণ 'জৈমিনী-ভারত'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার বিশেষত্ব অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনায়। বৈয়াসকী মহাভারতে অশ্বমেধ-পর্বের দিগ্বিজয়ের অংশ অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু জৈমিনী-ভারতে এই অংশ বিস্তৃত। ইহাতে স্ত্রীরাজ্যে (প্রমীলারাজ্যে) যজ্ঞীয় অশ্বের অভিযান এবং চন্দ্রহাসের উপাখ্যান বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা মহাভারত অশ্বমেধপর্বের বর্ণনায় জৈমিনী-ভারতকেই অনুসরণ করিয়াছে।

৮. বাংলা মহাভারত

রামায়ণের মত মহাভারতকথাও বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা', 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির', 'রন্ধনে দ্রৌপদী', 'বিদুরের খুদ', 'মাতুল শকুনি', 'দাতাকর্ণ', 'ভীমের গদা', 'ঘরে কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচন হইতে মহাভারত কোন্ কোন্ দিক হইতে বাঙালীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। রামায়ণের মত মহাভারত ঠিক গৃহস্থালির আদর্শ হিসাবে এদেশে স্থান লাভ করে নাই। মহাভারতে জ্ঞাতিবিরোধ এমন চরমে উঠিয়াছে যে, সর্বভারতীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধকোলাহলে পরিবারিক জীবনের প্রীতিস্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাভারতের গৃহজীবনে কোথায় যেন অভিশাপ আছে। লুপ্তপ্রায় পৌরব বা কৌরববংশের বাতি যথানিয়মে জ্বলে নাই। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাবশে চিরকুমার রহিলেন, সত্যবতী-সুত চিত্রাঙ্গদ অকালে যুদ্ধে নিহত হইলেন, বিচিত্রবীর্য সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে প্রাণ হারাইলেন। অতএব বংশ রক্ষা হইল না। ভগবান ব্যাসদেব যে নিয়মে সেই বংশধারাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও এদেশের গৃহজীবনের আদর্শ নয়। কুরুবংশে কানীন পুত্র কর্ণের দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে, কৃষ্ণার হাহাকারে গার্হস্থ্য জীবন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত গৃহজীবনের আদর্শ নয়, বিভীষিকা। 'মাতুল শকুনি', 'ঘরে কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবাদ তাহারই ইঙ্গিত। অবশ্য ধর্মশাস্ত্ররূপে মহাভারতের 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' নীতি বাঙালীর অন্তরে ধ্রুবাক্ষরে গ্রথিত হইয়া আছে।

ধর্মশাস্ত্ররূপে বাংলাদেশে মহাভারতের এই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সুদূর পাল আমল হইতে পাওয়া যায়। মদনপালদেবের পাটমহিষী চিত্রমতিকা বটেশ্বরস্বামী নামক একজন পাঠকের মুখে ভারতকথা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[১] বস্তুতঃ অমৃতসমান ভারতকথা বাংলাদেশে ধর্মশাস্ত্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত। পুণ্যকামী ব্যক্তি মহাভারত শ্রবণ করেন, বাঙালীর শ্রাদ্ধবাসরে 'বিরাট,' 'গীতা' পাঠ করা হয়, মৃত্যুর শোককরুণ পরিবেশে 'শান্তিপর্ব' পাঠ করিয়া বাঙালী শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে, বিদুরের খুদকণায় তৃপ্ত ভগবানের কথা স্মরণ করিয়া দারিদ্র্য-দৈন্য পীড়িত ভক্ত বাঙালী অশ্রুজলে সিক্ত হয়।

কিন্তু বাংলা মহাভারত রচনার পশ্চাতে অন্য একটা উদ্দেশ্য দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত দুই রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভাষায় ভারত

১। পণ্ডিতভট্টপুত্রবটেশ্বরস্বামিশর্মণে পটমহাদেবী চিত্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্ত প্রপাঠিতমহাভারত সমুৎসর্গিতদক্ষিণাত্বেন ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ—মদনপালদেবের তাম্রশাসন।

রচিত হইয়াছিল মুসলমান সম্রাটের অনুজ্ঞায়। প্রাচীন বাংলা মহাভারতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয় পাঞ্চালিকা' এবং শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ কথা'। এই দুইখানি কাব্যই মুসলমান লস্করদের নির্দেশে রচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পোষ্টা লস্কর পরাগলখান, আর শ্রীকর নন্দীর কাব্যের উৎসাহদাতা পরাগলসুত ছুটিখান। লস্কর পরাগলখান ধর্মমতি—'পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি'—আর ছুটিখানও 'বলিকর্ণ দধীচি সমান যার দান।' অতএব ধর্মকাহিনী শ্রবণ করিবার আগ্রহ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য পুরাণ ছাড়িয়া মহাভারতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল কেন? অনেকেই মনে করেন, মহাভারতে রাজনীতির প্রাধান্য। ভারতকথা রাজনীতির কূটকৌশলে ও যুদ্ধের হুঙ্কারে পূর্ণ। মহাভারত পাঠের ফলশ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা'। মুসলমান সম্রাটগণ ছিলেন জিগীষু; হুসেনশাহ 'অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত', লস্কর পরগলখান চট্টগ্রাম বিজয়ী, আর ছুটিখান 'সমরে নির্ভয়'। তাই জয়েচ্ছু সম্রাটগণের পক্ষে যুদ্ধবর্ণনাবহুল 'জয়াখ্য' পাণ্ডববিজয় শ্রবণের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ বাংলায় রচিত মহাভারতগুলিতে অশ্বমেধ পর্বের সংখ্যাবাহুল্য যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অশ্বমেধ পর্বের আদর্শ বৈয়াসকী মহাভারত নয়, জৈমিনীকৃত মহাভারত। বৈয়াসকী মহাভারতে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর ভারতজয়ের কাহিনী প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু জৈমিনীভারতে প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে ভারতের পূর্বাঞ্চল জয়ের কাহিনী। মুসলমান লস্করদেরও বিজয়ের লীলাভূমি ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চল। তাই অশ্বমেধ পর্ব শ্রবণে মুসলমান সম্রাটগণ এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। সম্ভবতঃ জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের জয় গৌরব প্রচারের আকাঙ্ক্ষাও মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব দ্বারা সম্পন্ন হইত। হয়তো তাঁহারা বুঝাইতে চাহিতেন, যে পূর্বদেশ জয় করিতে আসিয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের বিজয় গাণ্ডীব বারবার হস্তচ্যুত হইয়াছে, সেই দেশ তাঁহারা অবলীলাক্রমে জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন। মোটের উপর বাংলাভাষায় প্রাচীন মহাভারত রচনার প্রেরণা ঠিক ধর্মশাস্ত্র শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত হয় নাই, উহার পশ্চাতে অন্যান্য রাজনৈতিক কারণগুলিই প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলায় অশ্বমেধ পর্ব রচনার প্রাচুর্যও এই সত্য সপ্রমাণ করে; জিগীষু ব্যক্তিদের দ্বারা বা জয়েচ্ছু নৃপতিদের প্রেরণায় এগুলি রচিত হইয়াছে।

কিন্তু আদৌ যে উদ্দেশ্যেই বাংলামহাভারত রচিত হইয়া থাকুক, শেষ পর্যন্ত ইহা ধর্মশাস্ত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছে। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে যে মহাভারতখানির সমাদর, যাহার প্রতিষ্ঠা কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুল্য, সেই কাশীদাসী মহাভারত এদেশে ধর্মগ্রন্থরূপেই প্রচারিত: কাশীরামের মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যও ধর্মমূলক:

যেই বাঞ্ছা করি লোক শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ ॥

প্রচারবাহুল্যে ও জনপ্রিয়তায় কাশীরাম দাসের মহাভারত বাংলায় সর্বাগ্রগণ্য। কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতখানি কাশীরামের একার রচনা কি না, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন Composite text, কাশীদাসের মহাভারত সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির রচনাপ্রবাহ মিলিত হইয়া কাশীরামের নামিত ভারতপাঁচালীতে পরিণত হইয়াছিল কাশীরামের কাব্য বলিতে আমরা কাশীরাম-গোষ্ঠীর এই সংহিতাই বুঝি।'[১] উক্তিটির যাথার্থ্য অসংশয়িত। কাশীরামদাস ভাষায় ভারতপাঁচালীর আদিপ্রণেতাও নহেন—তথাপি বাংলায় মহাভারতরচনার যাবতীয় গৌরব কাশীরামদাসের। এই মহাভারতখানি বিশ্লেষণ করিলেই বাংলামহাভারতের স্বরূপ ও রূপ ধারণা করা সম্ভব।

(১) প্রাচীন বাংলার অনুবাদসাহিত্য প্রায়শঃ মূল হইতে বিচ্যুত, উহা স্বাধীন কল্পনা ও লোকশ্রুতিদ্বারা পল্লবিত ও পরিবর্দ্ধিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু কাশীদাসী মহাভারত এ দিক হইতে একটি ব্যতিক্রম। ইহাতে স্বাধীন কল্পনা ও বাংলার লোকশ্রুতি বা বিশ্বাস স্থান লাভ করিলেও উহা মোটামুটি মূলের সার্থক অনুবাদ। রামায়ণে যেমন অবাধ কল্পনা মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, মহাভারতে সেরূপ হয় নাই। বাংলা মহাভারতে মূল সংক্ষেপিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে প্রায় মূলকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। যেমন,

(ক) বৈয়াসকী মহাভারতের 'কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা' দ্রৌপদীর উৎপত্তি-বর্ণনা [আদি ১৬০] কাশীদাসী মহাভারতে হইয়াছে,...

তবে ঐ যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশদিক করে মহাদ্যুতি ॥
নীলপদ্ম আভা অঙ্গে ভ্রমর বর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি ঘনপীনস্তনী ।
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব বাঞ্ছিত। [আদিপর্ব]

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন।

(খ) ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের প্রমাদ : বৈয়াসকী মহাভারত :

স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
স্ফাটিকং স্থলমাসাদ্য জলমিত্যভিশঙ্কয়া।
স্ববস্ত্রোৎকর্ষণং রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ॥
দুর্মনা বিমুখশ্চৈব পরিচক্রাম তাং সভাম্।
ততঃ স্থলে নিপতিতো দুর্মনা ব্রীড়িতো নৃপঃ॥
ততঃ স্ফাটিকতোয়াং বৈ স্ফাটিকাম্বুজশোভিতাম্।
বাপীং মত্বা স্থলমিতি সবাসাঃ প্রাপতজ্জলে॥
জলে নিপতিতং দৃষ্ট্বা কিঙ্করা জহসুর্ভৃশম্। [সভা. ৪৫]

কাশীদাসী মহাভারত :

বিহার মাতুল সহ করে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন্॥
তথা হইতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর॥
স্ফটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন। [সভাপর্ব]

(গ) যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকের প্রশ্ন : বৈয়াসকী মহাভারতে :

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥ [বন ২৮৭]

কাশীদাসী মহাভারত :

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চাবি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

(২) মোটামুটি মূলানুসারী হইলেও কাশীদাস স্বাধীনতাও প্রচুর দেখাইয়াছেন :

(ক) প্রথমতঃ কাশীদাসী মহাভারতে কোথাও মূলের ঘটনা ইচ্ছানুযায়ী সজ্জিত এবং পারম্পর্য-ক্রম লঙ্ঘিত। বৈয়াসকী মহাভারতের অনুশাসনপর্ব এবং মহাপ্রস্থানিক পর্ব

কাশীদাসে নাই—এইগুলি উহাতে সংক্ষেপে যথাক্রমে শান্তি ও স্বর্গারোহণপর্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাশীদাসে গদাপর্ব ও ঐষীক পর্ব পৃথক পর্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। মূলে 'গদাযুদ্ধপর্ব' শল্যপর্বের উপপর্ব এবং ঐষীক পর্ব সৌপ্তিক পর্বের অন্তর্ভুক্ত। মূলের পর্বসংখ্যা একরূপ থাকিলেও পর্বনাম নির্বাচনে কাশীদাসে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

(খ) কোন কোন কোন স্থলে মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে কাশীদাস রঙে-রেখায় বিস্তারিত করিয়াছেন, যেমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের এই অংশ :

ততো দুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যাপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥
কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।
ততস্তু ধর্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বিবিধৈর্বস্ত্র পুগৈঃ ॥
আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যাশ্চ বিশাম্পতে।
তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ ॥
নানারাগবিরাগাণি বসনান্যথ বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্মস্য পরিপালনাৎ ॥ [সভা. ৬৫]

কাশীদাসী মহাভারত :

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে নারায়ণে ॥
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
হেথায় সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাজ
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহার করিতে দৃষ্টি
পুনঃপুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া
অনাথার কর প্রতিকার ॥......
দ্রৌপদী আকুল জানি অস্থির সে চক্রপাণি
যাঁর নাম বিপদভঞ্জন।

ধর্মরূপে বিশ্বপতি রাখিতে এলেন সতী
সত্যধর্ম করিতে পালন ॥
আকাশমার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লৈয়ে
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায় ।
যত দুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গলপীত নীল শ্বেত বিরচিত
নানাচিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥

(গ) কাশীরামদাসে নূতন বিষয়যোজনাও অল্প নয়। বনপর্বে শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান, বিস্তৃত শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য—বিরাটপর্বের গোগ্রহ অংশে রণভূমে চামুণ্ডার আগমন ও খর্পর ভরিয়া অর্জুনের কল্যাণে মৃতসৈন্যের রুধির পান—শান্তিপর্ব্বে একাদশী মাহাত্ম্য ও হরিমন্দির মার্জনের ফল বর্ণনা প্রভৃতি মূল মহাভারতে নাই। শুধু তাই নয়, কাশীদাসী মহাভারতে ভক্তিবাদের—বিশেষতঃ হরিভক্তিবাদের যে প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাও মূল বহির্ভূত। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের লোকশ্রুতি ও ভক্তিবাদের তুলনায় কাশীদাসে অবান্তর অংশের যোজনা অল্প।

(ঘ) কাশীদাসী মহাভারতে মূল হইতে বিচ্যুতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অশ্বমেধপর্বে। বাংলায় রচিত অশ্বমেধপর্বের আদর্শ বৈয়াসকী মহাভারত নয়, জৈমিনী মহাভারত ও গর্গসংহিতা। বৈয়াসকী মহাভারতে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা অংশ সংক্ষিপ্ত। উহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে মরুত্ত-উপাখ্যান, অনুগীতা ও দানধর্মের কথা। দিগ্বিজয় অংশে ত্রিগর্ত্ত, সিন্ধুদেশ, গান্ধার ও মগধজয়ের সহিত সংক্ষেপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মণিপুর ও বঙ্গজয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনীভারতে যজ্ঞাশ্বের স্ত্রীরাজ্যে গমন, চন্দ্রহংসরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ আছে। কাশীদাসী মহাভারতে মরুত্তের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যুবনাশ্বরাজার কাহিনী; অনুগীতা বা দানধর্মের প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত; যুদ্ধাংশের বর্ণনায় কাশীদাস মূলের সভাপর্বের পাণ্ডবদিগ্বিজয় ও অশ্বমেধপর্বের পাণ্ডবদিগ্বিজয় একত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মূলের নীলরাজার কাহিনী-রেখা কাশীদাসে অতি বিস্তৃত নীলধ্বজ-জনা উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। সভাপর্বের হংসধ্বজ রাজার প্রসঙ্গ কাশীদাসে বিস্তৃত সুধন্বাকাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাশীরামদাসে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ-

করিয়াছে ভারতের পূর্বাঞ্চল জয়ের কাহিনী—এই কাহিনীগুলির মধ্যে প্রধান প্রমীলা-রাজ্যে যজ্ঞাশ্বের প্রবেশ এবং মণিপুরে বভ্রুবাহনের উপাখ্যান।

॥ নব্যযুগে বাংলায় ভারতী কথার রূপায়ণ ॥

প্রাচীন বাংলায় মহাভারতের বিচিত্র উপাখ্যান যেমন বাংলা মহাভারতের মাধ্যমে পরিবেশন করা হইয়াছে, তেমনি আধুনিক বাংলায় ভারতীকথার রস পরিবেশিত হইয়াছে নবযুগের যাত্রা, নাটক ও কাব্য-কবিতার মাধ্যমে। কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারতের গদ্যানুবাদ ব্যতীত অখণ্ড কোন মহাভারত নব্য বাংলায় রচিত হয় নাই; যাহা যাত্রা, নাটকে বা কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে তাহাও মহাভারতান্তর্গত কোন খণ্ড উপাখ্যান। যাত্রায় ভক্তিবাদ অলৌকিক বিশ্বাস ও রৌদ্ররসের প্রভাব। তাই বীররসের নামে রৌদ্ররসাত্মক 'অভিমন্যুবধ' (কেদারনাথ, তিনকড়ি বিশ্বাস, ব্রজমোহন রায়), সতীনারীর কাহিনীরূপে 'সাবিত্রী সত্যবান' (তিনকড়ি বিশ্বাস, কেদারনাথ, ব্রজমোহন), 'নলদময়ন্তী' (হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ভোলানাথ মুখো) এবং ভক্তিমূলক কাহিনী-রূপে 'দুর্বাসার পারণ' (ভোলানাথ মুখো), পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ (তিনকড়ি বিশ্বাস) প্রভৃতি পালা যাত্রার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। যাত্রাপালার আদর্শও মূল মহাভারত নয়, কাশীদাসী মহাভারতই উহাদের আদর্শ; তাহাও আবার অতিউচ্ছ্বসিত ভক্তি, স্থূল হাস্য, রোমহর্ষক রৌদ্ররসের মিশ্রণে অতিনাটকীয়। মহাভারতীয় উপাখ্যান লইয়া রচিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'জনা' নাটকের বিষয়বস্তু কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে সমাহৃত। জনার চরিত্রে মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র প্রভাব বিদ্যমান। বিরোধে ভক্তি প্রদর্শনই এই নাটকের মূল ভাব; জনার প্রতিহিংসাপরায়ণা মাতৃমূর্তি আত্মউচ্ছ্বাসে পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ছয়খানি নাটক—বভ্রুবাহন, সাবিত্রী, উলুপী ভীষ্ম, মন্দাকিনী ও নরনারায়ণ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কাহিনী মহাভারত হইতে সংগৃহীত। বভ্রুবাহন ও উলুপী নাটকের কাহিনীতে কাশীদাসের অনুসৃতি বেশি। ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নাটক 'ভীষ্ম ও 'নরনারায়ণ'। উভয় নাটকেই প্রধান চরিত্র দুইটি—ভীষ্ম ও কর্ণ মানবীয়ভাবে চিত্রিত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পৌরুষ দৈবদ্বারা নির্জিত। অলৌকিকতা ও ভক্তিবিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়া মানবীয় ভাব বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভীষ্ম নাটকে 'দ্যুতি' চরিত্রের পরিকল্পনা নূতন, শিখণ্ডী-জনিত ভীষ্মের অন্তর্দ্বন্দ্বেও নূতনত্ব আছে। নরনারায়ণ নাটকের কর্ণচরিত্র মহাভারত হইতে স্বতন্ত্র। মহাভারতে যে কর্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে মন্ত্রণা দিয়াছেন, এখানে সেই কর্ণই

নিজের সাধুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদ্মাবতীচরিত্র মূল মহাভারতে নাই। ভক্তিবলে পদ্মাবতীর দূর হইতে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করার দৃশ্য অলৌকিকতার চূড়ান্ত। কৃষ্ণভক্তিতে কর্ণচরিত্রের পরিসমাপ্তি পৌরাণিক নাটকের উপযোগী হইলেও মূল হইতে বিচ্যুত। 'নরনারায়ণ' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বরূপ যুগোপযোগী একটি সমস্যা অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত পুরাণ-ভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই —শেষ পর্যন্ত 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' নীতিই জয়ী হইয়াছে।

পুরাতন কাহিনীকে যুগচেতনার আলোকে প্রকাশ করার প্রবণতা উনিশ শতকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে কয়েকটি মহাভারতীয় চরিত্র অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগের প্রেম-বিচিত্রাকে রূপায়িত করিয়াছেন। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা পত্রিকাগুলির বিষয় মহাভারত। মূল পুরাতন, কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। শকুন্তলা পত্রে কালিদাসের প্রভাব বহিয়াছে; মহাভারতের শকুন্তলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, মধুসূদনের শকুন্তলায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা ব্যক্তিত্ববর্জিতা এক দুর্বল প্রণয়ভীরুর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে: পত্রের ভাষাও গোপন-প্রণয়িনীর আবেগ-শঙ্কিত। জাহ্নবীর পত্রে আধুনিকা কোন প্রণয়িনীর সান্ত্বনা-দায়ক প্রত্যাখ্যান 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেব না আমায়।' মহাভারতে দ্রৌপদী অর্জুনের দেবপুরে গমনকালে বলিয়া-ছিলেন, 'নৈব নঃ পার্থ ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে। তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘ প্রবাসিনি' [বন. ৩৩]—তুমি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে আমার ভোগে, ধনে বা জীবনে আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, তথাপি তুমি গমন কর, 'স্বস্তি প্রাপ্নুহি কৌরব।' অর্জুন স্বর্গপুরে গমন করিলে দ্রৌপদী উতলা হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, 'শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।' —সব্যসাচী ব্যতীত আমি এই পৃথিবীকে শূন্য দেখিতেছি। মহাভারতের বিরহিণী দ্রৌপদীর এই অবস্থাকে স্মরণ করিয়া মধুসূদন দ্রৌপদীর পত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতীয় দ্রৌপদীর তেজস্বিতা এ পত্রে নাই, আছে প্রণয়ভীতা এক নব্য নারীর দুর্বল মর্মোচ্ছ্বাস—'অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?' দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী ও জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা পত্রিকা দুইটিও উনবিংশ শতকের নারী-মানসের প্রতীক। এই সকল পত্রিকার মধ্য দিয়া, নব্য মন কিরূপে প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে তৎপর হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জনার পত্রিকা। জনার চিত্র কাশীদাসী মহাভারত হইতে সমাহৃত। তেজস্বিনী জননীর ও স্বামীর প্রতি অভিযোগকারিণীর মূর্তি যুগোচিত ভাবে বিলসিত। মধুসূদনে গ্রহণের পদ্ধতি গতানুগতিক বিশ্বাসের পথে নয়, নবলব্ধ যুক্তির পথে।

মহাভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ছিল; ভারতীয় জীবনের প্রতিনিধি এই মহাকাব্যের রসাস্বাদটিও ছিল সুগভীর। মহাভারত যে যুগ যুগ ধরিয়া এদেশবাসীর হৃদয়ে এক সকরুণ শান্তির বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন [দ্রষ্টব্য পুরস্কার—সোনারতরী]। মহাভারতের কয়েকটি আখ্যানকেও তিনি নূতনভাবে রূপ দিয়াছেন: বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস প্রভৃতি নাট্যকাব্য এবং চিত্রাঙ্গদা নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল কাহিনীতে তিনি পুরাতনী ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করেন নাই—কিছু পরিবর্জন করিয়াছেন, কিছু পরিবর্ধন করিয়াছেন, কিছু পরিবর্তনও করিয়াছেন—তাহা করিয়াছেন মূল কাহিনীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা তিনি সবত্রই নিজস্ব একটি চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়াছেন।

'বিদায় অভিশাপ' মহাভারতের আদিপর্বের কচ-দেবযানী সংবাদ অবলম্বনে রচিত। দেবযানী প্রণয়ে ব্যর্থ হইয়া যেমন কচকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 'কচ! ন তে বিদ্যা সিদ্ধমেষা গমিষ্যতি'—তেমনি কচও দেবযানীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, কামপ্রণোদিত হইয়া তুমি যেমন আমাকে অভিসম্পাত করিলে, আমিও বলিতেছি তোমারও কাম পূর্ণ হইবে না। [আদি ৭৫]। 'বিদায় অভিশাপে' কচের প্রত্যভিশাপ নাই, আছে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা,

> আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
> ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে। [বিদায় অভিশাপ]

'সৌহার্দে চানুরাগে চ' প্রীতিমতি দেবযানীর চিত্রটি নূতন না হইলেও—হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত রবীন্দ্রনাথে নূতন; বাচনভঙ্গী এবং অরণ্যের ··· শকল্পগুলিও মৌলিক।

'গান্ধারীর আবেদন'এর মূল মহাভারতের সভাপর্ব ও উদ্যোগপর্ব। সভাপর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা চরমে উঠিলে গান্ধারী বলিয়াছিলেন, 'তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ'। মহাভারতে গান্ধারী ধর্মভীরু নারী, তাঁহার জীবনের মূলাদর্শ 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ'। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীতেও এই আদর্শ প্রতিবিম্বিত, তাঁহারও আবেদন, 'ত্যাগ করো এইবার'। গান্ধারী এখানে দুর্যোধন-জননী হইয়াও সমগ্র অত্যাচারিতা নারীর প্রতিনিধি। চরিত্রটি মহাভারতীয় চরিত্র হইতে ভিন্ন নয়। অবশ্য মহাভারতে দ্রৌপদীর প্রতি গান্ধারীর কোন আশীর্বাণী নাই, রবীন্দ্রনাথে উহা কুন্তীর উক্তি হইতে গৃহীত। ভানুমতী-গান্ধারী সংবাদও মৌলিক। 'অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে' ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এ ধরনের উক্তি মহাভারতে নাই। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র চিরকপট। তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু কৌটিল্যনীতির দিক হইতে। অবশ্য পাপের পরিণাম তিনি জানিতেন, জানিয়াও

পুত্রস্নেহবশে ও জ্ঞাতির প্রতি অসূয়া হেতু তিনি পাপের সমর্থন হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। দুর্যোধনের প্রতি তাঁহার যে স্নেহান্ধতা ছিল, তাহা সুপরিস্ফুট। দুর্যোধন মহাভারতের কূটরাজনীতিজ্ঞ, মদোদ্ধত দুর্যোধনেরই প্রতীক। দুর্যোধন যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা মহাভারতোক্ত 'কণিক-নীতি' বা শুক্রনীতি বা বার্হস্পত্য নীতিরই প্রতিধ্বনি—নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যে দৃষ্টান্ত ও ঔপম্য গর্ভ বাচন দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে গৃহীত। কর্ণ ও কুন্তী রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি নয়। কুন্তী এখানে স্নেহশীলা জননী। মহাভারতেও কর্ণকে রঙ্গশালায় দর্শন করিয়াই কুন্তীর মূর্চ্ছা ['কুন্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ' —আদি ১০১]; দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণের অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সংবাদে কুন্তীর সন্তোষ ['কুন্ত্যাশ্চ প্রত্যভিজ্ঞায় দিব্যলক্ষণসূচিতম্। পুত্রমঙ্গেশ্বরং স্নেহাচ্ছন্না প্রীতিরজায়ত' —আদি ১৩২]; বনপর্বে কানীন পুত্রকে মণিমঞ্জুষায় ভরিয়া জলে ভাসাইতে গিয়া কুন্তীর বিলাপ ও বাৎসল্য ['ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি। যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র স্তনং পাস্যসি দেবজ॥' —বন. ২৭২] রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোগপর্বে কুন্তী নিজের পুত্রদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদুরের নিকট যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভীতা হইলেন, কৌরব পক্ষের ভীষ্ম-দ্রোণের কথা চিন্তা করিয়া ভাবিলেন,—একমাত্র পাপমতি কর্ণই মোহবশতঃ দুর্মতিপরায়ণ দুর্যোধনের অনুবর্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে। অতএব আজ তাহার নিকট যাইয়া, যাহাতে পাণ্ডবদের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিব, 'আশংসে ত্বদ্য কর্ণস্য মনোঽহং পাণ্ডবান্ প্রতি'। ইহারই ফল কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। এই সংবাদে কুন্তী স্বার্থপরায়ণার ন্যায় কার্য করিয়াছেন, কর্ণের প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ এখানে অনুদ্‌ঘাটিত, স্নেহ যাহা তাহা পাণ্ডবদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে কুন্তীর মধ্যে অপার মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্ণের যুক্তি ও প্রত্যাখ্যানোক্তি মহাভারতেরই প্রতিধ্বনি, কিন্তু একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার স্নেহবুভুক্ষা :

এসো স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল।

এ ধরনের উক্তি মূল মহাভারতে নাই।

'নরকবাস' কবিতার উৎস বনপর্বের সোমক-ঋত্বিক কাহিনী [বন, ১০৫-৬]।

মহাভারতের কাহিনী এখানে ঢালিয়া সাজানো। মহাভারতে আছে, ঋত্বিক এক-পুত্রক সোমক রাজাকে দিয়া পুত্রমেধ যজ্ঞ করাইয়া তাঁহাকে শতপুত্রের অধিকারী করিয়া তুলেন। বৈধকর্মে হিংসাহেতু ঋত্বিক প্রত্যবায়ভাগী হইয়া নরকে গমন করেন এবং রাজা সোমক স্বর্গগমনের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু রাজা ঔদার্যবশে স্বীয় পুণ্যফল ঋত্বিককে অর্পণ করিয়া সমভাবে ঋত্বিকের সহিত নরক ভোগ করিয়া একসঙ্গে উভয়ে সহিত মুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে নরকের বর্ণনা দিয়াছেন, নরকবাসী প্রেতগণের মর্ত্য-প্রীতির কথা বলিয়াছেন—এগুলি মহাভারতে নাই। তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মাধর্মের দিক হইতে বিচার না করিয়া কাহিনীটিকে মানবধর্মের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মানবধর্ম দয়া-ক্ষমা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় ঋত্বিক নরক ভোগ করিতেছেন, আর সোমক মানবস্নেহবশতঃ স্বর্গের অধিকার লাভ করিয়াছেন। সোমকের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উভয়স্থলেই উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। সোমক বলেন।

> পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকানৃতেঽহং ব্রহ্মবাদিনম্।
> ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং সুরালয়ে ॥
> নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণাঽস্য সমো হ্যহম্।
> পুণ্যাপুণ্য ফলং দেব সমমস্ত্বাবয়ো'রদম্ ॥ [বন, ১০৬]

তেমনি বলেন রবীন্দ্রনাথের সোমক :

> যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
> ততকাল তার সাথে কর মোর যোগ,
> নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

রবীন্দ্রনাথে মহাভারত-চর্যা এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে মহাভারতে আছে, অর্জুন মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং মণিপুররাজের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহাকে জানান, বংশের নিয়মানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে পুত্রিকা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার যে পুত্র হইবে—সেই হইবে মণিপুরের বংশরক্ষক। অর্জুন এই সর্তেই চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র হয়। অর্জুন তিন বৎসর মণিপুরে থাকিয়া চিত্রাঙ্গদার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা প্রসঙ্গ অতি সংক্ষিপ্ত।

> তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদর্শনা ॥
> তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।
> দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্ ॥ [আদি ২০৮]

এই কাহিনী-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব প্রেমের বৃত্ত রচনা করিয়াছেন, এবং নারী সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চাহিয়াছেন রূপ-পসারিণীর বেশে নারী যে পরিচয়, তাহা পুরুষের লালসাকে উদ্দীপিত করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারে, কিন্তু প্রেম জাগাইতে পারে না। মদনসহায়ে নারীর যে জয়, সে জয় নারী-জীবনের সার্থকতা বহন করে না। নারীর আসল রূপটি রহিয়াছে নারী-হৃদয়ে। হৃদয়-সৌন্দর্যের সেই জ্যোতির্ময় আলোকেই নারীর যথার্থ পরিচয়। সে সৌন্দর্য অবিমিশ্র ভোগ নয়, তাহার সহিত দুঃখ, ভয়, লজ্জা, দুর্বলতাও জড়িত—কিন্তু তাহাই প্রকৃত নারী-হৃদয়। অপূর্ণতা মিশানো সেই 'অনন্ত-মহৎ' হৃদয় যেদিন পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয়, সেইদিনই নারীর সার্থকতা। তাই অর্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন :

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথে চিত্রাঙ্গদা শুধু নারী নয়, একটি তত্ত্ব।